মধ্যযুগে বাঙ্গলা

কালীপ্রসন্ন

মধ্যযুগে বাঙ্গলা

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন ১৩৩০

মূল্য ৩ টাকা।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১ হইতে ২৭ ফর্ম্মা কালিকা যন্ত্রে এবং অবশিষ্ট
সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে মুদ্রিত।
প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল।

উৎসর্গ পত্র

স্বর্গীয়

পরমারাধ্য পিতৃদেবের

শ্রীচরণ কমলে।

বিজ্ঞাপন।

দুই বৎসর কাল নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের কবল-মুক্ত হইল। কখনও নিজের অসুস্থতা কার্য্যের অন্তরায় হইয়াছে, আবার আমি প্রস্তুত হইলে ছাপাখানা অপ্রস্তুত করিয়াছে। প্রুফ্ দেখার ত্রুটিতে অনেক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। 'মধ্যযুগ' শব্দ লইয়া মতভেদ হইতে পারে; গ্রন্থভাগে মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতে মধ্যযুগ কল্পিত হইয়াছে। এই পুস্তককে মধ্যযুগের বাঙ্গলার এক সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ইতিহাস বলিতে পারি না। একালে 'বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাসে আবার 'পাথুরে প্রমাণ' চাই। তত শক্ত জিনিস হজম করিবার সাধ্য না থাকিলেও বহুতর পুস্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব প্রকৃতের অনুসরণ করা গিয়াছে। গ্রন্থাদির নামের তালিকা দিয়া পুঁথি বাড়াইবার আবশ্যক দেখি না। সাময়িক পত্রে ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রবন্ধ দিয়াছিলাম তাহাই যোড়াতাড়া দিয়া 'সেকালের চিত্র' নামে এক পুস্তক ছাপিতে দেওয়া হয়; তাহার কয়েক ফর্ম্মা ছাপা হইয়াও নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেই কল্পনা পরিবর্ত্তিত আকারে 'মধ্যযুগে বাঙ্গলায়' পরিণত হইল। 'যে যাহা লিখিবে তাহাই মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি'; মহাজনের এই উক্তি সুচিরকাল আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে। জীবনের ব্রত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের শেষাংশের উপকরণ নানা উপায়ে সংগৃহীত হইলেও দেশ-কালের অবস্থা এখন ঐ রূপ গ্রন্থ প্রকাশের অনুকূল নহে। মধ্যযুগের

রাজনীতিক বিবরণ নানা গ্রন্থে আলোচিত হইতেছে বলিয়া উহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সে কালের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য এই পুস্তকে বলা হইল না; এখনও অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনা শেষ হয় নাই।

যে মহানুভবের অর্থসাহায্যে সে কালের চিত্র মুদ্রণের উদ্যোগ হয়, নামোল্লেখ তিনি ইচ্ছা করেন না। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ অনুগ্রহ করিয়া মধ্যযুগের ইতিহাসের ১৮০ খণ্ড ক্রয় করিবার আজ্ঞা দেওয়ায় গ্রন্থ প্রকাশ সহজ-সাধ্য হইয়াছে। চিত্রগুলির ব্লক্ প্রকাশক প্রস্তুত করাইয়াছেন; কেবল ৺ভুবনেশ্বরীর ব্লক্ সুহৃদ্বর সতীশচন্দ্র মিত্রের নিকট পাইয়াছি। অন্যান্য প্রাচীন মূর্ত্তির সহিত তুলনায় এই ত্রিপুটেশ্বরী মূর্ত্তি মধ্যযুগের প্রথমে নির্ম্মিত এই ধারণা হওয়ায় ইহা গ্রন্থারম্ভে দেওয়া হইল।

দুর্গাগ্রাম
১লা আশ্বিন—১৩৩০। } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।



শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র।

অবতরণিকা।

জগতের ইতিহাসে এক জাতির নব অভ্যুত্থানে অন্য প্রাচীনতর জাতির পতন নিত্য ঘটনা। যে আর্য্য-সমাজ যুগ-যুগান্তর ব্যাপী অধিকারে সমগ্র ভারতে ধর্ম্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা বিস্তার করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, কালবশে তাহাদের ক্ষাত্রশক্তির অধঃপতনে পাশব-বলে বলীয়ান্ অপরের জয়লাভ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। এমন সময় গিয়াছে যখন ভুবন-বিজয়ী আলেক্জণ্ডারও ক্ষৌদ্রকাদি ক্ষুদ্র সীমান্তবাসী জাতির বল পরীক্ষা করিয়াই ক্লান্ত হইয়া গ্রীষ্মাধিক্যে সেনা-দলের অগ্রসর হইবার অনিচ্ছার ছলে প্রত্যাবর্ত্তনই সৎপরামর্শ বিবেচনা করিয়াছিলেন। শক হূণাদি বর্ব্বর জাতি পশ্চিম ভারতে উৎপতিত হইয়া সময়ে হিন্দু-শক্তির বিনাশ-সাধনের উদ্যোগ করিয়াও শেষে আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া পুড়িয়াছিল। তখন আর্য্য হিন্দুর প্রাণ ছিল, আঘাতে প্রতিঘাত চলিত; আবার তাহার সুবিশাল ক্রোড়ে নবাগতেরও স্থান হইত। নব-ধর্ম্মবলে উত্তেজিত দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতি আফ্রিকা পদদলিত করিয়া স্পেন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে; পূর্ব্ব রোমক-সাম্রাজ্যের প্রাচীন ভিত্তিও তাহাদের নিদারুণ আঘাতে কম্পিত হইয়াছে; সভ্যতর পারসিক জাতি উৎখাত হইয়াছে। কিন্তু তিনশত বর্ষের অধিককাল ধরিয়া ইস্লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা পূর্ব্বভাগে হিন্দু-রাজ্যের দিকে আর অগ্রসর হয় নাই। ক্ষুদ্র সিন্ধুরাজকে পরাভূত করিয়া কাসেমের মুসলমান দল অধিক-কাল ফলভোগের সুযোগ পায় নাই। নানা কারণে পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু-

রাজারা যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পার্ব্বত্য মরুভূমি নিবাসী জাতির নায়ক-স্বরূপে গজনবী সুলতানগণ বলসঞ্চয় করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। শেষে অমিততেজা মহমুদ প্রতিভাবলে প্রবল সৈন্যদল গঠিত করিয়া ধর্ম্ম-বিস্তারের সঙ্গে ধন লুণ্ঠনের লোভ মিলিত করিয়া দিয়া, ভারতের দিকে যখন ঐ প্রচণ্ড চমূ চালনা করিলেন, তখন সেই পার্ব্বত্য-স্রোতের গতিরোধ অসাধ্য হইয়া উঠিল।

দিগ্বিজয়ী সুলতান মহমুদের দুর্ব্বার আফ্‌গান ও পার্ব্বতীয় সেনাদলের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তৃণের ন্যায় উড়িয়া যাওয়া (১) গৃহ-কলহে দুর্ব্বলীকৃত উত্তরাখণ্ডের ক্ষত্রিয় (?) রাজগণের পক্ষে কলঙ্কের কথা না হইতে পারে। এক সময়ে সভ্যতর প্রাচীন রোমক জাতি অসাধারণ দেশাত্ম-বোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া হানিবলের বলহানির যে আয়োজন করিয়াছিল, অধঃপতিত ভারত-ক্ষত্রকুলের পক্ষে সেরূপ রাষ্ট্রীয় সুযোগ ঘটে নাই। বহুতর সামন্ত রাজার অধীনতায় স্থাপিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি শক্তি সঞ্চয়ের অনুকূল ছিল না। গজনবী সুলতানেরা পঞ্জাবে স্থায়ী ভাবে যে মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা আর সিন্ধুদেশে মহম্মদ বিন্ কাসেমের আধিপত্যের মত উৎখাত হইল না। গোরের পার্ব্বত্য উপত্যকার নব মুসলমান মহমুদের বংশধরগণকে নির্জ্জিত করিয়া শেষে পঞ্চনদে প্রবেশ করিল; তখন অব্যবহিত পূর্ব্বভাগের রাজপুত-রাজগণের সহিত উহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইল। তোমর বংশীয় দিল্লীপতিগণই ইতঃপূর্ব্বে বৈদেশিক আক্রমণে বাধা দিয়া আসিয়াছিলেন, এখন চাহমান্ বংশের প্রথিত—নাম পৃথ্বিরাজের স্কন্ধে সেই ভার পড়িল। তিনি বারম্বার মুসলমানকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া চারণ গ্রন্থে উল্লেখ

(১) আল্-বিরুণী (আবি রেহান্)

আছে। কিয়ৎকাল মাত্র প্রতিহত হইলেও ঐ পার্ব্বত্য স্রোতঃ আর বাধা মানিল না। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু রাজারা তখন ঈর্ষা ও কলহে কালাতিপাত করিতেছিলেন। যখন ১১৯২ খৃষ্টাব্দে গোরদলপতি মহম্মদ বিন্ সাম দিল্লী প্রদেশ আক্রমণ করিলেন, তখন পৃথ্বিরাজ অমিতবিক্রমে হিন্দু-সেনা চালনা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, একথা মুসলমানী ইতিহাসেও স্বীকৃত। প্রভুভক্ত এক সৈনিকের পৃষ্ঠদেশে আহত মহম্মদকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিল; পরবর্ষে বলসঞ্চয় করিয়া গোরীয় বীর চাহমান্ নায়ককে পরাভূত করিয়া ভারতে মুসলমান রাজত্বের বীজ বপন করিলেন। দেশীয় প্রবাদে বিশ্বাস করিলে এই সময়ে কানোজ-পতি জয়চন্দ্রের সহিত কলহ হিন্দুর কাল স্বরূপ হইয়াছিল; জয়চন্দ্রের দশাও অনতিবিলম্বে সমান দাঁড়াইল।

কিন্তু মধ্য-আর্য্যাবর্ত্তের নবক্ষত্রিয় রাজপুতের তখনও শক্তি ছিল। দিল্লী প্রদেশ অধিকৃত হইলেও আজমীরের চৌহান্‌গণ সত্বরে বিজয়ী মুসলমানের পদানত হয় নাই। নিজের দেশ রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত ঐ চৌহান্ ও রাঠোরদিগের তৎকালিক আচরণে পরিস্ফুট হইলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, রাষ্ট্রনীতির সাধারণ সূত্রেও তাহাদের জ্ঞানের অভাব ছিল। যূপ-কাষ্ঠের সম্মুখে আনীত মেষ স্বচ্ছন্দে নবদুর্ব্বাদল চর্ব্বণ করিয়া থাকে; পা মোচড়াইয়া তসলায় ফেলিয়া ধরিলেও কাণ্ডজ্ঞানের উদয় হয় না, কাটিয়া ফেলিবার পরেই যত ছট্‌ফটানি। চাহমানের পরবর্ত্তী চেষ্টিত বা জয়চন্দ্রের কিশোর পুত্রের অধিনায়কতায় গাহড়বালের কিয়ৎকাল আত্মরক্ষার উদ্যম ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। চাহমান ও রাঠোরের দেশাত্মবোধ জ্ঞান ছিল না। আত্মদ্রোহিতাই একালের হিন্দুর কাল হইয়াছিল; একতা থাকিলে ইতিহাস অন্য ভাব ধারণ করিত, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, ঐ দুই শক্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে পাঠান (?)-

বন্যা নিম্নভূমি প্লাবিত করিল। ইতি মধ্যেই রন্ধ্রপথে লুণ্ঠন লব্ধ অর্থলোলুপ পার্ব্বতীয় দরিদ্র দুর্ব্বৃত্ত দলের ধারা শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। তাহারই অন্যতম স্রোত প্রথমে ক্ষীণকায় থাকিলেও বাঙ্গলার নিম্নভূমিতে উপনীত হইয়া বিশাল বপু ধারণ করিয়াছিল; শেষে সহস্রধারায় পরিণত হইয়া বঙ্গ সমাজ-সাগরে বিলীন হইয়া গেল।

এমন দিন গিয়াছে যখন বাঙ্গালীও এক শক্তিশালী জাতি ছিল। পুরাকালের কাহিনী পরিত্যাগ করিলেও দেখিতে পাই, মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজক উপস্থিত হইলে, এই বাঙ্গালী জাতির নায়কেরাই পরামর্শ করিয়া রাজাসনে গোপাল নরপালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল দেবপালের বিরাট্ বঙ্গীয়-বাহিনী এক সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে। 'গান্ধার হ'তে জলধি শেষ' তাঁহাদের জয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। "সমগ্র জম্বুদ্বীপ ভূপাল" একদিন বাঙ্গলার পালের অনুগত হইয়া সেনাবল বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। যোদ্ধজাতির কথা দূরে থাকুক্, এককালে দেবপালের বৃহস্পতি-প্রতিম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী কেদার মিশ্র মহাভারতের যুগের দ্রোণাচার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রণপাণ্ডিত্যও প্রদর্শন করিয়াছেন; মন্ত্রীপুত্র সোমেশ্বরও যুদ্ধে সে যুগের ব্রাহ্মণের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ তখন কেবল ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং রাজমন্ত্রী ছিলেন না, জননায়কও হইতেন। পালরাজের পতনের পরেও হেমন্তসেন 'নিজভুজমদমত্ত' রিপুকুলের শাস্তা, বিজয়সেন 'বিজয়ী' বল্লালসেন 'দিবসকর' সদৃশ তেজীয়ান্ 'নিখিলচক্রতিলক' ছিলেন; তাম্রশাসনের এই সমস্ত বিশেষণ অতিরঞ্জিত বোধ হয় না। যে মহারাজ লক্ষ্মণসেন যৌবনে কলিঙ্গ-বিজয়ী, শ্রীক্ষেত্র, বারাণসী এবং প্রয়াগে যাঁহার জয়স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহারাই বৃদ্ধ দশায় বিজাতীয় আক্রমণে রাজ্যলোপ কিরূপে সম্ভবে? এই সমস্যা পূরণে কেহ কেহ লক্ষ্মণসেনের পরলোকান্তে মুসলমান বিজয় ঘটিয়া-

ছিল, একথা কষ্টকল্পিত প্রমাণের বলে, কুত্রাপি বা স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্হাজ সিরাজ নদীয়া আক্রমণ এবং রায় লস্মণিয়ার পলায়ন বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের এই অংশ গল্পগুজবে পূর্ণ (২); এই

(২) গৌড় বিজয়ের চত্বারিংশৎ বৎসর পরে ঐতিহাসিক মিন্হাজ এদেশে আসিয়া সম্সাম্-উদ্দীন নামে বখ্তিয়ারের এক প্রাচীন সৈনিকের সাক্ষাৎ পান। মগধ এবং গৌড় জয়ের বিবরণ সম্ভবতঃ এই সম্সাম্ ও অন্য মুসলমানের কথিত উপাখ্যান হইতে সংগৃহীত। গল্পে লিখিত হইয়াছে যে, লস্মণিয়া পিতার মৃত্যুকালে মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে জ্যোতিষিরা গণিয়া বলিলেন যে, সেইকালে সন্তান প্রসূত হইলে হতভাগ্য হইবে। রাণী আদেশ দিলেন, তাঁহার পা দুইটি বাঁধিয়া তাঁহাকে উর্দ্ধপদে রাখা হউক; তাহাই করা হইল। শুভ মুহূর্ত্তে পায়ের বাঁধন খসাইয়া দিলে পুত্র প্রসূত হইল, কিন্তু রাণী মারা গেলেন। নবকুমারকে তখনই সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। লস্মণিয়ার অশীতি বর্ষ বয়সের সময় বখ্তিয়ার সদলে নদীয়া আক্রমণ করিলেন। সৈন্যদল পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; সপ্তদশ আরোহীর সহিত রাজদ্বারে উপনীত হইয়া বখ্তিয়ার যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই কাটিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধ রাজা তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন, সংবাদ পাইয়া খিড়কী দুয়ার দিয়া পলাইয়া নৌকারোহণে শঙ্কনাথে উপস্থিত হইলেন ইত্যাদি। তবকাৎ-ই নাসিরীতে আরও অনেক আজগুবী কথা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্তিয়ার খিলিজী বঙ্গ বিজয় করেন, এ কথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার। কিন্তু শুধু চটিলে চলিবে না, তা চট্টোপাধ্যায় হইলেই বা? প্রমাণ প্রয়োগ চাই। এ কালে অনেক বাঙ্গালী লেখনী-মুখে লক্ষণসেনের কলঙ্ক মোচনে অগ্রসর; কিন্তু কলমের জোরে কলঙ্ক ঘুচে না, বরং কলমই বাঙ্গালীর কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! 'বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে' ইতিহাস রচনার পক্ষপাতী আমার সুকৃতী ছাত্র শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধিক কিছু করিতে পারেন নাই; কেবল ভরসা দিয়াছেন, 'যাহা ভূগর্ভে অথবা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত আছে তাহা যখন দিবালোক দর্শন করিবে'—তখন নূতন ইতিহাস রচিত-

অবস্থায় ঐতিহাসিক সমালোচনায় তথ্য নির্ণয় করা কঠিন। হিন্দুর রচিত কোন ইতিহাস নাই। মহম্মদই বখ্‌তিয়ার যে তাঁহার মালভূমি নিবাসী ধনলুব্ধ, পাশব-বলে দক্ষতর সৈনিক সঙ্গে সহসা উৎপতিত হইয়া প্রথমে বিহারের রাজধানী, শেষে নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণের সহিত দেশীয় প্রবাদ যোগ করিয়া ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কাল কোন প্রকারে গ্রথিত হইতে পারে। বল্লাল সেন মিথিলা জয়ে যাত্রা করিলে জনরব উঠিয়াছিল যে তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে; তখন বালক লক্ষ্মণকে রাজাসনে স্থাপিত করা হয় এ প্রবাদ অনেক পরবর্ত্তী রচনা হইলেও লঘুভারতে আছে। সামন্তসেনের গঙ্গাবাস পাথরে খোদা সুতরাং অকাট্য, বল্লাল এবং লক্ষ্মণ উভয়েরই পর পর বৃদ্ধ-দশায় নবদ্বীপে গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন ইহাই আমাদের অঞ্চলের লোকে বিশ্বাস করে। লক্ষ্মণের অশীতিবর্ষ বয়সের পরে বখ্‌তিয়ারের আক্রমণ মিন্‌হাজের পুস্তকে আছে; ইহা লক্ষ্মণ সংবৎ (১১১৯ খৃঃ) এবং আক্রমণ-কালের সহিত মিলাইয়া ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ বা ১২০০ ধরিলে গোল হয় না। যত গোল, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মত ব্যক্তি জীবিত থাকিতে বিদেশীর দ্বারা লাঞ্ছনাতে বিশ্বাস করায়! বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পুত্রদিগের হস্তে রাজ্যভার দিয়া এক প্রকার বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া বিচিত্র নহে। অনুপযুক্ত পুত্রেরা গৃহকলহে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। রাখাল দাসও লিখিয়াছেন, "বিনা যুদ্ধে বা অল্লায়াসে গৌড়মণ্ডলের একমাত্র তোরণ পথ

হইতে পারিবে। বৃদ্ধ সে আশায় বসিয়া থাকিতে পারে কই? আবার, ভূগর্ভ হইতে রক্তের সন্ধানে লেখনী মুখে ময়লা মাটিই বাহির হয় দেখা যাইতেছে। অজগর কবে উঠিবে, কে জানে? হিন্দুর লিখিত ইতিহাস যখন পাওয়া যায় না, তখন নাসিরীর গল্প-গুজব কিছু বাদ দিয়া না লইলে উপায় কি?

অধিকৃত হইয়াছিল, মুসলমান সেনা গৌড়মণ্ডলে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, লক্ষ্মণ সেনের কুলাঙ্গার পুত্রত্রয় বোধ হয় তখন আত্মদ্রোহে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশ স্বধর্ম্ম ও স্বজনের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিলেন। (৩) ফলকথা, এই সময়ে বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার এবং স্বার্থপরতা প্রবল ছিল। কাব্যে হইলেও সমাজ-চিত্র ইতিহাসের এক প্রধান উপকরণ। তখন মুক্ত রাজপথে সায়ংকালেই বারবিলাসিনী দলের 'মঞ্জু মঞ্জীর ধ্বনি'—'বন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ'। ধর্ম্মের কথাও কি পরিচ্ছদে বাহির হইত, জয়দেবে তাহার নমুনা আছে। শ্রীমান্ কেশব সেনই বোধ হয় তখন রাজকার্য্য দেখিতেন। তিনি কৌমারে বীরব্রত হইলেও তখন কেবল 'কুরঙ্গী-দৃশা' লজ্জাবনতা সুন্দরীকুলের 'নীবিবন্ধ বিসরণে'ই ব্যাপৃত থাকিয়া উদ্ভট শ্লোকের 'নীবি মোক্ষো হি মোক্ষঃ' এই পরিহাস বাক্য সার্থক করিয়াছিলেন। অধঃপতন কেন না হইবে? বঙ্গের শেষ নবাবের যে গতি হইয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ হইবে বিচিত্র কি?

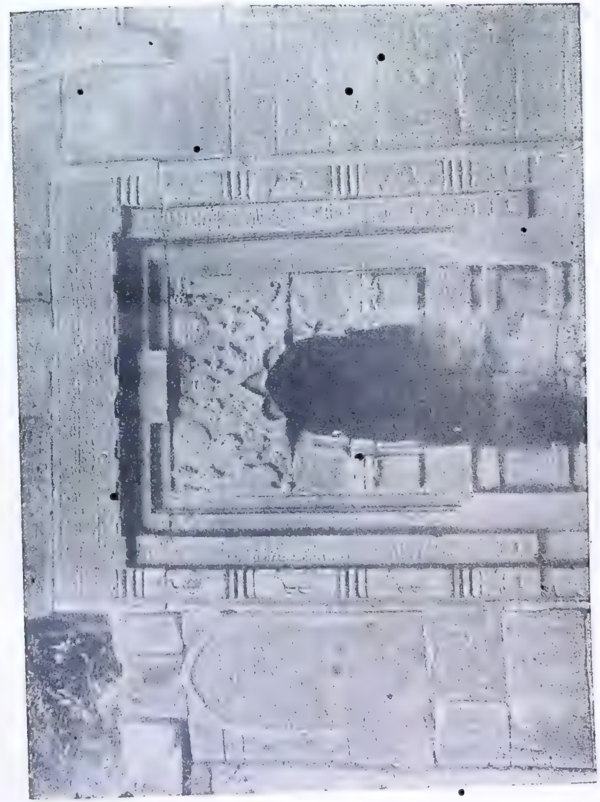
যে দিন খল্‌জবংশীয় খর্ব্বকায় মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার দারিদ্র্যের পীড়নে পিতৃভূমি অনুর্ব্বর গোর উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে আসিয়া গজনীর গোরীয় সুলতানের নিকট সৈনিকের সামান্য কর্ম্ম প্রার্থনা করেন, সে দিন কে ভাবিয়াছিল সেই নগণ্য সামান্য ব্যক্তি শেষে ভারতের ইতিহাসে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিবে? দেহের খর্ব্বতা সেনাদলে প্রবেশের

---

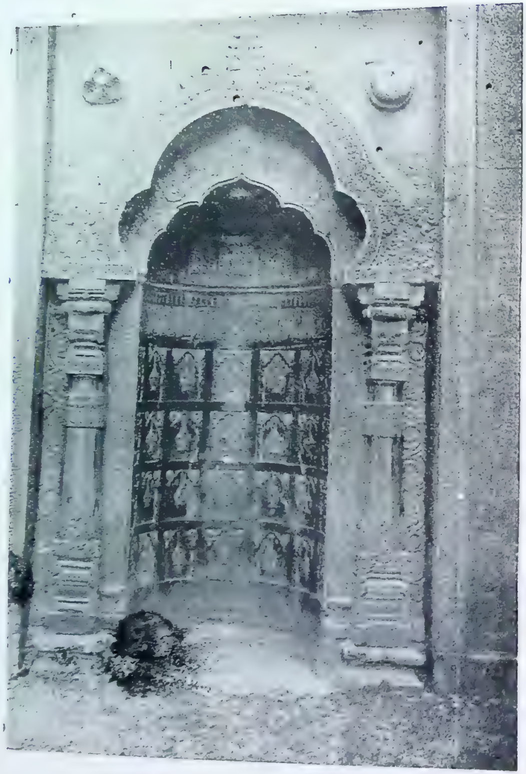
(৩) রাখাল দাসের উল্লিখিত বুদ্ধ গয়ায় অশোক চল্লাদির শিলালিপি, ১১৭০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণের লোকান্তর হওয়ার প্রমাণ বলিয়া অনেকে গ্রহণ করেন না। লক্ষ্মণ-সেনের অমাত্য বটু দাসের পুত্র শ্রীধরের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ইহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের পরলোকান্তে মুসলমান আসিয়াছিল, এ কথা এখনও প্রমাণিত হয় নাই।

অন্তরায় হইলে বখ্‌তিয়ার অবশ্য কিছু দিনের জন্য একটি তুচ্ছ চাকরী পাইয়াই কৃতার্থ হইলেন। শেষে দেখিলেন, দলে দলে স্বদেশের লোকে ভারত আক্রমণে সজ্জিত হইতেছে; ভারতের ধন রত্নে দুঃখ দৈন্য দূরে যাইবে ইহা নিশ্চিত ভাবিয়া এই কর্ম্মঠ মুসলমান দুই চারি জন সমদশাপন্ন লোকের সঙ্গে যাত্রা করিয়া দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন। তখন সবে মাত্র দিল্লীপ্রদেশ গোরী বিজেতৃদলের করায়ত্ত হইয়াছে। দিল্লীর সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষও খর্ব্বস্থূলতনু গণ-নায়কের আবাহন করিলেন না; শেষে বদাওয়নের সেনাপতি বক্তিয়ারের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে সৈনিকের কার্য্য দিলেন। অযোধ্যা প্রদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষতঃ লুণ্ঠনাদি ব্যাপারে সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়া বখ্‌তিয়ার চুনারের জায়গীর লাভ করিলেন। সেখান হইতে সময়ে সময়ে সদলে বাহির হইয়া চারিদিকের স্থান সমূহে উৎপাত আরম্ভ করিয়া তিনি দেশীয় লোকের ভীতি এবং অনুচরের অনুরাগ অর্জ্জন করিতেছিলেন। ক্রমে লুণ্ঠন লব্ধ অর্থ সাহায্যে অনেক আফগান্ বর্ব্বরকে অনুগত করিয়া লইয়া বখ্‌তিয়ার এক সেনাদল গঠিত করিলেন। অতঃপর বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের সীমান্তভাগ এমন কি মুঙ্গের পর্যান্ত তাঁহার দলের সাময়িক পদার্পণে উপক্রুত হইল (৪)। বিহারের তৎকালিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। পাল বংশের শেষ রাজা গোবিন্দ পাল পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকের হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক বারম্বার নির্জ্জিত হওয়ায় এই সময়ে মগধ বা দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ মাত্র তাঁহার প্রভুশক্তি স্বীকার করিত। দেশ রক্ষার সুব্যবস্থা বা সৈন্যবল ভাল ছিল না। বখ্‌তিয়ার ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজধানী উদ্দণ্ডপুর (বর্ত্তমান বিহার) আক্রমণ করিলে মুষ্টিমেয় সেনা মাত্র লইয়া দুর্গ এবং নগররক্ষা অসাধ্য হইল। রাজা যুদ্ধে নিহত হইলে মুসলমানদল লুণ্ঠন এবং হত্যায় নাগরিক বর্গকে

(৪) তবকাৎ-ই-নাসিরী (মিন্‌হাজ্ সিরাজ)



জাফর খাঁর মসজিদের দ্বার—সপ্তগ্রাম (ত্রিবেণী) — জ



আদিনা মস্‌জিদের মিহ্‌রাব্ (পাণ্ডুয়া—মালদহ)—ঝ

উদ্বাস্ত করিয়া শেষে গিরিশীর্ষে উদ্দণ্ডপুর সংঘারাম আক্রমণ করিল। এখানে মুণ্ডিতশীর ভিক্ষুর দলও বর্ব্বরের হস্তে পরিত্রাণ পাইল না (৫) ; কৃপাণের মুখে পণ্ডিত মূর্খ সকলেই উৎসর্গীকৃত হইল। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ্ লিখিয়াছেন, দুর্গ অধিকৃত হইলে দেখা গেল উহা একটি বিদ্যালয়, তথায় রাশীকৃত পুস্তক সাঞ্চত রহিয়াছে। গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের সন্ধান করিয়া জানা হইল যে সমস্ত হিন্দুই নিহত হইয়াছে। উহারা হিন্দী ভাষায় ঐ স্থানকে বিহার বিদ্যাপীঠ কহে (৬)।

দুর্ব্বল গোবিন্দ পালকে নির্জ্জিত করিয়া বখ্‌তিয়ার সহজেই মগধের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির মঠ বা সংঘারাম বিজয় দৃপ্ত মুসলমানের সমধিক আক্রোশ আকর্ষণ করিয়াছিল ; কারণ বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধ তাহাদের বিশ্বাসে ধর্ম্মযুদ্ধ, ধর্ম্ম-মন্দিরাদি ধ্বংস

---

(৫) Mohammad-i-Bakhtiar by the force of his entrepidity, threw himself into the postern of the gateway of the place and they captured the fortress and acquired great booty. The greater number of inhabitants of that place were Brahmans and the whole of those Brahmans had their heads shaven ; and they were all slain (তবকাৎ নাসিরী, অনুবাদ, ৫৫২ পৃঃ)

(৬) There were great numbers of books there ; and when all these books came under observation of the Musalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respeeting the import of those books ; but the whole of Hindus had been killed. On becoming acquainted, it was found that the whole of that fortress and city was a college, and in the Hindi tongue, they call a college, Bihar—তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুবাদ।

কেহ কেহ উদ্দণ্ডপুর সংঘারাম ও রাজদুর্গ এক মনে করিয়া ভ্রম করেন, কিন্তু বিহারের প্রাচীন দুর্গের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান ; সংঘারাম ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত ছিল।

করাও এই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। হিন্দুর দেশে লুণ্ঠনাদি তাহারা অন্যায় মনে করে নাই, এবং লুণ্ঠন ও ধ্বংস কার্য্যে এই যুগের তুরস্ক মুসলমান সমধিক ক্ষিপ্রহস্ত ছিল। বিক্রমশীলার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারও উদ্দণ্ডপুরের দণ্ডভোগ করিয়াছিল, তবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের অনেকেই পূর্ব্ব সূচনায় এখান হইতে প্রস্থান আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশিষ্টেরা নিহত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার বিহারের সহিত ভস্মীভূত হইয়াছিল। অনেকের মতে মধ্যএসিয়ার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তুরস্ক জাতি ইতঃপূর্ব্বে আরব দেশ আক্রমণ করিয়া নৃশংস ব্যবহার করায় মুসলমানেরা বৌদ্ধের প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত আফগান দল এদেশের হিন্দুর জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা করে নাই; সারনাথের প্রসিদ্ধ বিহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কাশীর একাংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল। ইয়ূন চাং কথিত বিরাট মহেশ্বর মূর্ত্তির অন্তর্ধান সম্বন্ধে ইতিহাস কোন সংবাদ দেয় না। বাঙ্গলায় হিন্দুর "দেউল দেহারা ভাঙ্গে" একথা সর্দ্ধর্ম্মীর পুঁথিতেই পাওয়া যাইতেছে (৭)। কানোজকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমান নায়কবর্গ এই সময়ে চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন এবং তথাকথিত ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পশ্চিম ভারতে তখনও লোকের আত্মরক্ষা করিবার কথঞ্চিৎ সাধ্য ছিল। বিহারে, বৌদ্ধ বিহারের এ যুগের ধর্ম্ম সাধনার প্রভাবে হৃদয় দৌর্ব্বল্যের যেরূপ প্রসার হইয়াছিল, পাল বংশের অবনতির সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহও সেইরূপ ক্ষত্রিয় শক্তি অর্থাৎ বাহুবল বিনাশের সহায়তা করিয়াছিল।

এখানে শ্রীমান্ রাখাল দাসের ইতিহাস হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 'সেনরাজ লক্ষ্মণাবতী রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইলেও বিনাযুদ্ধে সমগ্র

(৭) শূন্য পুরাণ—রমাই পণ্ডিত। এই সময়েই মুসলমানের ভয়ে মগধ ও উত্তর বঙ্গের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ নেপালে পলায়ন করায় তথায় বৌদ্ধ গ্রন্থাদি পাওয়া যাইতেছে। হিন্দুর দেবমূর্ত্তি এবং ইতিহাসের উপকরণ কত নষ্ট হইয়াছে, কে তাহার খবর রাখে?

গৌড়মণ্ডল মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজী লক্ষ্মণাবতী নগর ও তাহার চতুষ্পার্শস্থিত সামান্য ভূমি মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশ মাত্র তাঁহার পদানত হইয়াছিল। এই সময়ে গঙ্গাতীর হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ ক্রোশ পরিমিত ভূমি তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণতীরে মুসলমানাধিকার বহুদূর বিস্তৃত ছিলনা, কারণ কামরূপ অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বখ্‌তিয়ার মহম্মদ শেরাণ নামধেয় জনৈক খল্‌জ আমিরকে গৌড় হইতে দশ দিনের পথ চত্বারিংশৎ ক্রোশ দূরে (৮) অবস্থিত লখ্‌নোর নগর অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের আট বৎসর পরে বখ্‌তিয়ারের স্থলাভিষিক্ত হসাম্ উদ্দীন বা গিয়াস্ উদ্দীন ইউয়জের অধিকারকালে, গঙ্গার উত্তরে দেবকোট পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে লখ্‌নোর পর্য্যন্ত ভূমি মুসলমান গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ তখনও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অধিকারী ছিলেন। সেন রাজবংশ হীনবল হইয়া পড়িলে দক্ষিণ বঙ্গ কিয়ৎকাল কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজগণের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। কলিঙ্গরাজ বারবার এই পথে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণাবতীর ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুগ্রল তোগান্ খাঁ ও ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন য়ুজ্‌বক্ কলিঙ্গসেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৬৫৩ হিজরায় (১২৫৫ খৃঃ) অথবা তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে য়ুজ্‌বক্ দক্ষিণে নবদ্বীপ ও উত্তরে বর্দ্ধন কোট পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। য়ুজ্‌বক্ নবদ্বীপ ও বর্দ্ধন কোট বিজয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ যে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন, তাহার

(৮) এখানে নাসিরী গ্রন্থে কিছু গোল আছে; দশ দিনের পথ কোন হিসাবেই চত্বারিংশৎ ক্রোশ হয় না। সেকালের সেনাদল এত ধীর পাদক্ষেপে অভ্যস্ত ছিলনা।

দুই একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুসলমান অধিকারের প্রারম্ভে সুলতানগণ কোন বিখ্যাত স্থান বিজিত হইলে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইতেন। কান্যকুব্জ বিজয় করিয়া অলতমশ এইরূপ নূতন মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সিকন্দরশাহ কামরূপ বিজয় করিয়া কামরূপ বা চাউলিস্তানের নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। সুলতান্ আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ কামরূপ, কামতা, জাজনগর এবং উড়িষ্যা বিজয় করিয়া স্মরণার্থ, বিজিত প্রদেশ সমূহের নাম নিজনামে মুদ্রিত মুদ্রায় সন্নিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। মুগীস্ উদ্দীন্ যুজবকের শাসন কালের পরে ষষ্ঠিবর্ষকাল লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয় নাই। সম্রাট্ গিয়াস্ উদ্দীন বলবনের মধ্যম পৌত্র বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান রুকন্ উদ্দীন্ কৈকায়ূস্ শাহের রাজ্যের শেষভাগে দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। ৬৯৮ হিজরার (১২৯৮ খৃঃ) দেবকোটের ভূত-পূর্ব্ব শাসন কর্ত্তা বহরাম ঈৎগীন্ জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম বিজয় করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম বিজিত হইলেও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ বঙ্গ মুসলমানের পদানত হয় নাই। ৮৭০ হিজরার (১৪৬৫ খৃঃ) অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুলতান্ রুকন্উদ্দীন্ বারবক্ শাহের রাজ্যকালে দক্ষিণ বঙ্গও সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল। কৈকায়ূশ শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শমসুদ্দীন্ ফিরোজ শাহের রাজত্ব কালে (৭০২-৭২২ হিজরী, ১৩০২-১৩২২ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল"। তারিখ নাসিরী এবং মুদ্রা হইতে উক্ত ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তিন পুত্র মাধবসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন পর পর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের উত্তর পুরুষ যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে ঐ শতাধিক বর্ষ রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম সম্পূর্ণ জানা যায় না। বল্‌বন কর্ত্তৃক তোগ্রল্ খাঁর বিদ্রোহ

দমনের সময়ে সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি কুলগ্রন্থের দনুজ মাধব এবং আইন আকবরীর রাজা নৌজা হওয়া সম্ভব; তাঁহার পূর্ব্বে ১২১১ শকাব্দে মধুসেন নামক 'রাজাধিরাজ শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বর' (৯) এক রাজার নাম সম্প্রতি জানা গিয়াছে, সম্ভবতঃ তিনিও সেনবংশীয়। সেনবংশের অন্য কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ব সীমায় হিমালয়ের পাদদেশে কতকগুলি পার্ব্বত্য রাজ্যের রাজা সেনবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুরসেন মণ্ডী ও সুকেত রাজের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পঞ্জাব গেজেটিয়ারে গৃহীত হইলেও তাঁহার দেশত্যাগের কাল এবং অন্যান্য বিবরণ সন্দেহ জনক। সেনবংশ বাঙ্গলার বৈদ্য এবং কায়স্থ উভয় জাতিতেই মিশিয়া গিয়াছিল। গৌড় মুসলমান বিজেতার হস্তগত এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ তাঁহাদের অধিকৃত হইলেও ১২২ বৎসর কাল সেন রাজারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মুসলমানের সহিত যুদ্ধাদির বিরাম ছিল না, অনুমান করিয়া লইতে পারি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরাকাণ এবং পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিরাও সময়ে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিয়া সেন রাজগণকে বিপন্ন করিত (১০)।

---

(৯) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত পঞ্চরক্ষা নামক বৌদ্ধগ্রন্থের পাদটীকায় ইহার নাম ও তারিখ দেওয়া আছে। আইন্ আকবরীতে উল্লিখিত সদাসেনের উদ্দেশ পাওয়া যায় না; সুরসেন প্রয়াগ যাত্রা করেন এবং তাঁহার বংশ হিমালয় প্রদেশে আছে বলিয়া প্রকাশ।

(১০) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী গৌড়ের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে আরাকাণের মগদিগের উৎপতন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ বিশ্বাসযোগ্য। মগেরা শেষে সেন রাজগণকে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করিয়াছিল।

মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার গৌড় বিজয়ের কিয়ৎকাল পরে সুলতান্ কুতবুদ্দীনের নিকটে গিয়া হস্তী ও লুণ্ঠনলব্ধ অর্থাদি দানে বশ্যতা স্বীকার করেন। বিজয়-গর্ব্বিত বখ্তিয়ার পরে কামরূপ হইয়া তিব্বত আক্রমণে অগ্রসর হইলে, পার্ব্বত্য প্রদেশে শত্রুহস্তে মুসলমান দলের ক্লেশের একশেষ হইয়াছিল (১১) প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কামরূপবাসীরাও তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছিল। বখ্তিয়ার দেবকোটে ফিরিয়া পীড়িত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সহচর আলিমর্দ্দান দেবকোটে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ; অনেকের মতে তিনি পীড়িত বখতিয়ারকে ছুরিকাঘাতে নিহত করিয়া সিংহাসন লাভের উদ্যম করেন। অন্যতম সেনানী মহম্মদ শেরাণ আলিমর্দ্দানকে পরাস্ত করিলে তিনি দিল্লীতে পলাইয়া কুতবউদ্দীনের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য আমিরগণের সহিত যুদ্ধ কলহে শেরাণ পরাজিত ও নিহত হইলে, আলিমর্দ্দান-ই দিল্লী হইতে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তিনি যথেচ্ছাচার আরম্ভ করায় একদল আমির তাঁহাকে নিহত করিয়া হসাম্ উদ্দীন্ ইউয়জ্‌কে কর্ত্তা করেন। কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পরে হসাম্ উদ্দীন্ গিয়াসুদ্দীন্ নাম ধারণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। সুলতান আল্‌তমশ তাঁহাকে দমন করিতে বাঙ্গলায় আসিলে, সন্ধি করিয়া গিয়াসুদ্দীন্ বশ্যতা স্বীকার করেন।

গিয়াসুদ্দীনের সময়ে উত্তর রাঢ় মুসলমান অধিকারে আইসে। তিনি লক্ষ্মণাবতী হইতে পশ্চিমে লখ্‌নোর এবং পূর্ব্বে দেবকোট পর্য্যন্ত দশ দিনের পথ একটি উচ্চ শরণি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ; বর্ষায় এই সকল স্থান জল

(১১) সম্ভবতঃ কামরূপের পশ্চিমোত্তর বাসী কোন পার্ব্বতীয় জাতির হস্তে বখ্তিয়ারের সৈন্য পরাভূত হইয়াছিল ; মুসলমান ইতিহাসে ইহা তিব্বত অভিযানে উঠিয়াছে।

এবং কর্দ্দমপূর্ণ হওয়ায় নৌকা ব্যতীত যাতায়াত চলিত না (১২) লখ্‌নোর বীরভূমির 'নগর' বলিয়া অনুমিত হয়। গৌড়ের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ অধিকৃত হইলে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ, জাজনগর (উড়িষ্যা), কামরূপ এবং ত্রিহুতের হিন্দু রাজ-গণকে কর প্রদানে বাধ্য করেন বলিয়া পারসী ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। মিন্‌হাজ গিয়াসুদ্দীনের দয়া, দানশীলতা এবং সুবিচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি পরে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করায় আল্‌তমশের পুত্র নাসির উদ্দীন্ বাঙ্গলায় আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। নাসির উদ্দীনের অকাল মৃত্যুর পরে বঙ্গে পুনরায় বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং আলতমশ আবার বাঙ্গলায় আসেন। তৎপরে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ শাসন কর্ত্তা হন ; ইনি জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করিতে গিয়া মহানদী তীরে কটাসিন্ দুর্গের পুরোভাগে উড়িষ্যা-রাজের সৈন্যদলের নিকট পরাস্ত হন (১২৪৩ খৃঃ)। পরবর্ষে উড়িষ্যা-রাজ গঙ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহদেব সসৈন্যে গৌড় মণ্ডল আক্রমণ করেন। লখ্‌নোর আক্রমণ করিয়া উড়িয়া সৈন্য তথাকার মুসলমান গণকে নিহত করিয়াছিল। উহারা লক্ষ্মণাবতী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তোগান্ খাঁর সাহায্যার্থ দিল্লীর বাদশাহের আদেশে তমুর খাঁ এক বৃহৎ সেনাদল লইয়া আসিতেছেন শুনিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই টুকু কৃতিত্ব লইয়াই উৎকল তাম্রশাসন লেখক কাব্য করিয়াছেন 'রাঢ় বরেন্দ্রের যবনীদিগের নয়নাশ্রুপূর্ণ অতএব কালিমশ্রী হইয়া গঙ্গাও এই রাজার অদ্ভুত কীর্ত্তিতে নিস্তরঙ্গা হইয়া অধুনা 'যমুনা' হইয়াছে-(১৩) ; গৌড়মণ্ডল অধিকার করিতে পারিলে কাব্যালঙ্কার কতদূর

(১২) তবকাৎ-ই নাসিরী—ইং অনুবাদ ৫৮৬ পৃঃ।

(১৩) 'রাঢ়া বরেন্দ্র যবনী নয়নাঞ্জনাশ্রু পুরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভঃ করুণাদ্ভুত নিস্তরঙ্গা গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ ॥'
Journal As. Soc. 1896. P 232.

উঠিত কে জানে? ইহার পূর্ব্বেও একবার উড়িয়ারা মুসলমানকে পরাস্ত করিয়াছিল। কেহ কেহ গঙ্গবংশীয়দিগকে বঙ্গীয় মনে করিয়া লইয়া আনন্দিত হন! যাহা হউক, তোগান্-তৈমুর গণ্ডগোলের পরে ইথ্তিয়ার উদ্দীন্ যুজবক্ শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইয়া উড়িষ্যা, আক্রমণ করিলেন। মিন্হাজ লিখিয়াছেন, রাজা পলায়িত হইলে তাঁহার পরিবারবর্গ, হস্তী ও ধনরত্ন মুসলমানের হস্তগত হইল (১৪); কিন্তু এই সময়ে উড়িষ্যার কোন অংশ অধিকৃত হওয়ার বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ ওড্ররাজের অধিকৃত দক্ষিণবঙ্গ বিজয় করিয়াই নায়ক যূজবক্ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; হইবার কারণ ও আছে, এই প্রদেশও আয়তনে বা সমৃদ্ধিতে নগণ্য ছিলনা। যূজবক অতঃপর কামরূপ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়া বহুতর ধনরত্ন লাভ করিলেন। কিন্তু বর্ষা আসিলে খাদ্যাভাবে তাঁহার সেনাদলের দুর্দ্দশা ঘটিল, তখন প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। জলপ্লাবিত ভূমিতে কামরূপ সৈন্য মুসলমানগণকে নির্জ্জিত করিয়া আহত যূজবককে বন্দী করিল; শেষ মৃত্যু আসিয়া তাঁহার যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। নবদ্বীপ ও বর্দ্ধনকোটের নাম সম্বলিত যুজবকের মুদ্রা দেখিয়া ঐ দুই স্থান তাঁহার সময়েই প্রথমতঃ অধিকৃত হয় এই অনুমান সঙ্গত নহে, তবে সাময়িক বিদ্রোহের পর পুনরধিকার সম্ভব। বিজয় যাত্রা কালেও এরূপ মুদ্রা অঙ্কিত হইতে পারে। নাসিরী গ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণী হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিণ রাঢ় পূর্ব্বেই বিজিত হইয়াছিল।

যূজবকের মৃত্যুর পর কিয়ৎকাল বঙ্গের শাসনভার লইয়া আমিরদিগের মধ্যে আবার বিবাদ বাধে। পরে বলবনের রাজত্বকালে তোগ্রল খাঁ কর্ত্তা

(১৪) তবকাৎ ই নাসিরী। এখানে পারসী ইতিহাস পাল্টা জবাবে পরিবার বর্গ পর্য্যন্ত ধৃত হইবার যে গল্প করিয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ সে সময়ে মুসলমান সেনা বাঙ্গলার দক্ষিণ ভাগ মাত্র সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল।

হইয়া কামরূপ ও জাজনগর আক্রমণ করিয়া ধন এবং বল সঞ্চয় করেন। তিনি পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় বল্বন্ তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত সদলে বাঙ্গলায় আসেন। তাঁহার অগ্রগামী সেনাদল তোগ্রলের নিকট পরাভূত হয়; শেষে বহুতর সৈন্য সমিভ্যাহারে সুলতান্ স্বয়ং আসিয়া পড়ায় তোগ্রল্ জাজনগরের দিকে (১৫) পলায়ন আরম্ভ করেন। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু রাজা দনুজ রায় বল্বনের সহিত সন্ধি করিয়া যাহাতে তোগ্রল ঐ দিক হইয়া পলায়ন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হন। ক্রমাগত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শেষে বল্বনের একদল সৈন্য তোগ্রলকে পরাস্ত ও নিহত করিল। বল্বন নিজ পুত্র বগড়া খাঁকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা এবং নিজ মনোনীত কয়েকটি লোককে নানা স্থানের অধিকারী বা এক্তাদার নিয়োজিত করিয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন—(১২৮২ খৃঃ)। এই সময়ে লক্ষণাবতী বল্গকপুর (বিদ্রোহী পুরী) নামে কথিত হইয়াছিল। অতঃপর বল্বনের বংশীয় কয়েকজন গৌড়ে রাজত্ব করেন; তোগলকদিগের সময়ে তাঁহাদের হস্ত হইতে শাসনভার দিল্লী হইতে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হয়। এই সময়ে কখনও বা গৌড় ও পূর্ব্ববঙ্গে দুইজন লোকের উপর শাসনভার পড়িত এবং অব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল। পঞ্চাশৎ বৎসরের উর্দ্ধকাল এইরূপে অতীত হইলে মহম্মদ তোগলকের সময়ের গোলযোগে ফকরউদ্দীন্ নামক সেনানায়ক পূর্ব্ব-বঙ্গে সুবর্ণগ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া গৌড় পর্য্যন্ত অধিকার করেন বলিয়া কথিত আছে। অল্পকাল গৌড় ও সুবর্ণগ্রামে দুইজন সুলতানের আধিপত্যের পরে শমস্উদ্দীন ইলিয়াস্ শা সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন রাজা

(১৫) বার্ণীর তারিখ ফিরোজশাহী—Elliot। এই জাজনগর লইয়া কিছু গোল আছে; কেহ কেহ ত্রিপুরাকে জাজনগর বলেন; উহা না হইলে পূর্ব্ববঙ্গ রাজকে পলায়ন নিবারণে সহায়তা করিতে অনুরোধ করার সঙ্গতি থাকে না।

হইয়াছিলেন (১৩৪০ খৃঃ)। এই সময়ে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী হইয়াছিল। ফিরোজ শা ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস্ শাকে দমন করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে বাঙ্গলায় আইসেন। ইলিয়াস্ দিল্লীশ্বরের বৃহতী বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসা না হইয়া একডালার সুদৃঢ় দুর্গে সদলে আশ্রয় লইলেন। বাদশাহীদল গৌড়মণ্ডল অধিকার করিয়া হিন্দু ভূস্বামীগণের অনেককে বশীভূত করিলেন; উত্তর বঙ্গের অনেকে ইলিয়াসের পক্ষপাতী হইলেও বাদশাহের নামেই অনেকে ঢলিয়া পড়িলেন। ফিরোজ শা পাণ্ডুয়া অধিকার করিলেন; কিন্তু প্রকাণ্ড জলপূর্ণ পরিখা বেষ্টিত সুদৃঢ় একডালা দুর্গ জয় করা অসাধ্য হইল (১৬)। ঐতিহাসিক শম্স আফিফ্ কাব্য করিয়া লিখিয়াছেন, মুসলমানের হত্যা এবং একডালার প্রাসাদোপরি সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণীর অশ্রুপূর্ণ নির্ব্বাক্ আত্ম-নিবেদন, বাদশার চিত্ত বিচলিত করায় তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শার মৃত্যুর সমকালে ফিরোজ শা পুনরায় গৌড়মণ্ডল আক্রমণ করায় ইলিয়াসের পুত্র সেকন্দর শা পিতার ন্যায় একডালা দুর্গেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এবার বাদশাহী দলে আরাদা, মঞ্জানিক প্রভৃতি তাৎকালিক ক্ষেপনী যন্ত্রাদিও আনীত হইয়াছিল। দুর্গের একটি প্রাচীর পড়িয়া যাওয়ায় বাদশাহী সৈন্য ঐ পথে দুর্গপ্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশে দুর্গস্থ রমণীগণ দুর্ব্বৃত্ত সৈন্যের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে পারে বলিয়া বাদশা মত দেন নাই, এই কথা লিখিয়া আফিফ্ পুনরায় নারীভক্তির আদর্শ দেখাইয়াছেন! ধর্ম্মভীরু হইলেও ফিরোজ শা কি বুঝিতেন না যে তাঁহার অভিযানে ঐ সকল ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী? ভগ্ন প্রাকার-পথে প্রবেশ

(১৬) একডালার দুর্গ গৌড় পাণ্ডুয়া হইতে কিয়দ্দূরে বর্ত্তমান মালদহ জেলাতেই স্থাপিত ছিল। কেহ কেহ অন্য জায়গায় স্থাপিত উল্লেখ দেখিয়া উহাকে পূর্ব্ববঙ্গে উঠাইয়া লইবার উদ্যমে ফিরোজের মতই বৃথা চেষ্টা পাইয়াছেন।

করিতেও সাহসে কুলায় নাই, ইহাই নির্গলিতার্থ। বাদশা খণ্ড যুদ্ধে নিজ দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই আর দুর্গজয়ের উদ্যম না করিয়া সেকন্দরের নীতিকুশল দূত বাঙ্গালী হয়বৎ খাঁর প্রস্তাব মত সন্ধি করিয়া ফিরিলেন (১৩৫৮)। সেকন্দর তাঁহাকে ৪০টি হস্তী এবং অন্যান্য উপঢৌকন দেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

অতঃপর পঞ্চাশ বৎসর কাল ইলিয়াস্-শাহী বংশই বাঙ্গলায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। সেকন্দর ৩২ বর্ষকাল প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন করিয়াছিলেন; তাঁহার নামে 'সেকন্দরী' গজ হইয়াছে। দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হিন্দু প্রজার সহায়তা পাইলেও তিনি রাজাসনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতার মত হিন্দুর সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, মনে হয় না। পাণ্ডুয়ার হিন্দু মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত আদিনা মস্জীদ (৭৬৬—৭৭০ হিঃ) নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৭)। "আদিনার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাষাণ নির্ম্মিত বহু হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আদিনা মস্জীদের বেদীর নিম্নে, ভগ্ন সোপানাবলী মধ্যে অল্পদিন পূর্ব্বে একটী ভগ্ন দশভূজা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইত। আদিনা মসজীদ দৈর্ঘ্যে পাঁচ শত ফুট ও প্রস্থে তিন শত ফুট। মস্জীদের মধ্যস্থলে প্রশস্ত অঙ্গন এবং অঙ্গনের তিন দিকে দুই শ্রেণীর স্তম্ভ ও দুইটি প্রাচীর বাহিত তিন শ্রেণীর গুম্বজ ছিল। চতুর্থ দিকে চারিশ্রেণীর স্তম্ভ ও দুইটি প্রাচীর বাহিত পাঁচ শ্রেণীর গুম্বজ ছিল। এই দিকের মধ্যদেশে বিশাল তোরণের নিম্নে অপরূপ কারুকার্য্য শোভিত ব্রহ্মশিলা (কষ্টি-পাথর)

(১৭) ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, আদিনা মস্জীদ এক বৌদ্ধ স্তূপের উপরি নির্ম্মিত; এ কথার প্রমাণাভাব। হিন্দু দেবদেবীর ভগ্ন মূর্ত্তি হিন্দুর উপর হস্তাবলেপনই সমর্থন করে। শ্রীমান রাখালদাস Ravenshaw's Gaur এবং তাঁহার নিজের Notes হইতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উপরে উদ্ধৃত হইল।

নির্ম্মিত একটী বেদী ও দুইটি মিহরাব্ বা খিলান আছে। এই দিকের কিয়দংশ দ্বিতল, ইহা বাদশাহ-কা-তখৎ নামে পরিচিত। মসজীদের বহির্দ্দেশে সেকন্দর শাহের পাষাণ নির্ম্মিত সমাধি আছে।* ঐ কালের গৌড় বাদশাকে বাঙ্গলার হিন্দু প্রজা কি ভাবে দেখিত, তাহা সেকন্দরের মত প্রতাপশালী সুলতানের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া সহজেই অনুমেয়।

সেকেন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দীন্ বিমাতার চক্রান্ত বিফল করিবার জন্য পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সেকেন্দর যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হইলে গিয়াস্ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের দৃষ্টিশক্তি নাশ করিয়া দিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। তিনি কিন্তু ন্যায়বান্ ও প্রজা হিতার্থী বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। মৃগয়াকালে রাজশর-বিদ্ধ অনাথার বালকের বিচারে কাজী এবং গিয়াসুদ্দীনের কাহিনী সুপরিচিত। ভারতের ইতিহাসে পিতৃদ্রোহী বা ভ্রাতৃহন্তা নৃপতির প্রজারঞ্জনে আদর্শ স্থান অধিকার করার দৃষ্টান্ত এই নূতন নহে। অশোক ও অজাতশত্রুর এই কলঙ্ক গাথা বৌদ্ধ কথা সাহিত্যে বর্ণিত আছে; রিয়াজ গ্রন্থের গল্প ভিন্ন এ যুগের প্রামাণিক ইতিহাস বেশী কিছু নাই। গিয়াসুদ্দীনের তৃতীয় পুরুষে দুর্ব্বল গৌড়াধিপের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কিরূপে অপহৃত হইয়াছিল গ্রন্থভাগে তাহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

এই উপক্রমণিকা ভাগে যাহা বলা হইল তাহাতেই অনুমিত হইবে যে দুই শত বৎসর ধরিয়া গৌরীয় সামন্তবর্গ এবং তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ মধ্যবঙ্গের অধিকার বাহুবলে রক্ষা করিয়া গেলেও দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রথমযুগে বঙ্গবিহারে গঙ্গা ও ভাগীরথী প্রবাহের পার্শ্ববর্ত্তী উর্ব্বর বিভাগের সমৃদ্ধিই নব বিজেতৃ দলের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম দেশীয় সামন্ত রাজন্যবর্গকে উৎখাত করিবার উদ্যম হইলেও পরবর্ত্তীকালে দিল্লীর অধীনতা পাশমুক্ত

গৌড়ীয় সুলতানেরা হিন্দু ভূস্বামীদিগকে স্বপদে সুস্থির রাখাই পরামর্শ মনে করিয়াছিলেন; স্থানে স্থানে শাসন সুদৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত সেনানায়ক-দিগকে জায়গীর নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অধিকৃত ভূভাগের রাজস্ব অবাধে ভোগ করাই তাঁহাদের কাম্য ছিল। প্রত্যন্ত ভাগে এই দুই শত বর্ষকাল মুসলমান রাজের শাসন প্রতিষ্ঠিতই হয় নাই। গৌড় বঙ্গে এই যুগে মুসলমানের যথেষ্ট বসতি বিস্তার হয় নাই। ধর্ম্মপ্রচারক পীর প্রভৃতির আবির্ভাব তখনও বাঙ্গলায় অধিক ঘটে নাই। পাঠান রাজের পক্ষাবলম্বন স্বাধিকার রক্ষার উপায় বলিয়া পূর্ব্বতন হিন্দু ভূস্বামীরা তাঁহাদের অনুগত হইয়াছিলেন; অন্যে গৌড় সরকারের রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া ক্রমে ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিতেন। দিল্লীশ্বর ফিরোজশার আক্রমণকালে মধ্যবঙ্গের অনেক হিন্দু ভূস্বামী বাদ-শাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া শেষে গৌড় বাদশার শরণাগত হইয়াছিলেন। এ কালে দেশের সর্ব্বত্র স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বর্ণিত যুগে দেশের সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল, ভাল জানা যায় না। হিন্দুর রচিত কোন বিবরণী পাওয়া যায় না; মুসলমান লেখকগণও এ বিষয়ে কোন কথা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বিদেশীর মধ্যে আফ্রিকাবাসী ইবন্ বতুতা ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে বাঙ্গলায় আইসেন। গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী সোদ্ কা ওয়ান্ (সাত গাঁ) পৌছিয়া তিনি বাঙ্গলায় দ্রব্যাদির সুলভতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার দীনার (রৌপ্য মুদ্রা), দিরহাম (⅛ দীনার) প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য জানা না থাকলেও সেকালে বাঙ্গলায় চাউল, তৈল, ঘৃত যে অন্যান্য দেশ হইতে অধিক সুলভ ছিল তাহা তাঁহার উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তিন দীনারে দুগ্ধবতী গাভী ও এক দিরহামে ৮টি ভাল মুরগী মিলিত; বৃহৎ মেষের মূল্য ছিল দুই দিরহাম্। দুই দীনারে ত্রিশ হাত লম্বা সূক্ষ্ম মস্‌লীন্

পাওয়া যাইত। সুন্দরী যুবতী ক্রীতদাসীর মূল্য ছিল এক স্বুবর্ণ দীনার; বতুতা অবশ্য একটি ক্রয় করিবার লোভ সম্বরণ করেন নাই। তাঁহার বন্ধু এক সুশ্রী কিশোর দাস দুই দীনারে কিনিয়াছিলেন।

১৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীনরাজের দূতের সঙ্গে মা হুয়ান্ নামক দ্বিভাষী এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ অনুসারে বুঝা যায় তাঁহারা সুমাত্রা হইতে অর্ণবপোতে চট্টগ্রাম এবং সেথান হইতে নৌকায় সুবর্ণগ্রামে আইসেন। তিনি বলেন, সোনার গাঁ হইতে স্থলপথে ৫২॥০ ক্রোশ গমন করিলে বাঙ্গলা রাজ্য পাওয়া যায়। তিনি এদেশের প্রাচীর বেষ্টিত নগর, মুণ্ডিত মস্তক কৃষ্ণবর্ণ মুসলমান নাগরিক ও তাহাদের পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিয়াছেন। মুদ্রার নাম টঙ্গ—কা; সামান্য ক্রয় বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হয়। এখানে সমস্ত বৎসর চীন দেশের গ্রীষ্মকালের মত গরম; ধান্যাদি শস্য প্রচুর জন্মে, নানা প্রকারের ফল যথেষ্ট এবং তাল, নারিকেল ও ধান্য হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। এদেশে ছয় প্রকারের কার্পাস নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করে, উহা দৈর্ঘে ১৯ হাত এবং প্রস্থে দুই হাত। রেশমের কীট পালিত হয় এবং রেশমের বস্ত্রও হয়। দেশে কবিরাজ, জ্যোতিষী, পণ্ডিত ও শিল্পীদিগের বাস আছে। রাজা বাণিজ্য জন্য বিদেশে জাহাজ পাঠান। গিয়াসুদ্দীনের সময়ে চীন রাজের সহিত উপঢৌকন বিনিময়ের ও উল্লেখ আছে। ধন ধান্যে এবং বস্ত্র শিল্পে বাঙ্গলা যে সে যুগেও সমৃদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ সকল দিক্ হইতেই পাওয়া যাইতেছে। বহু শত বর্ষ ধরিয়া শান্তি-সুখে বাস করার পরে হঠাৎ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন সুখের হয় নাই, এবং সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠায় সময় লাগিয়াছিল।



মধ্যযুগে বাঙ্গলা।

প্রথম অধ্যায়।

রাজা গণেশ।

বঙ্গে মুসলমান অধিকারের দুই শত বৎসর অতীত হইয়াছে। পাঠান সামন্তবর্গ ইতিপূর্ব্বেই দিল্লীশ্বরের অধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যের বা অরাজকতার বিস্তার করিয়াছেন। এই মধ্যযুগে মধ্যবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকার জয় জয়কার; সর্ব্বত্র বিজেতা পাঠানের প্রভাব সুবিস্তৃত। মুসলমান জায়গীরদার ও তাঁহার আনুসঙ্গিক বিদেশীয় যুদ্ধব্যবসায়ী দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সামন্তবর্গের পরস্পর ঈর্ষাজনিত বিপ্লবে দেশ সংক্ষুব্ধ ও সম্পূর্ণ উপদ্রুত। মৃতপ্রায় নিরীহ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ ধর্ম্মান্ধ বিজেতার সাময়িক অত্যাচারে ম্রিয়মাণ। এমন সময়ে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের প্রভাবে স্রোত ফিরিল।

মহাপুরুষগণ সংসারগগনের এক এক প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক; সমাজ-জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবের অন্ধকার-পথের প্রধান সহায়। কর্ম্মবীর মহা-পুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ ঐতিহাসিক আলোচনার এক প্রধান মর্ম্মগ্রন্থি। ইহাকে ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না; এইরূপ কাহিনী এবং আদর্শ ভবিষ্যতে অন্যের অবলম্বন বা পরিহারের বিষয় হইয়া মানব-সমাজে লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করে। রাজনৈতিক জগতে বঙ্গবাসীর গৌরব করিবার বেশী কিছু নাই। আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর আত্মদ্রোহিতা বড়ই প্রবলা; স্বজাতিপ্রতিষ্ঠায় সমবেত চেষ্টার বিশেষ কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় নাই। পরন্তু দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অভাব বলিয়া মরজগতে বঙ্গবাসীর গৌরবের যে দুই একটি দৃষ্টান্ত আছে, তাহাও লোকচক্ষুর অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব মুসলমান-প্রভাবের সময়ে যে অসামান্যপ্রতিভাশালী হিন্দু রাজা পাঠানের হস্ত হইতে গৌড়ের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই মহাতেজা রাজা গণেশের কীর্ত্তি-কলাপও অন্যান্য কালের বিবরণের মত অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে।

রাজা গণেশের রাজ্যকাল বা কীর্ত্তি-কলাপের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম লইয়াই ঐতিহাসিকসমাজে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়াছে। হস্তলিখিত মুসলমানী ইতিহাসে সর্ব্বত্র 'কংস' নাম উল্লিখিত দেখা যায়। রিয়াজ্-উস্-সালাতিন্ গ্রন্থকার একখানি প্রাচীন পারসী পুস্তিকা হইতে কনিস্ বা কংস নাম পাইয়াছেন; ইনি ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন। গণেশ বা 'গণশ্' পারসী বর্ণবিন্যাসে কনিশ্ বা কংস হইয়া পড়া সম্ভব; কারণ পারসী কাফ্ একটি ক্ষুদ্র অর্দ্ধমাত্রা 'আলিফ্' যোগে 'গ' হইতে পারে। ইংরেজ আমলের প্রথম ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ রিপোর্টার ডাক্তার বুকানন্ দিনাজপুরের বিবরণী মধ্যে লিখিয়াছেন:—"তদনন্তর দীনাজের হিন্দু হাকিম গণেশ রাজদণ্ড কাড়িয়া লন।" একখানি পারসী পুঁথি তাঁহারও

অবলম্বন। এই 'দীনাজ' দিনাজপুর হইতে পারে বলিয়া বুকানন্ ইঙ্গিতও করিয়াছেন (১)।

গৌড়ের বাদশাহী সিংহাসনে যে হিন্দু রাজা নিজভুজবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার গণেশ-নামে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। ১৪৯০ শকে রচিত ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশে বৈষ্ণবজগতে সুপরি-চিত অদ্বৈতাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥
যাঁর কন্যা-বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউর প্রদেশে হয় যাহার বসতি॥"

(১) ১৩০৬ সালের নব্যভারতে স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুল্লুক-ভট্ট হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে রাজা গণেশের নাম নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, এই উক্তির পোষক প্রমাণ নাই। কিছুদিন হইল, দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তাঁহাদের নিজ অঞ্চলের ও পরিবারের জনশ্রুতি হইতে গণেশের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়াছেন, বলেন। কিন্তু তাঁহার নিজেরই মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ। নব-পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে আমার 'গণেশ' যখন দর্শন দেন, তাহার পরে সান্যাল মহাশয়ের কাহিনী প্রকাশিত হয়। তাঁহার সামাজিক ইতিহাস দ্বিতীয় সংস্করণ আমি যথাসম্ভব সংশোধনও করিয়াছি। তৎপরে বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ বসুর 'গণেশ দত্ত খান'। দিনাজপুর রাজবংশের সহিত গণেশের সম্বন্ধ স্থাপন কষ্টসাধ্য।

অতঃপর প্রচলিত মুসলমানী ইতিহাসের মতে কংসের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ফেরিস্তার গ্রন্থে নির্দ্দেশ আছে "শমসুদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজা কংস মুসলমানপ্রতাপের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া রাজ্য-গ্রহণে সক্ষম হন; কিন্তু ভগবান্ অচিরে কৃপা প্রত্যাহার করায় সাত-বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে, ৭৯৫ হিঃ (১৩৯২ খৃঃ)।" তবকাৎ আকবরীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন;—"রাজা মুসলমান না হইলেও মুসলমানগণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল; এইজন্যই অনেক মুসলমান তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পরে তাঁহার মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা শপথ করিয়া বলিয়া মুসলমানশাস্ত্রমতে তাঁহাকে সমাহিত করিবার প্রস্তাব করেন। সাত বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজ্য করিয়া তাঁহার মৃত্যুসংঘটন হইলে, তাঁহার পুত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; ইনি পবিত্র ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" রিয়াজ-উস্-সালাতিন্ গ্রন্থকার একখানি ক্ষুদ্র পারসী পুস্তক হইতে মুসলমানমুখরোচক কোন গোঁড়া বিরুদ্ধবাদীর সঙ্কলিত প্রবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। উহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"শমসুদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দু জমিদার রাজা কংস বাহুবলে সমগ্র বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। রাজদণ্ডগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচার ও মুসলমানরক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বাঙ্গলা হইতে ইস্লামধর্ম্মের উচ্ছেদই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক মুসলমানগণের উপর ভয়াবহ অত্যাচার হইতে লাগিল'। অভিবাদন না করার অপরাধে সেখ বদর উল্ ইস্লামকে নিহত করার এবং তৎপরে মুসলমান উলামা-(শাস্ত্র-বেত্তা)-গণকে নৌকাসহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করাইবার গল্পে গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাঁহার পুস্তকের এক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। শেষে এইরূপ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে মৌলবী পীর হজরৎ নুর কুতবাল্

আলমের (২) আসন টলিল। পীরসাহেব স্বয়ং প্রতিবিধানে অসমর্থ, সুতরাং সুদীর্ঘ পত্রে কংসের অত্যাচার জ্ঞাপন করিয়া জৌনপুরের সুলতান্ এব্রাহিমকে বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়া কাফেরের উচ্ছেদসাধন জন্য অনুরোধ করা হইল। সুলতান্ মুসলমানগুরুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন; কংসরাজ তখন বিপন্ন হইয়া ফকিরের পদতলে লম্বমান। পীরসাহেবও কল্মা পড়াইয়া রাজাকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাজ্য-ভোগে অভয়দানে প্রস্তুত হইলেন। রাজার ইচ্ছা থাকিলেও স্ত্রীর মন্ত্রণায় তিনি স্বর্গের সহজ পথ দেখিতে পাইলেন না! দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র যদুকে পীরের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অচিরেই ভবলীলা সাঙ্গ হইবে; অতএব আমার এই পুত্রকে দীক্ষিত করিয়া রাজ্যভার অর্পণ করুন।" দীক্ষার প্রথম সূচনায় কুত-বালম্ কিঞ্চিৎ চর্ব্বিত তাম্বুল ভাবী শিষ্যের বদনে প্রদান করিলেন; পরে দীক্ষা এবং জলালুদ্দীন্ নামে যদুর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইল। পীরসাহেব তখন স্বধর্ম্মীর রাজ্য হইয়াছে বলিয়া সুলতান্ এব্রাহিম্‌কে স্বদেশে প্রতিগমনের অনুরোধ করিলেন। সুলতান্ কিঞ্চিৎ উগ্রভাব

(২) পাণ্ডুয়ার 'ছোটী-দরগা' নামক মস্‌জীদে এই ধার্ম্মিক মুসলমান পীরের সমাধি-স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান। কুতব আলমের মৃত্যুকালসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। আইন্ আকবরীতে ৮০৮ হিঃ নির্দ্দেশ আছে; ব্লক্‌ম্যান্ প্রভৃতি সমাধিমন্দিরের তারিখ ধরিয়া ৮৫১ হিঃ করিতে চান। মালদহনিবাসী ইলাহীবক্স তাঁহার খুরসেদ্ জাঁহানামা গ্রন্থে পাণ্ডুয়ার খাদিমের নিকট যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে 'নুর বানুর শোদ্' কথা উদ্ধৃত করিয়া ৮১৮ হিঃ অব্দ (১৪১৫ খ্রীঃ) যে কুতবের মৃত্যুর প্রকৃত সময়, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি আমার কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ রাখাল-দাস তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেক মস্‌জীদ্ ও তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

দেখাইলে 'নিপাত যাও' বলিয়া অভিশাপ দেওয়া হইল; তিনি বাসায় গিয়া মরিলেন। (৩)

'এদিকে রাজা কংস আবার রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। স্বর্ণনির্ম্মিত একটি গাভী প্রস্তুত করাইয়া জলাল্‌কে তাহার মুখবিবর দ্বারা প্রবেশ করাইয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে পুনরায় 'যত্ন' করিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইল; স্বর্ণ-গো ব্রাহ্মণকে দান করা হইল। কিন্তু পীরের শিক্ষা (না, মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত পীযূষের) গুণে জলালের সত্যধর্ম্ম হইতে মতি বিচলিত হইল না। পুনরায় রাজার অত্যাচার ভীষণ হইল; পুত্র পর্য্যন্ত কারাগারে রহিলেন। আবার কুতব্ আলম্ আসরে নামিলেন। এবারে গল্পের মাধুর্য্য পূর্ব্বের বর্ণনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। হজরতের পুত্র আনোয়ার পিতৃসমীপে মর্ম্মবেদনা জানাইয়া বলিলেন, "পিতঃ, আপনি থাকিতে বিধর্ম্মীর হস্তে মুসলমানগণের এ লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না।" ঋষি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন; নেত্র উন্মীলন করিয়াই পৌরাণিক দুর্ব্বাসার মত সক্রোধে কহিলেন "তোমার রক্তে পৃথিবী অনুরঞ্জিত না হইলে এ অত্যাচারের অবসান হইবে না।" ভ্রাতুষ্পুত্র জেহাদ্‌সম্বন্ধে কি আদেশ জিজ্ঞাসা করিলে হজরৎ উত্তর দিলেন "যাবচ্চন্দ্র দিবাকর তাহার কীর্ত্তি-গাথা প্রচারিত থাকিবে।"

'কংসের অত্যাচার এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় দর্শন দিল। আনোয়ার ও জেহাদ্ বন্দীভূত হইলেন; কিন্তু জেহাদের বিবরণ অবগত হইয়া প্রাণ-বধ না করিয়া রাজা তাহাদিগকে সুবর্ণগ্রামে প্রেরণ করিলেন। কংসরাজ

(০) জৌনপুরের সুলতান্ এব্রাহিমের বাঙ্গলা-আক্রমণের কথা প্রসিদ্ধ মুসলমানী-ইতিহাসে নাই। এব্রাহিম কথিত সময়ে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার মৃত্যু অনেক পরে ঘটিয়া থাকিবে, কারণ ৮৩৪ হিঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, নির্দ্দেশ আছে।

শুনিয়াছিলেন, সেখানে মৃত্তিকামধ্যে উহাদের পৈতৃক অর্থ প্রোথিত আছে। সুবর্ণগ্রামের প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে আদেশ দেওয়া হইল, ঐ ধনরাশি হস্তগত করিয়া উহাদের প্রাণবধ করিবেন। বহুবিধ ভয়-প্রদর্শনেও তাহারা লুক্কায়িত ধনের সন্ধান দিল না। আনোয়ার প্রথমে নিহত হইলেন; পরে জেহাদ্‌কেও হত্যা করিবার উদ্যোগ হইলে তিনি বৃহৎ স্বর্ণ কলস প্রোথিত আছে বলিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। খনন করিয়া দেখা গেল, একটি কলসে একটিমাত্র আস্রফি (মোহর) আছে। অবশিষ্ট অর্থ কোথায় গেল এই কথার উত্তরে জেহাদ্ বলিলেন, বোধ হয় চোরে লইয়াছে। জেহাদ্ রক্ষা পাইলেন। বাস্তবিক, টাকার কথা তিনি কিছুই জানিতেন না, দৈবানুগ্রহেই এরূপ ঘটিল। যে মুহূর্ত্তে সেখ আনোয়ারের পবিত্র রক্তপাতে ধরাতল সিক্ত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই কংসের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া নরকধামে প্রস্থান করিল। মতান্তরে তাঁহার বন্দী পুত্র কারাগার হইতে অনুচরগণ সাহায্যে কংসবধ-পর্ব্ব নির্ব্বাহ করেন।"

এখন জলালুদ্দীনের পালা। তিনি বিস্তর হিন্দুকে পবিত্রধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন। গোমাংসদ্বারা স্বর্ণগাভীদানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণকে জাতিভ্রষ্ট করা হইল। অতঃপর তিনি সেখ জেহাদের নিয়োগানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এখানে 'আমার কথাটি ফুরালো' বলিবার বড়ই লোভ হয়।

ধর্ম্মান্ধ মুসলমান লেখকের আজ্‌গুবী গল্প বাদ দিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখা যায়, রাজা গণেশ সম্পূর্ণ পাঠান প্রভাবের সময়েই বলে ও কৌশলে বঙ্গের রাজদণ্ড কাড়িয়া লন। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানেরই তখন সম্পূর্ণ প্রাধান্য; মুসলমান সামন্ত ও জায়গীরদারগণই সমধিক প্রবল। তাঁহারা বিরুদ্ধাচারী হইলে সুব্যবস্থা করিয়া রাজ্যশাসন অসম্ভব ছিল।

প্রামাণিক ইতিহাস তবকাৎ আকবরী সাক্ষ্য দিতেছে, "রাজা সর্ব্বথা মুসলমান প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সদয় ব্যবহারে অপক্ষপাতে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন'। এই কারণেই তাঁহার অল্পকালব্যাপী অধিকারে প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই কারণেই মৃত্যুর পরে মুসলমান-গণও রাজার পবিত্র দেহ সমাহিত করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিল। এই মুসলমানপ্রভাবের ফলে এবং মুসলমান রাজকুমারীর প্রণয়ে পড়িয়া রাজপুত্র যদু শেষে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নুর কুতবাল্ আলমের উপদেশে যদুর মুসলমানধর্ম্মগ্রহণের প্রবাদে সত্য নিহিত থাকা সম্ভব। কুতব আলম্ পূর্ব্বতন গৌড়রাজগুরু; পরম ধার্ম্মিক বলিয়া তাৎকালিক মুসলমানসমাজে সবিশেষ সমাদৃত ছিলেন। তাঁহার উপদেশ বা দৃষ্টান্তে হিন্দুরাজার মুসলমান হওয়া বিচিত্র নহে। (৪)

রাজা গণেশের অল্পকাল পরে উত্তরবঙ্গে তাহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রাজা কংশনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। হোসেনশাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের বাদশাহী আমলে দুর্ব্বল হাব্‌সী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির অবকাশে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন কংশনারায়ণ উত্তরাঞ্চলে বহুদূর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ক্ষমতাপ্রভাবেই তিনি বারেন্দ্রসমাজে সমাজপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। রিয়াজ্‌গ্রন্থে স্বাধীন রাজা কংস ভাতুড়িয়ার জমিদার বলিয়া উল্লিখিত; পরগণা ভাতুড়িয়াও বর্ত্তমান রাজশাহী জেলায়, এবং কংশনারায়ণের রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ মুসলমান লেখকগণ কংশ-নারায়ণের সহিত গণেশের গোল বাধাইয়াছেন। তাঁহার মত প্রভাবান্বিত

(৪) অন্যান্য মুসলমান ইতিহাসে যদুর রাজ্যলাভের পর মুসলমান হওয়ার কথা আছে। ষ্টুয়ার্ট অনুমান করিতে চান, যদু গণেশের কোন মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত হইতে পারেন; অন্য পুত্র না থাকায় বা যদুই প্রথম পুত্র বলিয়া রাজ্য পাইয়াছিলেন।

ভূস্বামীকে পরবর্ত্তীকালে স্বাধীন গৌড়েশ্বর বলিয়া ভ্রম করা আশ্চর্য্য নহে। কবি কৃত্তিবাস তাঁহাকে রাজা গৌড়েশ্বরই বলিয়াছেন।

মুসলমান ইতিহাসের মতে গণেশের রাজ্যকাল ১৩৮৫-৯২ খৃঃ। মুদ্রা প্রভৃতির আলোচনায় ইহা ১৪০৯ খৃঃ অব্দে আসিয়া পড়িয়াছে (৫)। এক্ষণে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ হইতে দুইটি বংশপত্রিকা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া কংশ-নারায়াণের সময় নির্ণয় করা যাইতেছে ঃ—(৬)

(৫) এই বৎসর হইতে বায়াজিদ্ শার মুদ্রা দৃষ্ট হয়। তাঁহার মুদ্রা থাকিলেই যে তিনি গৌড়ে রাজা ছিলেন এমন প্রমাণ হয় না। পলাতক রাজা অন্যত্র মুদ্রাঙ্কন করিতে পারেন। গণেশই বায়াজিদ শা নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, এই অদ্ভুত মতও প্রচারিত হইয়াছে।

(৬) (১) কাশ্যপগোত্রে—সুষেণ হইতে ১৭শ পুরুষে

উদয়নাচার্য্য (পরিবর্ত্তমর্য্যাদাকার)
|
পশুপতি
|
যগাই
|
বলাই
|
অংশুমান্
|
মুকুন্দ ভাদুড়ী
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
সুবুদ্ধি খাঁ — কেশব খাঁ — জগদানন্দ রায় (২৪)

(ইঁহারা রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয়)

তালিকার অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত; শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, অথচ কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধ। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন; ১৪৮১ শকে (১৫৫৯ খৃঃ) তাঁহার তিরোধান ঘটে। ১৪৩০ শকে রচিত পূর্ব্বোক্ত ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশের উক্তির সহিত উল্লিখিত জন্ম-পত্রিকার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। অদ্বৈতের পাঁচপুরুষ পূর্ব্বতন নরসিংহ অথবা রাজা গণেশকে মোটামুটি ১২৫ বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ধরিলে গণেশের ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট রাজ্যকালের সহিত গরমিল হয় না। এক্ষণে কংশ-নারায়ণের ভাগিনেয়গণের বংশাবলী দেখুন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে যে, কংশনারায়ণের প্রথম ভাগিনেয় এই সুবুদ্ধি খাঁ বৃদ্ধবয়সে হোসেন্ শার রাজ্যকালে যবনহস্তে নিগৃহীত হইয়া শেষে বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর সহিত মিলিত হন। ইঁহাকে চৈতন্যের একপুরুষ পূর্ব্ব-বর্ত্তী ধরিলে মাতুল কংশনারায়ণ চৈতন্যের অন্ততঃ ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। সম্প্রতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়, কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়া দেখিলেন—

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।

---

(২) ভরদ্বাজগোত্রে—গৌতম হইতে ১৬শ পুরুষে
আরু ওঝা নাড়িয়াল।
|
নরসিংহ নাড়িয়াল (২২)
|
বিদ্যাধর
|
ছকড়ি
|
কুবেরাচার্য্য
|
অদ্বৈতাচার্য্য (২৬)

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥ (শ্রীকৃষ্ণ ?)
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥

উদ্ধৃত বংশাবলীর সহিত এই সভাবর্ণন মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, কৃত্তিবাস যে পণ্ডিতপ্রধান মুকুন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্ভবতঃ জগদানন্দের পিতামহ এবং কংশনারায়ণের ভগিনীর শ্বশুর ও ধর্ম্মাধি-কারী মহাপাত্র শ্রীকৃষ্ণ জগদানন্দের পিতা এবং রাজার ভগিনীপতি। এদিকে রাঢ়ীয় ঘটক দেবীবরের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, দেবীবর-কর্ত্তৃক রাঢ়ীয় কুলীনগণের মেলবন্ধন সময়ে কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালা-ধর খাঁকে লইয়া মালাধর-খাঁনী থাক্ হয়। এরূপে কৃত্তিবাস ও জগদা-নন্দ বা সুবুদ্ধির মাতুল কংশনারায়ণ এক সময়ের লোক হইতেছেন। কৃত্তিবাস স্বয়ং ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২২শ পুরুষ; ইহাতেও সময়ের ঠিক্ মিল হইতেছে। কৃত্তিবাসের রাজসভাবর্ণনে যে মুসলমান-প্রভাব একবারে দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণও এই। কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর স্বাধীন রাজা 'কংস' বা গণেশ নহেন। তিনি সমাজপতি এবং সজ্জনপালক কংশনারায়ণ; গৌড় অঞ্চলের ভুস্বামী রাজা।

অতঃপর রাজা গণেশ ও তাঁহার সমসাময়িক দেশের কথা আলো-চিত হইবে। উপক্রমণিকায় নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, বঙ্গে প্রথম যুগের মুসলমান অধিকার এক ধারাবাহিক বিপ্লবের সমষ্টি মাত্র। মহম্মদ ই বখ্তিয়ার পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গ ও কামরূপ অধিকারের কামনায় ধাবিত হইয়া বিফলমনোরথ হইলেন। পরাজয়ে ভগ্নহৃদয়ে এবং আসামী জল বায়ুতে রুগ্নদেহে ফিরিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পরবর্ত্তী

পাঠান শাসনকর্ত্তৃদলও ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে দিল্লীর সম্রাট্ দুর্ব্বল হইলে সময়ে সময়ে তাঁহার শাসন উপেক্ষা করিয়া বঙ্গীয় পাঠান সামন্তবর্গ স্বতন্ত্র ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। শেষে মুসলমান অধিকারের সার্দ্ধ শত বর্ষ মধ্যেই খাজে ইলিয়াস্ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া গৌড়ে স্বতন্ত্র বাদশাহী স্থাপন করিলেন (৭)। বিকৃতমস্তিষ্ক মহম্মদ তোগলকের কুব্যবস্থা ও অত্যাচারে এবং পরিশেষে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীর সাম্রাজ্য ভগ্ন হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা সুবিধা পাইয়া সর্ব্বত্র স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গলায় ইলিয়াস্শাহী বংশ চল্লিশ বৎসর কাল প্রবল প্রতাপে রাজ্যভোগ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গের স্থানে স্থানে পাঠান সামন্তবর্গকে দেশ রক্ষার নিমিত্ত জায়গীর দেওয়া হইলেও পাঠানরাজেরা কোন কালেই মুসলমানের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দেন নাই। পাঠান সর্দ্দারগণের সহিত সরস্বতীরও তত সদ্ভাব ছিল না; পরন্তু নিজের ব্যয়েই তাঁহারা রাজস্বের টাকা নিঃশেষ করিয়া ফেলিবেন, অথবা বল সঞ্চয় করিয়া বিদ্রোহী হইবেন, সে আশঙ্কাও ছিল। এই কারণে মধ্যবঙ্গে সে কালে একপ্রকার আদায়কারী হিন্দুজমিদারের সৃষ্টি হইতেছিল। বিচার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শাসনেও পাঠানরাজ বড় হস্তক্ষেপ করেন নাই, সুতরাং পাঠান অধীনে বাঙ্গলায় স্বায়ত্ত শাসন বদ্ধমূল হইয়াছিল। 'ভুঁইয়া' বলিয়া উল্লিখিত এই জমিদারবর্গের উপরে পাঠান-রাজ বিশেষরূপে নির্ভর করিতেন। তখন এ দেশে মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্প ছিল এবং সকলে সকল সময়ে এক মতে কার্য্য করিত না। শমসুদ্দীন্ এই

(৭) ১৩৪২ খ্রীঃ। খাজে ইলিয়াসের পূর্ণ নাম সুলতান শমসুদ্দীন্ আবুল্ মজঃফর ইলিয়াস্ শা। তিনি ভাঙ্গ খাইতেন বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে ভাঙ্গরা উপাধিও লাভ করিয়াছেন।

ভুঁইয়া সাহায্যেই প্রবল হইয়াছিলেন এবং রাজ্য লাভের পরে উত্তরবঙ্গের ভুঁইয়াদিগের অধীনে রাজকীয় হিন্দু সেনাদল গঠিত করিয়াছিলেন। গৌড়ের পাঠান রাজসভায় এবং অভিযানে বার-ভুঁইয়ার সম্মানের আসন গ্রহণ বাঙ্গলা কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে। (৮) ভুঁইয়ারা শাসনকার্য্য ও সৈন্য পরিচালনে গৌড় বাদশার সহকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজের সেনাদলও থাকিত।

বর্ত্তমান রাজশাহী ও বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চলন বিলের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। সে কালে এই বিল আরও বিস্তৃত ছিল। এই চলন বিলের উত্তরে ভাদুড়িয়া গ্রামের ভাদুড়ী বংশ পূর্ব্বাবধি প্রসিদ্ধ ছিল; এই বংশেই সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের জন্ম হয়। ভাদুড়ী বংশের জগদানন্দ শমসুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং পরগণা ভাতুড়িয়া (ভাদুড়িয়া) তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দুর লাখেরাজ বা জায়গীর প্রাপ্তি পাঠান আমলে প্রচলিত না থাকায় ভাদুড়ীরা এক টাকা মাত্র রাজকর দিতেন, এই জন্য উত্তরকালে তাঁহারা একটাকিয়া ভাদুড়ী নামে কথিত হন (৯)। শমসুদ্দীন্ ও তাঁহার বংশের প্রধান রাজদ্বয়ের (সেকন্দর ও গিয়াসুদ্দীনের) শাসনকালে প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় এই ভাদুড়ী বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়। শমসুদ্দীনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্বিতীয় শমসুদ্দীন্ অতি অপদার্থ রাজা ছিলেন। ভাদুড়িয়ার রাজা গণেশনারায়ণ তৎকালে উত্তর বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি; নির্ব্বোধ

(৮) ধর্ম্মমঙ্গল। গজপৃষ্ঠে ভূপতি বেষ্টিত বার ভুঁইয়া ইত্যাদি।

(৯) দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তাঁহাদের বংশের ও দেশীয় প্রবাদ হইতে এই সমস্ত কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত সমগ্র কিম্বদন্তী গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিলেও রাজা গণেশ সম্বন্ধে প্রবাদ সত্য বলিয়া বোধ হওয়ায় এখানে তাহা উল্লিখিত হইল। ইহাতেও উদয়নাচার্য্যকে আনা হইয়াছে।

শমস্থদ্দীন্ গণেশ ও কয়েকজন মুসলমান সামন্তকে উত্যক্ত করিলেন। গণেশ পাঠান সামন্তের সাহায্যে অকর্ম্মণ্য বাদশাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি রাজা হইয়াও নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন না করিয়া রাজবংশীয় বায়াজিদ্ শার নাম চালাইয়াছিলেন (১০)। সম্ভবতঃ পাঠান সামন্তদলকে স্বপক্ষে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গণেশ মুসলমানগণেরও প্রিয় ছিলেন। দেশীয় কতকগুলি গল্পগুজব উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল লিখিয়াছেন—"রাজা গণেশ বাদশার বেগমগণকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন, এবং পাণ্ডুয়াতে নিজ পরিবারবর্গ সহ নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচারে থাকিতেন। গৌড়ে বেগমদের নামে অনেক দর্গা ও মস্‌জিদ্ দিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন; উভয় ধর্ম্মেরই উৎসাহ দিতেন এবং কোন ধর্ম্মের নিন্দাবাদ শুনিতেন না। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। এইরূপে সমগ্র বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমানের প্রীতি লাভ করিয়া গণেশ ইতিহাসে নিরপেক্ষতার এক সমুজ্জ্বল উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগণেশ ত কোন প্রকারে 'হিন্দুয়ানিটা বাঁচাইয়া' (?) চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র যদুর পক্ষে পূর্ণ মুসলমান প্রভাবের উপরে আর এক প্রবলতর আকর্ষণে বাধা প্রদান অসাধ্য হইল। গৌড়ের রাজকুমারী আশমান্‌তারা যদুকে যাদু করিল। সান্যাল মহাশয় বলেন "গণেশের জীবদ্দশাতেই যদু আজিম শাহের কন্যা আশমান্‌তারার প্রতি

(১০) এইরূপ ৩টি রজতমুদ্রা মিউজিয়মে আছে। উহার তারিখ ৮১২, ৮১৬ ও ৮১৭ হিঃ সাল। ৮১৮ হিঃ হইতে গণেশের পুত্র জলালুদ্দীনের মুদ্রা দৃষ্ট হয়।

আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান্ লোকের পক্ষে উপপত্নী রাখা এবং যবনীগমন দূষ্য ছিল না। আশমান্‌তারার মাতা গণেশের উপপত্নী ছিলেন; সুতরাং গণেশ যদুকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। যদু সম্রাট্ হওয়ার তিন বৎসর পরে আশমান্‌তারার গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি যদুকে কহিলেন, আমি বাদশাহের কন্যা, আমার সন্তান ঘৃণিত জারজ হইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, আমি আত্মহত্যা করিব"। রাজকন্যার প্রণয়মুগ্ধ যদু প্রথমে হিন্দুশাস্ত্রমত তাঁহাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা খুঁজিলেন। পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয় রাজাদের দৃষ্টান্ত থাকিলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মিলিল না; অগত্যা তিনিই মুসলমান হইয়া 'জলালুদ্দীন্' অর্থাৎ ধর্ম্মের গৌরব এই উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। যদুর মাতা ও পত্নী রাণী নবকিশোরী তাঁহার নাবালক পুত্র অনুপনারায়ণকে লইয়া ভাদুড়িয়া রাজধানী সাতগড়ায় গেলেন। অনুপ রাজা গণেশের পূর্ব্ব অধিকৃত জমিদারী ভিন্ন পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েক পরগণায় স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যদু জলালুদ্দীন্ মৃত্যুর পূর্ব্বেই আশমান্‌তারার জ্যেষ্ঠপুত্র আমেদ্ শাকে গৌড়ের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। জলালুদ্দীন্ ১৮ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদু বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। সে কালের বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে বীরত্ব ও শারীরিক বল দুর্লভ ছিল না। রাজা গণেশ স্বয়ং অপরিমিত বলশালী এবং যুদ্ধকার্য্যে নিপুণ বীরপুরুষ ছিলেন। যদু যৌবনে মল্লযুদ্ধে কৌশল দেখাইয়া 'যদু মল্ল' নামে খ্যাত হন। মুসলমান ইতিহাসের বর্ণবিন্যাসে নাম 'জেৎমল' এবং শেষে চৈৎমল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার সময়ে চট্টগ্রাম অধিকৃত হইয়াছিল। যদুর ধর্ম্মান্তর যেরূপে হউক, তিনি আনুষ্ঠানিক ভক্ত মুসলমান হইয়াছিলেন। পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ ও পীর

ফকিরকে দান করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। তিনি অনেকগুলি মস্‌জীদ, সরাই, স্নানাগার ও আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া গৌড় নগরীর সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করেন। ‘জলালী’ নামে অভিহিত এই সমস্ত কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

বলা বাহুল্য, জলালউদ্দীন্ যদুনারায়ণ রাজা গণেশের ন্যায় হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গকে সমান দেখিতেন; তাঁহার রাজ্যকালে শান্তির মধ্যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছিল (১১)। তৈমুরলঙ্গের পৈশাচিক উপদ্রবে যখন উত্তরপশ্চিম ভারত ম্রিয়মাণ, সর্ব্বত্র খণ্ডরাজ্যের আবির্ভাবে ও মুসলমান সামন্তগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচার অনাচারে হিন্দু প্রজাবর্গ ত্রস্ত ও মহাবিপন্ন, যদু জেলালুদ্দীন্ ও এবং তাঁহার কৃতী পুত্র আমেদ শার সুশাসনে বঙ্গভূমি তখন সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। আমেদ্ শা সমদর্শিতায় এবং নিরপেক্ষ বিচারে প্রকৃতিপুঞ্জের এতই প্রিয় হইয়াছিলেন যে হিন্দু মুসলমান সমগ্র বঙ্গবাসী কে কত রাজভক্ত তাহা দেখাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত (১২)। আমেদ্ নিঃসন্তান ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে পুনরায় পূর্ব্বের

(১১) যদু জলালুদ্দীনের সমকালেই দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত অনেক মুদ্রা পাওয়া যায়। দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজবংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার পাণ্ডুনগরে মুদ্রিত টাকা বড় পাণ্ডুয়ায় মনে করিবার কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজা স্বাধীন হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙ্গলায় মুদ্রা চালাইতে পারেন এবং এই প্রকার মুদ্রা প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষে পাওয়াও আশ্চর্য্য নহে। গৌড়েশ্বর হইলে প্রামাণিক ইতিহাসে তাঁহাদের কথা লিখিত থাকিত। মুদ্রাদোষ লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয় যে “অন্য কোন হিন্দুরাজা বাঙ্গলায় ইহাদের মত একচ্ছত্র হইতে পারেন নাই।”

(১২) রিয়াজ্ উস্ সালাতীন্ গ্রন্থকার গোলাম হোসেন কোন এক অজ্ঞাত পুস্তিকার মতে লিখিয়াছেন, আমেদ শা ভয়ানক অত্যাচারী ছিলেন, এবং অত্যাচা-

বিপ্লব দর্শন দিল। শেষে প্রধান মুসলমান সামন্তেরা মিলিয়া শমসুদ্দীনের বংশের এক যুবককে নাসির শা নাম দিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হিন্দু রাজা গণেশের বংশ তিন পুরুষে লোপ পাইল। ইলিয়াস্ শার বংশের এই পরবর্ত্তী কয়েকজন সুলতানের সময়ে গৌড়ে এক দুর্গ ও কোতোয়ালী দরজা এবং হুগলী পাণ্ডুয়ার সূর্য্যমন্দিরের স্থানে মস্‌জীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছিল। নাসিরুদ্দীন্ এবং তাঁহার বংশের অপর চারিজন রাজা ৪৫ বৎসর নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ করার পরে পুনরায় বিপ্লব উপস্থিত হইল। হাব্‌সী সেনাপতি সেনাদলের সাহায্যে সুলতান্ হইলেন; আবার অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে অনাচারের স্রোতঃ প্রবাহিত হইল।

রাজা গণেশের সময়ের বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষা দীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে প্রাচীন কালের কথা কিছু বলা আবশ্যক। আধুনিক প্রত্নতত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতবর্গের মতের অনুসরণ করিলে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রাচীন কালের বাঙ্গালীজাতি দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় প্রভৃতি রক্তমিশ্রণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র ভাবে গঠিত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্ম এখানে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ মতেরই প্রভাব অধিক ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভৃগু কথিত মনু-সংহিতায় তীর্থ যাত্রা ভিন্ন অঙ্গ বঙ্গে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এই বিধি আছে। তীর্থযাত্রার কথায় এদিকেও তীর্থ ছিল তাহা স্বীকৃত

রের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলে অমাত্যবর্গ তাঁহাকে নিহত করিয়া পূর্ব্ব রাজবংশের জনৈক কুমারকে রাজা করেন। উপরিলিখিত প্রামাণিক ইতিহাসের মত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

হইয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ইয়ুন্ চাঙ্গের সময়ে বহুতর বৌদ্ধ মঠ বঙ্গের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। হিন্দু বৌদ্ধ উভয় মতই এদেশে প্রচলিত বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক বাঙ্গালী অধ্যাপক তখন নালন্দার বিশ্ববিশ্রুত বিহারের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধমতের প্রতিকূল ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজা আদিশূর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব লক্ষ্য করিয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে বাধ্য হইলেন। এই ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহাদের বংশধরগণের সাহায্যে পুনরায় বেদানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড মধ্য বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু অন্যত্র বিশেষতঃ প্রত্যন্ত ভাগে ও সমাজের নিম্নস্তরে বৌদ্ধ প্রভাব বলবৎ রহিয়া গেল। বৌদ্ধ পাল রাজগণের অধিকার কালে সাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকৃত বৌদ্ধ মতেরই সমধিক প্রচলন ছিল, বোধ হয়। বৌদ্ধ মহাযান মত নানা ভাবে ভারতের নানা প্রদেশে দেখা দিয়াছিল। বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের মিশ্রণে নূতন ভাবের সাধনা ও পূজা পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল পূজা পদ্ধতি সমাজের উচ্চস্তর হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নে আসিয়া রূপান্তরিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। হিন্দুতন্ত্রানুমোদিত শিব ও শক্তি পূজা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করিলে ও নিম্ন শ্রেণীতে বৌদ্ধ শূন্য মূর্ত্তির রূপান্তর ধর্ম্ম পূজা এবং মনসা শীতলাদির পূজা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। রাজা গণেশের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিরচিত রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্ম পূজা পদ্ধতির পুস্তক 'শূন্য পুরাণে' বৌদ্ধধর্ম্মের আচারের যথেষ্ট আভাষ আছে। একালে ধর্ম্মপূজা শিব পূজায় পরিণত হইলেও বাগ্দী, ডোম,হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেই সাধারণতঃ ধর্ম্মের 'দেয়াসীন' হইয়া থাকে। 'নমো ধর্ম্ম নিরঞ্জন' 'ভাবসিদ্ধি' 'শূন্যমূর্ত্তিং' ইত্যাদি মন্ত্রে ও বাক্যে এখনও এই

পূজায় বৌদ্ধ ভাবেরই পরিচয় দেয়। হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের শিক্ষার মত নিম্নস্তরের সাধন ভজনও সমাজের একাংশে স্বীকার করিয়া লইয়া সমস্তকেই নিজস্ব করিয়াছেন। বৌদ্ধ সহজ সাধনা রূপান্তরিত হইয়া কি ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা অন্যত্র বিবৃত করা হইবে। অল্প দিন হইল, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে ময়নামতী ও গোবিন্দ চন্দ্রের গীতের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। 'গোরক্ষ বিজয়' নামে আধুনিক ভাষায় লিখিত আর এক পুঁথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ গুলির ভাষা গায়কমুখে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আসিলেও ইহা হইতে মুসলমান বিজয়ের সমকালবর্ত্তী বাঙ্গলার এক প্রদেশে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মের মিলনের পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধার কথায় যোগের 'মহাজ্ঞান' সাধারণের নিকট কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছে তাহা দৃষ্ট হয়। যোগী গোরক্ষনাথ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ব্যক্তি; ময়নামতী তাঁহার নিকট 'শিশুমতি' অবস্থায় মহাজ্ঞান লাভ করেন। হাড়িসিদ্ধা পার্ব্বতীর মায়ায় নরলোকে হাড়ি জন্ম লইয়া ময়নামতীর প্রেমে বদ্ধ হন; অথচ ইঁহাদের উভয়েরই অলৌকিক গুণপনা, মৃত ব্যক্তিকে বাঁচান, হয় কে নয় করেন, ইত্যাদি। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী বড়ই হৃদয়স্পর্শী। গাথা গুলিতে রাজা গণেশের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের সমাজের এবং কালে পরিবর্ত্তিত হইলেও সেকালের সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যেকালে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগের মত কালবশে উত্তর-ভারতে দুর্ব্বোধ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল; প্রাচীন পুরাণ ও তন্ত্রের মহাশক্তিবাদ বৌদ্ধতন্ত্রের মিশ্রণে ক্রমশঃ অর্ব্বাচীন তন্ত্রোক্ত শাক্ত ও শৈব মতে পরিণত হওয়ায় ধর্ম্মজ্ঞান, শিক্ষা ও সাধনের অপব্যবহারে গৌড়ীয় শাক্তসমাজ যখন

সময়েই গণেশের অর্থশূন্য কর্ম্মসাধনায় ব্যাপৃত ছিল, ঠিক সেই অবতার। শৈব বা শাক্ত সাধক সেকালে ফেৎকারিণী বা উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের উৎকট সাধনার সন্ধানে নিরত, কেহবা 'কামধেনু'র সহযোগে 'মাতৃকা ভেদ' সমাধা করিয়া 'কুলার্ণবে' পার্থিব তনু ভাসাইবার উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত। এই অবস্থায় তথাকথিত সাধক বা পণ্ডিত-বর্গের অনুষ্ঠান ও উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে সে যুগের সাধারণ ভদ্র লোকের ধর্ম্মভাব ও শিক্ষার গতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। গৌড়দেশ অতি প্রাচীনকাল অবধি শক্তিসাধনের ক্ষেত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু যে তান্ত্রিক উপাসনায় 'পরাৎপর' জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় 'সর্ব্বশাস্ত্র পরোদক্ষ, * * ···জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্ত মানসঃ' গুরুদেবের সন্ধান করা আবশ্যক এই নির্দ্দেশ আছে, যাহাতে 'উত্তমা মানসী পূজা বাহ্যপূজা কনীয়সী' বলিয়া সাধকের উপাসনার সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে কামনায় শিষ্যের ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালন সর্ব্বথা বিহিত হইয়াছে, সেই তান্ত্রিক মতেই আবার কালবশে বামাচারে পঞ্চতত্বে (পঞ্চ মকারে) আরম্ভ করিয়া কৌলাচারের অপব্যবহারে সাধকের রাক্ষসভাব আনিয়া ফেলিয়াছে (১৩)। বামাচার ও বীরাচার মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রতিপক্ষকে 'পশ্বাচারী' সংজ্ঞা

(১৩) 'কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে' ইত্যাদি ভেদাভেদ জ্ঞান এবং উচ্চতর সাধন কুলাচারের প্রাথমিক শিক্ষা ; ইহা শেষে কুলার্ণব নামক বর্ত্তমান তন্ত্রের বীর বা কৌল আচারে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণাচারের মতে বৈদিক নিয়মে দেবীর আরাধনা করিয়া সাত্বিক বা রাজসিক বলিদানের ব্যবস্থা আছে ; মদ্যাদি নিষেধ। বামাচারে পঞ্চমকার বিধেয়। বীরাচারের শেষ ব্যবস্থা বর্ত্তমান কুলার্ণবে যেভাবে বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ কুলস্ত্রী সংসর্গ ব্যাপারে 'যোগিনী সাধন' যেরূপ নির্লজ্জভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থগুলি যেন তান্ত্রিক সাধনের প্রতিকূল মতাবলম্বী

দিয়া সংজ্ঞারহিত 'বীর' সাধক ভ্রষ্টাচারে নিজেই বিকট পশুভাবে উত্থান করিয়াছেন! কৌল, দণ্ডী প্রভৃতিরাই প্রথম প্রথম চক্র করিয়া মকার সাধন করিতেন এবং ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মহাবিদ্যা'। শেষে অর্থাদি লোলুপ গৃহীও বামাচারীর সাহায্যে সাংসারিক ফললাভের আশায় অভিচার ক্রিয়াদি করাইয়া লইত। সাধারণ গৃহী ব্রাহ্মণ বা অপর সৎ জাতীয় লোকে অবশ্য কোন কালেই বামাচারের পক্ষপাতী ছিল না। শাক্তগণের মধ্যে চণ্ডীপূজা ও দুর্গোৎসবই বিশেষ প্রচলিত ছিল, এবং মানস করিয়া বাটীর বাহিরে নিশাযোগে দক্ষিণা কালিকার পূজা করা হইত। পুরাণ এবং তন্ত্র হইতে ভবদেব প্রভৃতি মহাত্মগণের সঙ্কলিত পূজা পদ্ধতির আলোচনায় এই সমস্ত পূজার বিধান দৃষ্ট হয়। সম্পন্ন বিত্তশালী গৃহস্থেরা শালগ্রাম শিলা ও শিব প্রতিষ্ঠা করিতেন। শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সকলের জন্যই তন্ত্রমন্ত্রের বিধান ছিল ; কালবশে সহজ পূজা উৎকট ভাব ধারণ করিতেছিল। বৌদ্ধভাবের সহজ সাধনাও বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। (১৪)

সামাজিক অবস্থার কথায় নরসিংহ নাড়িয়ালের কন্যার বিবাহে বারেন্দ্র সমাজে কাপের উৎপত্তির কাহিনী নিম্নে লিখিত হইল। প্রবাদ আছে যে, নরসিংহ নাড়িয়াল প্রথমে পান বিক্রয় করিয়া সংসার

লোকের বিদ্রূপোক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অনুষ্টুপে রচিত, কাজেই তাহাও শাস্ত্র! অনেকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাইয়াই সব বুঝা গেল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

(১৪) কেহ কেহ মনে করেন, সহজ সাধনা এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাবের উন্নতি করিয়াই বঙ্গদেশে নবীন তান্ত্রিক সাধনাকে গঠন করিয়া লওয়া হইতেছিল। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা হইতে ঠিক্ এতটা সপ্রমাণ হয় মনে হয় না হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বৌদ্ধ মতের প্রতিক্রিয়া হইতে পারে ; সমগ্র বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বলা চলে না।

সেই দোষে বা শ্রীহট্টে লাউড় বিভাগে বাস করার নিমিত্ত চালাইতেন। নরসিংহ সমাজে অবমানিত ছিলেন। শুকদেব আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধে কুলীন ব্রাহ্মণগণ নরসিংহের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন নাই বলিয়া নরসিংহ মহা কুলীন মধু মৈত্রের সহিত করণ করিয়া সমাজে উন্নত হইবার সঙ্কল্প করেন। কথিত আছে যে তিনি এক দিন নিজ কন্যা, একটি শালগ্রাম শিলা ও গাভী নৌকায় উঠাইয়া মধু মৈত্রের বাটীতে আসিয়া কন্যাদানের প্রস্তাব করেন। মধু এই প্রস্তাব উপেক্ষা করিলে নরসিংহ নদীগর্ভে নৌকা ডুবাইয়া এককালে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও শালগ্রাম বিসর্জ্জনের ভান করিলেন। মধুমৈত্র বিপাকে পড়িয়া পাপের ভয়ে অগত্যা কন্যা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। মধুর দুই পুত্র কুল নাশের ভয়ে পৃথক্ হইলেন। অন্যান্য প্রধান কুলীন-দের সাহায্যে মধুর কুল রক্ষা হইল, কিন্তু তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কোন কুলীনেই আশ্রয় দিলেন না। তাঁহারা গত্যন্তর না দেখিয়া ছয়ঘরিয়া দলে প্রবেশ করিলেন। এই ছয়ঘরিয়া সমাজের লোকেরা অতঃপর কুলীনের ন্যায় করণাদি করিতে লাগিলেন; তাহাতে প্রকৃত কুলীনেরা বলিতেন, উহাদের কুল নাই অথচ কাপ (কপট ব্যবহার) করিতেছে। এই অবধি কথিত ভ্রষ্ট কুলীনগণের ‘কাপ’ আখ্যা হইল। এই প্রবাদে দেখা যাইতেছে যে, যে ভাবেই হউক নরসিংহ অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও উন্নীত হইয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরি-বর্ত্ত মর্য্যাদা ও করণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পরে বারেন্দ্র সমাজে পটী ও থাকের উৎপত্তিতে অল্প সংখ্যক কুলীনের মধ্যে বিবাহ ব্যাপার আবদ্ধ থাকায় যে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হইয়াছিল, এস্থলে তাহার উল্লেখের অবসর নাই। রাঢ়ীয় সমাজে দেবীবরের প্রবর্ত্তিত মেল প্রথার কথা পরে লিখিত হইবে।

শিক্ষা বিষয়ে সাধারণ বাঙ্গালী তখন নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল। অনূন পঞ্চাশৎ বৎসর পরবর্ত্তী নদীয়াবাসী কৃত্তিবাস পণ্ডিতকেও পাঠ শেষ করিতে বড় গঙ্গা পারে অর্থাৎ বরেন্দ্র অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। মিথিলাই তখন সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও মহামনস্বী রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় পাঠ শেষ করিয়াছিলেন, সে কথা পরে বলা হইবে। বরেন্দ্রভূমি মিথিলা ও রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই ইতিপূর্ব্বে কুল্লুকভট্ট বা উদয়না-চার্য্যের মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। রাঢ় প্রদেশে বল্লালসেনের বংশের ক্রমশঃ সংশোধিত কৌলিন্য প্রথার প্রভাবে ছাপ্ মারা নবগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া কুলীন বংশধরের আর নূতন গুণ সংগ্রহের আবশ্যক হয় নাই! গৌড় বা বরেন্দ্র অঞ্চলে বর্দ্ধিষ্ণু ভূম্যধিকারীবর্গের উৎসাহেও শাস্ত্র ব্যবসায়ীর কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মণ রাজকার্য্যেও অপটু ছিলেন না, ইহার প্রমাণ বরেন্দ্রের সেকালের ইতিহাসে যথেষ্ট রহিয়াছে। মধু খান, জগদানন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-কুমার গৌড় রাজসংসারে কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন। অর্দ্ধশিক্ষিত মুসলমান সুলতান্‌গণ রাজকার্য্যে বাঙ্গালী হিন্দুর উপরেই বিশেষ নির্ভর করিতেন। এক কথায় এইমাত্র বলা যায়, যে যে কারণে বাঙ্গালীর কার্য্যকারিতা শক্তি ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, সেকালে সেই সমস্ত কারণের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হয় নাই। যখন পুর্ণ মুসলমান প্রভাবের মধ্যে চাণক্যের মত মনস্বী বারেন্দ্রব্রাহ্মণসন্তান নরসিংহের মন্ত্রণায় বঙ্গের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, সে কালের কথা স্মরণ করিলে বর্ত্তমানে আমাদের মত বাক্যবাগীশ বাঙ্গা-লীর কিঞ্চিন্মাত্র চৈতন্যোদয়ও কি আশা করা যায় না?

রাজা গণেশের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের গৌরব দুই সুপ্রসিদ্ধ

গ্রন্থকার আবির্ভূত হন। প্রথম চণ্ডীদাস, তাঁহার কথা বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যায়ে বলা হইবে। দ্বিতীয় কবি কৃত্তিবাসের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নবাবিষ্কৃত রামায়ণের পুঁথিতে কৃত্তিবাসের জন্মের তারিখ নির্দ্দিষ্ট আছে ;—"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস"। এই উল্লেখ হইতে জ্যোতিষিক গণনা করিয়া 'পূর্ণ মাঘ মাস' অর্থাৎ মাঘের সংক্রান্তি, রবিবার শ্রীপঞ্চমী সমস্ত মিল করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ ২৯শে মাঘ স্থির করিয়াছেন (১৫)। কৃত্তিবাসের নির্দ্দেশ মতে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ নরসিংহ ওঝা 'বেদানুজ' (দনুজমাধব) মহারাজার জনৈক পাত্র ছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গে 'প্রমাদ' অর্থাৎ মুসলমান বিজয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইলে নরসিংহ গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহার পূর্ব্বেও ফুলিয়া গ্রামে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। 'ফুলে মেল' এর কথা সকলেই জানেন। নরসিংহ হইতে কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত পুরুষ ধরিয়া আসিলে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে কবির জন্মগ্রহণ ইতিহাস নির্দ্দিষ্ট কালের সহিত বাধে না। ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ)

(১৫) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩২০—৪র্থ খঃ। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চতুর্থ সংস্করণে 'পূর্ণ মাঘ মাস' কথার একটা পরিষ্কার অর্থ হয় না কেন বলিয়াছেন, বুঝা যায় না। 'জ্যোতিষিক গণনার ভিত্তিভূমি' শুধু মুখের কথায় 'চূর্ণ' হয় না। ষ্টেপলটনের কথার গুরুত্ব অন্যে স্বীকার না করিতে পারে। যে সমস্ত প্রমাণে সুহৃদ্বর দীনেশবাবু কবি কৃত্তিবাসকে কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে চান, তাহার দ্বারাই তাঁহাকে পরবর্ত্তীকালে আনা যায়। ১৪০২ শকের মেল বন্ধনে মালাধরী থাক হইয়াছে ; 'মেল' নহে। কৃত্তিবাস জীবিত থাকিতে মালাধরের বৈবাহিক বন্ধন জন্য তাঁহার নামে থাক হওয়া বিচিত্র নয়। কবি 'উত্তরদেশ' 'বড় গঙ্গাপারে' পড়িতে গেলেন, যশোহরে কেন হইবে ?

রচিত ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে লিখিত আছে,'কৃত্তিবাসো কবির্ধীমান্ সৌম্য শান্ত জন প্রিয়ঃ'। কবি তখন ৫৩ বর্ষের প্রৌঢ় সম্মানী ব্যক্তি।

কবি কৃত্তিবাস ফুলের মুখটি ; অতীব সম্মানিত কুলীন বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ উৎসাহ রাজা বল্লাল সেনের সভায় মুখ্য কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হন। উৎসাহ হইতে কৃত্তিবাস নবম পুরুষ অধস্তন। বল্লাল সেন ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, প্রমাণিক ইতিহাসে স্বীকৃত। নয় পুরুষে প্রায় তিন শত বৎসর, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং কবির প্রদত্ত নিজ জন্মের তারিখ ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনায় ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহার সহিত সকল বিষয়েরই মিল হইতেছে। পুঁথির 'পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ' 'পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার' ইত্যাদি কথায় বরেন্দ্র ভূমিতে অধ্যয়নার্থ যাওয়াই সূচিত হইতেছে। 'গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন' করিবার সময়ে 'রাজ-পণ্ডিত হব মনে আশা করে' নবীন যুবক কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজার সভায় পাত্র মিত্র সকলেই হিন্দু, ব্রাহ্মণই অধিক, মুসলমান প্রভাবের কোন চিহ্নই নাই। রাজা গণেশের সভা হইলে অন্ততঃ দুই এক জন মুসলমান পাত্র মিলিত। 'গৌড়েশ্বর' কথায় সম্রাট্ বুঝাইলে অন্ততঃ একবার ও বাদশা বা পাতশা কথা লিখিত থাকিত। 'সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসনপরে' বলিয়া আবার রাঙ্গা মাজুরি'র উপর 'নেতের পাছুরি' পাতার কথা ও কবি লিখিতেছেন। রাজসভায় কবি রাজদত্ত 'পুষ্পমাল্য' 'চন্দনের ছড়া' ও 'পাটের পাছড়া' সম্মান স্বরূপ পাইলেন ; অন্য দান প্রার্থনা না করিয়া 'গৌরব মাত্র সার' স্থির করিয়া রাজসভায় পণ্ডিত বলিয়া স্বীকৃত হওয়াই যথেষ্ট মনে করিলেন। 'পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা' ইহা গণেশ বা অন্য গৌড় বাদশা সম্বন্ধেও খাটে না। মনে হয়, হাবসী রাজাদের বিপ্লবের

সময়ে গৌড় অঞ্চল ও সমগ্র বরেন্দ্রভূমির অধিকারী ভূস্বামী রাজা কংস-নারায়ণ অর্দ্ধস্বাধীন রাজা ছিলেন। এই নিমিত্তই ইতিহাসে গণেশ ও কংসে গোলযোগ ঘটিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা কালে কালে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা হইতে সেকালের ভদ্র-বাঙ্গালী সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র দেখাইবার প্রয়াস পাইব। কৃত্তিবাস বাল্মিকী রামায়ণের অবিকল অনুবাদ করেন নাই। সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের পাঠোপযোগী করিয়া নূতন পরিচ্ছদে মূল রামায়ণের বিষয়গুলিকে সাজাইয়াছেন। তাঁহার শ্রীরাম বাল্মিকীর অতিমানুষ শ্রীরামচন্দ্রের বাঙ্গালী সংস্করণ; সীতাদেবী বঙ্গবধূর কোমলতা অধিক মাত্রায় অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর এই নিজস্বভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ এত আদরের হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে রচিত ময়নামতী প্রভৃতির গান বা ধর্ম্মপূজার পুঁথিতে বাঙ্গলা ভাষার দৈন্যই প্রকাশ পায়। সম্প্রতি প্রকাশিত চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে সে যুগের বিকৃত রুচি সুস্পষ্ট। কৃত্তিবাসের সমগ্র গ্রন্থ উন্নত ভাব ও বিশুদ্ধ রুচির পরিচায়ক। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু বাল্মিকীর মত কবি কৃত্তিবাসকে এই ভাবে বাঙ্গলার আদি কবি বলা অসঙ্গত নহে।



বড় সোনা মসজিদ (গৌড়)—২৭ পৃঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

হোসেন শা।

বিদেশী হাব্সী সেনাপতি বিপ্লবের পর বিপ্লবের মধ্য দিয়া গৌড়ের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। অর্থলোলুপ সামন্ত দল ও পাইক সৈন্য তাঁহার সহকারী ও পৃষ্ঠপোষক। পুনরায় সমগ্র বঙ্গে অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় দর্শন দিয়াছে। নিরীহ নির্জ্জীব গৌড়ীয় হিন্দুসমাজ পুনরায় সাময়িক অত্যাচারে ম্রিয়মাণ। এমন সময়ে আর একজন কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইল। ইনি ইতিহাস-বিখ্যাত প্রথিত-নাম হোসেন শা।

হোসেন শার বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকসমাজে বিস্তর মত-ভেদ লক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ ফেরিস্তা বলেন 'তিনি সৈয়দ্‌বংশ সম্ভূত; ভাগ্য পরিবর্ত্তন কামনায় সুদূর আরবের মরুময় ভূখণ্ড হইতে বাঙ্গলার শস্যশালী জনপদে আসিয়া কালক্রমে গৌড়ের রাজ-মন্ত্রী হন।" রিয়াজ-উস-সালাতিন্ গ্রন্থকার গোলাম হোসেন্ লিখিয়াছেন,—'আমরা গ্রন্থান্তরে দেখিয়াছি, হোসেন্ শা ও তদীয় ভ্রাতা ইউসুফ ও তাঁহাদের পিতা সৈয়দ আশরফ্ হোসেন স্বীয় বাসস্থান তেরমজ্ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া রাঢ়ভূমির অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে বাস করেন। ভ্রাতৃদ্বয় তথাকার কাজীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। কাজী তাঁহাদের বংশ পরিচয় জ্ঞাত হইয়া ও হোসেনের বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করিয়া শেষে স্বীয় কন্যার সহিত হোসেনের বিবাহ দিলেন। অতঃপর সৈয়দ হোসেন

রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। অপর দুই একজন লেখকের মতে, মজঃফর শা ওরফে বদর দেওয়ানা চারি মাস কাল গৌড়ের দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া, শেষে সদলে বহির্গত হন। উভয় পক্ষের ষড়বিংশতি সহস্র সৈন্য কালের করাল-কবলে নিপতিত হইলে বিজয়শ্রী হোসেন্ শার অঙ্কগতা হইলেন। যেরূপেই হোসেনের রাজ্যলাভ ঘটুক, কোন লেখকেই মজঃফরের কুকীর্ত্তির অপলাপ করেন্ নাই। রাজার চরিত্রের অনুসরণ করিতে পাঠান সামন্তবর্গও কখনই পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বিদ্রোহের অবকাশে রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে অরাজকতা বিস্তার সেকালে নিতান্ত সহজ ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে সেকালের কথায় মুসলমানের হস্তে নবদ্বীপবাসী হিন্দুর নিগ্রহের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই বিপ্লবের অবস্থাতেই সংঘটিত হইতে পারে। বৈষ্ণব কবি সময় নির্দ্দেশ করিতে না পারায় এই অত্যাচারের অপরাধ হোসেন শার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন, হোসেন শা যুদ্ধান্তে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, সেই ঐতিহাসিকগণের মতে, উচ্ছৃঙ্খল সেনাদল হোসেনের অভিমতেই গৌড় নগরী লুণ্ঠন করে। কথিত আছে, সেনানায়ক ও অমাত্যবর্গ নাগরিকগণের চিরসঞ্চিত ধনরাশি তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইবে, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াই হোসেন শার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কয়েকদিন পরে সৈন্যদলকে লুণ্ঠন হইতে বিরত হইবার আদেশ প্রচারিত হইল। বারংবার নিষেধ করিলেও সেনাদল আদেশ পালন না করায় শেষে হোসেন শা অসংখ্যক লুণ্ঠনকারীকে নিহত করিয়া অত্যাচার প্রশমিত করিলেন। কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যের সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণে তাঁহার আপত্তি ছিল না; এই সময়ে তিনি তের শত রৌপ্যপাত্র প্রাপ্ত হন। মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, পুরাকাল হইতে লক্ষ্ণৌতি ও বঙ্গের

ধনশালী অধিবাসিগণের মধ্যে ভোজনকালে রৌপ্য পাত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। নিমন্ত্রণ ও ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে যিনি যে পরিমাণে রৌপ্যপাত্র প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনি সেই পরিমাণে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। গৌড়বাসী নাগরিকগণের অত্যধিক স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রের উল্লেখ তাঁহাদের অবস্থার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

গৌড়-অধিকার ও সিংহাসন লাভ করিয়া হোসেন শা আলাউদ্দীন্ উপাধি গ্রহণ করিলেন (২) ধীমান্ নবভূপতি প্রথমেই প্রকৃতিপুঞ্জের প্রীতি আকর্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে স্বপদে স্থিরতর রাখিয়া, উপযুক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি সাধন করিয়া সকলের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। উচ্ছৃঙ্খল পাইক সেনাদলই রাজবিদ্রোহ ঘটাইবার উপায় স্বরূপ ছিল; ভবিষ্যৎ-বিপ্লব পরিহারের মানসে হোসেন শা এই পদাতিক সেনাদলকে পদচ্যুত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করিলেন। স্বপদে দৃঢ়তর হইয়া ক্রমশঃ তিনি হাব্সী সেনাবৃন্দকেও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

রাজধানীকে নিরাপদ করিয়াও সম্ভবতঃ বিপ্লবের ভয়েই হোসেন শা গৌড় ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী একডালার সুদৃঢ় দুর্গে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের নির্দ্দেশমতে হোসেন শা 'শেব হঙ্গ' নামক একদল শরীররক্ষী সেনার গঠন করেন। বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে দেখা যায়, কেশব ছত্রী হোসেন শার শরীররক্ষী রাজপুত সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। সুলতান্-হোসেন শার সুব্যবস্থা ও সুশাসনে

(২) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ হোসেন শাকে 'আলাউদ্দীন সৈয়দ শরীফ মক্কী' নামে নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু রিয়াজ গ্রন্থকার হোসেন শা নির্ম্মিত সোণা মসজিদ ও অন্যান্য শিলালিপি হইতে 'সৈয়দ আসরফ হোসেনের পুত্র সুলতান হোসেন শা' এই নাম পাইয়াছেন।

অচিরেই দেশমধ্যে যথেষ্ট শান্তি স্থাপিত হইল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল; অশান্ত জায়গীরদার ও সামন্ত-বর্গের অত্যাচার ও সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা ত্বরায় বিদূরিত হইল। সাধারণ প্রজাবর্গ তাঁহার অনুরক্ত থাকায়, তিনি সহজেই উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। তৎপরে তাঁহার বিজয়ী সৈন্যদল আসাম প্রদেশে কামরূপ ও কামতা পর্য্যন্ত ধাবিত হইল। হিন্দু রাজা পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। সুলতান নিজ পুত্রের প্রতি সেনা পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। বর্ষার জলপ্লাবনে রাস্তা ঘাট দুর্গম হইয়া পড়িলে কামরূপ-রাজ পর্ব্বতাশ্রয় হইতে অবতরণ করিয়া বিপক্ষের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য নিহত হইল; রাজপুত্র কায়ক্লেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কামরূপ বিজয় এবার অসাধ্য হইল। (৩)

অতঃপর বহুদিন ধরিয়া কামতা ও আসাম রাজ্য বিজয়ের চেষ্টা চলিয়াছিল। গেট সাহেব আহম্ ভাষায় লিখিত বুরঞ্জী অনুসারে লিখিয়াছেন, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা কামতা খ্যেন্ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল (৪)। গল্প আছে যে, কামতাপুরের রাজা নীলাম্বরের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পুত্র রাজ-শুদ্ধান্তের বিশুদ্ধি বিনষ্ট করায় নীলাম্বর ঐ যুবককে বধ করাইয়া মন্ত্রীকে তাহার মাংসভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মন্ত্রী পাপ বিমোচনের নিমিত্ত গঙ্গাস্নানের ছলে গৌড়ে আসিয়া হোসেন শার আশ্রয় লইলেন। হোসেন শা মন্ত্রীর নিকট কামতা রাজ্যের অবস্থা সম্যক্ জানিয়া লইয়া কামতাপুর অবরোধ করিলেন।

(৩) রিয়াজ-উস্ সালাতীন্। তারিখ ফতে ই আসাম্ গ্রন্থের মতে হোসেন শার আসাম বিজয়ের উদ্যম ও এই ভাবের।

(৪) Gait's History of Assam.

কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে না পারিয়া সন্ধির জন্য রাজা নীলাম্বরকে জানাইলেন এবং বলিলেন যে তাঁহার পত্নী নীলাম্বরের রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করেন। এই ছলে অন্যান্য গল্পের মত কাপড় ঘেরা ডুলিতে মুসলমান সেনা নগর প্রবেশ করিয়া কামতাপুর দখল করিয়া লয়। নীলাম্বর বন্দী হইয়া গৌড়ের পথে রক্ষীর হাত এড়াইয়া পলায়ন করেন। হোসেন শা অতঃপর বড়নদী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়া পুত্র দানিয়ালকে কামতাপুরে রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই বীর পুত্র দানিয়াল জৌনপুরের সুলতানকে সাহায্য করিতে গিয়া ইতঃপূর্ব্বে সেকন্দর লোদীকে পরাস্ত করায় বিহারের কিয়দংশ হোসেন শাহের অধিকারে আইসে। কামতা অধিকারের পরে দানিয়াল আসাম জয়ের উদ্যম করেন। তারিখ ফতে ই আসাম গ্রন্থের মতে হোসেন শা প্রথম চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া পুত্র দানিয়ালকে আসাম বিজয়ের ভার দিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুহুঙ্গ মুঙ্গ এই সময়ে আসামের রাজা ছিলেন। বুরঞ্জীর মতে তাঁহার সময়েই আসামে প্রথম মুসলমান আক্রমণ; কিন্তু সেনাপতির নাম বড় উজীর। মুসলমানী ইতিহাসের মতে বর্ষাপগমে আসাম-রাজ দানিয়ালকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সদলে নিহত করেন। বুরঞ্জী অনুসারে আসামীরা বুরাই নদীর তীর পর্য্যন্ত মুসলমান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ৪০টী অশ্ব ও ঐ পরিমাণ কামান কাড়িয়া লয়। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বড় উজীরের এই পরাজয় ঘটে। আসাম বুরঞ্জীর সহিত প্রামাণিক ইতিহাসের মিল না থাকিলে বুরঞ্জীর প্রবাদ-উক্তি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে।

ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালার মতে হোসেন শা ত্রিপুরা অধি-কারের উদ্যোগ করিয়া প্রথমে রাজা ধনমাণিক্য ও সেনাপতি চয়চাগের

কৃতিত্বে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। (৫) দ্বিতীয় অভিযানের সময় হোসেন শার সেনাপতি গৌর মল্লিক (৬) কুমিল্লার নিকট এক প্রবল যুদ্ধে চয়চাগকে পরাভূত করিয়া মেহের কুল দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর গৌড়ীয় সৈন্য রাজধানী রাঙ্গামাটিয়ার দিকে অগ্রসর হইলে ত্রিপুর সৈন্য সোনা মাটিয়ার দুর্গে আশ্রয় লয়। চয়চাগ ইতিপূর্ব্বে গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া জল আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। যখন মুসলমান সৈন্য জলশূন্য শুষ্ক গোমতী অতিক্রমণ করিতেছিল তখন ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় উহাদের প্রাণ বাঁচান কঠিন হইয়া উঠিল। অধিকাংশ সৈন্য জলমগ্ন হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা চণ্ডীগড়ে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু তথায় রাজসৈন্যেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। অতি অল্প লোকই পলাইতে পারিয়াছিল। রাজমালার মতে তৃতীয় বারের অভিযানে হাতিয়ার খাঁ হোসেন শার সেনাপতি ছিলেন; চয়চাগ যুদ্ধে পরাভূত হইলেন, কিন্তু এবারেও গোমতী বাঁধ জলপ্লাবনে শত্রু ডুবাইবার সাহায্য করিল! চতুর্থ বার হোসেন শা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া কৈলারগড়ে ধনমাণিক্যকে পরাস্ত করিয়া সম্ভবতঃ ত্রিপুর রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। সুবর্ণ গ্রামে আবিষ্কৃত ৯১৯ হিঃ (১৫১৩ খৃঃ) অব্দের এক শিলালিপি দ্বারা ত্রিপুরায় মুসলমান অধিকার প্রমাণিত হইয়াছে (৭)

এইরূপে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ, বিহারের পূর্ব্বাংশ, কামরূপ কামতা

(৫) ত্রিপুরার ইতিহাস ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ।

(৬) এ 'গৌর মল্লিক' কি 'সাকর মল্লিক' শব্দের মত উপাধি? যাহা হউক, এই সেনাপতি যে হিন্দু ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৭) Journal. As. Soc. 1872

উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিয়দংশ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর উনত্রিংশ (কোনমতে ২৭) বর্ষকাল প্রভুত্ব করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরাগ আকর্ষণে প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইয়া মহামতি সুল্‌তান আলাউদ্দিন্ হোসেন শা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

হোসেন শার সেনাদল উড়িষ্যা আক্রমণের সময়ে যে সমস্ত কুকীর্ত্তি সাধন করিয়াছে, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে।

যে হোসেন শাহা পূর্ব্বে উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

কিন্তু হোসেন শা স্বয়ং বা তাঁহার পুত্র নসরৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন নাই। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে হোসেন শার সেনাদল উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্রের প্রতাপে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অগণিত বাহিনী সঙ্গে সেনাপতি ইস্মাইল্ খাঁ বালেশ্বর অধিকার করিয়া কটকের দিকে অগ্রসর হন। প্রতাপরুদ্রদেব তখন দক্ষিণাপথে তৈলঙ্গের অধিকার লইয়া কখনও বিজয়নগরের হিন্দু ভূপতির সহিত কখনও বা গোলকুণ্ডার মুসলমানরাজের সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্গীয় সৈন্য এই অবসরে কটক আক্রমণ করিয়াছিল। লুণ্ঠন ও দেবমন্দির ধ্বংস করিতে করিতে বিজয়ী পাঠান দল পুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। প্রতাপ রুদ্র এবারেও রুদ্রবিক্রমে মুসলমান সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়া উৎকলের সীমা হইতে বিতাড়িত করিলেন। এই সময় হইতে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা সীমান্তভাগে বড়ই গোলযোগ চলিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ প্রভু শ্রীক্ষেত্র যাইবার অভিলাষ জানাইলে অন্যে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলঃ—

এবে প্রভু হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয়।

দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ
মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।

*　　*　　*　　*

রাজারা ত্রিশুল গাড়িয়াছে স্থানে স্থানে
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে।

যাহা হউক, স্বয়ং হোসেন শার হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কোন প্রমাণ নাই; যাহা ঘটিয়াছিল, চর চামুণ্ডের হস্তে।

দেশ বিজয় ও যুদ্ধকার্য্য সত্বর সংক্ষেপ করার পরে প্রজাবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানই হোসেন শার একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ও সৎকুলজাত মুসলমান প্রজাবর্গের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে মস্‌জীদ ও অতিথিশালা নির্ম্মিত এবং সাধুদিগের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু কুতব উল্ আলমের অতিথি-শালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দু প্রজার হিতসাধনেও হোসেন শা উদাসীন ছিলেন না। বস্তুতঃ রাজকীয় ব্যাপারে কৃতিত্ব তাঁহার নাম চিরস্মর করিবার উপযুক্ত হইলেও, জাতি নির্ব্বিশেষে প্রজাপালনই হোসেন শার অতুল কীর্ত্তি। হিন্দু পল্লীতে হিন্দুর মধ্যে লালিত হইয়া তিনি সহজেই হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়েন। উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধযাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল আফ্‌গান সেনাদলের হিন্দু মন্দির চূর্ণীকরণ ও অন্যান্য অত্যাচার যে হোসেন শার অভিমত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অপিচ, হোসেন শা সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি-গণের সমগ্র উক্তি তাঁহার সাধুতাই প্রমাণ করিতেছে। সেকালের খ্যাত-নামা অনেক হিন্দুকেই হোসেন শার অধীনে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত দেখিতে পাই। রাজকার্য্যে বাঙ্গালী হিন্দুর পারদর্শিতা সম্ভবতঃ ইতঃপূর্ব্বেই পাঠান-রাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু হোসেন

শার পূর্ব্বে গৌড়ের রাজসরকারে উচ্চতর বিশ্বস্ত রাজকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্যাতনামা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু হোসেন শার উজির ছিলেন, ইনি পুরন্দর খান উপাধি লাভ করেন (৮)। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় গোবিন্দ ও প্রাণবল্লভ যথা-ক্রমে গন্ধর্ব্ব খাঁ ও সুন্দরবর খাঁ নামে প্রথিত হইয়া উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকথিত কেশব ছত্রী বাদশার বিশ্বস্ত হিন্দু শরীররক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক। মাধাইপুরের সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুমার সনাতন হোসেন শার দরবারে 'সাকর মল্লিক' উপাধি পাইয়া রাজস্ব-বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং সনাতনের কনিষ্ঠ,সুকবি ভবিষ্যৎ রূপ গোস্বামী রাজার 'দবির খাস' (Private Secretary)। (৯) এরূপ সমাবেশ যে আকস্মিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। কুলীন গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা মালাধার বসু হোসেন শার নিকট 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনিও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ষোড়শের প্রথমার্দ্ধ আর্য্যজাতির

---

(৮) বর্ত্তমান হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রাম পুরন্দর খাঁর জন্মস্থান; অদ্যাপি তথায় পুরন্দর গড় বিদ্যমান আছে। পুরন্দর খাঁর পিতামহও গৌড়সরকারে চাকরি করিয়া সুবুদ্ধি খান উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

(৯) রূপসনাতনের পূর্ব্বপুরুষ গৌড়ে অন্যতম রাজমন্ত্রী ছিলেন। নৈহাটীতে ও মালদহ মাধাইপুরে তাঁহাদের বাসের বাটী ছিল। কেহ কেহ উহা মাতুলালয় বলেন। এই স্থান বর্ত্তমান রামকেলীর নিকটবর্ত্তী। জীব গোস্বামীর কথিত বংশ পরিচয়ে ইঁহারা দক্ষিণ দেশের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ সমুদ্ভূত। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গলায় আসিয়া গৌড় বাদশার মন্ত্রী হন এবং দুই তিন পুরুষ ধরিয়া গৌড়েই রাজ-কার্য্য করিতে থাকেন। রূপ ও সনাতন ইঁহাদের বৈষ্ণব আশ্রমের নাম।

মনস্বিতা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিকাশকল্পে যে সহায়তা করিয়াছিল সেরূপ আর কখনও হয় নাই। সুদূর পশ্চিমে লুথার প্রভৃতি মহাপুরুষেরা খৃষ্টীয় জগতে যে সময়ে ধর্ম্ম-বিপ্লবের সূত্রপাত করিতেছিলেন, তাহার প্রায় সমকালেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কবীর, নানক ও বল্লভাচার্য্য এক এক নবীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। পরিশেষে এই নির্জীব কর্ম্মকাণ্ড-প্লাবিত বঙ্গভূমিও শ্রীচৈতন্যের মধুময় প্রেমভক্তি তরঙ্গে আলোড়িত হইল। চৈতন্যের নবধর্ম্ম প্রচারের সহিত সুলতান্ হোসেন শার সম্বন্ধ সাধারণের বিশেষ পরিজ্ঞাত না হইতে পারে ; এজন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ঃ—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলী গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপাম ॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
কাজি যবন কেহো ইহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা উহার মন ॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন ॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগনি।
তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ॥

রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥
দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেই ত প্রমাণ ॥
রাজা কহে শুন মোর চিত্তে এই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহো নাহিক সংশয় ॥ (১০)
এত কহি রাজা গেল নিজ অভ্যন্তর।
দবীর খাস আইলা তবে আপনার ঘর।
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু স্থানে।
* * —চৈতন্যচরিতামৃত ; মধ্য খণ্ড ; ১ম পরিচ্ছেদ।

'নীচজাতি, নীচসঙ্গে, করি নীচ কাজ'—পতিতপাবন! নিজ গুণে দয়া করিয়া আমাদের উদ্ধার করিতে হইবে, ইত্যাদি বিনয় ও দৈন্য-জ্ঞাপক প্রার্থনায় রূপসনাতন চৈতন্যের আশ্রয় লইয়া নবজীবন পাইলেন। তৎপরে,

---

(১০) হোসেন শা ভক্ত কবির নির্দ্দেশমত শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবুন বা না ভাবুন, 'হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে'—এই কথায় তাঁহার ধর্ম্মদ্বেষ ছিলনা বুঝা যায়।

'শ্রীরূপ সনাতন রামকেলী গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥
দুই ভাই-বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিঞা দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥

অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় কৃষ্ণ মন্ত্রে পুরশ্চারণ করাইয়া, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কুটুম্ব ভরণার্থ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, ভাল ভাল ব্রাহ্মণের নিকট অনেক টাকা গচ্ছিত রাখিয়া, গৌড়ে মুদীর গৃহে দশ হাজার মুদ্রা রাখিলেন। সনাতন রাজধানীতেই রহিলেন। কয়েকদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল; সনাতন পীড়ার ছল করিয়া রাজ দরবারে যান না, বাসায় শাস্ত্র-বিচারে কালাতিপাত করেন। রাজা এক দিন হঠাৎ আসিয়া এই ভাব দেখিলেন; বলিলেন 'তুমি এইরূপ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে আমার সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হয়, মনে কি আছে, বল।' সনাতন বলিলেন, 'আমার দ্বারা আর এ কার্য্য হইবে না। আপনি অন্যলোক নিযুক্ত করুন।' রাজা ক্রোধভরে বলিলেন,

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি সব থাকে কৈল নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ।
*   *   *   *
পলাইবে জানি সনাতনেরে বান্ধিলা।
হেনকালে চলে রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে।
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাই তোমার সঙ্গে যাইতে॥
তবে তারে বন্দী রাখি করিলা গমন (চৈঃ চ মধ্য, ১৯ পরিচ্ছেদ)

এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া রূপ পূর্ব্বেই স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া-

ছিলেন। মুদীর নিকটে যে দশহাজার টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহাই ব্যয় করিয়া সনাতন আত্মমোচনের উপায় করিলেন। 'বড় ভাই' অর্থে ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ আর একজন এক অঞ্চলের 'হর্ত্তা-কর্ত্তা' বিধাতা ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

উল্লিখিত উপাখ্যানে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর বৈষ্ণব ভক্তি জনিত বিশ্বাস ও নানাপ্রকারে শ্রুত গল্প গুজব ত্যাগ করিলেও, হোসেন শাকে বিষম অত্যাচারী বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। ভক্তিমান্ চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস চৈতন্য প্রভুর প্রভাবে হোসেনের 'দৈবে আসি সত্ত্ব গুণ উপজিল মনে' লিখিলেও শ্রীচৈতন্যের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মুসলমান বাদশাহ যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন, চৈতন্য ভাগবতে ও চরিতামৃতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। রূপ সনাতনের ধর্ম্মতৃষ্ণা ব্যতীত বাদশার কোপ সঞ্জাত হইবার অন্য কারণও থাকিতে পারে। এস্থলে হোসেন শার পূর্ব্ব প্রভু সুবুদ্ধি রায়ের কথাও আলোচ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন ঃ—

পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী
সৈয়দ হোসেন খাঁ করে তাহার চাকরী॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসীব্ কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হোসেন শা গৌড়ে রাজা হইলা।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহ বহু বাড়াইলা॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়রে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥

স্ত্রী কহে জাতি লহ প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি লৈলে ইহোঁ নাহি জীবে॥
স্ত্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পাণি তার মুখে দেয়াইলা॥
তবে ত সুবুদ্ধি রায় সেই ছিদ্র পাঞা।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া॥

—চরিতামৃত ; মধ্য খণ্ড ; ২৫ পরিচ্ছেদ।

হোসেন শার মত সুবিজ্ঞ নরপতি যে বিনা কারণে স্ত্রীর কথায় "পোষ্টা পিতার" তুল্য ব্যক্তির এইরূপ লাঞ্ছনা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে। প্রথমে সুবুদ্ধি রায় কে, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। পুরন্দর খাঁর পিতামহ সুবুদ্ধি খাঁকে কেহ কেহ এই সুবুদ্ধি রায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার উপর যবন দোষ স্পর্শের কোন নিদর্শন নাই; অধিকন্তু প্রিয় উজীরের পিতামহের উপর এইরূপ আচরণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় এক সুবুদ্ধি রায়ের উপর আলিয়ার খাঁনী যবন দোষ ঘটার উল্লেখ আছেঃ— 'আলিয়ার খান যবন সুবুদ্ধি রায়কে দন্তবান করেন।' ইহাতে কি ভাবে নিগ্রহ হইয়াছিল, স্পষ্ট বুঝা যায় না। আর এক সুবুদ্ধি রায় ভাতুড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয়। ইনি পূর্ব্বোক্ত সুবুদ্ধি খান, ইঁহার পিতা পরম কুলীন শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ী। এই আলিয়ার খাঁ কে, এবং এই ঘটনার সহিত হোসেন শার কি সম্বন্ধ,তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু কংসনারায়ণের ভাগিনেয়ের 'গৌড় অধিকারী' বা গৌড় অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ও রাজস্ব সংগ্রাহক জমীদার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা এবং তিনি হোসেন শার সমসাময়িক। এই প্রকারে, চৈতন্য-চরিতামৃতের বিবরণের সহিত বারেন্দ্র কুলজ্ঞের কথা মিলাইয়া অনুমান করা যায় যে, হোসেন শার রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে সুবুদ্ধি অধিকারীর

পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শেষে সুবুদ্ধি রায় কুবুদ্ধির ফলে হোসেনের আদেশে আলিয়ার খাঁর হস্তে নিগৃহীত হন, এবং তজ্জন্য তাঁহার জাতি যায়।

হোসেন শার রাজ্যকালের শেষ ভাগে শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-বিপ্লবের ও সামাজিক অবস্থার কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। হোসেন শা এবং তৎপুত্র নশরৎ শা বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ভাগবত ও মহাভারতের বাঙ্গলা অনুবাদ প্রথম প্রচারিত হয়। কবীন্দ্র বিরচিত মহাভারতের (পরাগলী ভারত) ভূমিকায় দৃষ্ট হয়ঃ—

নৃপতি হুসেন শাহ হয়ে মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর।
লস্কর পরাগল খান মহামতি
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি।
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া
চাটিগ্রামে চলি গেলা হরষিত হইয়া।
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি। (১১)

হোসেন শার অন্যতম সেনাপতি চট্টগ্রামে ভূসম্পত্তি জায়গীর পাইয়া বাস করেন। তাঁহার পুরাণে শ্রদ্ধা সেকালের মুসলমান

(১১) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধৃত পরাগলী ভারত।

রাজপুরুষদের মতি গতি নির্দ্দেশ করিতেছে। তাঁহার আদেশেই কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসা মঙ্গলও এইরূপে অন্য এক রাজসামন্তের অনুগ্রহে রচিত হয়ঃ—

'ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক।
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়া বাদ বঙ্গরোড়া তক সীম।'

ছায়া শূন্য বেদশশী '১৪০৬' শক (১৪৮৪ খৃঃ)। ফতেবাদ মুলুকের গুপ্ত কবিও সাদরে নৃপতি তিলকের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কুলীন গ্রামের সুবিখ্যাত মালাধর বসু ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ অব্দে) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম একাদশ স্কন্ধের বাঙ্গলা অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নাম দিয়া আরম্ভ করেন। ১৪০২ শকে এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। বসু কবিকে গুণগ্রাহী বাদশা 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন ;—

নির্গুণ অধম মুই নাহি কোন জ্ঞান,
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।

মালাধরের অপর এক জ্ঞাতি ভ্রাতা গোপীনাথ যশোরাজ উপাধি পাইয়া স্বরচিত পদে লিখিয়াছেন,

'নৃপতি হুসন, জগতভূষণ, সোহ এ রসজান'

এই গীতে ইঁহাদের আত্মীয় প্রধান মন্ত্রী পুরন্দরের কৃতিত্বও গৌড়েশ্বরের গুণগানের সঙ্গে স্থান পাইয়াছে। ১৪১৭ শকে বিপ্রদাস নামক ব্রাহ্মণ মনসামঙ্গল কাব্যেও হোসেন শার উল্লেখ করিতেছেন ঃ—

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম,
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম।
যুকলা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে
সিঅরে বসিয়া পদ্মা কহিলা উপদেশে।
কবি গুরু ধির জনে করি পরিহার
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার।
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ। (১২)

চট্টগ্রামের অপর কবি শ্রীকর নন্দীও তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব্ব অনুবাদে নৃপতি হোসেনের নামোল্লেখে বিস্মৃত হন নাই ঃ—

নসরৎ সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা।
নৃপতি হুসেন শাহ হত্র ক্ষিতি পতি।
সামদান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী।

উপরি লিখিত পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁ নন্দী কবির উৎসাহদাতা ছিলেন। হোসেন শার যোগ্য পুত্র নশরৎ শাও এ কবির প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়াছিলেন, অনুবন্ধে তাহা অনুমিত হইতেছে। কবীন্দ্রের ভারতে লিখিত আছে ঃ—নসরৎ খান ; রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।' অন্য এক বৈষ্ণব কবি নশরৎ শাকে বৈষ্ণব প্রেমের রসাস্বাদও দিতে ভুলেন নাই ঃ—'সে যে নসিরা শাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে।'

বস্তুতঃ হোসেন শার সময় বাঙ্গলা সাহিত্যের 'বিক্রমাদিত্যের যুগ' বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণব কবিগণের কথা পরে আলোচিত হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে হোসেন শা মুসলমান শাসনে যুগান্তর

(১২) Journal As. Soc. New series vol. v. p 253.

প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় হইয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে কথিত গৌঁড়েশ্বরের আদেশে নবদ্বীপ অঞ্চলে মুসল-মানের অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বাস করিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী হাব্‌শী রাজার স্কন্ধেই সে কলঙ্কের ভার পড়িবে, কারণ শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের শৈশব দশায় হোসেন "গৌড়েশ্বর" হন নাই। বৃন্দাবন দাস মহাশয় চৈতন্য ভাগবতে নদীয়ার দুরন্ত ফৌজদারের কথা উল্লেখ করিয়াও যুগাবতারের কীর্ত্তন নর্ত্তনের সময়ে তাঁহার অনুচর দলের দ্বারা কাজির বাগান ভাঙ্গার লঙ্কা-কাণ্ডের যে চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন, প্রকৃত হইলে হোসেন শার মত রাজার সময়ে না ঘটিলে তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমদর্শিতার কথায় "হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে, সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে" ইত্যাদি উক্তি প্রধান বৈষ্ণব কবি হোসেন শার মুখের কথাই বলিতেছেন। তবেই দেখা গেল, হোসেন শার রাজত্ব কাল বাঙ্গালী হিন্দুর মনস্বিতা বিকাশের স্থবর্ণময় যুগ। তিন শত বৎসরের পাঠান পদদলিত অথচ তন্দ্রাগত বাঙ্গালীর এই পুনরুজ্জীবন বড়ই বৈচিত্র-ময়। যে কালে নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মনস্বী রঘুনাথ শিরোমণির জ্ঞানালোকে বঙ্গভূমি উদ্ভাসিত হইয়া-ছিল; মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবে-ষণায় অধঃপতিত হিন্দুসমাজের স্থায়িত্ব সাধনের উপযোগী নিয়মা-বলীর আবির্ভাবে এবং রূপসনাতন প্রভৃতির অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও ধীশক্তি প্রভাবে বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষয় নহে।



হোসেন শার সমাধি, (গৌড়)—৪৬ পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায়।

সেকালের নবদ্বীপ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ নগর বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল। নবদ্বীপের মহিমা বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুবনে নাই,
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।
*　　*　　*　　*
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে,
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে,
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়,
নবদ্বীপে পড়ি সেই বিদ্যারস পায়।
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বৈসে,
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে। (চৈঃ ভাঃ—আদি)

কবি কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতের প্রথম প্রক্রমেও ইহারই অনুরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, কেবল ধর্ম্মকথার বাহুল্যে তথায় কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি যোগ আছে। চৈতন্য ভাগবতের অন্যত্র গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণের বর্ণনায় ও নবদ্বীপের সেকালের সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কবির 'লক্ষ লক্ষ' বাদ দিয়াও বুঝা যায় যে বিভিন্ন

পল্লীতে নানা জাতীয় বহুলোক বসতি করিত এবং নানা শ্রেণীর মধ্যে সমবেদনার অভাব ছিল না। হাট ঘাট, রাজপথ ও অট্টালিকার পারিপাট্যের উল্লেখও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণনা ইহারই অনুরূপ ঃ—

নানাচিত্রে ধাতু, বিচিত্র নগরী, নানাজাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহারা নানাবর্ণে বৃক্ষলতা ॥
জয় জয় ধন্য নদীয়া নগরী অলকানন্দার কূলে ;
কমলা ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাজ বকুল মালে ॥
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাকা উড়ে ;
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী বিজুরী ছটাক পরে ॥
নাট পাঠশালা দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
মাঠ মণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপন ॥
প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি গলি নৃত্য গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ ॥

জয়ানন্দের কাব্য কথা সাবধানে লইলেও সেকালে নদীয়া নগরীর যথেষ্ট গৌরব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে 'সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম' আছে। পরবর্ত্তী কালে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যেরা নবদ্বীপের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণ হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সম্বৃতঃ ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥

চক্রবর্ত্তী মহাশয় "ভারতবর্ষভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়। বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয়" বলিয়া শ্লোকের টিপ্পনিতে লিখিয়াছেন ঃ - "সাগরসম্ভূত ইতি সমুদ্র প্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে"। নবম দ্বীপের পৃথক্ নাম লেখা হয় নাই বলিয়াই শেষ দ্বীপটি নবদ্বীপ, কেননা নামেও মিল আছে, ইহাই নির্গলিতার্থ। কথিত শ্লোকে যে ভারতবর্ষের নবম ভাগের এক ভাগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে কথা মনে করেন নাই। বদ্বীপমধ্যস্থ নবদ্বীপ গ্রামের অস্তিত্ব পুরাণবর্ণিত যুগে সম্ভব কি না তাহা অবশ্য তখন আলোচিত হইবার নহে। এইরূপে অগ্রদ্বীপও গোপীনাথের কল্যাণে প্রাচীনত্ব পাইতে পারে। চক্রবর্ত্তী কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন ঃ—'নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়, নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়'। অতঃপর নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিকে দ্বীপ কল্পনা করিয়া তাহাদের সংস্কৃত নামকরণ হইয়াছে ;— যথা সীমন্তদ্বীপ (সিমলা), গোদ্রুম (গাদিগাছা), মধ্যদ্বীপ (মাজিদা), কোলদ্বীপ (কুলিয়া), ঋতুদ্বীপ (রাতু ও রাহুতপুর), মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি মাউগাছি), জহ্নুদ্বীপ (জাননগর), রুদ্রদ্বীপ (রাহুপুর) ; শেষ অর্থাৎ নবমটিকে অন্তর্দ্বীপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহারই মধ্যে মায়াপুর শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি। (১) সেকালের ঘটকদের গ্রন্থে অন্যভাবে গঙ্গাগর্ভোত্থিত চক্রদ্বীপ, জয়দ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপের কথা আছে ; এই উক্তি কৃত্তিবাসের কথার সহিত মিলে। বৈষ্ণব লেখকেরা ক্রমে ব্রজলীলার অনুসরণে ভাগীরথীর উভয় তীরের ষোলক্রোশ বিস্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পল্লীকে গৌড়লীলার 'বৃন্দাবন'

---

(১) অন্য এক কবি কিন্তু "নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম' লিখিয়া মুস্কিলে ফেলিয়াছেন।

ধরিয়া লইয়াছেন। অবশেষে প্রেমভক্তির প্রকোপে নদীয়ার বুড়ো শিব ও পোড়া মাকেও ব্রজের কালভৈরব ও যোগমায়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে! যাহা হউক, উক্ত দ্বীপ বা ধামগুলির সন্ধানে যাওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ নাই; তবে সেকালের নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী কুলিয়া, বিদ্যানগর, জাননগর প্রভৃতি পল্লীরও যে যথেষ্ট শ্রী ছিল, তাহার পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাইতে পারি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তখন ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্ত বাহিনী ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার সমধিক উন্নতি লক্ষিত হয়। চৈতন্য ভাগবতে 'সবে মহা অধ্যাপক' উক্তির সহিত নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থী আসারও সংবাদ পাইতেছি। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে যে বিদ্যালাভের জন্য 'বড়গঙ্গাপাড়ে' যাইতে হইত, একথা কৃত্তিবাসী রামায়ণের নবাবিষ্কৃত ভূমিকায় এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মিথিলায় পাঠ শেষ করিবার কথায় পাওয়া যায়। যে নবদ্বীপ বল্লাল ও লক্ষ্ণ সেনের গঙ্গাবাসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় পণ্ডিত সমাজের লীলাভূমি হইয়াছিল, যেখানে মহামনস্বী পশুপতি এবং হলায়ুধ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতে হিন্দুসূর্য্যের পাটে বসিবার সময়ে একবার রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়াছিল; যথায় 'ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ' মেঘদূতের কনিষ্ঠ সহোদর পবনদূতকে প্রেরণ করিয়া গৌড়জনের গৌরববার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন; উমাপতি ধর বাক্য পল্লবিত করিয়া ভবিষ্যৎ বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীকে ভাষা ফেণাইবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, সর্ব্বশেষ পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী অজের কবি জয়দেব অজয়ের মরাগাঙ্গে সন্দর্ভশুদ্ধ ললিত ভাষায় প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া ভাগীরথীও ভাসাইয়া তুলিয়াছেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেই নবদ্বীপের বড় দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল।

স্মৃতির স্মৃতি নবদ্বীপে যে একবারেই লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; শূলপাণি নদীয়া অঞ্চলেরই লোক এবং দেশীয় প্রবাদ জীমূতবাহনকে নবদ্বীপেই টানিয়া লইয়াছে। তুর্কীদল নদীয়ার সারস্বত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে নাই বটে, কিন্তু নগর ধ্বংসের সহিত তাহাও যে মাটিচাপা পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই শত বর্ষের প্রবল পাঠান-পীড়নে ম্রিয়মাণ বঙ্গীয় সমাজ রাজা গণেশের সময়ে চকিত মাত্র মাথা তুলিয়াছিল। সেই সময়ে রাজসভায় 'রায়মুকুট' উপাধিপ্রাপ্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ অন্বর্থনামা বৃহস্পতি স্মৃতির নূতন নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের গ্রন্থে বৃহস্পতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে; রঘুনন্দন স্বয়ং বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীনাথ আচার্য্যের নিকট পাঠ শেষ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। (২) গৌড়ের বাদশা হোসেন শার শান্তিময় শাসনের ফলে দেশে আবার শাস্ত্রচর্চ্চার সুবিধা হইয়াছিল; নবদ্বীপেও ক্রমশঃ অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইল। স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দনের পিতা হরিহর বন্দ্যোও এক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দার প্রথম দিকে মহেশ্বর বিশারদ ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিশারদ পণ্ডিতের পুত্র বাসুদেব মিথিলায় গিয়া মহামহোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লইয়া দেশে ফিরিলেন। সেকালে সম্ভ্রম রাখিবার জন্য মিথিলার অধ্যাপক মহাশয়েরা পুঁথি নকল করিয়া লইতে দিতেন না; অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে দেশে ফিরিয়া বাসুদেব গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চিন্তামণি ৪ খণ্ড এবং মূল কুসুমাঞ্জলি অবিকল লিখিয়া ফেলিলেন (৩)। নবদ্বীপ বিদ্যা-

(২) মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

(৩) একালে কেহ কেহ রঘুনাথ শিরোমণিই ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, এই

নগরের চতুষ্পাঠীতে দর্শন শিক্ষা দিয়া কিয়ৎকাল পরে তিনি উড়িষ্যায় রাজপণ্ডিত হইয়া যান ; কিন্তু তাঁহার সহোদর বিদ্যাবাচস্পতি বাটীর টোল চালাইয়াছিলেন। বাসুদেবের সুযোগ্য ছাত্র মহামনস্বী রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট পাঠ শেষ ও শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের যশঃ-সৌরভ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া সেকালের স্মৃতি ও দর্শনের ছাত্রদিগকে নবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই কারণেই বৈষ্ণব কবি 'সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ' বলিয়া উল্লসিত হইয়াছেন। তখন হইতে পণ্ডিতের নবদ্বীপ বঙ্গে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

নবীন যুবক নিমাই পণ্ডিতও (শ্রীগৌরাঙ্গ) অল্পবয়সে নবদ্বীপেই পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণের টোল খুলিয়া শব্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। যৌবনে পাণ্ডিত্যগর্ব্বে তিনি যার তার সঙ্গে ফাঁকি তর্ক করিয়া বেড়াইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যাবত্তা বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শ্লোকে দোষ দর্শাইবার দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন (৪)।

অলীক প্রবাদ প্রচার করিতেছেন। কুশাগ্রধী শিরোমণি মুখস্থ করার ছেলে ছিলেন না। আমরা ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে বাসুদেবের যে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির প্রবাদ শুনিয়াছি, এখনও তাহা চলিত আছে। সার্ব্বভৌম পুঁথি না আনিলে নদীয়ায় ন্যায়ের অধ্যাপনা চলিল কিরূপে ?

(৪) চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত। 'ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার, তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার'—চরিতামৃত। চরিতামৃতের কোন টীকাকার এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে 'কেশব কাশ্মিরী' ধরিয়া লইয়া এই বিষয়টির গুরুত্ব সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিয়াছেন। নিম্বার্ক মতাবলম্বী কেশব কাশ্মিরী কবি নহেন। চৈতন্যদেব তর্কে যে দর্শন জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা-প্রসূত। তিনি দর্শনের দর্শন টোলে অতি অল্প কালের জন্যই পাইয়াছিলেন।

কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে লালিত হইয়া গৌরাঙ্গের বিদ্যা যে-কেবল ব্যাকরণ অলঙ্কারেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, ইহা পরবর্ত্তী ভক্ত-দিগের অসহ্য হইল। যে কাণভট্ট রঘুনাথ শিরোমণি ধীশক্তির নিমিত্ত ভারতপ্রসিদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের বুদ্ধিবৃত্তি যে তাঁহা অপেক্ষাও প্রখরা, তিনি যে 'সব বিষয়ে সবার সেরা' এরূপ না দেখাইতে পারিলে যুগাবতারের সম্মান কোথায় ? ক্রমশঃ প্রচারিত দুই একটি গল্পে শ্রীগৌরাঙ্গকে শিরো-মণিরও শিরোমণি করা হইয়াছে। (প্রথম) রঘুনাথ একদিন গাছ-তলায় বসিয়া এক অতি জটিল প্রশ্নের সমাধানে সমাহিতচিত্ত আছেন, পৃষ্ঠদেশে কাকে মলত্যাগ করিয়াছে, জ্ঞান নাই ; এমন সময়ে নিমাই পণ্ডিত স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। বালক নিমাইএর স্নানের ঘাটে উৎপাতের কথা বাল্যলীলাপ্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন। তাহারই উপসংহারে গল্প-রচয়িতা বলিতেছেনঃ—রহস্যপ্রিয় নিমাই পণ্ডিত ভিজা কাপড় নিঙড়াইয়া রঘুনাথের পৃষ্ঠে জল দেওয়ায় তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—'কিহে নিমাই, ব্যাপার কি ?' নি—'পিঠে কাকে যে বাহ্যে করেছে ?' রঘু—'পড়াশুনা করতে হলে মনঃ-সংযোগ চাই, তোমার মত ভেসে ভেসে বেড়ালে চলে না।' চিন্তার বিষয়টা কি, জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ যে সমস্যার আলোচনা করিতেছিলেন তাহাতে ছয় প্রকার পূর্ব্ব পক্ষ এবং সেই সমস্তের যথাযথ মীমাংসা

তিনি যে পরে শুষ্ক জ্ঞানবাদীদিগকে ভক্তিমার্গে প্রণোদিত করিয়াছেন, ইহা যাঁহারা বিদ্যার জোরে বলিতে চান, তাঁহাদিগকে একালের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দৃষ্টান্ত মনে রাখিতে বলি। চৈতন্য দেব অন্ততঃ ব্যাকরণ অলঙ্কারে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রই তাঁহার বল ; তাঁহার বিদ্যা প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব অধ্যায়ে সুব্যক্ত।

শুনাইয়া অবশেষে যে আপত্তি উঠিতে পারে তাহা জ্ঞাপন করিলে গৌরচন্দ্র অনুমাত্র চিন্তা না করিয়াই তাহার সদুত্তর দিলেন।

(দ্বিতীয়) এক সময়ে রঘুনাথ ও নিমাই একসঙ্গে খেয়ার নৌকায় গঙ্গাপার হইতেছিলেন। বগলে কি পুঁথি জিজ্ঞাসায় নিমাই উত্তর দিলেন, তাঁহার স্বরচিত ন্যায়ের টীকা। রঘুনাথ তাহা একবার দেখিয়া লইয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন, "এই ন্যায়ের টীকা প্রচারিত হইলে আমার টীকার আর কিছুই আদর হইবে না।" রঘুনাথের দুঃখ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ ঐ পুঁথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন, ইতি। গঙ্গাজলে পুঁথি ফেলিয়া দেওয়ার গল্পটি ঈশান দাসের (নাগর) অদ্বৈতপ্রকাশে দেখা দিয়াছে। তখন শ্রীচৈতন্য অবতার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু ঐ পুস্তকেও রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই, কোন এক পণ্ডিতের প্রসঙ্গে উহা কথিত হইয়াছে। এই স্বার্থ-বিসর্জ্জনের গাল-গল্পের সমালোচনা বৃথা। অবশ্য শ্রীচৈতন্য-চরিত স্বার্থত্যাগের সুন্দর আদর্শ বটে, এবং শিশির বাবুর মত ভক্ত ব্যক্তি 'অফল শাস্ত্র টানিয়া ফেলাইতে' পারিলেও পারেন। কিন্তু ঐরূপ একখানি মূল্যবান গ্রন্থের বিনাশে জগতের যে ক্ষতি, তাহাতে স্বার্থ কোন্ দিকে কে তাহার মীমাংসা করে? কেহ কেহ কথিত ন্যায়ের টীকা রঘুনাথের প্রথম বয়সের লেখা বলিয়া গোল মিটাইতে চান। শ্রীচৈতন্য যৌবনেই অফল শাস্ত্র টানিয়া ফেলেন এবং শিরোমণির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মিথিলা হইতে ফিরিয়া প্রৌঢ়ে রচিত, ইহাও মনে রাখা উচিত।

এখন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপ-সমাজের শিক্ষা দীক্ষার কথা আর কি জানা যায় দেখা যাউক। বিশ্বম্ভর ওরফে নিমাই উপনয়নান্তে 'ত্রিকচ্ছ বসন' পরিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ব্যাকরণের

টোলে পড়িতে যান। তাঁহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া গুরু বড়ই তুষ্ট হইলেন ঃ—

গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দৃঢ় ॥

*   *   *   *

আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন,
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুঁথি ছাড়িয়া নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম,
বিদ্যারস ইহাঁর হয়েছে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়,
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥

ইহাতে নিমাইএর প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের শিক্ষার প্রণালীর কথাও পাইতেছি। নোট্ লিখাইয়া দিয়া বা প্রাত্যহিক পরীক্ষা সহযোগে তখনকার পাঠনা হইত না। গঙ্গাদাসের সভায় বা টোলে 'পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়', তখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়স। 'যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন, বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন', এই হইল বসিবার প্রণালী। মুরারী গুপ্ত 'স্বতন্ত্রয়ে পুঁথি চিন্তে,' তাঁহার নিকট প্রশ্ন করে না, দেখিয়া নিমাই বলিলেন, 'ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি, কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি।' গুপ্তের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া অন্যরূপে বুঝাইয়া দিলে মুরারী বলিল, 'চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।' অতঃপর পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার পড়িল। মুকুন্দ পণ্ডিতের বাড়ীতে বড় চণ্ডীমণ্ডপ, তাহাতে 'বিস্তর পড়ুয়া ধরে।' গোষ্ঠী করিয়া নিমাই সেখানে অধ্যাপনা করেন, এবং 'হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার, তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী তাহার' বলিয়া আস্ফালন করেন। এইরূপে 'বিদ্যারসরঙ্গে'

গৌরাঙ্গ কিছুদিন ফাঁকি তর্ক করিয়া বেড়াইলেন। 'ব্যাকরণ শাস্ত্র সবে বিদ্যার আদান; ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান,' অলঙ্কার বিচারেও ঐ প্রকার। একদিন ন্যায়ের পড়ুয়া গদাধরকে ধরিয়া "মুক্তির প্রকাশ, আত্যন্তিক দুঃখনাশ" এই উক্তি ও 'নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী পতি।' 'প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ', শেষে লোকে ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে তাঁহার নিকট ঘেঁসে না। 'উদ্ধতের চূড়ামণি' বলিয়া তাঁহার খ্যাতি তখন নবদ্বীপে প্রচারিত; স্নানের ঘাটেও অন্য ছেলেদের জোটাইয়া তিনি কত উৎপাত করেন। অবশ্য দাস ঠাকুর কৈশোর-লীলাপ্রসঙ্গেই এই সকল উত্থাপন করিয়াছেন; কৃষ্ণলীলার সহিত কতকটা সঙ্গতি রাখা ত চাই।

মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে চণ্ডীমণ্ডপে টোল করিয়া নিমাই পণ্ডিত রীতিমত অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন; তৎপূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত টোলে পাঠনা, পরে গঙ্গার ঘাটে জলক্রীড়া, বৈকালে ভ্রমণের সময়ে 'গঙ্গাতীরে শিষ্যসঙ্গে মণ্ডলী করিয়া' বসিয়া পাঠাদির আলোচনা, এইরূপে দিবা অতিবাহিত হইত। সেকালের পড়ুয়াদেরও এই ভাবের ক্লব কমিটী ছিল।

যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ,
কোটার্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র সাজ।
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য,
অধ্যাপনা বিনা কার আর নাহি কার্য্য।
যদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী,
শাস্ত্রচর্চ্চা হইলে ব্রহ্মারও নাহি সহি। (চৈঃ ভাগবত)

তথাপি প্রভুর প্রতি 'দ্বিরুক্তি করিতে কার নাহিক শকতি' এই বলিয়া ভক্ত কবি দিগ্বিজয়ী বিজয়োপাখ্যানের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিদ্যা-

চর্চ্চার উপসংহার করিয়াছেন। কবিকল্পিত 'কোটার্ব্বুদ' বাদ দিয়াও আমরা নবদ্বীপের অধ্যাপক সমাজের সেকালের প্রতিষ্ঠার কথা অনুমান করিতে পারি। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শেষ বয়সে উৎকল রাজের আমন্ত্রণে তথায় সভাপণ্ডিতের কার্য্য স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন; ভাগবত পাঠের সহিত দ্বিতীয় বর্গের চিন্তাও ছিল কি না, কে বলিবে? কিন্তু,

সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্।

বিদ্যানগরের বিদ্যাচর্চ্চা হীনপ্রভ হইতে দেন নাই। ভবিষ্যৎ সনাতন গোস্বামী এই বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র; বৈষ্ণব-তোষিণী টীকার নমস্কারে "বিদ্যা বাচস্পতিন্ গুরূন্" কথা তাহার প্রমাণ। জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য মঙ্গলের উক্তি অনুসারে কেহ কেহ অনুমান করিতে চান যে সার্ব্বভৌম 'যবনের ভয়ে' উৎকলে যান। একথা ঠিক হইলে নবদ্বীপের অন্যান্য বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তাহার সমকালেই সুখ শান্তিতে বিদ্যা চর্চ্চা কিরূপ সম্ভব হয়, ইহা তাঁহারা অনুধাবন করেন নাই। জয়ানন্দের কথিত বাদশাহের নিকট "নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা" এই উক্তি ধর্ম্মরাজ্য ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে; কিন্তু তিনি পিরল্যা গ্রাম বাসী মুসলমানের হস্তে নবদ্বীপ বাসীর লাঞ্ছনাও বর্ণন করিয়াছেন:—

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র স্কন্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥

গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
'পিরল্যা' গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ (৫)

জয়ানন্দ নবদ্বীপ হইতে দূরে বাস করিতেন; কাহারও নিকট গল্প গুজব শুনিয়া এই সমস্ত কথা লিখিয়া থাকিবেন। প্রামাণিক বৈষ্ণব কাব্য চৈতন্য ভাগবতে বা চরিতামৃতে নিজ নবদ্বীপে যবনের অত্যাচারের কথা থাকা দূরে থাকুক, বরং মুসলমান রাজপুরুষের প্রশংসা আছে। হোসেন শার রাজ্যকালের পূর্ব্বে বা তাঁহার প্রথম আমলে বিপ্লবের সময় এরূপ সাময়িক অত্যাচার ঘটিতে পারে। চৈতন্য ভাগবতকার হোসেন শার মুখ দিয়া সেনাপতি কেশব ছত্রিকে বলাইতেছেন ঃ—

(গৌরাঙ্গ) সর্ব্বলোক লঞা সুখে করুন কীর্ত্তন।
কিবা বিরলে থাকুন যাহা লয় মন॥
কাজী বা কোটাল বা তাহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥

চরিতামৃত মধ্য খণ্ডেও ইহার অনুরূপ নির্দ্দেশ আছে, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতএব শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে মুসলমানের অত্যাচারের কাহিনী অলীক বলিতে পারি। যথাস্থানে শ্রীচৈতন্য ও নবদ্বীপের কাজির কথা উল্লিখিত হইবে।

প্রাচীন নদীয়ার একপ্রান্তে একটী খাল পারে বিদ্যানগর পল্লী স্থাপিত ছিল। পণ্ডিতবর ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় গর্গসংহিতা

(৫) পিরল্যার ব্রাহ্মণেরা নবদ্বীপ সমাজের লোক হইতে পারেন, কিন্তু 'পিরল্যা' গ্রাম কোথায়? এই সমস্যায় কেহ কেহ পার্ল্লে নাম উল্লেখ করেন। তাহা কিছু দূরবর্ত্তী; পিরল্যা কথা হইতেই কি পিরালি?

হইতে "জগাম বেদনগরং জম্বুদ্বীপে মনোরমং" "মূর্ত্তিমান্ যত্র নিগমো" এবং "তৎ সভায়াং সদা বাণী বীণা পুস্তক ধারিণী" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া বেদনগর বা বেদপুরই বর্ত্তমান বিদ্যানগর ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন (৬)। দত্ত ভক্তিবিনোদ 'ধাম-মাহাত্ম্যে' প্রমাণ খণ্ডে তাহাই তুলিয়াছেন। শেষ কলির পাষণ্ড দলের ইহাতেও তৃপ্তি না হইলে তাঁহার দোষ নাই। বিদ্যা নগর এত প্রাচীন না হউক, নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের অন্যতম কেন্দ্রস্থান বলিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উহার নাম যে সার্থক হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়ের টোল করিলে ইহার খ্যাতি আরও বিস্তৃত হইল। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিরচিত ন্যায় শাস্ত্রের চারিখণ্ড টীকা তত্বচিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলি নামক বঙ্গে অপ্রচারিত প্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ অদ্ভূত স্মরণ শক্তি প্রভাবে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া বাসুদেব স্বগৃহে ন্যায়ের প্রধান টোলের প্রতিষ্ঠা করেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (৭) ভারতবিখ্যাত

(৬) কৈশোরে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হরিসভায় অনেক সন্দেশ খাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কথা মিষ্টমুখেই বলিতে হয়। আঢ্য বৈষ্ণব শিষ্যের অনুরোধে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারবাদের নবীন প্রমাণ সংগ্রহ আরম্ভ করেন।

(৭) প্রবাদ আছে যে সার্ব্বভৌম তৎকালপ্রচলিত শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম উপাধি পান। শলাকা পরীক্ষার অর্থ এই যে একটি সূচ্যগ্র শলাকা নানা পুঁথির উপর নিক্ষেপ করিলে যেখানে শেষ দাগ পড়িবে, সেইস্থান হইতে পরীক্ষা হইত। গল্প আছে যে সার্ব্বভৌমের দেশে ফিরিবার সময়ে তাঁহার পুঁটুলি কাপড় চোপড় পরীক্ষা করিয়া পুঁথি আছে কিনা দেখা হয়। তিনি বলেন, পুঁথিতে আমার প্রয়োজন কি? গুরুর কৃপায় সবই স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। ইহাতে অন্য অধ্যাপকদের ঈর্ষার উদ্রেক দেখিয়া তিনি নবদ্বীপের পথে না ফিরিয়া কাশী যান; সেখানে কিছুদিন বেদান্ত পাঠ করিয়া দেশে ফিরেন।

রঘুনাথ শিরোমণি সার্ব্বভৌমের নিকটই প্রথম ন্যায় শিক্ষা আরম্ভ করেন। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন তাঁহার অন্যতম প্রধান ছাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গও কোন কোন মতে বাসুদেবের টোলে ন্যায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থ চরিতামৃতের ভাবে মনে হয় উৎকল যাত্রার পূর্ব্বে উভয়ে পরিচিত ছিলেন না।

এই সম্বন্ধে কিছু পরবর্ত্তী নদীয়া অঞ্চলবাসী ঘটক নুলো পঞ্চানন যে কারিকা রচনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

বাসুদেবে তিন শিষ্য চৈয়ে রঘো ন্বয়।
নদের লোক যাহাদের নামে জীয়ে রয়॥
চৈয়ে ছোঁড়া দুষ্ট বড় নিমে তার নাম।
রঘো বেটা বুদ্ধি মোটা ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥
তিনজন তিন পথে কাঁটা দিল শেষ,
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ।
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত,
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত।
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়,
মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে,
খ্যাত নাম দেবীবর লোকে যারে বলে।
সেই ছোঁড়া মনে ক'রে কুলে করে ভাগ,
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ।

তাঁহার সার্ব্বভৌম নাম সার্থক ছিল; পূর্ব্বেই পিতার নিকট স্মৃতি, পড়া ছিল। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'সার্ব্বভৌম নিরুক্তি।'

কুলের কথা যথাস্থানে কহা যাইবে। টুলো ছাত্র নুলো সেকালের টোলের ভাষায় ব্যজস্তুতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করা ভাল। চৈতন্য বাসুদেবের ছাত্র কি না তাহা পরে দেখা যাইবে।

নবদ্বীপ সারস্বত সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলার কোটা মানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (৮) তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাঁহার জননী

---

(৮) রঘুনাথের পিতৃকুলের পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী স্বীয় আবিষ্কৃত এক কুলজীর বলে চৈতন্যের ন্যায় রঘুনাথকেও শ্রীহট্টবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩১১)। সুহৃদ্বর নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষে ও সামাজিক ইতিহাসে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন; অনেক পূর্ব্বে 'নবদ্বীপ মহিমা' প্রণেতা কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। নানা কারণে অবিশ্বাসী লোক আজি কালি অপ্রচলিত কুলজীর কথায় সন্দিহান। অপিচ, অচ্যুতবাবুর আবিষ্কৃত কুলজীর বংশলতার রঘুনাথ যে রঘুনাথ শিরোমণি তাহা কি বলিবে? ৪৫ বৎসর নবদ্বীপের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় আমরা নদীয়ার অনেক কথা জানি। রঘুনাথ শিরোমণিকে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ নিজের বলিয়াই জানেন। অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার বংশের এক ব্যক্তি নবদ্বীপে ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অধুনা লোকান্তরিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য কথার পরে লিখিয়াছিলেন "নবদ্বীপ আম্পুলিয়া পাড়ায় তাঁহার বংশধর রামতনু ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন, আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি।" রঘুনাথ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অত্যল্প কাল পূর্ব্বে সম্প্রতি পরলোকগত ভট্টপল্লী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ও আমায় বলিয়াছেন,—'গুরুপরম্পরায় সকলে জানে, কোটা মানকর শিরোমণির পিতৃভূমি'। বৈদিক হইলে ভট্টপল্লী তাঁহাকে ছাড়িত না।

১৩২০ সালের প্রতিভা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রমাণ করিয়াছেন যে শ্রীহট্টের রঘুনাথ, রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পারেন না। তিনি পরবর্ত্তী কালের

ভরণপোষণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়া এক কুটম্বের বাটীতে আশ্রয় লন। এই এক চক্ষু কাণা বালক রঘুনাথের বুদ্ধিশক্তি বিষয়ে ভবিষ্যতে অনেক গালগল্প সৃষ্ট হইয়াছে (৯)। এইরূপ গল্পগুজব বাদ দিলেও তিনি যে বাল্যেই 'বুদ্ধে দড়' ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সার্ব্বভৌম তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়াই নিজের টোলে ভর্ত্তি করিয়া ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। মতান্তরে রঘুনাথের দুঃখিনী মাতা সার্ব্বভৌমের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। নদীয়ার পাঠ শেষের পরে রঘুনাথ যখন মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে গেলেন, সেই কালের কথায়ও নদের টোলের পক্ষ হইতে অনেক উদ্ভট গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

লোক এবং যে হিন্দুরাজার সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তামাকের প্রচলন হইয়াছিল একথা আমার ন্যায় উপেন্দ্র বাবুও লক্ষ্য করিয়াছেন।

৯। (ক) রঘুনাথ না কি অক্ষর পরিচয়ের সময় প্রথমে 'ক' বলা হয় কেন, জিজ্ঞাসা করেন (কিন্তু সেকালে ৭এর মত গণেশের আঁকড়ী প্রথমে বসিতেন)। (খ) শিশু রঘুনাথ গ্রাম্য শিক্ষকের আদেশে তামাক খাইবার নিমিত্ত আগুন আনিবার জন্য গুরুপত্নীর রন্ধনশালায় যান, আগুন চাহিবামাত্র গুরুগৃহিণী হাতার দ্বারা জ্বলন্ত অঙ্গার তুলিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেলেন; বুদ্ধিমান্ বালক তৎক্ষণাৎ ধূলি মুষ্টি ধরিয়া লইয়া তাহার উপর আগুন লইলেন (এখানে আবার তামাক। পরবর্ত্তী কালের গুরু মহাশয়ের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বকালে আরোপিত)। (গ) রঘুনাথ নাকি জন্মাবধি কাণা ছিলেন না। এক সপ্তমীর রাত্রিতে তিনি উর্দ্ধদৃষ্টিতে একাগ্রমনে দার্শনিক বিচারে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় এক পতঙ্গ তাঁহার চক্ষে পড়ে; এবং এই ঘটনায় সেই চক্ষুটি কাণা হইয়া যায়। বিদ্বান্ ব্যক্তি কাণা হইয়াছে বিদ্যার দমানে, এইরূপ বলিলেই মানায় ভাল। সপ্তমীতে পাঠ নিষিদ্ধ, নদের নৈয়ায়িকগণ ঐ তিথিতে ন্যায় চর্চ্চা করেন না। কিন্তু রঘুনাথ ত কেবল শাস্ত্র চিন্তাই করিতেছিলেন, পড়েন নাই। তিথির এতই জোর।

এই সমস্ত গল্পের সমালোচনা অনাবশ্যক; দুই একটির নমুনা টীকায় দেওয়া গেল (১০)

---

(১০) অন্য দুইজন সহাধ্যায়ীর সঙ্গে রঘুনাথ মিথিলায় উপনীত হইলে তথাকার পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? উত্তর হইল—

কুশদ্বীপ নলদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনিষিণঃ।

একথা ঠিক্ হইলে তাঁহার শিরোমণি উপাধি নদীয়ার টোলের বলিতে হয়। যৌবনেই ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ তর্ককৌশলের এবং সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যায় দোষ দর্শাইবার গল্প নানা মূর্ত্তিতে টোলের পড়ুয়াদের নিকট শুনা যাইত। কিন্তু মিথিলার মহামহোপাধ্যায় মিশ্র মহাশয় তাঁহার তথায় প্রথম আগমনের সময়েই 'অন্যে দ্বিলোচনা সর্ব্বে কো ভবানেকলোচন' ইত্যাদি বিদ্রূপ বাক্য উচ্চারণ করেন, এইরূপ উল্লেখ করিয়া টুলো ছাত্র যতই 'রাসিক্য' প্রদর্শন করুন, অসংস্কৃত লোকে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিবে। এইরূপ আরও কত উদ্ভট কবিতা টুলো ছাত্রের বুদ্ধির দৌড় দেখাইতে সৃষ্ট হইয়াছে। শিরোমণির বিষয়ে শেষ গল্পটির উল্লেখ করিয়া আমার কথাটি শেষ করি। দর্শন শাস্ত্রের পাঠ শেষ করিয়া রঘুনাথ মৈথিলী গুরুর নিকট উপাধি চাহিলেন। গুরু কিছুতেই উপাধি দিয়া ছাত্রকে বিদায় দিবেন না। শিষ্যের গুণে মুগ্ধ গুরু যে তাহাকে ছাড়িতে চান না রঘুনাথ ইহা বুঝিলেন না; নিত্য নূতন পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন করিয়া তিনি পক্ষধরকে স্বপক্ষ সমর্থনে বিপন্ন করিতেন। রঘুনাথের বিশ্বাস হইল, গুরু দুই একবার বিচারে পরাস্ত হইয়াছেন বলিয়াই উপাধি দিতে চাহেন না। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধান্ধ হইয়া একদিন রাত্রিতে একখানি দা লইয়া গুরুকে কাটিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে রঘুনাথ বাটীর অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। পক্ষধর ও তাঁহার পত্নী তখন শয়নাগারে কথোপকথনে ব্যাপৃত। ব্রাহ্মণী চাঁদের শোভায় মোহিত হইয়া পক্ষধরকে চন্দ্র দেখিতে বলায় তিনি বলিলেন 'আমি এখন ভূতলে যে রঘুনাথ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহার কথাই ভাবিতেছি; এমন অদ্ভুত ধীমান্ ছাত্র আর দেখি নাই।" গুরুর মুখে নিজের অত্যধিক প্রশংসা শুনিয়া অনুতপ্ত রঘুনাথ

যাহাকে 'কো ভবানেকলোচন' বলিয়া বিদ্রূপ করার উদ্ভট শ্লোক প্রণীত হইয়াছে, সেই এক লোচন যুবক পরে নিজ অলোকসামান্য প্রতিভায় লোকলোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া 'কাণভট্ট শিরোমণি' নামে নদীয়ার তথা বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে, রঘুনাথ মিথিলায় গুরুর নিকট বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বারা ছাত্র মধ্যে মনোনীত হন। পক্ষধর অত্যল্প কালেই ছাত্রের কুশাগ্র বুদ্ধি ও তর্ক কৌশল দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইলেন। মিশ্র মহাশয় তখন 'সামান্য লক্ষণা' নামক ন্যায়গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই বিষয়ে নবাগত ছাত্রকে পূর্ব্বপক্ষ করিতে আজ্ঞা দিতেন এবং উভয়ের যুক্তি তর্কে যে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইত তাহাই ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল। এই বিষয়েও উদ্ভট কবিতায় মহোপাধ্যায়ের মুখে 'কাণ' শব্দ যোজনা করিয়া কবিতাকার কোন কোন ব্যক্তি আনন্দ লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, পক্ষধরের পাদমূলে অন্যত্র অপ্রাপ্য ন্যায়ের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া উপাধি ও গুরুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া 'রঘুমণি' দেশে ফিরিলেন। তাঁহার অপ্রতিম প্রতিভা সমন্বিত বিচারশক্তি এবং নব নব উদ্ভাবনের কথা শিক্ষার্থীর মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে মিথিলার যশঃশ্রী ক্রমে মলিন হইল। নানা দিগ্দেশ হইতে ন্যায়ের ছাত্র নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে আসিতে লাগিল; তখনই নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সারস্বত মন্দির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। মহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত 'চিন্তামণি দীধিতি' 'প্রামাণ্যবাদ' 'ব্যুৎপত্তিবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি গৌড়জনের সর্ব্বপ্রধান গৌরব এবং চারিশত বর্ষ ধরিয়া এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন করিয়া উঠিলে মিশ্র মহাশয় বাহিরে আসিলেন। রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া সব কথা স্বীকার করিলেন, ইত্যাদি।

হিন্দু ন্যায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ উক্ত গ্রন্থগুলি নদীয়াকে নব্য ন্যায়ে ভারতের মধ্যে প্রধান আসন দিয়াছে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক লজিক্‌ভক্ত পণ্ডিতম্মন্য কোন কোন বাঙ্গালী এই সমস্ত নৈয়ায়িক গবেষণার কণা মাত্র সন্ধান না জানিয়াও 'তাল পড়িয়া টিপ করিল না টিপ করিয়া তাল পড়িল' 'পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র' ইহাতেই ন্যায়ের বিদ্যা পর্য্যবসিত হইয়াছে ধরিয়া লইয়া 'ন্যায়ের কচকচি'কে নাকচ করিতে চান। তাঁহারা মনে ভাবেন, ন্যায় কেবল 'Logic'—তাহাও সেকেলে! শিরোমণির পুত্র রামভদ্রও নব্য ন্যায়ের কয়েকখানি প্রামাণিক টীকা প্রণয়ন করেন। পরবর্ত্তী গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতির টীকা প্রচারে নবদ্বীপের ন্যায়ের প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। অবশ্য এই সকলের দ্বারা কচকচির সৃষ্টি হইতেছিল (১১)। এখনও ভারতের নানা স্থান হইতে ন্যায় শিক্ষার্থী অনেক ছাত্র পাঠ শেষের নিমিত্ত নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন। এখনও নদের পাকা টোলের খ্যাতি পাকাই আছে।

নবদ্বীপের এই নব অভ্যুদয়ের সমকালে স্মৃতিশাস্ত্রেরও অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল। সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও চৈতন্য এবং রঘুনাথের সমসাময়িক। তাঁহার পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ার অন্যতম স্মার্ত্ত অধ্যাপক ছিলেন। সময় প্রদীপ ইঁহারই রচিত। রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বে "নবাষ্ট মাত্রাহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা" বচনে ১৪৮৯ শক পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ১৪০৭ শকে; সুতরাং রঘুনন্দন তাঁহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ

(১১) গদাধরের টীকা মুখে 'অভিবন্দ্যমুহুঃ সমাদরাৎ, পদপঙ্কজযুগং পুরদ্বিষঃ। বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীরিতি দুর্ব্বোধগিরং শিরোমণেঃ ॥" কথায় পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের বুদ্ধির অভাব সুস্পষ্ট।

শিরোমণি রঘুনন্দনের প্রতিষ্ঠা লাভের সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গোপালভট্ট নামক দাক্ষিণাত্যবাসী ভক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনেন; ইনিই পরে 'ভগবদ্ভক্তি' বা 'হরিভক্তি বিলাস' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন (১২)। রঘুনন্দন হরিভক্তি বিলাসের বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোপাল ভট্টের এই গ্রন্থ এবং মহাপ্রাজ্ঞ সনাতন গোস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা মহাকবি রূপের গ্রন্থাদিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিধিব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লেখনী ধারণের পূর্ব্বে বঙ্গীয় সমাজের দুর্দ্দশার দিন; মুসলমান সংঘর্ষে, বিপ্লবে ও অনাচারে দেশ উপক্রত। হোসেন শা তখনও রাজাসন গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালী হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম নানা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পরম্পরায় দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনন্দন স্মৃতি শাস্ত্রের সময়োচিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান; সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত পূর্ব্ব মতের খণ্ডন বা স্থাপন দ্বারা তিনি উক্ত বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। "মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধি নির্ণয়ে" ইত্যাদি ২৮টি বিষয় লইয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' মহাগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। একালের ধৃষ্ট ব্যক্তির উল্লিখিত 'ধৃষ্টত্বায় মলিম্লুচে'র সঙ্গেই সুপরিচিত আমরা অনেকে তাঁহার এই সমস্ত তত্ত্বের কথার তত্ত্ব না লইয়াই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত। তাই কালবশে সর্ব্বথা পূর্ব্বস্মৃতির বিরোধী বঙ্গীয় পুঙ্গব বর্গের উদ্দাম আস্ফালনে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য আজ তথাকথিত বঙ্গীয় বিদ্বৎ সমাজে হতাদর! চারিশত বর্ষ যাবৎ বঙ্গীয় সমাজ যাহার ব্যবস্থা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতেছে, তাহাকে 'মুখস্থ চোটাৎ' হঠাইয়া দিবার সাধ্য কাহারও নাই। রঘুনন্দনের স্মৃতি সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই নানা বিপ্লবে বাঙ্গালী হিন্দুর হিন্দুত্ব বর্ত্তমান আছে। যাহারা মনু প্রভৃতিকেই কর্ম্মনাশায় টানিয়া ফেলিতে উদ্যত, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ হিন্দু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট সবিশেষ ঋণী। সেকালের প্রয়োজন মত সমাজসংস্কারই রঘুনন্দনের প্রধান কীর্ত্তি। কালোচিত ব্যবহার বজায় রাখিয়া মিটমাট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুর আচার সম্বন্ধেও তিনি অনেক প্রাচীন মত খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। রাঢ়ে সিদ্ধ চাউল এবং বঙ্গে মসুরের প্রচলন দেখিয়া হিন্দুর পক্ষে সিদ্ধ চাউল এবং মসুর প্রভৃতি ভোজনের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছেন। উদ্বাহতত্ত্বে গুণবান্ পাত্র না পাইলে কন্যা বড় করিয়া রাখার মনুর ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। স্মৃতি শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই গভীর গবেষণার ফলে তিনি যে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচার নৈপুণ্য কত প্রখর, তাঁহার ব্যবস্থা কত সুযুক্তিসঙ্গত, তাহার আলোচনা অল্প লোকেই করিতে সমর্থ। একালে সামান্য ইংরেজী লেখাপড়ার জ্ঞানে অহংমুখ ব্যক্তি বিষয়টি তলাইয়া না দেখিয়া সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কৃত বিধবার একাদশী ব্যবস্থাই অধুনা বেশী নাড়া চাড়া হয়; অনেক হঠাৎ পণ্ডিত বলিয়া বসেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন একাদশীতে বিধবার অনুকল্প ব্যবস্থা না করিয়া বড়ই কঠোর নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি প্রকাণ্ড ভ্রম। রঘুনন্দন বিধবার অনুকল্প বিষয়ে বিধি বা নিষেধ কিছুই বলেন নাই। রঘুনন্দনের অসামান্য ধীশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বড়ই গৌরবের বস্তু। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত লোকেও তাঁহার

(১২) কেহ কেহ এই গ্রন্থের অধিকাংশ সনাতন গোস্বামী রচিত বলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভট্টের নামে ইহা প্রচারিত হয়।

সিদ্ধান্ত সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়াছেন (১৩)। "হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তম স্মৃতঃ" এই মহাকবি বাক্যের অন্বর্থ "স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের" ব্যবস্থা সমাজ এখনও নতশিরে গ্রহণ করে।

---

(১৩) গল্প আছে যে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আহ্নিকের সময় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের একদিন কাছা খুলিয়া যায়। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও তাহা দেখিয়া কাছা খুলিয়া তর্পণ আরম্ভ করেন। কি জানি, শাস্ত্রে যদি ঐ ব্যবস্থাই থাকে? কেহ কেহ ঐ গল্পটি পল্লবিত করিয়া সেদিন ঘাটের সকল ভট্টাচার্য্যকেই কাছা খোলাইয়াছেন। রঘুনন্দনের সমকালেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এক বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বিদেশেও তাঁহার খ্যাতি শীঘ্র প্রচারিত হইয়াছিল, এই কথার প্রমাণে বলা হয় যে তিনি গয়ায় পিতৃকৃত্য করিতে গেলে পাণ্ডারা তাঁহার নিকট অধিক অর্থ চাহিলে তিনি 'ক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র' এই বচন উদ্ধৃত করিয়া মাঠে পিণ্ডদানের উদ্যোগ করেন। তখন পাণ্ডা মহাশয়েরা শুনিলেন, এই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, তবে ত সকলে অতঃপর বাহিরেই পিণ্ড দিবে, অতএব তাঁহার শ্রীচরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা, ইতি—

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য।

এখন নবদ্বীপের গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গের মহনীয় চরিতের ঐতিহাসিক ভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ; তিনি তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য স্বজনবর্গসহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জন্য শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। জগন্নাথের নবদ্বীপ আগমন কালে নদীয়ায় পণ্ডিতের অভাব ছিল না; কিন্তু সাধারণ হিন্দু সমাজ পূর্ব্ব শতাব্দের অনুরূপই ছিল। ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুণী পূর্ণিমার রাত্রিতে গৌরাঙ্গের জন্ম। তখন গ্রহণ জন্য নদীয়া নগরে কীর্ত্তন চলিতেছিল, যেন নাম কীর্ত্তন সঙ্গে লইয়াই তাঁহার আবির্ভাব। দশম গর্ভজাত এই পুত্রকে মাতা নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম আটটি সন্তান শৈশবে মৃত; এই শেষটির তিক্ত নামে যেন যমের অরুচি হয় এই অভিপ্রায়। তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। নবম গর্ভের বালক বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের সুন্দর গৌরবর্ণ দেহের জন্য প্রতিবেশীরা গৌরাঙ্গ বলিত। নবম বর্ষ বয়সে গৌরাঙ্গের উপনয়ন হয় এবং একাদশ বৎসরে পিতৃবিয়োগ হয়। নিমাই বাল্যে বড় দুষ্ট ছিলেন। এই দুরন্ত বালকের কুকীর্ত্তি ভক্ত বৈষ্ণব কবির লীলা ভাবে লইয়াছেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে তাঁহার পাঠ বন্ধ হয়, তৎপূর্ব্বেই প্রতিবেশী বল্লভাচার্য্যের সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। জয়ানন্দ রচিত

চৈতন্যমঙ্গলে গৌরাঙ্গের অর্থোপার্জ্জন জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যাওয়ার কথা আছে; কিন্তু প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ টোল করিয়া নদীয়াতেই প্রথম অবধি বাসের কথা বলেন। এই সময়ে দাম্ভিক নিমাই পণ্ডিত যাহাকে তাহাকে তর্কে আহ্বান করিতেন। সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইলে নদীয়াবাসী সনাতন পণ্ডিত তাঁহার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীগৌরাঙ্গে সমর্পণ করেন। কিয়ৎকাল নিজ ব্যাকরণের টোলে খ্যাতিলাভের পরে নিমাই পণ্ডিত পিতৃপিণ্ডদানের নিমিত্ত গয়া গমন করেন। গয়াকার্য্য শেষের সময়ে তথায় সাধকবর ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পুরী তাঁহাকে দীক্ষা মন্ত্র দেন। গুরুর মন্ত্র-প্রভাবেই হউক বা গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনেই হউক, এই সময় হইতে তাঁহার ভাবান্তর হয়; সঙ্গীরা বহু যত্নে তাঁহাকে বাটী ফিরাইয়া আনেন (১) এই অবধি তিনি হরিভক্ত হইয়া টোলে বসিয়া সব কথা কৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, সুতরাং শীঘ্রই ব্যাকরণের টোলেরও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।

এই সময়ে নদীয়াবাসী শ্রীবাস নামে হরিভক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে কয়েকজন ভক্ত লোক মিলিয়া হরিগুণ গান হইত। গৌরাঙ্গের সহপাঠি সুগায়ক মুকুন্দ সেই দলে সময়ে সময়ে যোগ দিতেন। মুকুন্দের সহিত গৌরাঙ্গ ঐ হরিসভায় মিশিলেন,—তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তিভাবে এই ক্ষুদ্র হরিসভার সকলেই অনুপ্রাণিত হইলেন। শান্তিপুরনিবাসী নদীয়াপ্রবাসী ভগবদ্ভক্ত পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য এই সভার নেতা ছিলেন। তিনি এই অবধি গৌরাঙ্গের উত্তরসাধক হইলেন। কিছুদিন পরে বীরভূমির একচাকা গ্রামবাসী ব্রাহ্মণকুমার অবধূত নিত্যানন্দ নদীয়ায় আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে

(১) চৈতন্যভাগবত। অন্যান্য ভক্তের গ্রন্থে অনেক অবান্তর কথা আছে।

হরিগুণ কীর্ত্তনানন্দে ইঁহারা সকলে নদীয়া নগরী মাতাইয়া তুলিলেন। কীর্ত্তনকালে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ প্রবল ও বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইত। অদ্বৈত, নিতাই, শ্রীরাম, মুকুন্দ, মুরারী, গদাধর, হরিদাস, দামোদর প্রভৃতিকে লইয়া তিনি হরিনাম কীর্ত্তন নূতন ভাবে সৃষ্টি করিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে ভাগবতাদি পাঠের পরে সঙ্কীর্ত্তনে ইঁহাদের ভাব দেখিয়া অনেকে ভক্তের দলে মিশিল; দুই চারিজন পাষণ্ড লোকে প্রতিকূল আচরণ এবং অত্যাচারও করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় নগর সঙ্কীর্ত্তনে লোক মাতাইয়া প্রতিদিন ভক্তদলের উল্লাস দুই চারিজনের অসহ্য হইল। কেহ কেহ শ্রীবাসের দ্বারে কালীপূজার দ্রব্যস্বরূপ মদ্য মাংসাদি ফেলাইতে লাগিল। পাষণ্ডদলের মধ্যে জগাই মাধাই নামে দুই দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমার ছিল। তাহারা জমিদারের পুত্র, খুড়তুতো ভাই—প্রকৃত নাম জগন্নাথ ও মাধব। মাধাই একদিন মদ খাইয়া এক কলসীর কাণা তুলিয়া লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মত্ত নিত্যানন্দের মাথায় এমন নিদারুণ আঘাত করিল যে তাঁহার মস্তকের একদিক্ কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। নিতাই নিদারুণ আঘাত পাইয়াও প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে মদোন্মত্ত মাধাই পুনরায় মারিতে উদ্যত হইল। তখন জগাই আসিয়া মাধাইকে সরাইয়া দিয়া ভর্ৎসনা করিল। নিতাইএর এই "মেরেছিস্ কলসীর কাণা তা বলে কি প্রেম দিব না" বোলে পাষণ্ড জগাই মাধাইএর সঙ্গে সঙ্গে অন্য দর্শকও গলিয়া গেল (২)। নিমাইএর দলের কীর্ত্তন ও

(২) এখন নদীয়ায় মাধাইএর বংশ লোপ হইয়াছে। জগাইএর বংশ আছে, তাহারা "ছ্যাকৃকলা বাড়ী" নামে কথিত এবং পুরুষানুক্রমে শাক্ত। জগাই মাধাই সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন:—

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ অনুক্ষণ। (চৈঃ ভাগবত)

নিত্যানন্দের নর্ত্তন অনেককে নবগোরার এই প্রেমে মাতোয়ারা করিল। নদীয়া নিবাসী শাক্ত ব্রাহ্মণেরা অবশ্য এই সমুদায় প্রলাপ বলিয়া ধরিতেন; তাঁহারা ইহা "শচী পিসীর দুরন্ত ছেলের" অন্য এক খেয়াল বলিয়া উপহাসই করিতেন। তখন বৈষ্ণবের এই নবভাব হাসিয়া উড়াইবার জিনিসই ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবোচ্ছ্বাস ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; হরিনামে বিভোর হইয়া সময়ে সময়ে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। এদিকে কীর্ত্তন যথারীতি চলিতে লাগিল। কীর্ত্তনের দল একদিন কাজীর বাটী পর্য্যন্ত

জয়ানন্দ বলেন :—

অন্ন যোনি বিচার নাহিক দুই ভাই,
শ্চান সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত জগাই মাধাই।
গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ জত জত,
বলে ছলে গুরুপত্নী হরে শত শত।
গোমাংস শূকরমাংস করে সুরাপান,
ধর্ম্ম কথা না শুনে না করে গঙ্গাশ্চান।
শিশু সব আছাড়িয়া মারে শিলাপাটে
কত কত গর্ভবতীর কত গর্ভ কাটে।
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভক্ষণে
ঘূর্ণিত লোচন চারু পূর্ণ শক্রাসনে।
দস্যুগণ সঙ্গে থাকি ঘরে অগ্নি দেই
বুকে বাঁশ দিয়া কারো সর্ব্বস্ব নেই।

লোকমুখে গল্প ক্রমশঃ এইরূপে অতিরঞ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলেও 'ব্রাহ্মণ যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ে। ব্রহ্মবধ, গোবধ, স্ত্রী-বধ শত শত।'—ইত্যাদি, প্রথম মঙ্গলের প্রতিধ্বনি মাত্র। বধ বা ঘরে আগুন লাগান সেকালেও বড় সহজসাধ্য ছিল না। পরবর্ত্তী ভক্ত কবিরা জগাই মাধাই কাহিনী আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন।

ধাওয়া করিল। কাজী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তিনি এ ভক্তদলের সম্মানই করিয়াছিলেন (৩)। এই ভাবে ৩।৪ বৎসর নদীয়ায় অতিবাহিত করিবার পরে গৌরাঙ্গের সংসারে বিরাগ জন্মিল; স্নেহময়ী জননীর যত্ন, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম, কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় গৌরাঙ্গকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ১৪৩১ শকের (১৫০৯ খৃঃ) উত্তরায়ণের দিন প্রত্যূষে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়াই ভাগীরথী পার হইয়া কাটোয়ার দিকে চলিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য কাটোয়ায় আশ্রম কেশব ভারতীকে তিনি ইতঃপূর্ব্বে একবার নদীয়ায় দেখিয়াছিলেন। প্রদোষে কাটোয়া পৌঁছিয়া ভারতী ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে তিনি প্রথমে নানা কথায় ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইতিমধ্যে মুকুন্দ নিত্যানন্দ গদাধর চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সুহৃদ্ ও ভক্তবর্গ তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার নবীন বয়স, অপরূপ রূপ, ঘরে বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী পত্নীর কথা বলিয়া ভারতী বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বম্ভরের দৃঢ় পণ টলাইতে পারিলেন না। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণের আয়োজনের ভার পড়িল। শুভ উত্তরায়ণে শ্রীশিখা সমেত চাঁচড় কেশ নাপিতের নয়নাশ্রুর যোগে মুণ্ডিত হইল (৪)। স্নানান্তে মহামন্ত্র গ্রহণের পর যখন গেরুয়া ও দণ্ড গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দণ্ডায়মান

---

(৩) ভক্ত বৈষ্ণব লেখকগণ এই কাজী দমন ব্যাপার বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। সেকালে অন্য কাজীর বাগান ভাঙ্গা হইলে একটা হুলস্থূল হইত। কীর্ত্তনের দল আনন্দ করিয়াছিল, ইহাই সম্ভব। এই কাজী হোসেন শার পূর্ব্ব শিক্ষক মওলানা সিরাজুদ্দীন্। নদীয়ার মায়াপুরের দিকে তাঁহার সমাধি আছে।

(৪) চৈতন্যের মস্তক মুণ্ডনের 'শ্রী ক্ষুর' বলিয়া এক পদার্থ আমরা কাটোয়ায় প্রভুর বাটীর নিকটে দেখিয়াছি। তাঁহার বয়স কিন্তু চারিশত বর্ষ বলিয়া বোধ হয় না।

হইলেন, তখন তাঁহার গৌর সুঠাম যৌবন কান্তিযুক্ত মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া নাগরিকগণ চমৎকৃত হইল। দর্শকের দুঃখের অবধি রহিল না। তাহারা (৫) জানিত না, এই নবীন মুণ্ডী সন্ন্যাসী ভারতে যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর হইবেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় তাঁহার নাম হইল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। দীক্ষার পরে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কৃষ্ণ উদ্দেশে বৃন্দাবন চলিলাম বলিয়া পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দাদি কয়েক দিন তাঁহার অনুসরণ করিয়া, ভুলাইয়া বৃন্দাবনের পথ বলিয়া শান্তিপুরের অপর পারে লইয়া গেলেন। তখন শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন। ভক্তবৃন্দ নদীয়া হইতে তাঁহাকে দেখিতে শান্তিপুরে আসিলেন; সঙ্গে শচী মাতাকেও আনা হইল। অতঃপর কীর্ত্তনানন্দে কৃষ্ণপ্রেম-প্রবাহে শান্তিপুর 'ডুবু ডুবু' হইল। কয়েক দিন শান্তিপুরে বাসের পরে মাতা ও অন্যের নিকট বিদায় লইয়া চৈতন্য নীলাচল (পুরী) যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও জগদানন্দ পণ্ডিত সঙ্গী হইলেন।

ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন করিয়া গ্রামাধিকারী রামচন্দ্র খানের আনুকূল্যে আনীত নৌকায় উঠিয়া তাঁহারা সুন্দরবনের পশ্চিম-ভাগ ধরিয়া যাত্রা করিলেন;

(৫) শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতা চাখন্দী গ্রামবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সন্ন্যাস ব্যাপার দৃষ্টে এতই ব্যথিত ও আত্মহারা হইয়াছিলেন যে তিনি কয়েক দিন যাবৎ কেবল 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করিয়া নিজের চৈতন্য হারাইতে বসিয়াছিলেন। দর্শকদের মধ্যে শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন; তিনি সেই অবধি চৈতন্য পরিচর হন। কেহ কেহ বলেন, নরহরি নদীয়ায় পাঠের সময় গৌরাঙ্গের সহচর ছিলেন।

যেখানে কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভিরেতে ধ'রে খায়॥ (চৈঃ ভাঃ)

ক্রমে সুন্দরবন পার হইয়া 'উৎকলের দেশে' শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন। এখানে গঙ্গাঘাট নামক ঘাটও ছিল এবং 'যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথি আছে' (ইহা কি তমোলুক?)। যাজপুর পার হইয়া সন্ন্যাসীর দল ক্রমে পুরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। কপোতেশ্বরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভার্গী নদী পারের সময় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সন্ন্যাসদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন; তদবধি ঐ স্থানের নাম 'দণ্ডভাঙ্গা' হইল। প্রভু ঐস্থান হইতে কপট ক্রোধ করিয়া অন্যের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথ দেউল দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেশ হইল। পুরী প্রবেশ করিয়া দর্শনকালে শ্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গিতে গিয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ এবং ভৃত্যগণের তাড়াইবার চেষ্টা চৈতন্য-চরিতামৃত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ঃ—

দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁকে করে দরশন।
পড়িছা মারিতে তিঁহ কৈল নিবারণ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমে হইল বিস্ময় অপার॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারা নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে রাখে শোয়াইয়া॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের কথিত "বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার। এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার"—ইহা 'সন্দীপ্ত সাত্ত্বিক প্রলয়' বা 'অধিরূঢ় ভাব' ইত্যাদি চিন্তার কথা না হয় বৃদ্ধ কবিরাজের

নিজের চিন্তাই ধরিয়া লইলাম। তৎপরে সার্ব্বভৌম পুনরায় মন্দিরে আসিয়া নিত্যানন্দাদির সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি নদীয়া-বাসী বিশারদের জামাতা গোপীনাথ আচার্য্য মুকুন্দকে চিনিতেন। তাঁহার সহিত মুকুন্দের কথোপকথনে সব কথা প্রকাশিত হইলে তিনি উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অচৈতন্য চৈতন্যের নিকট সার্ব্বভৌম আলয়ে গেলেন। নামসংকীর্ত্তনে তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতন হইলে "আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লইল পদধূলি।" ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, গৌরাঙ্গ নিমাই পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না; সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি জ্ঞানবাদীকে এত আত্মহারা করিতে পারে এমন মনে হয় না। ইহার পরে গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট 'কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম' জিজ্ঞাসায় ইঁনি নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, এই পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌম বলেন, নীলাম্বর "বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি। মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি। পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি॥" এই বলিয়া—

নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥
সহজেই পূজ্য তুমি আরেত সন্ন্যাস।
অতএব হও তোমার আমি নিজ দাস।

ইত্যাদি কবিরাজ উক্তি গদ্যময় পাঠক সহজে মানিয়া লইবেনা।

"শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥
তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সর্ব্বলোক উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥"

এই কথায়ও সার্ব্বভৌমের সহিত চৈতন্যের পূর্ব্ব পরিচয় প্রমাণ হয় না। পরে বেদান্তপাঠ এবং তদ্বিষয়ের তর্ক যাঁহা দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবি-রাজ বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল শুনা কথার উপরে তাঁহার নিজের পাণ্ডিত্যের যোগ মাত্র। অবশ্য, শুষ্ক মায়াবাদী বৃদ্ধ সার্ব্বভৌমকে ভক্তিমার্গে প্রণোদিত করার উপাখ্যান সকলেই বিশ্বাস করিতে পারেন। প্রেম ভক্তিতে জগৎ প্লাবিত করা যাঁহার আবির্ভাবের মধুময় ফল, তাঁহার দ্বারা এ কার্য্য সহজসাধ্য।

এইরূপে প্রেমানন্দে দুই মাস কাল নীলাচলে লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। একাকী যাওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু সকলের অনুরোধে "কৃষ্ণদাস নামে সরল ব্রাহ্মণকে" (৬) সঙ্গে করিয়া বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণে চলিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া দক্ষিণাপথে গিয়াছেন; তাঁহার অন্বেষণ করা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নাম বিলাইতে বিলাইতে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে চলিলেন; 'শক্তি সঞ্চারিয়া' শত শত লোককে বৈষ্ণব করিলেন। যার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করেন সেই ধন্য হয়। কূর্ম্মস্থানে

(৬) চৈঃ চরিতামৃত—মধ্য, ৭ পঃ। গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে এক পুস্তক প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরের ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় প্রকাশিত করেন। প্রকাশ কালে এই পুঁথির বিষয়ে অনেক সন্দেহের কথা উঠিয়াছিল। সহজভাবে বর্ণনা দেওয়া থাকিলেও ইহার ভাষায় নবীনত্বের গন্ধ সুস্পষ্ট। একস্থানে মুণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের 'খসিল জটার ভার' ও আছে। গ্রন্থভাগে সেই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের বর্ণনা প্রধানতঃ অবলম্বন করা হইল। ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ হইতে ফিরিবার পরে পুরীতে আসিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়; 'আপন শ্রীঅঙ্গ সেবা দিলা অধিকার'। কড়চায় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গিয়া গোবিন্দ কর্ম্মকার যাহা দেখিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ আছে।

'বাসুদেব নামে এক দ্বিজ মহাশয়, সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময়' —শ্রীচৈতন্যের আলিঙ্গনে রোগমুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। অতঃপর 'জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র' (ভিজিগাপটনের নিকট সিংহাচল?) দর্শন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গোদাবরী তীরে উড়িষ্যা-রাজের মন্ত্রী পরম ভাগবত রসিকপ্রবর রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন। "সূর্য্যশত সম কান্তি অরুণ বসন। সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন ॥" দেখিয়া রামানন্দ চমৎকৃত হইলেন। আলিঙ্গনের পরে রামানন্দ বলিলেন 'রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম' আমি তোমার স্পর্শে পবিত্র হইলাম। শ্রীচৈতন্য বলিলেন "তুমি মহাভাগবতোত্তম; অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমিই তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥" এইরূপে উভয়ের বিনয় সম্বর্দ্ধনা হইল। রামানন্দ সম্ভাষণে "এহো বাহ্য আগে কহ আর, এহ হয় আগে কহ আর" বলিয়া বলিয়া পণ্ডিত কবিরাজ মহাশয় রায়ের মুখে যে ক্রমোচ্চ প্রেম ভক্তি স্তরের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা মনোহর হইলেও বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয় নহে। কৃষ্ণলীলা রস প্রচারে কবিশেখর রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান সহায়; তাঁহার জগন্নাথ বল্লভ নাটক গৌরাঙ্গের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। "অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে। রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে"। অরসিক আমরা প্রভুর বাহিরের বিবরণ লইয়াই বিব্রত। রসাল রসের আস্বাদ না লইয়া 'কোন্ ডালের আম' তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত!

রাজমহেন্দ্রী অঞ্চল হইতে শ্রীচৈতন্য ক্রমশঃ মল্লিকার্জ্জুন, সিদ্ধিবট (৭)

(৭) গোবিন্দের কড়চায় সিদ্ধবটে এক ধনবান নাগর লক্ষ্মীবাই ও সত্যবালা নাম্নী দুই বেশ্যা লইয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যকে পরীক্ষা করিয়াছিল। বেঙ্কটে অদ্বৈতবাদী রামানন্দ শিষ্য হইয়াছিলেন।

স্কন্দক্ষেত্র, বৃদ্ধকাশী, ত্রিপদী ত্রিমল্ল বেঙ্কটাচল প্রভৃতি দর্শন করিয়া চলিলেন। বেঙ্কটে দস্যু পন্থভীলের সদলে বৈষ্ণব হওয়ার কথা গোবিন্দের কড়চায় আছে। পথে তার্কিক মীমাংসক বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা মতের খণ্ডন ও স্বমত স্থাপন চলিল। গোবিন্দের কড়চায় ত্রিমল্লে বৌদ্ধরাজ রামগিরি রায় এবং তার্কিক ঢুণ্ডীরাম তীর্থ শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণ ভক্ত কৈল'। বৃদ্ধকাল তীর্থে শ্বেত বরাহ ও পীতাম্বর শিব ও শিয়ালী ভৈরবী (৮) দর্শন করিয়া কাবেরীতীরে উপনীত হইলেন। গোসমাজ বেদাবন ও অমৃতলিঙ্গ মহাদেব দর্শন করাইয়া কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্য "সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব কলি" লিখিয়া আনন্দ অনুভব করিলেও মনে করিতে হইবে, শৈব প্রধান দক্ষিণে কৃষ্ণভক্তির প্রবল প্রচার কিছু শক্ত ব্যাপার।

"দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥
কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে আসি শিব দেখে তেজোবর ॥
পাপ নাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তবে কৈল আগমন ॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিলা কৃতার্থ ॥"

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে 'চাতুর্ম্মাস্য' করিতে রহিলেন। এখানে ব্রাহ্মণেরা 'এক এক দিন সবে কৈলা নিমন্ত্রণ' তাহাতেও 'কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল।' শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের বৈষ্ণবী ভক্তিতে

(৮) "গোবিন্দের কড়চায় চাঁইপল্লীতে (ত্রিচিনপল্লী) সিদ্ধেশ্বরী ও শৃগালী নামে ভৈরবী দর্শন হয়।

আপ্লুত রসাল মৃত্তিকা গৌরাঙ্গের প্রেমবন্যায় ভাসিয়া গেল। অতঃপর কামকোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরা (মাদুরা) দর্শনান্তর মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে বন্দনা করিয়া "সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান। রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম।" ইহা হইতে বোধ হয় বর্ত্তমান ধনুস্কোটির স্থান অপেক্ষা এই ধনুতীর্থ পূর্ব্বে রামেশ্বরের নিকটে ছিল। রামেশ্বরে, কূর্ম্মপুরাণে রাবণ মায়াসীতা মাত্র হরণ করিয়াছিলেন—সীতা লক্ষ্মী অগ্নিক্রোড়ে ছিলেন, এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া রামদাস মিশ্রকে জানাইতে পুনরায় মাদুরায় ফিরিয়া পরে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন (৯) গোবিন্দের কড়চা অনুসারে সেতুবন্ধ হইতে মাধ্বীবন পথে সাতদিন ধরিয়া চলিয়া তত্ত্ব কুণ্ডী তীর্থে স্নান এবং তথা হইতে তীম্রপর্ণী নদীতীরে পৌছিয়া মাঘীপূর্ণিমায় তাম্রপর্ণী তীর্থে স্নান ও একপক্ষ কাল তথায় বাস হইয়াছিল। চরিতামৃতে পরে—

"নয় ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে॥
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈলা শিব দরশন॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণু মূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি॥

---

(৯) গোবিন্দের কড়চায় কাবেরী স্নানের পরে সমুদ্রতীরে নাগোর নগরে গমন এবং সেখান হইতে সাতক্রোশ দূরে তাঞ্জোর যাত্রার কথা আছে। তথা হইতে চণ্ডানু পর্ব্বতের বনাঞ্চল দিয়া পদ্মকোট তীর্থে অষ্টভুজা ভগবতী দর্শন; অতঃপর ত্রিপাত্রে এক সপ্তাহ বাসের পরে পঞ্চাশ যোজনব্যাপী ঝাড়িবন পার হইয়া রঙ্গধামে (শ্রীরঙ্গপটনে) নরসিংহ মূর্ত্তি দর্শনান্তে ঋষভ পর্ব্বত ও রামনাথ হইয়া রামেশ্বর তীর্থে আগমন। কড়চায় শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের কথা এবং শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান নেতা বেঙ্কট ভট্টের কথা উল্লেখ না থাকা এক সন্দেহের কথা। কড়চায় মাদুরার কথাও নাই।

চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥
মলয় পর্ব্বতে কৈলা অগস্ত্য বন্দন॥
কন্যা কুমারী তাঁহা কৈলা দরশন
আমলী তলাতে রাম দেখে গৌর হরি।
মল্লার দেশেতে আইলা যথা ভট্টমারী॥
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বেতাপাণি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী॥

এখানে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণের সহিত ভট্টমারীর (বামাচারী) সাক্ষাৎ হইলে 'স্ত্রীধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল'। কামিনী কাঞ্চনের লোভে কত মহারথির যোগভঙ্গ হইয়াছে, সামান্য কৃষ্ণদাসে 'কা কথা'! এখানে ভট্টমারী সকলের নিজের উত্থিত কৃপাণ নিজের 'অঙ্গে পড়ার' কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই করিলেন; স্বীয় অনুচরকে "কেশে ধরি লঞা করিলা গমন"— ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতঃপর আদিকেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইয়া 'মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী কৈল। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল"। অল্প কথায় এই সংহিতা বৈষ্ণবশাস্ত্রে "অপার সিদ্ধান্ত" কহিতেছে, অতএব ইহা নব-বৈষ্ণব তন্ত্রে বহু মূল্যবান্। ইহার পরে অনন্ত পদ্মনাভ দর্শন করিয়া

পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণে।
সিংহারী মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে॥
মৎস্য তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥
মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী। (১০)
উড়ুপ কৃষ্ণ স্বরূপ দেখি হইলা প্রেমোন্মাদী॥

তৎপরে ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ বিশালা, পঞ্চাপারা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শচীর

---

(১০) মাধ্ব সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, ইহারা অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর মুখ দেখিলে স্নান করিয়া তবে শুদ্ধ হইতেন! চৈতন্য অবশ্য 'কবিরাজী' মতে ইঁহাদের

নন্দন গোকর্ণশিব, আর্য্যা দ্বৈপায়নী দেখিয়া ‘সুপারক তীর্থ আইলা ন্যাসী-শিরোমণি’।

কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা ভগবতী ॥
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র,
বিঠ টল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ।

এইস্থানে মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; এই পুরী পূর্ব্বে নদীয়ায় আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ‘অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট’ খাইয়া গিয়াছিলেন—তখনও উহা তাঁহার মুখে লাগিয়াছিল। তৎপরে ভীমরথী স্নান করিয়া কৃষ্ণবেণ্বাতীরে আসিয়া নানা তীর্থ দর্শন ও কৃষ্ণ-কর্ণামৃত পুঁথি প্রাপ্তি—‘যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে’।

তাপী স্নান করি আইলা মাহিষ্মতী পুরে।
নানা তীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥
ধনুতীর্থে দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত আইলা দণ্ডক অরণ্যে ॥ (১১)
প্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥

গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া চলিলেন। গোবিন্দদাসের বর্ণনায় শৃঙ্গেরী মঠে বিচার করিয়া মৎস্যতীর্থ হইয়া কাচাড়ে ভগবতী দর্শনান্তে ভদ্রায় স্নান—পরে নাগপঞ্চপদীতে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া চিতোলে (বর্ত্তমান চিতল দুর্গ) গমন; তথা হইতে তুঙ্গভদ্রায় স্নানান্তে কাবেরীর উৎপত্তিস্থান কোটিগিরি দর্শনের পরে চণ্ডপুরে ঈশ্বর ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ।

(১১) এই স্থানে কবিরাজ মহোদয় ব্যবস্থা করিয়া গৌরচন্দ্র দ্বারা সপ্ততাল আলিঙ্গন ও তাহাদের বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করাইয়াছেন, নতুবা রাম অবতারের সহিত সঙ্গতি থাকে কিরূপে?

নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্ত আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥
সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥”

চরিতামৃতে এই ভাবে চৈতন্য প্রভুকে পুরী প্রত্যাবর্ত্তন করান হইয়াছে। কর্ম্মকার গোবিন্দ শেষ দিকের যে ভ্রমণ বৃত্ত দিয়াছেন তাহাও দেওয়া গেল ঃ—চণ্ডপুর হইতে দুই দিন দুই রাত্রি চলিয়া পর্ব্বত (নীলগিরি) পার হইয়া গৌরচন্দ্র গুর্জ্জরী নগরে উপস্থিত হইয়া অনেক মারাঠী স্ত্রীপুরুষকে নামগানে মোহিত করেন। সেখান হইতে বিজাপুর পর্ব্বত পার হইয়া পুনায় পৌঁছেন (১২) তথা হইতে ভোলেশ্বর ও জিজুরী। এখানে খাণ্ডবামন্দিরে মুরারী উপাধি দেবদাসী উদ্ধারান্তে চোরানন্দী বনে উপনীত হন; তথায় নারোজী নামক ব্রাহ্মণ দস্যু সদলে প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। অতঃপর প্রভু খণ্ডনের দিকে চলিয়া মুলা নদী পার হইয়া নাসিক ও পঞ্চবটী হইয়া সুরঠ রাজ্যে গিয়া অষ্টভূজা মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তথা হইতে তাপী স্নানান্তে বামন দর্শনের পর ভরোচ নগরে গমন করেন। নর্ম্মদা স্নানের পর বরোদা গমন এবং সেখানে তিন দিন পরে নরোজীর স্বর্গলাভ; আহমাবাদে শুভ্রামতী তীরে গোবিন্দ ও রামচরণ নামক দুই কুলীনগ্রামবাসী

(১২) কড়চায় সেকালে পুনায় গীতা ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্রের চর্চ্চার এবং চৈতন্যদেবের সহিত ঐ বিষয়ের বিতর্কের বিবরণ দেওয়া আছে। এক অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ হ্রদের জলে কৃষ্ণ দেখা যাইতেছে বলায় প্রভুর ঝাঁপ দেওয়ার কথা মিষ্ট হইলেও এই অংশ যেন যমুনায় ও সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার ব্যাপারের অনুকরণে লেখা মনে হয়। অহো! বিশ্বাসের অভাব নানা গোল ঘটায়। মুরারী উদ্ধারে ‘মুই বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই’ লিখিয়া গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যকে সাবধান করার দাবিও করিয়াছেন।

বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। পরে ঘোগা গ্রামে গমন করিয়া বারমুখী বেশ্যাকে প্রভু উদ্ধার করিলেন (১০)। এথান হইতে নয় দিবসে সোমনাথ পত্তনে উপনীত হন; সোমনাথে সন্ন্যাসী-বেশধারী মহাদেবের গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ। পরে জুনাগড় গীর্ণার পর্ব্বত ভদ্রনদী প্রভৃতি হইয়া প্রভাসতীর্থে পৌঁছেন। ১লা আশ্বিন ১৪৩২ শক দ্বারকায় উপনীত হইয়া একপক্ষ কাল বাসের পর পুরীর দিকে ফিরিলেন; আশ্বিনের শেষ দিনে বরোদায় পৌছিয়া ১৬ দিন পরে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হন। এথান হইতে দোহদ, কুক্ষি, আম-ঝোর, মন্দুরা মণ্ডল, দেবঘর, শিবানী চণ্ডীপুর ও রায়পুর হইয়া পুনরায় বিদ্যানগরে পৌছেন এবং রত্নপুর স্বর্ণগড় সম্বলপুর, ভ্রমরা দাস-পাল ও আলাল নাথ হইয়া এক বৎসর আট মাস ২৬ দিন পরে ১৪৩৩ শক ১৫১১ খৃঃ ৩রা মাঘ পুরীতে পৌছেন।

শ্রীচৈতন্য পুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কাশী মিশ্রের বাটীতে থাকিয়া দ্বিগুণ স্ফুর্ত্তিতে ভক্তিরসের বহু প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। নিত্যা-নন্দাদি পার্ষদ কয়েকজন পূর্ব্ব হইতেই পুরীতে ছিলেন। আগামী স্নানযাত্রার পূর্ব্বে বঙ্গীয় ভক্তবর্গের পুরী আগমন স্থির হইল। অদ্বৈত-প্রভু সদলে শ্রীবাস হরিদাস মুরারিগুপ্ত শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি ও রঘু-নন্দন, কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁ, দামোদর ও গদাধর পণ্ডিত—ইত্যাদি 'দুইশত' ভক্ত সঙ্গে নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন। এই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্রও রায় রামানন্দের সহিত কথাবার্ত্তায়

(১০) নভাজী ভক্তমাল গ্রন্থে জনৈক সাধু কর্তৃক বারমুখী উদ্ধার বর্ণনা করিয়াছে। এই নব কড়চার লেখক কি চৈতন্যদেবকে সেই স্থানে বসাইয়া দেন নাই?

শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়ীয় ভক্তবর্গের নিমিত্ত উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিলেন। প্রেমানন্দে সেবার রথযাত্রার উৎসব নির্ব্বাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তবর্গ কার্ত্তিক মাসের উত্থান দ্বাদশী পর্য্যন্ত রাজার কৃপালাভ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ ভোগ করণানন্তর দেশে ফিরিলেন। স্বরূপ দামোদর ও গঙ্গাধর পণ্ডিত প্রভৃতি দশজন পুরীতে রহিলেন। পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই ভাবে ভক্তগণের যাতায়াত ও প্রেমানন্দ চলিল। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গে ফিরিয়া আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের আদেশ হইল। তাঁহার কার্য্য পরে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

পাঁচ বৎসরের পাকা সন্ন্যাসের পরে প্রভুর ইচ্ছা হইল গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন। ক্ষেত্র তৎপূর্ব্বেই প্রেমভক্তির স্নিগ্ধবারিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিজয়া দশমীর প্রভাতে পুরী হইতে যাত্রা করিয়া পিছলদা হইতে নৌকাযোগে খড়দহের নিকটে পানিহাটী পর্য্যন্ত আসিলেন। এখানে প্রভুর প্রিয়ভক্ত রাঘবের বাটী (যে রাঘবের ঝালির মত কোন ভক্তের পোঁটলা সন্দেশাদি বক্ষে ধরিয়া পুরী যাত্রা করে নাই)। এথান হইতে শ্রীবাসের নূতন বাটী কুমারহট্ট (হালিসহর) পৌছিয়া শ্রীবাসাদি পরিকরকে কৃতার্থ করিয়া কাঞ্চন পল্লীতে (কাঁচড়া পাড়া) শিবানন্দের বাটীতে উপনীত হইলেন। তথা হইতে নৌকায় শান্তিপুর আসিয়া অদ্বৈত ভবনে বিশ্রামান্তে যাত্রা করিয়া নবদ্বীপের পল্লী বিদ্যা-নগরে উপনীত হইয়া সার্ব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবতীর্ণ হইলেন। দলে দলে লোক আসিয়া বিশ্রুত কীর্ত্তি শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে লাগিল। জনতা দেখিয়া প্রভু ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামে মাধবদাসের বাটীতে গেলেন। কুলিয়াবাসী পণ্ডিত দেবানন্দকে বৈষ্ণব করার পরে ঐ স্থান অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ

বলিয়া খ্যাত হইল (১৪)। কুলিয়া গ্রাম হইতে গৌরাঙ্গ আত্মীয়বর্গের নিকট বিদায় লইয়া গৌড় যাত্রা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই স্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুর খড়ম যোড়াটি লইয়াই বাটীতে ফিরিলেন।

ভাগীরথী তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া যাত্রা করিয়া শেষে পদ্মাপার হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ের সমীপবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে উপনীত হইলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত কীর্ত্তনানন্দে নিরত গৌরাঙ্গ দর্শনের নিমিত্ত নানাস্থান হইতে লোক সমবেত হইল। বাদশা হোসেনশার মন্ত্রিদ্বয় (দবির খাস ও সাকর মল্লিক) সুপণ্ডিত রূপ ও সনাতন প্রভুর নিকট আসিলেন; রাজসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহারা

দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হইতে হীন॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনয় দেখিয়া গৌরও গলিয়া গেলেন; অচিরাৎ কৃষ্ণ তাঁহাদের উদ্ধার করিবেন এই ভরসা দিলে তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। সুবিজ্ঞ "সনাতন 'প্রহেলী করিয়া' শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন :—

যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে 'এই এক ঢঙ্গে'॥

---

(১৪) কুলিয়া গ্রামে কৈলা দেবা নন্দরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমা শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিলা কৃষ্ণ প্রেমে॥ চৈঃ চঃ (মধ্য—১ম)

দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন॥

মনে মনে এই বিচার করিয়া কানাইয়ের নাটশালা নামক স্থান হইতে ফিরিয়া শান্তিপুর আসিলেন। এখানে সপ্তগ্রামের জমিদার বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ মিলিলেন। প্রভু রঘুনাথকে বলিলেন 'স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাউল', 'মর্কট বৈরাগ্য' না করিয়া 'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া'—অন্তরে নিষ্ঠা থাকিলেই কৃষ্ণ পাইবে। বৃন্দাবন দেখিয়া নীলাচলে ফিরিলে আমার নিকট যাইও। পরে পুরী চলিলেন। বর্ষা চারিমাস অতীত হইলে শ্রীচৈতন্য বলভদ্র নামক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া গোপনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইবার মানসে ঝাড়িখণ্ডের বনভূমি দিয়া কাশীধামে পৌছিলেন। এখানে তাঁহার ভক্ত তপন মিশ্রের বাটীতে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র 'প্রভুর ব্যবহার' দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট গিয়া কহিল, জগন্নাথ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে

প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল নয়ন

তাঁহাতে ঈশ্বরের সল্লক্ষণ সমস্ত বর্ত্তমান, নিরন্তর জিহ্বায় কৃষ্ণনাম। কবিরাজের উক্তিতে প্রকাশানন্দ উপহাস করিয়া বলিলেন,

শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্য লোক-প্রতারক।
* * * *
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া,

সে মোহন বিদ্যা জানিতে পারে;—

সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালী॥

সে উচ্ছৃঙ্খল লোকের কাছে যাইও না, "বেদান্ত শ্রবণ কর"। চৈতন্য মহা বহির্মুখ মায়াবাদীর মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গ্রাহক নাই, না বিকায় লয়ে যাব ঘরে।" যে কারণেই হউক শ্রীচৈতন্য কাশীতে না তিষ্ঠিয়া প্রয়াগ ও মথুরায় বেণী এবং বিশ্রাম তীর্থে ও চব্বিশঘাটে স্নানাদি করিয়া বন ভ্রমণে চলিলেন। "লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে।" শেষে 'জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে। যার যত শক্তি তত পাথার সাঁতারে।" আরিট গ্রামের নিকটে আসিয়া রাধাকুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করায় কেহই উত্তর দিতে পারিল না।

লুপ্ততীর্থ জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈলা স্নান॥

রাধাকুণ্ড আবিষ্কৃত হইল ঃ—

"যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে॥'

বলিয়া প্রেমাবিষ্ট কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় "কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা মধুরিমা' এ কথা প্রেম ভক্তি রসে অনুভব করিয়া সংস্কৃত বচন তুলিয়াছেন। অতঃপর গৌরচন্দ্র গোবর্দ্ধন কাম্যবন ও নন্দীশ্বর দেখিয়া পর্ব্বতের উপরে এক 'গোফা উঘারিয়া' ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বর দেখিতে পাইলেন। মহাবন হইয়া একদিন গোকুলে গেলেন। আর একদিন কালিয় হ্রদে স্নান করিয়া কেশীতীর্থ আসিয়া রাসস্থলী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। এইরূপে শ্রীচৈতন্য লুপ্ততীর্থ সমস্ত প্রকাশ করিয়া নব-বৃন্দাবনের স্থাপনা করিলেন।

প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীর ঘাটে স্নান।
তেঁতুল তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥

কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ॥

কবিরাজ গোস্বামী এই তেঁতুলতলায় বাঁধা পিঁড়িতে অনেক দিন বসিয়াছেন,—তাঁর ভক্তি অতি প্রবল, বিশ্বাস জলন্ত, বৃক্ষ কত দিনের খোঁজ লইবার আবশ্যক ছিল না ; সুতরাং তিন হাজার বৎসর বয়সের তেঁতুল গাছে পাষণ্ডীর বিশ্বাস না হইলে, তাঁহার অপরাধ নাই (১৫)। শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন বাসকালে এক রাত্রিতে কোন ধীবর 'কালীদহে মৎস্য মারে, দেউটি জ্বালিয়া'—তাহা দেখিয়া লোকে কালীদহের জলে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন বলিয়া কোলাহল তুলিয়াছিল। গৌরাঙ্গ বলিয়া দিলেন, কলিতে কি কৃষ্ণ দেখা দেন, পাগল ! 'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়' 'কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ, দেখে কাঁহা ভ্রমে মানে'। ভক্ত বলিয়া উঠিল, 'তুমিই কৃষ্ণ অবতার'। চৈতন্যদেব 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলিয়া কহিলেন,—

জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিও,
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ কণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

এই সব কথা শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে স্থাপন করিয়াও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভক্তসুলভ "তটস্থ লক্ষণ" এবং 'স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন' লিখিয়া উপসংহার করিয়াছেন। একদিন 'এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল' বলিয়া প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া 'ডুবিয়া রহিল'—'দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল। ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল', শেষে আর ঐরূপ 'নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়া ভাল।' "বৃন্দাবন হইতে যদি প্রভুরে

(১৫) বৃন্দাবন প্রবাস কালে কৃষ্ণলীলার 'বংশী বট'—পাণ্ডাঠাকুরের কৃপায় আমরা দেখিয়াছি, অন্যান্য বৃক্ষগুলি আর একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে, এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কাড়িয়ে। তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে।"—এই মনে করিয়া ভক্তগণ মাঘীস্নানের অনুরোধে গৌরাঙ্গকে প্রয়াগের দিকে লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে পাঠান দস্যু প্রভুর কৃপায় উদ্ধার পাইয়া বৈষ্ণব হইল। এদিকে

শ্রীরূপ সনাতন রামকেলী গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥
দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় করিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ॥
শ্রীরূপ গোসাঞী তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে অর্দ্ধেক বিতরণ করিয়া একচৌঠী কুটুম্ব ভরণে এবং অন্য চৌঠী 'দণ্ডবন্ধ লাগি' রাখিলেন। 'ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল' এবং গৌড়ে দশ সহস্র মুদ্রা সনাতনের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাখিয়া দিলেন। এ দিকে সনাতন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত—

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥

গৌড়েশ্বর একদিন আচম্বিতে তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, বৈদ্য পাঠাইয়া জানিয়াছি 'ব্যাধি নহে সুস্থ' "মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ' তোমার বড় ভাই ১৬ চাকলার সব নষ্ট করিতেছে, (১৬) এ দিকে তুমি 'সর্ব্ব কার্য্য নাশ' করিতেছ।

(১৬) রূপ প্রভৃতি তিন ভাই ভিন্ন আর এক বড় ভাই ছিলেন, দেখা যাইতেছে। ইঁহাদের বংশ এমন কি ভগিনীপতি শ্রীকান্তও হাজিপুরে উচ্চ রাজকার্য্য করিতেন।

আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় চল। সনাতন অস্বীকার করায় রাজা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া (বন্দী করিয়া) গেলেন। রূপ শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে পত্র দিয়া কনিষ্ঠ বল্লভের সঙ্গে প্রয়াগে গেলেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাতে প্রভু 'শ্রীরূপে শিক্ষা দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া' সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিলা। শ্রীরূপ গোস্বামী "হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ"—ইত্যাদি কথায় 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে স্বয়ং যাহার অবতারণা করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় রূপ-চৈতন্য সংবাদে শ্রীমুখের বাণী বলিয়া তাহার এক সুদীর্ঘ বর্ণনায় বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রের ক্রমগুলির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিরূপে "সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয়।"—ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা রসামৃত সিন্ধুকেও অতিক্রম করিয়াছে। শ্রীরূপকে বৃন্দাবন যাত্রার আদেশ দিয়া গৌরাঙ্গ প্রভু কাশী আসিলেন।

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে।
শ্রীরূপ গোসাঞীর পত্র আইল হেন কালে॥

সাত হাজার টাকা ঘুস দিয়া মুসলমান রক্ষককে বশীভূত করিয়া একমাত্র ভৃত্য ঈশানকে লইয়া দরবেশের বেশে সনাতন গৌড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হাজিপুরে শ্রীকান্ত নামে তাঁহার এক ভগিনীপতি রাজকার্য্য করিতেন। সনাতনের মলিন বেশ দেখিয়া তিনি এক ভোট কম্বল দিলেন। বারাণসীতে উপনীত হইয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধার পরে 'ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল'; নূতন বস্ত্র দিতে গেলে তাহা অঙ্গীকার না করিয়া এক খানি পুরাণ কাপড় চাহিয়া লইয়া 'তিঁহো দুই বহির্বাস কৌপিন

করিল'। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সনাতনকে কাশীতে থাকার সময় তাঁহার গৃহেই অতিথি হইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলে—

'সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার॥'

সনাতন বুঝিলেন 'তিন টাকার ভোট কম্বল' গোল বাধাইয়াছে। তখন গঙ্গাতীরে 'এক গৌড়ীয়া' 'কান্থা ধুঞা শুকাইতে' দিয়াছে দেখিয়া তাহার কান্থার সহিত কম্বল বদল করিলেন। পরে কথাচ্ছলে এই বিষয়ের উত্থাপন হওয়ায় শ্রীচৈতন্য বলিলেন, কৃষ্ণ যখন তোমার 'বিষয় রোগ খণ্ডাইল'—তখন আর সেই 'তিনমুদ্রার ভোট গায় মধুকরী গ্রাস'—রাখাটা লোকে উপহাস করিবে। তখন তিন মুদ্রার এতই কদর ছিল। যাহা হউক, সনাতন সর্ব্বত্যাগী হইলেন; শ্রীচৈতন্য কথোপকথনে তত্ত্ব নিরূপণের উপদেশ দিলেন। সনাতন গোস্বামী দৈন্য বিনতি করিয়া কহিলেন :—

নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম। (১৭)
কুবিষয় কূপে পড়ি গোয়াইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি,
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥

আমি 'সাধ্য সাধন তত্ত্ব' পুছিতে জানিনা; কৃপা করিয়া আমায় কর্ত্তব্য উপদেশ দিন। তখন কবিরাজ গোস্বামী আর একবার 'কৃষ্ণের

(১৭) শুদ্ধ রাজকার্য্য করায় যাবনিক ভাব প্রাপ্তি এই দৈন্য প্রকাশের কারণ মনে হয় না। কোন অজ্ঞাত কারণে ইহাঁরা 'হীনজাতি' অর্থাৎ সমাজে পতিত ছিলেন, এরূপ প্রবাদ নদীয়ায় ছিল। দীনেশ বাবুর কথিত মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের প্রমাণাভাব।

তটস্থ' শক্তি লইয়া যে দীর্ঘ বিচার আরম্ভ করিয়াছেন—তাহাতে অনেককেই তটস্থ হইতে হয়। সনাতন গোস্বামীর রচনার ব্যাখ্যাও এই ভাব-বিচারে স্থান পাইয়াছে। সম্বন্ধ তত্ত্ব নিরূপণে স্বরূপ ভেদ বিচার, তথা শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যবর্ণন ও আত্মারাম শ্লোক ব্যাখ্যায় সনাতনানুগ্রহো নামক পরিচ্ছেদত্রয়ে সুবিজ্ঞ ভক্ত কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অনেক তাঁহার নিজস্ব; চৈতন্যদেবের মুখ দিয়া প্রকাশিত করা হইয়াছে মাত্র। কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গকে বৈষ্ণব করার কথা সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ নবদ্বীপের ন্যায় কাশীতেও চৈতন্যের মত তাৎকালিক বিদ্বৎসমাজে পরিগৃহীত হয় নাই। সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবন প্রেরণ করিয়া গৌরচন্দ্র পুনরায় পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। এখানে কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার ভাব বৈকল্য উত্তরোত্তর প্রবল হইল। কখনও বা জগন্নাথ মন্দিরে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত থাকিতেন; শিষ্যবর্গ নাম সঙ্কীর্ত্তনে চেতনাসঞ্চার করাইয়া আশ্রমে আনিত। একদিন প্রেমোন্মাদে চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত তরঙ্গায়িত মহোদধির কল্লোল-নৃত্য দর্শনে রাধাকৃষ্ণের জলকেলির ভাবাবেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এক ধীবরের জালে দেহ উপরে উঠিল, শেষে শিষ্যবর্গের যত্নে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবদের মতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ জগন্নাথদেবে মিলিয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের মতে পায়ে ক্ষত হওয়ায় তাঁহার মানবলীলা সাঙ্গ হয় (১৪৫৫ শক)। ৪৮ বৎসর বয়সে অলৌকিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে দেশ মাতাইয়া এই মহাপুরুষের জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। আর কি এমন বিশ্বপ্রেমিকের উদ্ভব হইবে?

পঞ্চম অধ্যায়।

মোগল-পাঠান।

হোসেন শার অযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্রের দুর্ব্বল হস্ত হইতে যে অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, মুসলমান ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। অস্তমিত পাঠান গৌরব তাঁহার কৃতিত্বে সান্ধ্য কুহেলিকা ভেদ করিয়া অল্পকাল মাত্র উজ্জ্বল থাকিয়া মহামোগলের সদ্যোত্থিত শশীকলার সাময়িক অন্তর্দ্ধান সংঘটিত করিয়াছিল। সেই মহাশক্তিশালী শেরশাহের অলৌকিক কীর্ত্তি কলাপ ইতিহাস পাঠকের এমন কি বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দের সুপরিচিত। শাহাবাদের সামান্য জায়গীরদারের পুত্র ফরীদ কিরূপে বিমাতার চক্রান্তে পিতৃগৃহ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ কার্য্যে যোগ্যতা দেখান, কিরূপে স্বহস্তে একাকী এক বাঘ মারিয়া শের খাঁ উপাধি পান, কিরূপে নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে চুণারের কিল্লাদারের বিধবা 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' লাবণ্যবতী লাদমালিকাকে কৌশলে বিবাহ করিয়া বিস্তর অর্থ সহ চুণার দুর্গের অধিকার লাভ করেন, সেই সমস্ত আখ্যায়িকা মুসলমানী ইতিহাসে অলঙ্কার যুক্ত হইয়া অনেক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে (১)। হুমায়ুন বাদশা যখন গুজরাটে বাহাদর শাকে দমন করিতে যাত্রা করেন সেই অবসরে বিহারের আমিরগণকে ছলে কৌশলে নির্জ্জিত বা বশীভূত করিয়া শের দক্ষিণ বিহারে নিজ শক্তি সুদৃঢ় করিয়া গৌড় আক্রমণ করেন। গৌড় বাদশা মহমুদ

(১) Elliot's History of India—vol iv.

হাজিপুরে পলায়ন করিয়া হুমায়ুনের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। শিক্রীগলিতে মোগলের গতি রোধের চেষ্টা, রোহতাস্ দুর্গের হিন্দুরাজা হরেকৃষ্ণের নিকট অনুনয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া শঠতা সাহায্যে ডুলির মধ্যে পরিবারের পরিবর্ত্তে পাঠান সেনা পাঠাইয়া দুর্গ অধিকার, শেষে হুমায়ুনের গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বক্সারের নিকটে মোগল সৈন্যের শেরের হস্তে দুর্দ্দশা, ইত্যাদি বিবরণ পারসী ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

পলায়িত হুমায়ুন বৎসরেক কাল শেরের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযানের উদ্যোগে ব্যাপৃত রহিলেন, শের ইত্যবসরে বঙ্গের বন্দোবস্ত সুস্থির করিয়া পাটনা পার হইয়া পশ্চিমামুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নব বল সংগ্রহ করিয়া হুমায়ূন সদলে কানৌজ পর্য্যন্ত পৌঁছিলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুমায়ূন পুনরায় পরাজিত হইয়া আগ্রায় পলায়ন করিলেন, তথা হইতে সপরিবারে লাহোর, শেষে রাজপুতানার দিকে চলিলেন। শের দিল্লী ও লাহোর প্রদেশ দখল করিয়া বাঙ্গলার বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত ফিরিয়া আসিলেন। পরে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন এবং গোয়ালিয়র দুর্গ ও মালব জয় অত্যল্পকালেই সমাধা হইল। অতঃপর পাঁচ বৎসর কাল রাজপুতগণের সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও অক্লান্তকর্ম্মা শের পূর্ব্বভাগের রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং স্থানে স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার নবজিত রাজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত যে রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়া যান তাহাই বর্ত্তমান Grand Trunk Road এর মূল। এই প্রশস্ত সরণির পার্শ্বে বৃক্ষ, ক্রোশান্তরে কূপ ও সরাই এবং সংবাদ বহনের জন্য স্থানে স্থানে ঘোড়ার ডাক বসান হয়। বড় বড় সরাইগুলিতে দাতব্য অতিথিশালাও স্থাপিত হইয়া সেকালের আদর্শ

রাজার প্রজা রঞ্জনের পদ্ধতি দেখাইয়াছিল। শেরশার সুশাসনে শান্তি এতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যে পথিক ও ব্যবসায়ী দল নির্ভয়ে এই সকল পান্থশালায় নিজ দ্রব্যাদি রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা উপভোগ করিতে পারিত।

শেরশাহের বংশধরদিগের শাসনকালে অন্যতম পাঠান সেনাপতি সোলেমান্ কররাণী বিহারের শাসনকর্ত্তা হন। দুর্ব্বল রাজার অধীনে বিদ্রোহী সেনানীদলের দ্বন্দ্ব কোলাহলের মধ্যে সোলেমান স্বাধীন হইয়া শেষে গৌড় পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইলেন। ইতিপূর্ব্বেই শেরশার বংশের দুর্ব্বল রাজা আদিলের সেনাপতি সুবিখ্যাত হিমুকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ দিল্লীতে পুনরায় মোগল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গ বিহারের পাঠান সামন্তবর্গের অনেকে মহাবল সোলেমান কররাণীর দল পুষ্টি করিতে-ছিল। গৌড়ের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সোলেমান গৌড় হইতে রাজমহল যাইবার পথে টাঁড়ায় দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। আকবর বাদশাহের উদীয়মান রাজশক্তি লক্ষ্য করিয়া চতুর সোলেমান তাঁহার দূতের এবং পরে তাঁহার সেনাপতি মুনেম খাঁর সহিত পাটনায় সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার অধিপতি রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেব আকবর বাদশাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পশ্চিম বঙ্গ আক্রমণ করেন, এবং বর্ত্তমান হুগলী জেলার গঙ্গা ও সরস্বতীর উপরে স্থাপিত সেকালের সর্ব্বপ্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়া লন। সোলেমান কররাণী এই সময়ে আকবরের সেনাপতিদিগের বিহারে উপস্থিত থাকায় দক্ষিণ বঙ্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই। দুই তিন বৎসর পরে (১৫৬৭ খৃঃ) আকবর যখন মেওয়ারে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত, সেই সময়ে অবসর বুঝিয়া

তিনি সদলে উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন। কালাপাহাড়ের অধীনে তাঁহার সৈন্যদল ময়ূরভঞ্জ হইয়া উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হইল,—রাজা সুদৃঢ় কোটসামা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। উড়িষ্যার রাজ-সামন্তদিগের বিদ্রোহে মুকুন্দদেব নিহত হইলে কালাপাহাড় সামন্তদিগকে ক্রমে ক্রমে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। পাণ্ডারা জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ চিল্কা হ্রদের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গহ্বরে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরনারায়ণ রাজা হন (১৬৪০ খৃ)। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজ পূর্ব্বে আহম্ রাজ্য এবং কাছাড় মণিপুর ও ত্রিপুর রাজগণকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সোলে-মান কররাণীর রাজ্যকালে কোচ সেনাদল উত্তর বঙ্গও আক্রমণ করে; কিন্তু অমিততেজা কালাপাহাড় শুক্লধ্বজকে পরাভূত করিয়া তেজপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। এই সময়ে কামাখ্যা মন্দির ধ্বংস করা হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে কররাণীর সেনাদল কোচবিহার আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সোলেমান্ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সোলেমান্ কররাণী গৌড়ের সুবিখ্যাত সোণা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান।

সোলেমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শত্রুর মন্ত্রণায় ঘাতক হস্তে নিহত হইলে দ্বিতীয় পুত্র দায়ুদ গৌড়ের সিংহাসনে অধিরুঢ় হইলেন। গর্ব্বিত দায়ুদ খাঁ পৈতৃক ভাণ্ডারের ধনবল, ৪০ হাজার অশ্বারোহী একলক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতি, ২০ হাজার কামান, ৩৬০০ রণহস্তী প্রস্তুত দেখিয়া মোগলের অধিকৃত বিহার প্রদেশ পুনরধিকারে অগ্রসর হইলেন। শিক্রী গলীর পথ সুরক্ষিত করিয়া তিনি সেনাপতি ও উজীর লোদী খাঁর

অধিনায়কতায় পাটনার দিকে সৈন্য পাঠাইলেন। মোগল সেনাপতি মুনেম্ খাঁর অগ্রগামী সেনাদলের সহিত সামান্য সংঘর্ষের পরে লোদী খাঁ মোগল পক্ষের সহিত এই সন্ধি করিলেন যে দায়ুদ্ খাঁ বাদশাহের অধীনে বিহারে করদ রাজা থাকিবেন, মোগল সৈন্য বিহার ত্যাগ করিয়া যাইবে। দায়ুদ ঐ সময়ে বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া শেষে লোদী খাঁর বিপক্ষ মন্ত্রীদলের পরামর্শে তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিলেন। লোদী বেগতিক বুঝিয়া রোটাস্ দুর্গে আশ্রয় লইয়া মুনেম খাঁর সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। মোগল পাঠানে আবার একটি সামান্য মত যুদ্ধ হইল। এদিকে কতলু খাঁ এবং বাঙ্গালী মন্ত্রী শ্রীহরির পরামর্শে দায়ুদ লোদী খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া নিহত করিলেন (২)। দায়ুদ এই সময়ে কালব্যাজ না করিয়া যুদ্ধোত্তম করিলে মোগল পক্ষকে নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইত; ইতস্ততঃ করিয়া সময় নষ্ট করা হইল। এই সময়ে বঙ্গ বিহার বিজয়ের নিমিত্ত আক্‌বর সুপ্রসিদ্ধ রাজা তোডর মল্লকে অন্যতম সেনাপতি করিয়া এদেশে পাঠাইলেন। মোগলদলের বল সঞ্চয়ে ত্রস্ত হইয়া দায়ুদ পাটনা দুর্গে ফিরিলেন। মোগল সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল। তোডর মল্ল চতুর্দ্দিকের জমিদারবর্গকে মোগল বাদশার অর্থবলে বশীভূত করিয়া শত্রুপক্ষের রসদ বন্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্গ আক্রমণ সহজ হইল না। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে আকবর শা সদলে বিহারে উপনীত হইলেন। পাটনার নিকটে আসিয়া বুঝিলেন, যে সম্মুখে হাজিপুরের দুর্গ অধিকার না করিতে

(২) তবকাৎ—ই, আকবরী। শ্রীহরি বঙ্গজ কায়স্থ। ইনি দায়ুদের প্রিয়পাত্র হওয়ার পরে উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি পান। ইঁহার বিক্রম, মুসলমানী ইতিহাসে যতদূর দেখা যায় তাহাতে কুমন্ত্রণাতেই পর্য্যবসিত। ইঁহারই পুত্র স্বনামধন্য প্রতাপাদিত্য।

পারিলে সুবিধা নাই। ভোজপুরের রাজা গজপতি মোগলের সহকারী হইয়াছিলেন। অন্য সেনানীর সহিত তিনিও হাজিপুর আক্রমণে যোগ দিলেন। পাঠানেরা নৌকাযোগে নদীর মোহানায় বাধা দিলেও স্থলপথে মোগল দলের জয় হইল। হাজিপুর দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পরে দায়ুদ আকবরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আবুল্ ফজল্ লিখিয়াছেন "বাদশা দূতকে বলিলেন, আমরা অল্প লইয়া অনেক দিতে অভ্যস্ত। আমাদের ক্ষমা প্রতিহিংসা চাহেনা। দায়ুদ খাঁ ইচ্ছা করিলে এই ভাবে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে; আমরা উভয়ে দ্বন্দযুদ্ধ করি, ভগবানের ইচ্ছায় যে জিতিবে, সেই রাজ্য পাইবে। সাহসে না কুলায়, তাঁহার দলের এক বাছাই বীর আমার পক্ষের এক জনের সহিত লড়িতে পারে; না হয়, তাঁহার এক বাছাই হাতী আমার এক হাতীর সহিত লড়ুক। আফগান্ কুলাঙ্গার ইহার কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করে নাই!" এই গল্প প্রকৃত হউক বা না হউক, এ দৌত্যে কার্য্যকালে কোন ফল হইল না। পাঁচ পাহাড়ীর উপরে উঠিয়া আকবর একদিন পাটনা দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিপক্ষদলে তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া কামান ছুড়িল; কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছিল। আকবর এক্ষণে দ্বিগুণতর উৎসাহে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে দায়ুদ ভীত হইয়া পুনরায় শ্রীহরির স্মরণ করিলেন। শ্রীহরির পরামর্শে নৌকাযোগে পাটনা ত্যাগই স্থির হইল (৩)। তাঁহার মূল্যবান্ সম্পত্তি ও নগদ টাকা শ্রীহরির নৌকায় থাকিল। কেহ কেহ বলেন, এই সম্পত্তির অনেকাংশ শ্রীহরির নিজের বাটী প্রাচীন যশোহরে পৌছিয়াছিল। যাহা হউক, দায়ুদ ত জলপথে শ্রীহরি করিলেন। সেনাপতি গুজর খাঁ সসৈন্যে স্থলপথে

(৩) তবকাৎ-ই-আকবরী Elliot's Histry vol v.

বাঙ্গলার দিকে চলিলেন। মোগলেরা পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কিছু অনিষ্ট করিল। কথিত আছে, এই সময়ে ৪০০ হস্তী মোগলের হস্তে পড়ে। আকবর স্বয়ং কিছুদূর পর্য্যন্ত আফগান্‌দের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পাটনা জয়ের পরে তিনি রাজধানী চলিলেন।

মুনেম খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া বঙ্গবিজয়ের ভার পাইলেন; রাজা টোডর মল্ল দশসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে রহিলেন। মোগল সৈন্য মুঙ্গের পর্য্যন্ত অধিকার করায় খড়্গপুরের অর্দ্ধস্বাধীন রাজা সংগ্রাম সিংহ এবং গিধোরের রাজা পূরণমল বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন। হিন্দু রাজন্যবর্গকে সহজে আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়েই আকবর টোডর মল্লকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।

দায়ুদ গণ্ডী বা শক্তি গলীর সুদৃঢ় দুর্গ সুদক্ষ সেনানী ইস্‌মাইলের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মোগলদল ভাগলপুর অঞ্চল দখল করিয়া পশ্চিমোত্তরের পার্ব্বত্য পথ দিয়া গলীর সম্মুখে উপনীত হইলেই ইস্‌মাইল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। দায়ুদ টাঁড়া ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামের দিকে চলিলেন; মুনেম খাঁ সদলে সহজেই গৌড় অধিকার করিয়া বসিলেন (৪ঠা জমাদি সানী ৯৮২—১৫৭৫ খৃঃ)। রাজা টোডরমল্ল অশ্বারোহী ও উৎকৃষ্ট একদল সৈন্য সঙ্গে পলায়িত দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবনে নিয়োজিত হইলেন। এই সময়ে দায়ুদের অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড় ঘোড়াঘাটের (রঙ্গপুরের) জায়গীরদার সোলেমান্ মনক্লী খাঁর সহিত যোগে কুচবিহার রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মোগলসেনাপতি মজ্‌নুন্ খাঁ কাকশালান্ ঘোড়াঘাটের দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। সহজে রঙ্গপুর বিজয় সমাধা হয় নাই। কালাপাহাড় প্রভুর সাহায্যার্থ সদলে সপ্তগ্রামের দিকে চলিয়া

আসিলেও ঘোড়াঘাটের আফগান্ দল সম্পত্তি এবং পরিবার বর্গের রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া মোগলদলের বহু লোকক্ষয় করিয়াছিল; কিন্তু শেষে বিপুল মোগল বাহিনী সংখ্যাধিক্যেই জয়লাভ করিল। জায়গীরদার সদলে নিহত হইলে আফগান স্ত্রীলোক বালক মোগলের হস্তে বন্দী হইল। মজনুন্ খাঁ নিজ দলের সেনানী বর্গের মধ্যে ঘোড়াঘাট জায়গীর বিভাগ করিয়া দিলেন এবং জায়গীরদারের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া সেনাদলের অনেককে আফগান্ রমণী বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি দিলেন। বলা বাহুল্য, বহুদিন ধরিয়া প্রবাসে অভ্যস্ত মোগল সৈন্যদলের এই প্রস্তাবে আপত্তি হইল না। কোচবিহার রাজ এই অবসরে মোগলের পক্ষসমর্থন করিলেন। শুক্লধ্বজ সসৈন্যে বাঙ্গলায় আসিয়া গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেন (৪)

এদিকে রাজা টোডরমল্ল বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে মাদারণে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে দায়ুদ খাঁ রীণকসারী গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদিগকে একত্র সমবেত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এবং হুগলী জেলায় ধরপুর গ্রামে সুদৃঢ় মৃৎপ্রাকার নির্ম্মাণ করাইয়া মোগলসেনার গতিরোধের জন্য প্রস্তুত আছেন। রাজা যুদ্ধোদ্যমের মত সৈন্যবল নাই বলিয়া মুনেম্ খাঁর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। মহম্মদ কুলীখাঁর অধীনে দ্বিতীয় সৈন্যদল যতশীঘ্র সম্ভব আসিয়া পাঠান শিবিরের দশ ক্রোশ দূরে সমবেত হইল। এই সময়ে জুনেদ্ খাঁ কররাণী নামক দায়ুদ খাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ঝাড়খণ্ডের পার্ব্বত্য ভূমি হইতে সদলে মোগলের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। দায়ুদ পূর্ব্বে ইহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় ইনি পাঠান শিবির ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে স্বাধীনভাবে মোগলের প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছিলেন। নূতন পাঠান

(৪) Gait's History of Assam. pp. 53-54.

দলের আগমনে মোগল সেনাপতিরা বিব্রত হইলেন ; তাঁহাদের মতেরও একতা ছিল না। রাজা টোডর মল্লের অগ্রগামী সৈন্যদল জুনেদের আফগান্ সেনার সম্মুখে বিনষ্ট প্রায় হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার সমগ্র সেনা লইয়া জুনেদের সহিত যুদ্ধ দিতে গেলেন (৫) পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইলেও অনেকে দায়ুদের দলে যোগ দিয়াছিল।

মোগলদল পুনরায় একত্রিত হইলে দায়ুদ প্রমাণ গণিলেন, এবং হুগলী ছাড়িয়া মেদিনীপুরের দিকে চলিলেন। মোগল সেনা বর্ত্তমান মেদিনীপুর নগরের নিকটে মণ্ডলঘাটে উপনীত হইল। এইস্থানে অন্যতম মোগল সেনাপতি মহম্মদকুলীর মৃত্যু হইলে সেনানীদল নানা-প্রকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। হিন্দুরাজা টোডর মল্লকে অনেকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইত না ; তিনিও বাদশাহ সরকার হইতে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পাইয়া আসেন নাই। কয়েকমাস গোলমালে কাটিল। রাজার পরামর্শে মুনেম্ খাঁর প্রেরিত অর্থ দ্বারাও অনেকের মুখবন্ধ করার উদ্যোগ হইল। মুনেম খাঁ সংবাদ পাইয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানীর অধীনে অপর এক সেনাদল রাজার সহিত যোগে কার্য্য করিবার নিমিত্ত অগ্রে পাঠাইয়া স্বয়ং পশ্চাতে চেতুয়ায় গিয়া মিশিলেন। মোগলদল এক্ষণে সতেজে অগ্রসর হওয়ায় দায়ুদ কটকের দিকে কটক চালনা করিলেন।

সুবর্ণরেখা নদীতীরে জলেশ্বরের অনতিদূরে তুকারুই (মোগলমারী) গ্রামে মোগল-পাঠানে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটন হইল (২০ শে জেলকাদা ৯৮২—৩রা মার্চ্চ ১৭৭৫ খৃঃ) (৬) মোগলের পক্ষে স্বয়ং মুনেম খাঁ খান খানান্ মধ্যভাগের ও রাজা তোডর মল্ল বামপার্শ্বের নেতা ছিলেন।

(৫) Akbarnama Trans—vol III.

(৬) আইন্ ই আকবরী (ইং অনুবাদ Beverige – 3rd v.)

উভয়দলের সৈন্যবল প্রায় সমানই ছিল। পাঠান সেনাপতি বীরবর গুজর খাঁ মধ্যভাগের সৈন্য চালনা করিতেছিলেন। পাঠানরাজের দুই শত হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে পুরোভাগে স্থাপিত হইল,—মত্তহস্তী সাহায্যে মোগলের সুদৃঢ় ঘন সন্নিবিষ্ট ব্যূহভেদ করিয়া আফগান্ অশ্বারোহী দল বিপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করিবে এই কল্পনা ছিল। মুনেম খাঁর ক্ষুদ্র কামান মুখে মত্তহস্তী তাড়িত হইল। কিন্তু আফগান্ অশ্বারোহীদল গুজর খাঁর নেতৃত্বে ক্ষিপ্রতার সহিত ধাবমান হইয়া মোগলের অগ্রসর সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। সেনাপতি মুনেম খাঁ আহত হইলেন ; তাঁহার অশ্ব অশান্ত হইয়া উঠায় তিনি প্রায় বন্দী হন, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে পাঠান দলের অধিনেতা গুজর খাঁ তীরবিদ্ধ হইয়া নিহত হইলেন। অন্য কয়েকজন উৎকৃষ্ট সেনানীও নিহত হওয়ায় দায়ুদ ভয় পাইয়া কটক দুর্গের দিকে পলায়ন করিলেন ; শিবির বিপক্ষদলে লুণ্ঠন করিবে ইহা ভাবিবার অবকাশও হইল না। যুদ্ধে মোগলপক্ষের এত অধিক লোক হতাহত হইয়াছিল যে শত্রুর অনুসরণ অসাধ্য হইল। এই কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রের নাম মোগলমারী হইয়াছে। পরদিন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে থাকিয়া হত লোককে সমাহিত এবং আহতকে পশ্চাতের শিবিরে প্রেরণের ব্যবস্থা চলিল। অতঃপর রাজা টোড়র মল্ল এবং শাহম্ খাঁ শনৈঃ শনৈঃ কটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। মোগল কটক অবরোধের উদ্যোগ করিতেছে, আর উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া দায়ুদ্ খাঁ দূত প্রেরণ করিয়া মুনেম খাঁর নিকট সন্ধি ভিক্ষা করিলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিধানে স্বজাতি নির্ব্বংশ নিষেধ ; বাদশাহের অধীনে পূর্ব্ব রাজ্যের এক অংশে স্বজনসহ শান্তিতে দায়ুদ শা যাহাতে বসতি করিতে পান ইহার ব্যবস্থা করা হউক, দূত এইরূপ প্রস্তাব করিলে

মুনেম খাঁ দায়ুদ শাকে নিজ শিবিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। আগত্যা দায়ুদ আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন। উড়িষ্যা পাঠানকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এই সময়ে কালাপাহাড় মনক্ত্রী আফগান্দলের যোগে ঘোড়াঘাট রঙ্গপুরের মোগল কাকশালদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। মুনেম খাঁ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রাজধানীতে পৌঁছিয়াই সেনাসামন্ত পাঠাইয়া মজনূন কাকশালের সাহায্য করিলে পাঠান পূর্ব্ব দক্ষিণের জঙ্গলভূমিতে তাড়িত হইল। অপর মোগল সেনাপতি মজঃফর সাসেরাম অঞ্চল অধিকার করিয়া বারম্বার ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে পাঠানদলকে নির্জ্জিত করিতেছিলেন। বিহারে হাজিপুরের নিকটে পাঠানকে পরাজিত করিয়া ত্রিহুত অধিকারে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে মুনেম খাঁ তাঁহাকে আগ্রা গমনে আদেশ দিলেন। বিহার দেশে পাঠান দলনে তাঁহার দরবারে সুখ্যাতি হওয়ায় আকবর-শা তাঁহাকে সমগ্র বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

মুনেম খাঁ গৌড় পরিদর্শনে গিয়া নগরের অবস্থান এবং সৌধমালা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সেই স্থানেই রাজধানী করা মনস্থ করিলেন। বর্ষার সময়েই রাজকীয় আদালত ও সৈন্য সামন্ত গৌড়ে নীত হইল। বর্ষাপগমে প্রাচীন গৌড়ে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইল। গঙ্গা কিছু সরিয়া যাওয়ায় বিলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জল বায়ু পূর্ব্বে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল। এক্ষণে বহুলোক সমাগমে মড়ক পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল (১)। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে

(১) আইন আকবরী ও আকবর নামার বিবরণী হইতে এই মারীভয় কিরূপ, প্লেগ না জ্বর পীড়া, বুঝা যায় না। প্রাচীন অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহুতর লোক সমাগমে

লাগিল। শেষে কবর দিবার বা দাহ করিবার লোকাভাব হওয়ায় শবদেহ গঙ্গার বিলে ফেলিয়া দেওয়া চলিল। বহুতর মোগল কর্ম্মচারী মারা গেল। মাসাধিক কালে জনপূর্ণ রাজধানী মহাশ্মশানে পরিণত হইল। মুনেম খাঁ রাজধানী পরিবর্ত্তন অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, মনে করিতেছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন জুনৈদ খাঁ কররাণী সদলে বিহারের দক্ষিণ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। তিনি গৌড় ত্যাগ করিয়া সেনাদলের অগ্রভাগ সহ টাঁড়ায় পৌছিয়া মারা গেলেন। মারীভয়ের বীজ সঙ্গেই আনিয়াছিলেন।

মোগল প্রতিনিধির মৃত্যু ও মোগল দলের দুরবস্থায় সংবাদ পাইয়া দায়ুদ খাঁ সমুত্থিত আফগান দলকে একত্রিত করিয়া শত্রু দলনে অগ্রসর হইলেন। ভদ্রকের মোগল সেনানীকে পরাভূত করিয়া দায়ুদের দল বাঙ্গলার সীমানায় পৌঁছিলে অন্যান্য আফগান সামন্তেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে মোগল সেনা পাটনার দিকে তাড়িত হইল। মুনেম খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আকবর শা হোসেনকুলী খাঁজাহানকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা করিয়া তাঁহার সহিত রাজা টোডর মল্লকে বিদ্রোহ দমনে পুনরায় বঙ্গে পাঠাইলেন। শিক্রিগলী রক্ষক মোগল সামন্তকে উৎখাত করিয়া দায়ুদের দল যখন আগমহলের (বর্ত্তমান রাজমহল) নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময়ে খাঁজাহান্ তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বিহার হইতে মজঃফর খাঁ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন; এই সময়ে রোহতস্ দুর্গও মোগলের হস্তচ্যুত হইল। দায়ুদ খাঁ দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী রাখিয়া এক উপযুক্ত স্থানেই সমর সজ্জা করিলেন।

ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্লেগের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভব। 'গৌড় গোর হইল' বলিয়া ঐতিহাসিক নিস্তব্ধ।

কয়েক মাস ধরিয়া মোগল পাঠান উভয় পক্ষ প্রায় সম্মুখীন হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয় দলেই চতুর্দ্দিক হইতে নূতন সেনা আসিয়া বলবৃদ্ধি করিল। মোগল পক্ষে পাটনার দিক হইতে নূতন কামানও আসিল। পাঠান পক্ষে জুনৈদ খাঁ ও কালাপাহাড় দুই পার্শ্বে সৈন্য চালনা করিতেছিলেন; মোগল আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবল পীড়নে দুই অধিনায়কের সেনাদলই সন্ত্রস্ত হইল। দুই জনেই গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইলেন (৮)। অন্যান্য অনেক সেনানী হতাহত হইলে পলায়নপর দায়ুদ্ ধৃত হইয়া মোগল সেনাপতির শিবিরে নীত হইলেন। বিদ্রোহ অপরাধে তাঁহার শিরশ্ছেদ দণ্ড হইল। আকবর বাদশা বঙ্গবিহারে বিষম গোল শুনিয়া স্বয়ং সদলে ফতেপুর শিক্রী হইতে গৌড়াভিমুখে চলিয়াছেন, পথে সেকালের নিয়মে দায়ুদের ছিন্ন শির তাঁহার সমীপে উপহার আসিল (৯)। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (৯৮৪ হিঃ—১৫৭৬ খৃঃ)। বঙ্গে পাঠান শাসন শেষ হইল; কিন্তু পাঠান দলনের অনেক বিলম্ব রহিল।

রাজমহলের যুদ্ধের পরে হোসেনকুলী খাঁজাহান্ হস্তী ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি মহা সমারোহে রাজা টোডর মল্লের সঙ্গে বাদশাহের সমীপে পাঠাইয়া মজঃফর খাঁর অধীন সৈন্যদলকে বিহারের পাঠানগণকে নির্জ্জিত করিবার জন্য রাখিয়া স্বয়ং সপ্তগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় আফগান সেনানীদিগকে দূরীভূত করিয়া দায়ুদের

(৮) আকবর নামার মতে কালাপাহাড় আহত হইয়া পলায়ন করেন। অন্য এক যুদ্ধে মারা যান।

(৯) আকবর নামা—ইং অনুবাদ। শত্রুর মস্তক কাটিয়া উপহার প্রেরণ মোগল পক্ষের নিয়ম। মোগলমারীর যুদ্ধের পরে বন্দীদিগের শিরশ্ছেদ করিয়া মিনার সাজাইবার কথা ও আছে।

পরিবারবর্গকে বন্দী করিলেন। এক দল সৈন্য উড়িষ্যার দিকে পাঠান তাড়াইবার নিমিত্ত এবং অপরদল উত্তরাঞ্চলে প্রেরিত হইল। কুচবেহার রাজ মোগলের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে পাঠানেরা প্রবল রহিল। খাঁজাহানের দুই বৎসর শাসন কালের মধ্যে সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যার উত্তর ভাগ হইতে পাঠানেরা তাড়িত হইল। মজঃফর খাঁ রোহতস্ দুর্গ জয় করিলে পাঠান পুনরায় ঝাড়খণ্ডের দিকে সরিয়া পড়িল। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে মজঃফর খাঁ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন; কিন্তু এই সময় হইতে আকবর স্বতন্ত্র ভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য এক দেওয়ান্ এবং প্রধান বিচারপতি দিল্লী হইতে নিয়োজিত করিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান্ রাজস্ব বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া সুবাদারের আবশ্যক মত টাকা তাঁহাকে দিয়া অবশিষ্ট বাদশাহ সরকারে পাঠাইবেন, এই নিয়ম হইল। মজঃফর খাঁ এই বৎসরেই পাঁচলক্ষ টাকা পাঠাইয়া বাঙ্গলা সুবার খাজানা চালান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সঙ্গে উপঢৌকন স্বরূপে কয়েকটা হস্তী ও বাঙ্গলার শিল্পজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদিও প্রেরিত হইল।

মোগল বংশের পূর্ব্ব প্রথামত মুনেম খাঁ বঙ্গে জায়গীরদারের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আফগান্ জায়গীরদারদিগের স্থানে নূতন লোক প্রতিষ্ঠা সহজও ছিল,—তদ্ভিন্ন প্রত্যন্তভাগে কয়েকজন সেনানীকে জায়গীর প্রদত্ত হইয়াছিল। এখন বাদশাহের আদেশে জায়গীরদারগণের নিকট তাঁহাদের অধীন সেনাদলের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এবং সৈন্যের ব্যয় বাদে বাকী টাকার তলপ দেওয়া হইল। এই সমস্ত জায়গীর পরিবর্ত্তনের কথাও উঠিল; কারণ সেনানীবর্গ একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিলে গোল উঠিতে পারে। মোগল জায়গীরদারবর্গ এই আদেশ প্রচারে আতঙ্কিত হইলেন। উত্তরে ঘোড়াঘাট

রঙ্গপুরে কাকশালান্ দলপতি বাবা খাঁ এবং দক্ষিণে বালেশ্বরের নূতন জায়গীরদার খালেদীই প্রথমে মাথা নাড়িলেন ; ক্রমে অন্য দুই চারি জন তাঁহাদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। শেষে বাবা খাঁ নেতা হইয়া বরেন্দ্র হইতে গৌড় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময়ে বিহারের জায়গীরদারেরাও বাদশাহী আদেশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া মাসুম কাবুলীকে নেতা করিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। আকবর শা প্রথমে দান ও ভেদ নীতির প্রয়োগ উপযুক্ত বোধ করিয়া আদেশ পাঠাইলেন, সুবাদারের কঠোর ব্যবহার সঙ্গত হয় নাই, কাকশালান্‌গণ সরকারের চিরদিনের হিতাকাঙ্ক্ষী,—বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাহাদের অপরাধ গ্রহণ করা হইবে না। মজঃফর ইতিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম কূল রক্ষার উদ্যোগে ছিলেন। বাদশাহী আদেশ বিদ্রোহী দলে জ্ঞাপন করিলে তাহারা ছল করিয়া রাজস্ব দেওয়ান্ এবং তন্‌খা দেওয়ানকে নিকটে আনাইয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিল এবং নূতন সর্ত্তের প্রস্তাব করিল। ইতিমধ্যে বিহারের বিদ্রোহী-দল তেলিয়াগড়ী হইতে বাদশাহী ফৌজ তাড়াইয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলে সকলে একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিল। রাজধানী টাঁড়া রক্ষা অসাধ্য হইল। মজঃফর আত্মসমর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ নিহত হইলেন। রাজবন্দীদিগের মধ্যে সৈফউদ্দীন্‌কে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া বঙ্গ বিহারের বিদ্রোহী মোগল সামন্তেরা কিয়ৎকাল যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল।

এই সমস্ত সংবাদ আগ্রায় বাদশার নিকট পৌঁছিলে, কেবল মোগল সেনাপতি নিয়োগ নিরাপদ নহে, হিন্দু জমিদার ও প্রজাবর্গকে স্বপক্ষে আনয়ন আবশ্যক, এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিচক্ষণ আকবর শাহ রাজা টোডরমল্লকে শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতিপদে বরণ করিয়া

বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাঞ্চলে পাঠাইলেন। সমগ্র শাসকবৃন্দ, জায়গীরদার ও জমিদারবর্গের উপর পরোয়ানা জারি করিয়া বিদ্রোহ-দমনে সকলকে স্বপক্ষে আনয়নের ভারও রাজার উপর ন্যস্ত হইল। রাজা জৌনপুরে উপনীত হইলে তথাকার শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি মাসুম ফারংখুদী তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ যোগ দিতে প্রস্তুত হইলেন। গর্ব্বিত তরুণবয়স্ক মাসুমের দ্বারা বিশেষ কোন্ সহায়তা হইবে না জানিয়াও পশ্চাতে ঐরূপ সৈন্যদল রাখিয়া যাওয়া নিরাপদ নহে ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইল এবং চাতুরী করিয়া তাহাকে একটু বাড়াইয়া অনুগত করিয়া লইবার চেষ্টাও করিলেন।

রাজা টোডরমল্ল নির্ব্বিঘ্নে মুঙ্গের পর্য্যন্ত আসিলেন (১৫৮০ খৃঃ)। ভাগলপুরের নিকটে ৩০ হাজার বিদ্রোহী সেনা সমবেত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া মুঙ্গেরের পশ্চিমে পাহাড় পর্য্যন্ত স্থান গড়বন্দী করিয়া সৈন্য সংস্থাপন করাই পরামর্শ হইল। কয়েকদিন মধ্যেই বাদশাহী দলের দুইজন সেনানী বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দিল ; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল নানা কৌশলে এবং নগদ অর্থ দিয়া হিন্দু জমিদারবর্গের নিকট স্বয়ং রসদ সংগ্রহ ও বিদ্রোহীদল যাহাতে উপযুক্ত রসদ না পায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বিদ্রোহী সেনাপতিরা তিন দিকে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাইতে বাধ্য হইল। মাসুম কাবুলী বিহারের দিকে যাত্রা করিলে রাজা পাটনা রক্ষার নিমিত্ত একদল সৈন্য পূর্ব্বেই পাঠাইয়া স্বয়ং অপর সেনাসহ সত্বর অগ্রসর হইলেন। একটি যুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পুনরায় বাঙ্গলার দিকে ফিরিল ; রাজা বর্ষাকালে হাজিপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই সময়ে আজাম্ খাঁ বাদশাহ দরবার হইতে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ফারুংখুদী অযোধ্যায় বদলী হইয়া বিদ্রোহী হওয়ায় রাজা টোডরমল্লের প্রেরিত শাহবাজ খাঁর

অধীন সেনাদল এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তাকে দমন করিয়া অযোধ্যার বিদ্রোহ দলন করিল (১৫৮১ খৃঃ)। আজাম খাঁ সদয় ব্যবহারে বিদ্রোহী দলকে বাদশাহের পক্ষে লওয়ান বিফল দেখিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের সমগ্র অবস্থা জ্ঞাপন জন্য বাদশাহের নিকট গেলেন। এই সময়ে গুজরাটে বিদ্রোহ চলিতেছিল, আকবরের ভ্রাতা হাকিম কাবুল হইতে পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। বঙ্গ বিহারে দুইজন কর্ত্তা থাকিলে বিভক্তকর্তৃত্বে বিদ্রোহের শান্তি অসম্ভব দেখিয়া রাজা টোডরমল্লকে পশ্চিমাঞ্চলে কার্য্য দিয়া বাদশা আজাম্ খাঁকেই বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিলেন। আজাম খাঁ আকবরের ধাত্রীপুত্র,—তাঁহার নাম আজিজ (১০)। সদয় ব্যবহারে এবং উৎকোচাদির প্রয়োগে তিনি অল্পদিন মধ্যেই কাকশালান্ দিগকে বশীভূত করিলেন। মাসুম কাবুলীর দলও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। টাঁড়া অধিকারের কিছুদিন পরেই এদেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে লক্ষ্য করিয়া আজাম অচিরে বিদায় পাইবার প্রার্থনা করিলেন।

মোগল সেনানীগণের বিদ্রোহের অবকাশে ছত্রভঙ্গ পাঠানদল পুনরায় কতলু খাঁর অধীনে সমবেত হইল। উড়িষ্যার উত্তরাংশ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্দ্ধমান অধিকার করিতে বিলম্ব হইল না। দামোদর নদ এখন মোগল পাঠানের অধিকারের সীমাসূচক ব্যবধান হইল। আজাম্ খাঁ পাঠানের বিরুদ্ধে যে সেনাপতিকে পাঠাইলেন, তিনি সৈন্যবল যথেষ্ট নহে বলিয়া সন্ধির নিমিত্ত পাঠান-শিবিরে দূত পাঠাইলেন; সন্ধির কিছুই হইল না।

(১০) আকবর বলিতেন 'আজিজ ও আমার মধ্যে এক দুধের নদী আছে, উহা পার হওয়া যায় না'।

সামান্য দুই একটি যুদ্ধের পরে উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কতলু খাঁর সহিত সন্ধি হয়।

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান ভৌমিক ইসা খাঁ মসনদ আলি (১১) অন্য দুই একজন পাঠান সামন্তের সাহায্যে মোগলের অধীনতা অস্বীকার করেন। মাসুম খাঁ কাবুলী ভাটি অঞ্চলে গিয়া ইসা খাঁর আশ্রয় লন। মোগল শাসনকর্ত্তা শাহবাজ খাঁ সদলে খিজিরপুরের নিকট খন্না পার হইয়া ইসার অনুপস্থিতে সোনার গাঁ অধিকার করিলেন। কাতরাপুর প্রভৃতি দখল করিয়া মোগলদল ব্রহ্মপুত্রের ধারে শিবির সন্নিবেশ করিল। মাসুম খাঁ ভাওয়ালের দিকে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ইসা খাঁ কুচবিহার অঞ্চল হইতে সৈন্যসম্ভার সহ আসিয়া পড়ায় অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। ভাওয়ালের দিক্ হইতে নদীর তীরে অন্যতম মোগল সেনানী তার্সুন্ খাঁ মাসুমের দ্বারায় পরাভূত হইলেন। ব্রহ্মপুত্রের উচ্চ বাঁধ কাটিয়া দিয়া মোগল শিবিরের এক অংশ প্লাবিত করা হইল। তখন শাহবাজ ইসার সহিত মিটমাট করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের দলে মতান্তর ঘটিল। শাহবাজ টাঁড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি আগরায় ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে বাদশাহের আদেশ আসিল, শীঘ্র ফিরিয়া বিদ্রোহ দমন করুন; অন্যান্য সৈন্যদল তাঁহার সহিত যোগ দিবে। শাহবাজ পূর্ব্ববঙ্গে চলিলেন। সেরপুরের নিকট হইতে মাসুম খাঁকে দূরীভূত করিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু সতর্ক ইসা খাঁ নিজ অধিকারে জল জঙ্গলের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিলেন। শেষে মোগল বাদশাকে

(১১) আবুল ফজল্ ইহাঁকে 'মর্জবান্ ই ভাটি' উপাধিতে নির্দ্দেশ করেন। ইসাখাঁ ও অন্যান্য ভৌমিকদের বিষয় পরে বলা হইবে।

উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া মিটমাট করিলেন। মাসুম মক্কা গমন স্থির করিয়া নিজ পুত্রকে বাদশাহ সমীপে পাঠাইয়া ক্ষমা চাহিলেন। (১২)

শাহবাজের পরে অস্থায়ী মোগল শাসনকর্ত্তা উজির খাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাজা মানসিংহ বাঙ্গলা বিহারের সুবাদার হইয়া আসিলেন। প্রথমেই তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ ঘোড়াঘাট অঞ্চলের মোগল সামন্তগণকে দমন করিয়া যশস্বী হইলেন। বাঙ্গলার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মানসিংহ বিহারেই রহিলেন; সইদ্ খাঁ ডেপুটী স্বরূপে বাঙ্গলার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বিহারের দুই এক জন অশান্ত জমিদারকে দমন করিয়া মানসিংহ পাঠানের হস্ত হইতে উড়িষ্যা কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। আফগানেরা দক্ষিণ বাঙ্গলার অধিকার একবারে ত্যাগ করে নাই। রাজা ঝাড়খণ্ড হইয়া অগ্রসর হওয়া স্থির করিয়া সইদ্ খাঁকে সদলে বর্দ্ধমানের দিকে সৈন্য চালনার নিমিত্ত লিখিলেন। সইদ্ বর্ষা আগত জানাইয়া ইতস্ততঃ আরম্ভ করিলেন। মানসিংহ বর্দ্ধমান পার হইয়া জাহানাবাদে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু কতলু খাঁর দল তাহার ২৫ ক্রোশ দূরে ধরপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, এবং বাহাদুর খাঁর অধীনে একদল পাঠান অগ্রে আসিতেছে সংবাদ পাইয়া মানসিংহ জগৎসিংহের অধীনে একদল সেনা পুরোভাগে প্রেরণ করিলেন। বাহাদুর রায়পুর দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়া সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন, এ দিকে কতলু খাঁর নিকট সাহায্য চাহিলেন। অপর পাঠান সেনাদল আসিয়া উপস্থিত হইলেও জগৎসিংহ সতর্ক হইলেন না। শেষে পাঠানের আক্রমণে পরাস্ত হইয়া শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়নে বাধ্য হইলেন। বিষ্ণুপুরের জমিদার হাম্বির পূর্ব্বেই কুমারকে সতর্ক করিয়াছিলেন; এক্ষণে

(১২) আকবর নামা—Elliot—vol. V, I.

তাঁহারই আনুকূল্যে প্রাণরক্ষা হইল। বিষ্ণুপুর-রাজ তাঁহাকে নিজের বাড়ী লইয়া গেলেন (১৩)। মানসিংহ পুত্রের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া সেনানী দিগকে লইয়া পরামর্শে কর্ত্তব্য স্থির করিবার ইচ্ছা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, সলিমাবাদে ফিরিয়া সৈন্য সমবেত করা হউক। মানসিংহ ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হওয়াই সৎযুক্তি মনে করিলেন। বাদশাহের সৌভাগ্য তাঁহার সহায় হইল। কতলু খাঁ দশ দিনের পীড়ায় মারা গেলেন। আফগানেরা সন্ধির প্রার্থনা করিল। মোগল বাদশার নামে খোৎবা চালাইবে ও মুদ্রা প্রস্তুত করিবে স্বীকার করিল। জগন্নাথ ক্ষেত্র পুরী ছাড়িয়া দিবে এবং জমিদার বর্গের উপর উৎপাত করিবে না,—অবশিষ্ট উড়িষ্যায় তাহাদের অধিকার থাকিবে, এইরূপ মীমাংসা করিয়া মানসিংহ বিহারে ফিরিলেন।

কতলু খাঁর মন্ত্রী ইশা খাঁ লোহানীর জীবিতকালে পাঠানেরা সন্ধি ভঙ্গ করে নাই। কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে আবার উহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। জগন্নাথক্ষেত্র পুরী দখল করিয়া বসিল এবং হাম্বিরের অধিকৃত বিষ্ণুপুরের দক্ষিণভাগ লুণ্ঠন করিল। রাজা মানসিংহ এক্ষণে বঙ্গ বিহারের সমগ্র সৈন্য একত্রিত করিয়া পাঠান দলনের সঙ্কল্প করিলেন। সইদ্ খাঁ পীড়িত ছিলেন; সারিয়া উঠিয়া সার্দ্ধ ষষ্ঠসহস্র অশ্বারোহী সহ রাজার দলে যোগ দিলেন। শত্রুদল মেদিনীপুরের জঙ্গলের মধ্যে ছিল। মোগল সৈন্য অগ্রসর হইলে উহারা সুবর্ণরেখা পার হইয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। সম্মুখে হস্তী সাজাইয়া যুদ্ধোদ্যম চিরদিনই পাঠানের প্রতিকূল হইয়াছে। এবারেও কামানমুখে হস্তী নিজের দল ভেদ করিয়াই পলাইল।

(১৩) আকবরনামা Elliot. আফ্‌গানেরা জগৎসিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে এই সংবাদ কয়েকদিন প্রচারিত হইয়াছিল।

পাঠানেরা প্রাণপণে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিলেও মোগলদের সংখ্যাধিক্যে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিতে পারিল না। সমস্ত দিন যুদ্ধের পরে, যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। মোগলদল পশ্চাৎ ধাবন করিয়া কটক দুর্গ অবরোধ করিল। শেষে কটকের জমিদার রামচন্দ্রের প্রার্থনায় পাঠানেরা সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিবে ও রামচন্দ্র নিয়মিত রাজকর দিবেন, স্বীকারে সন্ধি হইল; পাঠানগণকে খলিফা-বাদে জায়গীর দেওয়া হইল।

মানসিংহ বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাঠানদের নিকট গৃহীত ১২০ টি রণহস্তী বাদশাহের নিকট উপহার পাঠাইলেন। বাঙ্গলা বিহারের শাসন ভার সম্পূর্ণভাবে স্বহস্তে রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই সময়ে আগ্‌মহলের দুর্গ সংস্কার করাইয়া তন্মধ্যে নিজ প্রাসাদ নির্ম্মিত করিলেন। এই সময় হইতে উহার নাম হইল রাজমহল। মুসল-মানেরা পরে বাদশাহের নামে উহার নাম রাখিল 'আকবর নগর'। রাজমহল কিয়ৎকাল বাঙ্গলার সুবাদারের রাজধানী ছিল। কটকের জমিদার রামচন্দ্র অঙ্গীকৃত রাজস্ব না দেওয়ায় পরবর্ষে (১৫৯২ খৃঃ) কুমার জগৎসিংহ কটক অঞ্চলে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে পাঠানদের উপর কর আদায় লইয়া কিছু অত্যাচার হইয়াছিল। কুমার সদলে কটক অঞ্চলে ছিলেন, সেই সময়ে পাঠানেরা পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া বঙ্গে প্রবেশ করিল, অগ্রগামী একদল পাঠান আসিয়া সপ্তগ্রাম বন্দর লুণ্ঠন করিয়া হুলস্থুল বাধাইয়া দিল। রাজা মানসিংহ আবার সদলে আসিলেন; কিন্তু পাঠান দিগকে অধিক উত্যক্ত করা নীতি বিরুদ্ধ ভাবিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট জায়গীর ছাড়িয়া দিয়া এবং জমিদার রামচন্দ্র ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁহার সহিত মিট মাট করিয়া কিছু

দিনের জন্য শান্তি স্থাপনা করিলেন। পরবর্ষে রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় জাহাঙ্গীরের পুত্র বালক খসরু নামে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার পাঁচহাজারী মনসব্‌দারীর ব্যয় স্বরূপ উড়িষ্যার রাজকর হইতে কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল; রাজা তাঁহার ডেপুটী স্বরূপ রহিলেন। রাজা মানসিংহ অতঃপর বাদশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্দ্ধিত সম্মান লইয়া বঙ্গে প্রত্যাগমন করিলেন। কুচবিহার রাজ এই সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মোগল বাদশার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কুচ বিহারে ফিরিয়া গেলে রাজগণ ও অমাত্যবর্গ তাহার প্রতিকূল হইয়া তাঁহাকে বন্দীভূত করিল। মানসিংহ জেহাজ খাঁ নামক সেনানীর অধীনে মোগল সেনা পাঠাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া স্বপদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। (১৪)

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে আকবর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রার জন্য রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলা হইতে যতদূর সম্ভব সৈন্য লইয়া যাইতে আদেশ দেন। রাজার প্রস্থানের পরেই আফগানেরা দলে দলে ওসমান খাঁর (১৫) অধীনে সমবেত হইয়া বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইল। রাজার প্রতিনিধি মহা সিংহ ও প্রতাপ সিংহ ভদ্রকে পাঠানের হস্তে সম্পূর্ণ নির্জ্জিত হইলেন (১৬)। পাঠানেরা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। এই সমস্ত সংবাদ আজমীরে রাজা মানসিংহের নিকট পৌঁছিলে তিনি

---

(১৪) Stewart—History of Bengal.

(১৫) ষ্টুয়ার্টের নির্দ্দেশ মতে ওসমান কুতলু খাঁর পুত্র। কিন্তু অন্য মতে ইনি অমাত্য ঈশা খাঁ লোহানীর পুত্র।

(১৬) আকবর নামা—Elliot vol vi. ষ্টুয়ার্ট ভ্রমে 'মোহন সিং' লিখিয়াছেন।

যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ত্বরিতপদে বাঙ্গলার দিকে আসিলেন। রোসাটের নিকটে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পলায়িত মোগলদল একত্রিত করিয়া লইয়া মানসিংহ বাঙ্গলার সীমান্তে উপনীত হইলেন। সেরপুর আতাইএর নিকটে সুসজ্জিত আফগান দলের সহিত মোগলের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। আবার পুরোভাগের হস্তী পাঠানের বৈরী হইল। রাজপুত ও মোগল দলের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পাঠান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। যুদ্ধ জয়ের পরে মানসিংহ বাদশাহের নিকটে গিয়া সাত হাজারী মন্‌সবদারী পাইয়া সসম্মানে বঙ্গে প্রত্যাগমন করিলেন। আরও তিন বৎসর এদেশে থাকিয়া শান্তি স্থাপন করিয়া মানসিংহ বাদশাহের সম্মতিক্রমে কার্য্য ত্যাগ করিয়া আগ্রায় দরবারে রহিলেন। তৎপরে আকবর শার মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর পুনরায় তাঁহাকে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গে প্রেরণ করেন। ওস্‌মানের দল আর একবার মস্তকোত্তলন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বাদশাহী থানাদার বাজ বাহাদুরকে তাড়াইয়া দেয়। মানসিংহ পুনরায় পাঠান দলন করিয়া পরে জমিদার গণের বিদ্রোহ দমন করেন।

পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী ও আরাকানের মগের মধ্যে যখন দক্ষিণ বঙ্গে যুদ্ধ কলহ চলিতেছিল, সেই সময়ে সুবিধা বুঝিয়া আফগানেরা পুনরায় ওস্‌মান্ খাঁর নেতৃত্বে উত্থিত হইয়াছিল (১৭)। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে

(১৭) ষ্টুয়ার্টের মতে এই আফগান্ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ উড়িষ্যায় ঘটিয়াছিল। Blochmann ঢাকা হইতে শত ক্রোশ দূরে এক মোগল পাঠান যুদ্ধের কথা বলেন, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এই যুদ্ধের অন্যতম মোগল সেনানী মির্জা হসনের আত্মকাহিনী হইতে দেখাইয়াছেন যে যুদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা ও শ্রীহট্টের মধ্য সীমানায় দৌলম্বাপুরে হইয়াছিল।

মোগল শাসনকর্ত্তা ইস্‌লাম খাঁ সুজাৎ খাঁ নামক সেনানায়ককে ওস্‌মানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধের পরে আফগানেরা পরাজিত হয়। ওসমান সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া সন্ধ্যার সময় মারা যান। তাঁহার ভ্রাতাও পুত্র বাদশার বশ্যতা স্বীকার করিয়া মুক্তি পায় এবং এই সময় অবধি অগত্যা পাঠানেরা শান্তভাব ধারণ করে। মোগল-পাঠান এখনও বাঙ্গলার স্থানে স্থানে ক্রীড়াপটে বিরাজমান। ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে এই ক্রীড়ায় সমগ্র বঙ্গ অন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম দক্ষিণ বাঙ্গলা রসদ যোগাইতেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল; ইহার উপরে বিপ্লবে অবশ্যম্ভাবী দস্যুদলের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়া লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জমিদার ও মগ ফিরিঙ্গী।

মোগল পাঠান বিপ্লবের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ এবং সুন্দরবন অঞ্চল বার ভুঁইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়াছিল। ফার্ণাণ্ডেজ ডুজারিক প্রমুখ পর্ত্তুগীজ জেস্যুইট পাদরীদিগের লিখিত বিবরণীতে বার ভুঁইয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে প্রধান রাজার অধীন আট বা বার জন সামন্তকে লইয়া একটি মণ্ডল গঠিত হইত (১)। কালে হয়ত বার জন সামন্ত থাকার প্রথাই প্রচলিত হইয়াছিল। পাল রাজগণের শাসন সময়ে বাঙ্গলায় এইরূপ বার ভুঁইয়া ছিল, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য গুলিতে পাওয়া যায় (২)। তৎপরবর্ত্তী কালের এই বার ভুঁইয়ার কথা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় বিশেষ ফল নাই। মোগল আক্রমণের সমকালেই জেস্যুইট্ পাদরীরা এদেশে আসিয়া নিম্নবঙ্গে রাজার তুল্য ক্ষমতাশালী দ্বাদশ ভৌমিকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন; পার্চাসের ভ্রমণবৃত্তেও ঐরূপ কথা আছে। পর্ত্তুগীজ পাদরীরা লিখিয়াছেন, ভুঁইয়াদের মধ্যে তিনজন হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান; শ্রীপুর, বাক্‌লা (চন্দ্রদ্বীপ) ও চণ্ডিক্যান্—এই তিনের অধিপতি হিন্দু ভুঁইয়া।

(১) মনু সংহিতা—৭ম অধ্যায়।

(২) 'বারভুঞা বসে আছে বুকে দিয়া ঢাল' মাণিক গাঙ্গুলী। 'গজপৃষ্ঠে নৃপতি বেষ্টিত বারভুঞা।—ঘনরাম।

চণ্ডিক্যান্ লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইলেও পূর্ব্বে চাঁদ খাঁর জায়গীর ছিল বলিয়া সুন্দরবন অঞ্চলই বিদেশী পর্য্যাটকের বিকৃত উচ্চারণে ঐ নাম পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ডুজারিক লিখিয়াছেন—'মোগলেরা ইহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেও ইহারা আবার স্বাধীন হইয়াছে। ইহারাই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যাধিপতি; কিন্তু ভুঁইয়া নামে অভিহিত। সমস্ত পাঠান ও বাঙ্গালীরা ইহাদের অধীনতা স্বীকার করে'। (৩)

জেস্যুইট্ পাদরীরা সোণার গাঁ অঞ্চলের পূর্ব্ব কথিত ইশা খাঁকেই প্রধান ভুঁইয়া বলিয়াছেন; অন্য মুসলমান ভুঁইয়ার নাম পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, ইশা খাঁর পিতা রাজপুত বংশীয় হিন্দু। বাল্যে ইঁহারা দুই সহোদরে দাস স্বরূপে বিক্রীত হইয়া বিদেশে নীত হন এবং পরে ইঁহার মাতুল ইঁহাকে বাঙ্গলায় লইয়া আসেন। ইশা নিজ প্রতিভাবলে ক্রমে সুবর্ণগ্রাম খিজিরপুরের জমিদারী লাভ করেন। মোগল-পাঠান বিপ্লবের কালে অন্য জমিদার দিগকে আয়ত্ত করিয়া তিনি সমগ্র ভাটি বা পূর্ব্ব বঙ্গের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। খিজিরপুরের মধ্যে কাটরা পুর তাঁহার রাজধানী ছিল। (৪)। মাসুম খাঁ কাবুলী ইঁহার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। খাঁজাহানের সময়ে ইশা নামে মাত্র মোগলের প্রভুশক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। মোগল সেনানীগণের বিদ্রোহাচরণে সুবিধা পাইয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ব্যবহার আরম্ভ করেন।

(৩) প্রতাপাদিত্য—শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়।

(৪) Akbarnama—Elliot vol. vi. আকবর নামায় '১২জন জমিদারকে ইশা খাঁ নিজ অধীন করেন' লেখা আছে। জেস্যুইট পাদরীরা কাটরাপুরের স্থানে 'কত্রাভু' করিয়াছেন।

কুচবিহার রাজ পর্য্যন্ত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাঁহার অধিকারে জল জঙ্গল অধিক থাকায় সহজে শত্রু পক্ষ তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত না। কথিত আছে যে পার্শ্ববর্ত্তী বিক্রমপুর শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের (কোন মতে কেদার রায়ের) বিধবা কন্যা সোণামণিকে বল ও কৌশলে আনাইয়া ইশা খাঁ তাহাকে বিবাহ করেন। এই চাঁদ ও কেদার রায় শ্রীপুরের ভুঁইয়া। চাঁদ রায় এই অপমানের পরে ইশা খাঁকে নির্য্যাতন করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষোভে কালগ্রাসে নিপতিত হন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পরে সোণাবিবি মগ দিগের আক্রমণ হইতে দেশ ও আত্ম রক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই প্রবাদ ও চলিত আছে।

শ্রীপুরের কেদার রায় ও দুর্দ্ধর্ষ ভৌমিক ছিলেন। বিক্রমপুরের চতুর্দ্দিকে বহুতর নদী থাকায় বিপ্লবের অবকাশে শক্তি সঞ্চয় ও স্বাধীনতা অবলম্বন অনেকটা সহজও ছিল। ইশা খাঁর অধিকার আক্রমণ ব্যাপারে নিষ্ফল হইলেও কেদার রায়ের পক্ষে সে সময়ের সুবিধায় মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করা কঠিন হয় নাই। তাঁহার অনেক-গুলি কোষা রণতরী ছিল। নৌসৈন্য চালনার জন্য তিনি অনেক পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী ও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া তখন গোলযোগ চলিতেছিল। মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া প্রচারিত হইলেও আরাকানের মগ ও পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীর মধ্যে উহার স্বামিত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব হইত। কেদার রায় এই সুযোগে সনদ্বীপ নিজ অধিকারে আনয়নের উদ্যোগ করিলেন। কার্ভালো নামক পর্ত্তুগীজের অধীনে অনেক রণতরী পাঠাইয়া কেদার রায় একবার সনদ্বীপ দখল করিলেন। কিন্তু কার্ভালো অচিরে মগ ও মোগলদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ

হইলে বঙ্গোপসাগরের পর্ত্তুগীজ দলপতি মাটুম্ চারিশত সৈন্য সঙ্গে আনিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন। কেদার রায় পর্ত্তুগীজদের হস্তেই সনদ্বীপের ভার দিলেন। এই সময়ে চট্টগ্রাম হইতে সমগ্র বঙ্গোপ-সাগরের মুখে পর্ত্তুগীজের প্রাধান্য বিস্তার দেখিয়া আরাকান রাজ তাহাদের দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি পর্ত্তুগীজের বিরুদ্ধে কামান যুক্ত বড় জাহাজ ব্যতীত দেড় শত ত্রিংশৎ ক্ষেপণীযুক্ত রণতরী পাঠাইলে কেদার রায় উহাদের সাহায্যার্থ একশত কোষা প্রেরণ করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পরে পর্ত্তুগীজেরা জয়ী হইল। বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করিয়া লইল (১৬০২ খৃঃ) (৫)। আরাকান রাজ এই পরাভবে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বহুসংখ্যক রণতরী (৬) পাঠাইলে পর্ত্তুগীজেরা অল্প সংখ্যক নৌকা ও লোক সাহায্যে সেবারেও জয়লাভ করে। অনেক মগ নিহত হয় এবং তাহাদের ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। জয়লাভ হইলেও রণতরী সকল বিনষ্টপ্রায় হওয়ায় এবং ঝড়ের ভয়ে পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো ৩০ খানি নৌকাসহ শ্রীপুরে কেদার রায়ের আশ্রয়ে আসিলেন। অবশিষ্ট পর্ত্তুগীজেরা বাক্‌লা, চণ্ডীক্যানে গেল। সনদ্বীপ মগেরা অধিকার করিয়া লইল।

এই সময়ে রাজা মানসিংহ নিম্ন বঙ্গের জমিদারবর্গকে আয়ত্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ভুঁইয়াদের মধ্যে পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব ছিল, এবং গৃহচ্ছিদ্র জানাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। কেদার রায় বিক্রমপুর অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন

---

(৫) Purchas. Pilgrims—4th Part, Book. V.

(৬) পর্ত্তুগীজ বিবরণীতে ইহার সংখ্যা সহস্র এবং নিজেদের ৬০ মাত্র আছে।

বলিয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য নৌসেনাপতি মন্দা রায়ের অধীনে মোগল রাজের একশত খানি কোষা রণতরী প্রেরিত হইল। মেঘনা বক্ষে এক ঘোরতর জলযুদ্ধে কার্ভালোর নায়কতায় সমর কুশল কেদার রায়ের জয় হইল; মন্দা রায় নিহত হইলেন (৭)। কার্ভালো অতঃপর গোলিন বন্দরে (হুগলিতে) উপস্থিত হইয়া সেখানে এক মোগল দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। পার্চাস্ লিখিয়াছেন, কার্ভালোর নামে বাঙ্গলায় লোকের এতই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, এক সময়ে একজন ৫০ খানি রণপোতের অধ্যক্ষ মগ সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালো আক্রমণ করিয়াছে ভাবিয়া লোকজনকে বিব্রত করিয়া তুলেন। আরাকান রাজ ইহা শুনিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। যাহা হউক, মোগল ও মগের ভয়ে কার্ভালো নানাস্থানে পলাইয়া শেষে যশোরে প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লয়। মগেরা এই সময়ে সনদ্বীপ ও বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ঐ অঞ্চলে ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। আরাকান রাজ যাহাতে তাঁহার অধিকার আক্রমণ না করেন, এই উদ্দেশ্যে এবং হয়ত তাঁহার অনুরোধ ক্রমেই প্রতাপাদিত্য কার্ভালোকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করেন।

(৭) Carvalius staid at Siripur...with Cadry lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred Cosses sent by Mansinha, Governor of the Mogal, who having subjected that tract to his master, sent forth his navie against Cadry, Mandary a man famous in those parts being admiral; where after a bloody fight Mandary was slain, De Carvalius carried away the honour. From thence recovering of a wound in the late fight he went to Golin; where he won a castle of the Mogors kept by foure hundred men &c. &c. Purchas Pilgrims Part IV. Bork V.

ফিরিঙ্গী দস্যু হইলেও সেই বীর পুরুষকে আশ্রয় দিয়া নিহত করা নির্দ্দয়তা ও কাপুরুষতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

পাঠান দলপতি ওসমান খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব বঙ্গে আসিয়া রাজা মানসিংহ কেদার রায়কে পরাস্ত করেন। জয়পুরে আবিষ্কৃত বংশাবলী ও বিবরণী হইতে জানা যায় যে কেদার রায়কে পরাভূত করিয়া রাজা মানসিংহ তাঁহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার কুলদেবতা শিলা দেবীকে জয়পুরে লইয়া যান (৮)। এই সময়ে কেদার রায় মানসিংহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেও পরে তিনি আরাকান রাজের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। (৯) মগেরা নিম্নবঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়া বিক্রমপুর আক্রমণ করিলে কেদার তাহাদের পক্ষই অবলম্বন করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মগগণকে পরাভূত করিয়া রাজা মানসিংহ কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে কেদার রায়ের পাঁচশত রণতরী ছিল। মোগল সেনানী কিলমক্ আক্রমণ করিতে আসিয়া শ্রীপুরে কেদার রায়ের বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজা মানসিংহ তাঁহার সাহায্যার্থ অন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রবল যুদ্ধের পর কেদার রায়

(৮) শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়ের উদ্ধৃত 'জয়পুর বংশাবলী'—নিখিল নাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্যে' এ বিষয় সম্পূর্ণ আলোচিত হইয়াছে। শিলাদেবীকে জয়পুর লইয়া যাওয়া কেদার রায়ের দ্বিতীয় বার পরাভব ও মৃত্যুর পরে হওয়াই সম্ভব। শিলা-দেবী (শল্লাদেবী) এখনও প্রাচীন আমেরের রাজধানীতে স্থাপিত আছেন। তাঁহার পুরোহিত বাঙ্গালী; দেবীর নিকট প্রত্যহ এক ছাগ বলি হয়।

(৯) He (Magh-Raja) succeeded by his wiles in bringing over Kaid Rai, the Zemindar of Bikrampur who had been forcibly reduced by Mansingh—Elliot's India—vol vi.

আহত হইয়া বন্দীভূত হইলেন ; তাঁহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১০)।

চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর সোণার গাঁ হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে পদ্মার তৎকালবর্ত্তী একশাখা কালীগঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। তৎপরে পদ্মাবতীর প্রবল প্রবাহ যোগে ঐ নদী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীপুর প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া প্রবাহিত হয়। চাঁদ কেদার রায়ের সমগ্র কীর্ত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে বলিয়া উহার নাম এখন কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। কেদার রায় বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন; কেদারপুর নামক গ্রাম এখনও তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ এখন এই রায় বংশের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। সেকালের জমিদারবর্গের ত কথাই নাই, সাধারণ ভদ্রলোকেও কুস্তী, তীরচালনা প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। পাঠান আমলে বাঙ্গলায় পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্ত শাসন ছিল, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। জমিদারবর্গকে নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানে লিপ্ত হইতে হইত। মোগল পাঠান বিপ্লবে আত্মরক্ষার জন্যও বল প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠান আমলে অর্দ্ধস্বাধীন থাকায় জমিদারবর্গ সহজে মোগলের করায়ত্ত হইতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু কেদার রায় বা প্রতাপাদিত্যের চেষ্টিত বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির উদ্যম নহে। ব্যক্তিগত প্রয়াস সমবেত চেষ্টার অভাবে বিফল হইয়াছিল। বঙ্গে বীরধর্ম্মা লোকের অভাবে 'এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে' হইয়া কেদার রায়ের বীরত্ব ও কীর্ত্তি কাহিনী নানাভাবে পল্লবিত হইয়াছে (১১)।

(১০) Inayat ulla's Ikmila—Akbarnama—Elliot's History of India—vol. vi.

(১১) প্রবাদ বলে যে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে মানসিংহ তাঁহাকে এই পত্র লেখেন :—

ভারতচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় যাহার কীর্ত্তি গাথা উজ্জ্বলতর রূপে চিত্রিত হইয়াছে (১২) সেই বঙ্গীয় বীর প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর ঐতিহাসিক ভাগ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ব পুরুষেরা সপ্তগ্রামে কানুন্‌গো সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন। তাঁহার পিতা শ্রীহরি ও খুল্লতাত জানকী বল্লভ সুলেমান কররাণীর রাজত্ব কালে গৌড় বাদশা সরকারে কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়া উঠেন। সমবয়স্ক বলিয়া দায়ুদ খাঁর সহিত শ্রীহরির যথেষ্ট সদ্ভাব হয়, এবং রাজা হইয়া দায়ুদ শ্রীহরিকে উচ্চতর পদে উন্নীত করেন। কতুল খাঁ ও শ্রীহরির পরামর্শেই দায়ুদ নিজ প্রধান মন্ত্রী লোদী খাঁকে নিহত করেন (১৩), সেই অবধি শ্রীহরির প্রতিপত্তি আরও বর্দ্ধিত হয়, এবং তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন, এই সমস্ত কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌমিক চাঁদ খাঁ নিঃসন্তান মারা

ত্রিপুর মথ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পলায়ী,
হয় গজ নর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি,
বিষম সমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি।

উত্তরে কেদার রায় লিখিয়া পাঠাইলেন :—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং,
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং,
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে,
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।

মানসিংহের সংস্কৃত কুলায় নাই বলিয়া হিন্দীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে!

(১২) যশোর নগরধাম, প্রতাপআদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ইত্যাদি।

(১৩) Tabakat Akbari—Elliot's India—vol v.

যাওয়ায় শ্রীহরি দায়ুদের নিকট ঐ জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং পীঠস্থান যশোর ঈশ্বরীপুরে আবাসস্থান মনোনীত করেন। বাদশাহের সহিত যুদ্ধে দায়ুদের পাটনা হইতে পলায়নের সময়ে শ্রীহরি তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন অনেক নৌকাপূর্ণ করিয়া শ্রীহরি করিয়াছিলেন। এই ধনসম্পত্তি যথাসময়ে যশোরের বাটীতে আইসে। দায়ুদের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে এই অর্থ আর প্রত্যর্পিত হওয়ায় সুবিধা ঘটে নাই, বলাই বাহুল্য। যশোরের চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ শ্রীহরির করতলগত হইলে তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় নগর পত্তন ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। মোগলের সহিত যুদ্ধে দায়ুদের পতনের পরে অবশ্য তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু কথিত আছে যে রাজা টোডর মল্ল বঙ্গের ব্যবস্থা করিতে আসিলে ইঁহারা অনেক সরকারী কাগজপত্র দিয়া তাঁহার সহায়তা করেন; তজ্জন্য রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাদের প্রার্থনা মতে নির্দ্দিষ্ট রাজকর স্বীকারে যশোহর জমিদারী ইঁহাদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

শ্রীহরির পুত্র প্রতাপ বাল্যকালে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎকাল প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম ও অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় তাঁহার 'হঠকর্ম্মে সদামতি, হঠ হঠ সদাগতি' হইয়াছিল। বন্য জন্তু শীকার প্রভৃতি শক্তির পরিচায়ক কার্য্যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রবাদ আছে যে এই হঠকারী যুবককে কিঞ্চিৎ শান্ত করিবার বাসনায় তাঁহার খুড়া বসন্ত রায়ের পরামর্শ ক্রমে তাঁহার পিতা প্রতাপকে কিছুদিন আগরায় বাদশা দরবারে প্রেরণ করেন, কারণ মোগল রাজধানীর ঐশ্বর্য্য দেখিলে প্রতাপ আপন শক্তির লঘুতা অনুভব করিবে। এই প্রবাদে আরও গল্প যোগ হইয়াছে যে প্রতাপ তথা হইতে নিজের নামে জমিদারী পত্তনের ফর্ম্মান

আনিয়াছিলেন (১৪)। প্রতাপাদিত্য চরিত রচয়িতা রাম রাম বসু 'যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে' বলিয়া আরম্ভ করিয়া প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ মূলক বিবরণী দিয়াছেন, এখানে তাহার আলোচনার স্থান নাই, নিখিল বাবু সে কার্য্য যথেষ্ট করিয়াছেন। এই সকল গল্প হইতে বুঝা যায় যে প্রতাপ কোপন স্বভাব ছিলেন এবং খুল্লতাত বসন্ত রায়ের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। পিতার জীবিতকালেই তিনি পৃথক্ ভাবে থাকিবার ইচ্ছায় যশোরের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে ধূমঘাট নামক পল্লীতে এক নগর পত্তন করেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রকে দশ আনা ও ভ্রাতাকে ছয় আনা বিষয়ের অংশ দিয়া যান।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে ধূমঘাটে মহা ধূমধামে প্রতাপাদিত্যের গৃহ প্রবেশ ও অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। বসু মহাশয়ের নির্দ্দেশ

---

(১৪) প্রতাপ আদিত্য চরিত রচয়িতা রাম রাম বসু লিখিয়াছেন, সুরসিক আকবর বাদশার জিজ্ঞাসিত 'শেত ভুজঙ্গিনী জাত চলিহেঁ' সমস্যার পূরণ করিয়া প্রতাপ দরবারে সম্মানিত হন এবং কৌশলে নিজনামে ফর্ম্মান্ করাইয়া লন।—সমস্যার পূরণ এইরূপ অদ্ভুত ভাষায়;—

সো বর কামিনী নীর নাহারতি, রিত ভালি হেঁ।
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছ চল্ল চলি হেঁ।
রায় বেচারি আপন মনসে, উপমা ওচারি হেঁ,
কেছুঁঈ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী জাত চলি হেঁ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরন বিদ্যাভূষণ ইহার অর্থ করেন, সেই শ্রেষ্ঠ কামিনী জলে স্নান করিতেছে, এ রীতি ভাল বটে; তাহার পর ঘাটের উপর বস্ত্রখানি নিঙ্গড়াইয়া পুষ্করণীর ধারে চলিয়াছে; রায় বেচারা আপন মনে বিচার করিয়া এই উপমা স্থির করিল যেন মূর্ত্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলিয়া যাইতেছে। প্রতাপাদিত্য—রায়।

মতে অন্নপ্রাশনের সময় 'প্রতাপাদিত্য' নামকরণ হয়। ইহা সম্ভব, কারণ পিতার ন্যায় পুত্রের উপাধি দিতে দ্বিতীয় দায়ুদ অবতীর্ণ হয় নাই। আবার তাঁহার পুত্র 'উদয়াদিত্য' নাম পাওয়ায় একথা সমর্থিত হইতেছে। নূতন নগরে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতাপ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইবার কল্পনা করেন। বিপ্লবের সময়ে পাঠান সর্দ্দারদের মত ভুঁইয়া জমিদারেরা ও সহজে মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। বল সঞ্চয় করিয়া সাগর দ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিতে প্রতাপাদিত্যের বিলম্ব হয় নাই। ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও সুবাদার আজিম খাঁর সময়ে প্রতাপের সহিত মোগল সৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল, বোধ হয়। প্রতাপাদিত্য চরিত্রে লিখিত আছে, আবরম্ খাঁ নামে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া নিহত হন। ইব্রাহিম খাঁ নামক সেনানী আজিম খাঁর সময়ে বাঙ্গলায় কার্য্য করিয়াছিলেন (১৫)। পাঁচ হাজারী বা নিহত না হউন, হয়ত তিনি প্রতাপের দমনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যশোর চাঁচড়ার রাজাদিগের প্রাচীন কাগজ পত্র হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহাদের বংশের স্থাপয়িতা ভবেশ্বর রায় প্রতাপের বিরুদ্ধে আজিম খাঁর সহায়তা করায় আজিম সৈয়দপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণা প্রতাপের রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভবেশ্বরকে প্রদান করেন, (১৬)। সম্ভবতঃ আজিম খাঁ স্বয়ং সদলে অগ্রসর হইলে প্রতাপ অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঘটক কারিকার জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রেরিত সেনাপতি—"আজিমং পাতয়ামাস"—ইত্যাদি উক্তি ঐ জাতীয় গ্রন্থের মূল্য জ্ঞাপন করিতেছে!

(১৫) Blochman—Ain-i Akbari—P. 403. (১৬) West land's Jessore.

মোগলের সহিত সংঘর্ষে নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া প্রতাপাদিত্য কিছুকাল বল সঞ্চয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি পর্ত্তুগীজ সেনানীর অধীনে এক দল গোলন্দাজ সৈন্য শিক্ষিত করাইয়াছিলেন। রাজ্যরক্ষার জন্য সাগরের দিকে তাঁহার নৌসৈন্যও ছিল। নৌবল অধিক না থাকায় আরাকান রাজের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্য তিনি পর্ত্তুগীজ নাবিক কার্ভালোকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যখন পূর্ব্ববঙ্গে মোগল পাঠানে হাঙ্গামা চলিতেছিল, এবং শাহবাজ খাঁ ও পরে মানসিংহের সেনাদল যখন ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, সেই সময়ে প্রতাপ সৈন্যবল বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। খুড়া বসন্ত রায় সম্ভবতঃ প্রতাপের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসের প্রতিকূল ছিলেন। যে কারণেই হউক, প্রতাপের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে কাপুরুষোচিত নৃশংস পিতৃব্য হত্যাকাণ্ডে প্রণোদিত করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে বসন্ত রায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রতাপ নিরস্ত্র পাইয়া তাঁহাকে তরবারির আঘাতে নিহত করেন। বসন্ত রায়ের দুই পুত্রও নিহত হন; কনিষ্ঠ নাবালক কচুরায় (১৭) বাঁচিয়া গিয়া বাদশাহ দরবারে অভিযোগ করেন। বসন্ত রায়কে সবংশে নিহত করার পরে একেশ্বর হইয়া প্রতাপ উত্তরোত্তর বলবৃদ্ধি করিতেছিলেন। অন্নদা মঙ্গলে "বায়ান্ন হাজার যার ঢালী"—এবং 'ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি' আছে; সংস্কৃত ক্ষিতীশ-

(১৭) "তার বেটা কচু রায়, রাণী বাঁচাইল তায়, জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল" —ভারতচন্দ্র। ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে "একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চী বনে রক্ষিতঃ' আছে; সেই জন্যই নাম কচুরায়, এই প্রবাদ হইয়াছে। ইহার প্রকৃত নাম রাঘব।

বংশাবলী উহাতে ৫১ হাজার ধনুর্দ্ধারী যোগ করিয়াছে। বহুতর সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া প্রতাপ এখন প্রকাশ্যভাবে মোগলের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় এই সময়ে পাষাণ হৃদয় প্রতাপ স্বীয় নাবালক জামাতা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার কল্পনা করেন; প্রতাপের পুত্র কন্যার কৌশলে রামচন্দ্র রক্ষা পান। রাম রাম বসুর মতে বসন্ত রায়ের বাটী হইতেই দ্রুতগামী নৌকারোহণে রামচন্দ্র পলায়ন করেন, এবং বসন্ত রায়ের যোগে এই কার্য্য হইয়াছে ভাবিয়া প্রতাপ তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করেন। যে ভাবেই হউক, কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত প্রতাপ ঘৃণিত হন ও সেই অবধিই তাঁহার অধঃপতন আরম্ভ হয়। প্রতাপ প্রথম অবস্থায় সচ্চরিত্র, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন এই প্রবাদ বসু মহাশয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেবীভক্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন; যশোরেশ্বরীর মন্দির সংস্কার করাইয়া পূজার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং সাধক ছিলেন, ইষ্টদেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন—একথা প্রবাদ সমর্থন করে। ভারত চন্দ্র এই জন্যই 'বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর' লিখিয়া প্রতাপকে অমর করিয়াছেন। প্রতাপের দান শক্তির প্রবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া পাটরাণী দানের গল্পকে ও আশ্রয় দিয়াছে। রাজোচিত নানা গুণ সমন্বিত হইয়াও অহঙ্কার ও নির্দ্দয়তার নিমিত্ত প্রতাপ স্বীয় অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করেন। এক স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদের গল্প ও চলিত আছে, এবং সেই জন্যই 'বিমুখী অভয়া' (১৮) কথায় যশোরেশ্বরী ছাড়িয়া গিয়া মন্দির

(১৮) শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিল রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি॥—ভারতচন্দ্র

সহিত দক্ষিণ হইতে পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, এই প্রবাদ রচনা হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রতাপের কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে মানসিংহ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের নিয়োগে পুনরায় বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্ভবতঃ মানসিংহের প্রস্থানের পরে ১৬০৪ হইতেই প্রতাপ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া চন্দ্রদ্বীপ অধিকার ও বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ড সমাধা করেন এবং দেশের অনেক লোকে তাঁহার প্রতিকূল হয়। মানসিংহ রাজমহলে ফিরিয়া আসিলেই সম্ভবতঃ কচুরায় তাঁহার শরণাপন্ন হন; তখনকার দিনে বালকের বাদশা দরবার আগরা গমন সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কচু রায়কে মানসিংহ 'যশোর জিৎ' উপাধি দেওয়ার প্রবাদ তাহাকে যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইয়াছে, এমন কি কচুরায় স্বয়ং যুদ্ধে মহাবল প্রতাপের হস্তচ্ছেদ পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছে! মানসিংহ রাজমহল হইতে যশোর অভিমুখে 'বাইশী লস্কর সঙ্গে' (১৯) অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে বর্দ্ধমান জেলার বড় রাস্তা দিয়াই আসিতে হইয়াছিল; কবি ভারতচন্দ্র এই অবকাশে "বিদ্যা সুন্দরের কথা, প্রসঙ্গত শুনিল

কালীমাতা সুপ্রসন্না হইয়া কন্যাভাবে প্রতাপের গৃহে ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া শেষে কন্যারূপে তাঁহার নিকটে গিয়া 'বাবা তবে আমি আসি' বলায় প্রতাপ দূর দূর বাক্যে তাঁহাকে বিদায় করিয়াছিলেন—ইত্যাদি।

(১৯) 'বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচু রায় লয়ে রঙ্গে মানসিংহ বাঙ্গলা আইল' অন্নদামঙ্গল। যশোরের প্রবাদ এই বাইশী লস্কর লইয়াও নাড়া চাড়া করিয়াছে। গল্প উঠিয়াছে, মানসিংহের যুদ্ধে আগমনের পূর্ব্বে বাদশা ক্রমে ২২ জন ওমরা প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য সকলেই নিহত হন; তাঁহাদের কবর এখন পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকে।

সেথানে'—লিথিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের স্থাপয়িতা ভবানন্দ মজুমদার সে সময়ে কানুন্‌গো সেরেস্তার কার্য্য করিতেন এবং বাগোয়ান্ প্রভৃতি মৌজার তালুক্‌দার ছিলেন। মানসিংহের পূর্ব্বস্থলী নদীয়ার পথে গমন সময়ে ভবানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাদশাহী সৈন্যের রসদের সুব্যবস্থার সাহায্য করায় মানসিংহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অন্নদামঙ্গল এবং নদীয়া রাজের ক্ষিতীশ বংশাবলী এই সুযোগে রাজাকে ভবানন্দের নিবাস থ'ড়ে পার বাগোয়ানে লইয়া গিয়া সপ্তাহব্যাপী ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলিয়াছেন। অন্নদামঙ্গল অন্নদার মায়ায় এবং বংশাবলী গোবিন্দ এবং লক্ষ্মীর বিবাহ ব্যবস্থার ব্যপদেশে ভবানন্দের ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য জমাইয়া মানসিংহের লস্করের আহার পর্য্যন্ত সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন! যে উপায়েই হউক, ভবানন্দ মানসিংহকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কারণ রাজা মানসিংহ এই সময়ে ভবানন্দকে কয়েকটি জমিদারী দিয়াছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় তাঁহার ক্ষিতীশ বংশাবলীতে লিথিয়াছেনঃ—রাজা মানসিংহ ভবানন্দকে প্রথমে মহৎপুর প্রভৃতি যে কয়েক পরগণা দেন, তাহার ফরমান্ রাজবাটীতে আছে—ফরমানের তারিখ ১০১৫ হিঃ" (১৬০৬ খৃঃ)। ভবানন্দ তৎপরে উখড়া প্রভৃতি পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ নদীয়া রাজবংশের উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে কচুরায় যশোরজিৎ উপাধির সহিত ঐ জমিদারী ও পাইয়াছিলেন।

মানসিংহ সসৈন্যে যশোরের নিকটবর্ত্তী হইলে ধূমঘাটের নিকটবর্ত্তী মৌতলার গড়ের সম্মুখে প্রতাপাদিত্যের সৈন্য দলের সহিত রাজপুত ও মোগল সেনার এক তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালী যুদ্ধ

কার্য্যে অনভ্যস্ত ছিল না। ঢাল তরবার হয় হস্তী ত প্রতাপের যথেষ্ট ছিল; রুডা নামক পর্ত্তুগীজের অধীনে গোলন্দাজ সৈন্যও শিক্ষিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী সেনাপতি দ্বারা চালিত হইয়া বঙ্গীয় সৈন্য মোগল দলকে ত্রস্ত করিয়াছিল। যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ নিহত ও জগৎ সিংহ আহত হন। (২০)। প্রতাপাদিত্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত ও বন্দীভূত হইলেন। কথিত আছে যে আহত প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বাদশাহের নিকট পাঠান হইয়াছিল; পথিমধ্যে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায় বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের স্মৃতি চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে সন্দেহ নাই। মোগল পাঠান বিপ্লব সময়ে প্রধান বাঙ্গালী ভুঁইয়াগণ একযোগে কার্য্য করিলে হয়ত সফল কাম হইতেন। অন্ততঃ মোগল দলের অধিনায়কগণ ইঁহাদের পক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। প্রাচীন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন ঘটিয়া প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনের মূলে কুঠারাঘাত হইত না। কিন্তু সে কালের ভুঁইয়ারা দেশের কথা ভাবিতে পারেন নাই। গোলযোগের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসই বলবৎ ছিল। সেই কারণেই মহাবল মোগলের সম্মুখে তাঁহারা তৃণের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশ ও জাতি নূতন বন্ধনে দৃঢ়তর আবদ্ধ হইয়া পাঠান আমলের অর্দ্ধ স্বাধীনভাবও হারাইয়াছিল। প্রকৃত বীর বা দেশনায়কের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, প্রতাপাদিত্যে তাহার কিছুই

(২০) নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্যে উদ্ধৃত 'জয়পুর বংশাবলী'। এই পুস্তকে প্রতাপের ১৩ শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল, লিখিত আছে।

ছিল না। তিনি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খুল্লতাত বসন্ত রায়কে স্বহস্তে এবং আশ্রয় ভিক্ষার্থী কার্ভালোকে ঘাতক দ্বারা ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছেন; প্রবাদে বিশ্বাস করিতে হইলে স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদ করাইয়াছেন। দাতা ছিলেন বা ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন না, এই গুণে অমানুষিক নির্দ্দয়তা উপেক্ষিত হইতে পারে না। বীরধর্ম্ম ও কাপুরুষতায় অনেক প্রভেদ। বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ বীরের অভাবেই আমরা প্রতাপাদিত্যে সন্তুষ্ট থাকি।

মোগল পাঠান বিপ্লবের অবকাশে অন্যান্য জমিদারেরাও সুবিধামত রাজ্য বৃদ্ধির ও স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যশোরের পূর্ব্ব ভাগে ভূষণার জমিদার মুকুন্দ রায় প্রথমে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া পরে মোগল সেনানী দিগের বিদ্রোহের সুযোগে নিকটবর্ত্তী ফতেয়াবাদ জমিদারীও অধিকার করিয়া লন। অতঃপর মোগল সৈন্য তাঁহাকে উৎখাত করে। পাঠান আমলে প্রত্যন্ত-ভাগে বিষ্ণুপুরের রাজারা অর্দ্ধ স্বাধীন মত ছিলেন। কতলুখাঁর সহিত মানসিংহের যুদ্ধের সময় বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর পাঠানের দিকে যোগ দিয়াছিলেন এবং বিপন্ন জগৎসিংহকে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুর লইয়া যান,একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মানসিংহের সহিত পাঠানের সন্ধি স্থাপিত হইলে হাম্বীর মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন; সেইজন্যই পাঠানেরা পরে আবার বিষ্ণুপুর অঞ্চলেও উৎপাত করে। এই রাজা বীর হাম্বীরই শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে স্বপক্ষের লোক জনের দ্বারা ধন রত্ন মনে করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল অপহরণ করেন। শেষে শ্রীনিবাস রাজধানীতে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দানে দস্যু রাজাকে শিষ্য করিয়া গ্রন্থ ফিরিয়া পান এবং বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। ভুলুয়ার ভুঁইয়া লক্ষণ মাণিক্য পূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজার

অধীন ছিলেন। মোগল অধিকারে তাঁহার জমিদারী লইয়া অনেক বিভ্রাট হয়। ঘটকদের গ্রন্থে তাঁহার চন্দ্র দ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের হস্তে পরাজয় ও শেষে হত্যার কথা পাওয়া যায়।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রেরও নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। উপযুক্ত শ্বশুর প্রতাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ৬৪ দাঁড় দ্রুতগামী নৌকা যোগে তিনি আপন রাজধানীতে পলায়ন করেন। তাঁহার যৌবনাবস্থায় চন্দ্রদ্বীপ ও বাকলা লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়াছিল। তাঁহার পিতার সময়ে মুনেম খাঁর অন্যতম সেনানী মুরাদ খাঁ ফতেবাদ বাকলা প্রভৃতি মোগলের অধিকার ভুক্ত করেন (২১)। ফার্ণাণ্ডেজ্ প্রভৃতি জেসুইট্ পাদরীরা রামচন্দ্রের বাল্যাবস্থায় বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়াছিলেন। অতঃপর আরাকানের মগেরা বাকলা ও চন্দ্রদ্বীপের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লয়। রামচন্দ্র নিজ জমিদারীর উত্তরাংশ পরে পুনরুদ্ধার করিলেও দক্ষিণ ভাগে বাকলা বহুকাল ধরিয়া মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুর ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়ে।

বাণিজ্য ব্যবসায়ী পর্ত্তুগীজও বাঙ্গলায় বিপ্লবের সুযোগে জলদস্যু রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিপ্লবকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল। কার্ভালো ও মাটুস্ প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী নেতার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর দল ছাড়িয়া বঙ্গ সাগরে দস্যুবৃত্তি ও দুর্ব্বৃত্ত জমিদারদিগের অধীনে সৈনিক বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুর অত্যাচার পরেও কিছুকাল চলিয়াছিল। শাজাহানের রাজত্বকালে হুগলী হইতে পর্ত্তুগীজ-

(২১) Blochmann's Ain-i-Akbari.

গণ তাড়িত হইলে পর বঙ্গে পর্ত্তুগীজের উৎপাত শেষ হয়। পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীর উৎপাত নিবৃত্তি হইলেও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে অনেক দিন ধরিয়া আরাকানবাসী মগের অত্যাচার চলিয়াছিল। এখনও "মগের মুলুক" প্রবাদ মগের অনাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মোগল শাসনকর্ত্তা ফিরিঙ্গী ও মগের উৎপাত নিবারণের সুবিধার জন্যই রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন; কিন্তু এই সমস্ত উৎপাত অত্যাচারের নিবৃত্তির পর সম্পূর্ণ শান্তিস্থাপিত হইতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

মোগল পাঠান মগ ফিরিঙ্গীর ক্রীড়াভূমি হইয়া সমগ্র বাঙ্গলা দেশ চল্লিশ বৎসর কাল উপদ্রুত হইয়াছিল। মোগলরাজ সহজে বঙ্গভূমির অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। সেকালের বাঙ্গালী নিতান্ত নির্জ্জীব ছিল না। পাঠান ও জমিদার কিম্বা প্রধান জমিদারবর্গ এক যোগে কার্য্য করিলে হয়ত ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত, কিন্তু সমবেত চেষ্টা এক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল। সকলেই নিজের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেছিল। দেশাত্মবোধ তখন দেখা দেয় নাই; কখনও দিবে কিনা, তাহাই চিন্তার বিষয়।

সপ্তম অধ্যায়

বাণিজ্য ও বৈদেশিকের বর্ণনা

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের মত বাঙ্গলার বহির্বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় বীর বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রার পূর্ব্বে বাঙ্গলার বন্দর হইতে বাণিজ্যতরীর বহর যে বিদেশযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। বিষ্ণুপুরাণে প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে (১)। তৎপূর্ব্বে যখন আর্য্যগণ বঙ্গে আগমনই করেন নাই, তখনও বঙ্গজাতি বর্ম্মা, শ্যাম, আনাম প্রভৃতি নানা দেশে গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ একালে আবিষ্কৃত হইয়াছে (২)। অমর কবি কালিদাসের রঘুবংশে 'বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্' উক্তি সে যুগের বঙ্গবাসীর নৌবলের পোষক। গুপ্ত সম্রাটদিগের অধিকার কালে পূর্ব্ব ভারতের নাবিককূল একদিকে সিংহল সুমাত্রা, যাবা, অন্যদিকে সুবর্ণভূমি, কাম্বোডিয়া ও মালয় উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এক বৃহত্তর ভারতের স্থাপনা করিয়াছিল।

(১) তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি (বিষ্ণুপুরাণ ২৪ অঃ ১৮)। এদেশে তামার খনি নাই। অতি প্রাচীনে দাম লিপ্তী নাম পাইয়া কেহ কেহ এখানে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, অনুমান করেন।

(২) 'বন্-লাং' হইতে বঙ্ অর্থাৎ বঙ্গজাতীয় রাজপুত্র আনামে গিয়া নবরাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন, জেরিণী প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

এই সমস্তের বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয় নহে। ফাহিয়ান্ ৪১০ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধিবর্ণন করিয়াছেন; তাহার দুই শতাধিক বর্ষ পরে হুয়েন্ সাং ও ইহাকে পূর্ব্বাঞ্চলের প্রধান বন্দর বলিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক দিগের অনেকেই তাম্রলিপ্তি হইতে বাঙ্গালীর জাহাজে উঠিয়া সিংহল দিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। সেকালে পূর্ব্বভারত এবং দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত চীন দেশের সহিতও বাণিজ্যের আদানপ্রদান চলিত এবং বৌদ্ধ প্রচারকবর্গ এই সকল বাণিজ্যতরী যোগে চীন ও জাপানে গমন করিয়া তথায় ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালের সমতট এবং হরিকেলা নামের বাঙ্গলার বন্দর দুইটির স্থান বর্ত্তমানে নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত না হইলেও (৩) ইহারা সেকালের বাণিজ্য বিস্তৃতির সাক্ষ্যদান করিতেছে। বঙ্গে মুসলমান অধিকারের সমকালেই প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় (৪) ত্রিবেণী ক্ষেত্র হইতে বর্ত্তমান ত্রিশবিঘা পর্য্যন্ত স্থান লইয়া সরস্বতী কূলে প্রাচীন সপ্তগ্রাম নগর স্থাপিত ছিল। এখন সেই সপ্তক্রোশ ব্যাপী বিশাল নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি মস্জিদ ও একটি মাত্র মন্দির মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান! যে সরস্বতী দেশ দেশান্তর হইতে আগত অর্ণবপোত বক্ষে ধরিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত করিত, তাহাতে এখন সময়ে পথিকের পদপ্রক্ষালনের উপযোগী জলও থাকে না কিছু দিন

(৩) সেঙ্ চি, সমতট বন্দরের নাম করিয়াছেন। নদীর গতি পরিবর্ত্তন জলপ্লাবন এবং দ্বীপের বৃদ্ধির মধ্যে এইরূপ বন্দরের বিলোপসাধন স্বাভাবিক।

(৪) টলেমীর বিবরণী হইতে কেহ কেহ ত্রিবেণীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে চান। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য এক লেখক সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় সপ্তগ্রামের বর্ত্তমান বিবরণ লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রাচীন নদীগর্ভে জল সঞ্চালনের জন্য একটি ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছে; দক্ষিণভাগে কোথাও বা গর্ভের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। নদীগর্ভে হলকর্ষণ কালে ক্বচিৎ কোন কৃষক প্রাচীন মুদ্রা বা জাহাজের ভগ্নাংশ পাইয়া সাতগাঁয়ের কথা স্মরণ করে। এককালে প্রবল নদী প্রবাহ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ত্রিধারার মুক্তবেণী সৃষ্টি করিয়া প্রয়াগের ত্রিবেণী ক্ষেত্রের ন্যায় এখানে যে ত্রিবেণীর স্থাপনা করিয়াছিল, এখনও ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গীয় মহিলারা তাহার সম্মান রক্ষা করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন “প্রদ্যুম্ন নগরাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে। তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা। স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে”—ইত্যাদি বচনে সার্টিফিকেট দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর অনেককে সুদূর প্রয়াগযাত্রার ক্লেশ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রদ্যুম্ন নগর বর্ত্তমান পেঁড়ো (পাণ্ডুয়া)। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মনসার ভাসান প্রভৃতিতে এই ত্রিবেণীতীর্থের নিকটে ‘নেতা ধোপানীর ঘাটে’ বেহুলার মান্দাসে সযত্নে রক্ষিত মৃত পতির পুনর্জ্জীবন লাভ, এই তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে।

১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খৃঃ) কবি বিপ্রদাস ‘মনসামঙ্গল’ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি চাঁদ সদাগরের সপ্তগ্রাম দর্শন প্রসঙ্গে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন :—

বহিত্র চাপায়্যা কুলে, চাঁদ অধিকারী বুলে, দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তরিসি স্থান, সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান শোক দুঃখ সর্ব্বগুণধাম।
জোতি হয়্যা একমুতি রিসি মুনি সবে তথি, তপজপ করে নিরন্তর
গঙ্গা আর সরস্বতি, জমুনা বিশাল তথি, অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর।
দেখিয়া ত্রেবেণী গঙ্গা, চাঁদ রাজ মনে রঙ্গা, কুলেতে চাপায়্যা মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ, করে নানা তীর্থ কাজ, ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর।

তির্থ-কার্য্য সমাপীয়া অন্তরে হরি (ষ) হয়্যা উঠে রাজা ভূমিয়া নগর।
ছত্তিস আশ্রমে লোক, নাহি কোন দুঃখ শোক আনন্দে বঞ্চায় নিরন্তর।
বৈসে জতো দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ তেজময় যেন দিবাকর।
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে বিসারদ গুরুধর্ম্মে জ্ঞান গুরুদেবের সোসর।
পুরুষ মদন জেনো রমণি সাবিত্রি হেনো আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ জতো তাহা বা কহিব কত হেরিতে নিমিস বিলয়।
অভিনব সুর পুরি দেখি সব সারি সারি প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিসাল জোতিময় কাচ চাল রাজমুক্তা প্রলম্বিত ধারা।
সভে সেবে ভক্তিমুক্তি প্রতি ঘরে নানা মুত্তি রত্নময় সকল প্রাসাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্দি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে।
নিবসে যবন জতো তাহা বলিব কতো মোঙ্গল পাঠান মোকাদিম।
ছয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি দুই ওক্ত করে তছলিম।
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে ক্ষয়তা করয়ে পিত্র লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবি দ্বিজ বিপ্রদাস কবি উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে।

সপ্তগ্রামের কীর্ত্তিকাহিনী বৈষ্ণব সাহিত্যেও যথেষ্ট আছে। চৈতন্য-ভাগবতে প্রভু নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম আগমনের কথায় লিখিত হইয়াছে ঃ—

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ।
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সম্মিলন। ইত্যাদি

সপ্তগ্রামের বণিক কুলের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া প্রভু নিত্যানন্দের 'অধম মূর্খ' বণিকের উদ্ধারে উদ্ধারণদত্তের ভাগ্যের কথা বৃন্দাবন দাস সানন্দে বর্ণন করিয়াছেন। সে কালের সপ্তগ্রাম বন্দরের

বাণিজ্য ব্যাপারের বর্ণনা দেশীয় প্রাচীন কাব্যে যাহা পাওয়া যায়, বৈদেশিকের ভ্রমণ কাহিনীও তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। কবিকঙ্কন-চণ্ডী এবং মনসা-মঙ্গল গ্রন্থগুলিতে ধনপতি বা চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার যে বিবরণ আছে, কাব্যাংশ সামান্য বাদ দিয়া তাহা হইতে সে কালের প্রধান প্রধান বাঙ্গালী বণিকেরা যে 'ডিঙ্গা' সাজাইয়া সমুদ্রোপ-কূলে দূর দেশে বাণিজ্যে যাইত, তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। প্রথমে বৈদেশিক ভ্রমণকারী ও বণিকেরা একালের বাঙ্গলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণীতে দেশের অবস্থা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রধানতঃ বাণিজ্য ব্যপদেশেই ভারতবর্ষে আসেন; সুতরাং বাণিজ্য দ্রব্যাদির কথাই তাঁহাদের গ্রন্থের অনেক অংশ পূর্ণ করিয়াছে। ইটালী দেশবাসী বার্থেমা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ও পর্ত্তুগীজ পর্য্যাটক বার্বোসা ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আসেন। বার্থেমা বাঙ্গলায় অতি অল্প দিনের জন্যই ছিলেন, তজ্জন্য অন্য অঞ্চলের বিবরণ যত অধিক দিয়াছেন, এ দেশের কথা সেরূপ বলিতে পারেন নাই, নতুবা তাঁহার সহজ সরল বর্ণনায় আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থার অনেক কথা জানিতে পারা যাইত। টেনাসেরিম হইতে সেই দেশীয় এক জাহাজে তিনি বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর জাহাজের কথায় বার্থেমা লিখিয়াছেন, 'এই প্রদেশের লোকেরা নানা প্রকারের বড় বড় জাহাজ প্রস্তুত করে। তাহার মধ্যে কতকগুলির তলদেশ প্রশস্ত ও সমোচ্চ করা হয়, যাহাতে অল্প গভীর জলেও চালান যাইতে পারে। আর এক প্রকারের জাহাজ আছে যাহার দুই দিকেই সরু গলুই; ইহাতে দুখানি হাল ও দুইটি মাস্তুল

থাকে এবং উপরে ছত্রি ঢাকা থাকে না। গিয়ুঞ্চী নামে অন্য এক জাতীয় জাহাজ হয়, ইহাতে হাজার বস্তা মাল যাইতে পারে এবং তাহার উপরে কয়েকখানি করিয়া ছোট নৌকা উঠাইয়া লইয়া নাবিকেরা মলক্কা পর্য্যন্ত যায়'।

একাদশ দিন নৌযাত্রার পরে তিনি বাঙ্গেলা নগরে (১) উপনীত হন। এ পর্য্যন্ত যত নগর দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এইটি বড়ই সুন্দর। ইহার সুলতান এক মুসলমান। তাঁহার বিশ হাজার সৈন্য আছে। এখানে অন্য স্থান অপেক্ষা ধনবান্ ব্যবসায়ীর বসতি। তুলা এবং রেশম জাত বস্ত্রই এখানকার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য; এই বস্ত্র পুরুষে বয়ন করে, স্ত্রীলোকে নহে। এই দেশে সর্ব্বপ্রকার শস্যও চিনি, আদা, তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বাস করিবার পক্ষে পৃথিবীর মধ্যে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট স্থান। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে তোগলক বংশের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়া আফ্রিকা দেশীয় ইবন্ বতোতা ও এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এমন শস্তা জিনিষ অন্য কোথাও

(১) এই বাঙ্গেলা নগর কোথায় ইহা লইয়া অনেকে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। টেনাসেরিম হইতে এগার দিন সমুদ্রযাত্রার পরে পৌঁছিলে গঙ্গাসাগরের মুখে কোন বন্দরে পৌছান যায়; আবার নদীর মধ্যে সেকালের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামেও আসা যাইতে পারে। বার্থেমা সপ্তগ্রাম বা চট্টগ্রামের নাম করেন নাই; অথচ প্রধান বন্দরে, সুন্দর সহরে আসিয়াছিলেন। বার্বোসাও বেঙ্গলা নাম করেন, এই নিমিত্ত অনেকে কল্পনা করেন, নদীমুখে সেকালে কোন প্রসিদ্ধ নগর ছিল; সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পরে নষ্ট হইয়াছে। দেশীয় ইতিহাসে যখন এরূপ কোন স্থানের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না তখন সেকালের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামই বার্থেমার ও বার্বোসার বাঙ্গেলা মনে করা অসঙ্গত নহে। পরবর্ত্তী পর্য্যাটকেরা কেহই বাঙ্গেলার বার্ত্তা বলেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, রাজধানী গৌড়কেই বৈদেশিকেরা বেঙ্গলা সহর বলিয়াছেন।

দেখি নাই। একজন পাশ্চাত্য ধার্ম্মিক ব্যক্তি আমায় বলিয়াছেন, যে আট দর্হাম মাত্র ব্যয়ে তিনি পরিবার বর্গের এক বৎসরের খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আট দর্হামে আমাদের ২৪ শিলিং হয়।"

বাঙ্গলায় আসিয়া বার্থেমা ক্যাথে দেশীয় সারনাউ নিবাসী দুই জন খৃষ্টানের সাক্ষাৎ পান; ইহারা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখে। ইহারা পেগু প্রবাল বিক্রয়ের উপযুক্ত স্থান এই সংবাদ দিয়া বার্থেমাকে পেগুতে সঙ্গে লইয়া যায়। এ দেশ হইতে দক্ষিণ দিকের এক উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় হাজার মাইল গিয়া তাঁহারা পেগুতে উপস্থিত হন।

পর্ত্তুগীজ পর্য্যাটক বার্বোসা ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় উপনীত হন। তাঁহার গ্রন্থ ঠিক্ ভ্রমণবৃত্ত নহে; তিনি যে যে স্থান দেখিয়াছেন, তথাকার সাধারণ ও ঐতিহাসিক অনেক কথা উল্লেখ করিয়া দেশের বাণিজ্যাদি বিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ বণিকের ভারতে আসার পরে কলিকটে দুর্গ নির্ম্মাণ, অস্মজ অধিকার এবং ভারতীয় বণিক্‌দলের উপর উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের জাহাজ কাড়িয়া লইয়া যেরূপে দুর্বৃত্ত পর্ত্তুগীজ দল আরবসাগরে একাধিপত্য চালাইয়াছিল, তাহার অনেক কথা বার্বোসার পুস্তকে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার কথায় বার্বোসা বলেন "ইহারা হিন্দু, যুদ্ধে কুশল, এখানকার রাজা নরসিংহের (বিজয়নগর বা কলিঙ্গ) রাজার সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত। তাঁহার পদাতিক সৈন্য অসংখ্য। দেশের অধিকাংশ সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী হওয়ায় বন্দর অতি অল্প; বাণিজ্য ব্যবসায় সামান্য। তাঁহার রাজ্য গঙ্গানদীর নিকট পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীর হইয়া ৭০ লীগ্ হইবে। এই গঙ্গার অন্য পার্শ্ব হইতে বাঙ্গলা আরম্ভ; এই গঙ্গাস্নানের জন্য সমগ্র ভারতবাসী তীর্থযাত্রা করে; তাহারা বলে স্বর্গের এক প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহাতে

স্নান করিলে আপদ বিপদ দুর হইবে। এই নদী প্রকাণ্ড, এবং ইহার উভয় তীর সমৃদ্ধ নগরীমালায় সুশোভিত।

বার্বোসা লিখিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশের ভিতরে হিন্দুই অধিক; ইহারা বাঙ্গলার মুসলমান রাজার প্রজা। সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরে হিন্দু ও মুসলমান বাস করে। তাহারা নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে ব্যাপৃত থাকে। এখান হইতে নানাদেশে বহু জাহাজ চলিয়া থাকে, কারণ সমুদ্র এখানে উপসাগর হইয়া উত্তরমুখে দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ মুখে 'বাঙ্গেলা' নামে এক প্রকাণ্ড নগর আছে, তাহাতে এক সুন্দর বন্দর। এ নগর মুসলমানপ্রধান; তাহারা গৌরবর্ণ, সুগঠিত। (২)

নানা দিগ্দেশ হইতে বহুলোক এখানে সমবেত হয়। ইহার মধ্যে আরব, পারসীক, আবিসিনীয় ও ভারতবাসী সবই আছে। ইহারা বড় বড় ব্যবসায়ী। ইহাদের বড় বড় জাহাজ আছে, সেগুলি মক্কার জাহাজের ধরণে গঠিত; আবার জুঙ্গো নামে কথিত চীনা ধরণের প্রকাণ্ড জাহাজও আছে, এগুলিতে অনেক মাল ধরে। এই সমস্ত জাহাজ লইয়া ইহারা চোলমন্দর, মালবার, কাম্বে. পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা সিংহল ও মলকায় বাণিজ্য করিতে যায়। ইহারা নানাস্থানের নানাপ্রকার দ্রব্যের বাণিজ্য করে। এ দেশে বহু তুলা জন্মে; ইক্ষু, আদা ও লালমরিচ যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। তাহারা সূক্ষ্ম ও সুন্দর নানারূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে। নিজের প্রয়োজনে ইহাতে রঙ্গ করিয়া লয়; অন্যত্র ব্যবসারের নিমিত্ত সাদা পাঠায়, ইহাকে সরবতী বলে। এগুলিতে

(২) Inhabited by Moors white men and well formed এই সমস্ত কথায় মোগল বণিকগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে হয়। বার্বোসাও 'বেঙ্গলা' নগরের উল্লেখ করিয়া সন্দেহ বাড়াইয়াছেন।

মহিলাদের ব্যবহারার্থ সুন্দর ওড়না ও চাদর হইতে পারে, তজ্জন্য ইহার বড়ই আদর। আরব ও পারসীরা এই কাপড়ে এত অধিক পরিমাণে পাগড়ী টুপী প্রস্তুত করে যে তাহাদের জন্যই প্রতিবর্ষে কয়েক জাহাজ বস্ত্র চালান হয়। মামুনা, দোগজা, চৌতার, তোপান্ সোনাবাসো নামে অন্যান্য কাপড় আছে, তাহাতে জামা তৈয়ার হয় এবং সেগুলি টেঁকসই। এগুলি কম বেশী ২০ হাত করিয়া হয় এবং এই নগরে ইহা বেশ শস্তা। লোকে চড়কায় সুতা কাটিয়া এই সকল কাপড় বুনে।

এই নগরে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহারা কুঁদো মিছরি ভাল তৈয়ার করিতে না জানায় গুঁড়া অবস্থায় চামড়ায় বাঁধিয়া সেলাই করিয়া দূরদেশে পাঠায়। বহুতর জাহাজে এই সমস্ত চিনি ভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হয়। যখন এই সমস্ত বণিক অবাধে ও নির্ভয়ে (৩) মালবার ও কাম্বে উপকূলে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে পারিত, তখন চিনি ও কাপড়ের ব্যবসায়ে তাহারা সমধিক লাভবান হইত। এই নগরের লোকে নানাপ্রকার আচার ও চাটনী প্রস্তুত করিয়া থাকে। আদা ও কমলালেবু, লেবু ও অন্যান্য ফল এদেশে প্রচুর জন্মে। এখানে ঘোড়া, গরু, ভেড়া যথেষ্ট; অন্য প্রকারের মাংসও প্রচুর, এবং খুব বড় বড় মুরগী পাওয়া যায়। মুসলমান বণিকেরা দেশের ভিতরে গিয়া অনেক বালক বালিকা ক্রয় করে; ইহাদের পিতা মাতা বা বালক চোরেরা বিক্রয় করে। লইয়া আসিয়া খোজা করিয়া দেয়; কেহ কেহ এরূপে মারা যায়, যাহারা বাঁচিয়া উঠে তাহাদিগকে ভালরূপে মানুষ করিয়া ২০।৩০ ডুকাট মূল্যে পারসীক

(৩) এখানে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের উৎপাত লক্ষ্য করা হইয়াছে।

দিগের নিকট বিক্রয় করে। তাহারা নিজের গৃহ ও স্ত্রীলোকের রক্ষক স্বরূপে এইরূপ ক্রীতদাস বড়ই মূল্যবান্ মনে করে। এই নগরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা পা পর্য্যন্ত ঝোলান সাদা বা ফিকে রঙ্গের জোব্বা পরিয়া থাকে; নীচে কোমরে এক খানি কাপড় জড়ায়। রেসমী কোমর বন্ধে জামা আঁটে এবং তাহাতে রূপার কাজ করা ক্ষুদ্র তরবার বাঁধে। ইহারা অঙ্গুলিতে হীরা মাণিক বসান অঙ্গুরী এবং মাথায় টুপি ব্যবহার করে। ইহারা বিলাসী লোক; পানাহার যথেষ্ট চলে এবং অন্য কদভ্যাসও আছে। নিজের বাটীর পুষ্করিণীতে অনেক বার স্নান ইহাদের অভ্যাস; অনেক দাসদাসী থাকে। প্রত্যেকের ৩।৪টি বা যতগুলির ভরণপোষণ করিতে সমর্থ তত, স্ত্রী থাকে। উহাদিগকে প্রায়ই গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়; সুন্দর পোষাক, রেসমী কাপড় ও জড়োয়া সোণার গহনায় সজ্জিত থাকে। পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও পান ভোজন করিতে বা বিবাহ এবং অন্য উৎসবে ইহারা রাত্রিতে যাতায়াত করে। এখানে নানাপ্রকারের সুরা প্রস্তুত হয়,—প্রধানতঃ শর্করা ও খেজুর রসের; অন্যান্য দ্রব্যেরও হয়। স্ত্রীলোকের এই সুরা অতি প্রিয়, তাহারা ইহাতে খুব অভ্যস্ত। এদেশের লোকে গান, বাজনা ভাল জানে। সাধারণ লোকে উরু পর্য্যন্ত সাদা জামা ও ইজার পরে এবং ৩।৪ ফেরা পাগড়ী বাঁধে। সকলেই চামড়ার বা রেসমী, জড়িদার জুতা ও খড়ম ব্যবহার করে। দেশের রাজা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যে অনেক হিন্দু বসতি করে; ইহারা প্রতিনিয়ত রাজার বা শাসকবর্গের অনুগ্রহ লাভের জন্য মুসলমান হইতেছে। সমুদ্রতীরে ও ভিতরে বহু বিস্তৃত রাজ্যে অনেক হিন্দু মুসলমান বাস করে।

১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে ভিনিসের বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত সীজার ফ্রেডারিক

ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ১৮ বৎসর ধরিয়া প্রাচ্যখণ্ডে এখানে সেখানে ঘুরিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া সাধারণ পাঠকবর্গের হিতার্থে ভ্রমণ বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়াছেন, বলিতেছেন। আমরা তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণ হইতে আরম্ভ করিব। তিনি বলেন, যে পর্য্যন্ত উড়িষ্যার প্রকৃত অধিকারী হিন্দু রাজা কটকে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সেকালে লোকে টাকা হাতে লইয়া এই সুন্দর দেশের সর্ব্বত্র নির্ভয়ে যাইতে পারিত। সে রাজা বিদেশীয়গণের বিশেষতঃ ব্যবসায়ীর প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন; শুল্ক বা কোন কষ্টদায়ক কর ইহাদের উপর চাপিত না। দেশে জাহাজ আসিলে সামান্য মাশুল দিত মাত্র। প্রতিবর্ষে উড়িষ্যার বন্দরে ২৫।৩০ খানি জাহাজ চাউল, তৈল, মাখন, লাক্ষা, লঙ্কা মরিচ, আদা, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আইসে। এ দেশে ঘাসের কাপড় হয়; এক প্রকার রেসম আছে জঙ্গলে কমলা লেবুর মত বড় বড় ইহার গুটি ইচ্ছা করিলেই লোকে সংগ্রহ করিতে পারে। প্রায় ১৬ বৎসর হইল পাটনা এবং অধিকাংশ বাঙ্গলার যিনি রাজা তিনিই উক্ত হিন্দু-রাজার রাজ্য উৎসন্ন করিয়াছেন। রাজ্য অধিকার করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ২০ টাকা অধিক মাশুল বণিকদের উপরে চাপাইয়াছেন। এই অত্যাচারী রাজা অল্পকাল মাত্র এই রাজত্ব ভোগ করার পরে আর এক দুর্দ্দান্ত রাজা এদেশ অধিকার করিয়াছেন, তিনি আগ্রা দিল্লী প্রভৃতির মোগল রাজা (৪)।

আমি উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলায় পিকানো (ক্ষুদ্র) বন্দরে (সাতগাঁ)

---

(৪) মানসিংহ কর্তৃক উড়িষ্যা প্রথম অধিকার করার পরেই ফ্রেডারিক এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। মোগল-পাঠান বিপ্লবেও উড়িষ্যায় কৃষিবাণিজ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, ইহাঁর কথায় বুঝা যায়।

উপনীত হইয়াছিলাম; উহা উড়িষ্যা হইতে পূর্ব্বে ১৭০ মাইল। উপকুলে ৫৪ মাইল গিয়া গঙ্গানদীর মুখে প্রবেশ করা যায়। সেখান হইতে এক শত মাইল সাতগাঁ জোয়ারের সময়ে ১৮ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। ভাটায় নদীর স্রোতে যাওয়া অসাধ্য; অথচ নৌকা পাতলা ও দাঁড় আছে। জোয়ার আসা পর্য্যন্ত তীরে নৌকা বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। এই নৌকার নাম বজরা। সাতগাঁ পৌঁছার পূর্ব্বে বাতোর নামে এক স্থান আছে; ইহার উজানে জাহাজ যায় না, কারণ নদী অল্প গভীর ও জল কম। প্রতি বর্ষে এই বাতোরে, একটি গ্রাম প্রস্তুত হয় ও তাহা নষ্ট করা হয়। যতদিন জাহাজ থাকে চালের ঘর তুলিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এক বাজার বসে; জাহাজ চলিয়া গেলে লোকে খড়ের চাল পোড়াইয়া বাটী চলিয়া যায়। যাইবার সময় দেখিলাম এখানে অসংখ্য জাহাজ ও বজরা বাঁধা, ফিরিবার সময়ে পোড়ান ঘরের চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ছোট জাহাজ সাতগাঁ পর্য্যন্ত গিয়া বোঝাই লয়।

সাতগাঁ বন্দরে প্রতিবৎসর ৩০।৩৫ খানি জাহাজে চাউল, নানা প্রকারের কাপড়, লাক্ষা, তৈল প্রভৃতি, শর্করা ও অন্য নানাপ্রকারের বাণিজ্যদ্রব্য চালান হয়। মুসলমান নগরের মধ্যে সাতগাঁ নগর যথেষ্ট সমৃদ্ধ, নানাদ্রব্যে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে ইহা পাঠানের রাজার অধিকারে ছিল, এক্ষণে প্রধান মোগলের অধীন। আমি এই রাজ্যে চারি মাস ছিলাম; সেখানে প্রত্যহ এখানে সেখানে হাট বসে, এই কারণে বণিকেরা গঙ্গা নদীতে নৌকা করিয়া নানা স্থানের দ্রব্যাদি সুলভে ক্রয় বিক্রয় করে। আমিও একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া উজান ও ভাটি গিয়া ব্যবসা করিয়াছি এবং সেজন্য রাত্রিতে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি। বাঙ্গলা রাজ্য মুসলমানের অধীন হইলেও ইহাতে অনেক

মূর্ত্তি-পূজক হিন্দু বাস করে। দেশের ভিতরের লোকে গঙ্গানদীকে বিশেষ ভক্তি করে; কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে গঙ্গাতীরে আনিয়া ক্ষুদ্র চালা ঘর করিয়া রাখা হয় এবং প্রত্যহ তাহাকে সেই জলে ভিজান হয়। অনেকে এইরূপে মারা যায়। লোক মরিয়া গেলে তাহারা তৃণকাষ্ঠের এক স্তূপ করিয়া মৃতদেহ উহার উপর রাখিয়া দাহ করে এবং পরে অর্দ্ধদগ্ধ শবের গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেয়। দুইমাস ধরিয়া নানাস্থানে জিনিস কিনিতে গিয়া রাত্রিতে আমি এইরূপ কার্য্য দেখিয়াছি। এই কারণে পর্ত্তুগীজেরা গঙ্গার জল, খায় না; অথচ এজল দেখিতে নীল নদের জল অপেক্ষা পরিষ্কার।

সীজার ফ্রেড্রিকের এদেশে আসার ২০ বৎসর পরে আকবর বাদশার নামে এক পত্র লইয়া ইংরেজ বণিক জন নিউবেরী এবং তাঁহার সহযাত্রী রল্‌ফ ফিচ্ ভারতবর্ষে আসেন। দাক্ষিণাত্যে কাম্বে ও বিজাপুর অঞ্চলে পরিভ্রমণের পরে ইঁহারা গোয়ার পর্ত্তুগীজগণের হস্তে বন্দীভূত হন। নগর ছাড়িয়া যাইব না, এই অঙ্গীকারে জামিন দিয়া পরে ইঁহারা গোয়া হইতে পলায়ন করিয়া আকবরের তাৎকালিক রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে উপস্থিত হন (১৫৮৩ খৃঃ)। সেখান হইতে নিউবেরী পারস্যের দিকে যাত্রা করেন এবং ফিচ্‌কে বলিয়া যান, কনষ্টাণ্টিনোপল্ হইয়া তিনি দেশে যাইবেন, পরে ইংলণ্ড হইতে জাহাজ লইয়া দুই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া বাঙ্গলায় ফিচের সহিত মিলিত হইবেন। ইঁহাদের সঙ্গী মণিকার লীড্‌স ফতেপুরেই রহিয়া গেলেন; বাদশা তাঁহার বাসস্থান ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; হয়ত সেখানে বিবাহ করিয়া আর তাঁহার দেশে ফিরিবার প্রবৃত্তি রহিল না।

রল্‌ফ ফিচ্ আগরা হইতে ১৮০ খানি নৌকায় যমুনা ও গঙ্গা বাহিয়া লবণ, আফিং, কার্পেট্ প্রভৃতি মাল আসিতেছিল, তাহার একখানিতে চড়িয়া বাঙ্গলায় পৌছেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের আচার ব্যবহারের যে দুই চারি কথা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা এখনও বলবৎ আছে। প্রয়াগ ও বারাণসীতে ধর্ম্মকর্ম্ম ও সন্ন্যাসী দলের ব্যবহার যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখনও তাহাই রহিয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে এখনকার ভ্রমণকারীরা অনুসন্ধানের বলে অনেক বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। পাটনা পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে গঙ্গাতীরের স্থান সকলের সমৃদ্ধি ও দেশের উৎপাদিকা শক্তি দেখিয়া ইঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পাটনাতে মাটি ধুইয়া সোণা পাওয়ার কথাও ফিচ্ উল্লেখ করিয়াছেন। আবুল ফজল্ পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশের নদী এবং গঙ্গার বালুকা হইতেও এইরূপে স্বর্ণ পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। পাটনার কথায় ফিচ্ লিখিয়াছেন, নগরটি প্রকাণ্ড লম্বা কিন্তু ঘরগুলি প্রায়ই মাটির ও খড়ে ছাওয়ান। এখান হইতে তুলা, সূতার কাপড় এবং ভূরিপরিমাণ শর্করা ও আফিং বাঙ্গলায় চালান হয়।

'পাটনা হইতে গৌড়দেশে টাঁড়ায় উপনীত হইলাম। পূর্ব্বে ইহা পৃথক্ রাজ্য ছিল, এক্ষণে আকবরের অধিকৃত হইয়াছে। এখানে তুলা এবং বস্ত্রের বাণিজ্য সমধিক। দেশের লোকে কোমরে একটু কাপড় জড়াইয়া প্রায় উলঙ্গ থাকে। বাঙ্গলা দেশে অনেক বাঘ, বন্য মহিষ ও বন্য পক্ষী আছে। লোকে দেবোপাসক। টাঁড়া গঙ্গা হইতে তিন মাইল দূরে। পূর্ব্বে বর্ষাকালে জল উঠিয়া চারিদিক্ ডুবাইয়া দিত; এখন প্রাচীন খাত হইতে জল সরিয়া গিয়াছে। আমরা আগ্রা হইতে পাঁচ মাসে বাঙ্গলায় আসিয়াছি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অল্প সময়েও আসা যায়। বাঙ্গলা হইতে আমি কুচ দেশে যাই। টাঁড়া হইতে

পঁচিশ দিনে তথায় যাওয়া যায়। রাজা হিন্দু, নাম শুক্লধ্বজ (৫)। দেশের চতুর্দ্দিকে মাটিতে সূচাগ্র বাঁশ পোতা আছে। তাহারা ইচ্ছা হইলে দেশ ডুবাইয়া দিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত জল উঠাইতে পারে এবং যুদ্ধের সময় সমস্ত জল বিষাক্ত করিয়া দেয়। এখানে রেশম মৃগনাভি এবং সূতার কাপড় যথেষ্ঠ পাওয়া যায়। লোকে বাল্যকাল হইতে বাড়াইয়া কাণ বিতস্তি প্রমাণ লম্বা করিয়া ফেলে। এখানে সকল লোকই হিন্দু। তাহারা জীব হিংসা করে না। পশুপক্ষীর নিমিত্তও হাঁসপাতাল আছে। বৃদ্ধ এবং খঞ্জ হইয়া গেলে তাহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সযত্নে উহাদিগকে রক্ষা করে। লোকে কোন জীবিত জন্তু ধরিয়া আনিলে তাহাকে অর্থ বা খাদ্য দিয়া ঐ জন্তুকে ছাড়িয়া দেয় বা হাঁসপাতালে রাখে। পিপীলিকাকেও তাহারা খাদ্য দেয়। তাহারা পয়সা কড়ির স্থলে বাদাম ব্যবহার করে এবং অনেক সময়ে তাহা খাইয়া ফেলে।

"এখান হইতে আমি হুগলীতে ফিরিলাম। বাঙ্গলা দেশের এই স্থানেই পর্ত্তুগালেরা থাকে; ইহা ২৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে। সাতগাঁ হইতে তিন মাইল দূরে; ইহাকে পোর্টপিকানো (ক্ষুদ্র বন্দর) বলা হয়। আমরা জঙ্গল ভূমি দিয়া আসিয়াছিলাম, কেন না সোজা রাস্তায় চোর ডাকাইতের উপদ্রব। আমরা গৌড় দেশ হইয়া আসিলাম; ইহাতে গ্রাম অল্পই আছে, প্রায়ই জঙ্গল; সেখানে অনেক মহিষ, শূকর, হরিণ এবং বহুতর ব্যাঘ্র আছে। সাতগাঁ হইতে অল্প দূরে উড়িষ্যা দেশের মধ্যে এঙ্গিলী (হিজলী) নামে এক বন্দর আছে। এই দেশ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল, এবং ইহার রাজা বৈদেশিকের অনুকূল ছিলেন। পরে ইহা পাঠানের রাজার অধিকারে আইসে, কিন্তু তিনি অল্পকাল মাত্র

(৫) 'Suckel couse'—R. Fitch.

ভোগ করিয়াছেন, কারণ আগ্রা দিল্লীর রাজা আকবর উহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। উড়িষ্যা সাতগাঁ হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ছয় দিনের পথ। এই স্থানে যথেষ্ট চাউল ও সূতী কাপড় হয়। এখানে ঘাস হইতে অনেক বস্ত্র প্রস্তুত হয়; লোকে ইহাকে 'এরুয়া' বলে (৬) ইহা রেসমের মত; ইহা দ্বারা সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহারা ভারতবর্ষে ও অন্য দেশের নানা স্থানে পাঠায়। এঙ্গিলী বন্দরে প্রতিবর্ষে নাগাপটন, সুমাত্রা, মলক্কা ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক জাহাজ আসে; তাহাতে বহুতর চাউল, সূতী কাপড়, চিনি, লঙ্কা, মাখন ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বোঝাই হয়। মুসলমানদের নগরের তুলনায় সাতগাঁ বেশ সুন্দর সহর; সকল প্রকার দ্রব্যই এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে কোন না কোন স্থানে প্রতিদিন একটা বড় বাজার বসে, ইহাকে চান্দো (চাঁদনী হাট ?) বলে। ইহাদের Pericose নামে অনেক বড় বড় নৌকা আছে। এই নৌকায় নানাস্থানে গিয়া তাহারা চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য কিনিয়া আনে। নৌকাগুলিতে ২৪৷২৬ খানি দাঁড় থাকে; অনেক বোঝাই লয়, কিন্তু উপরে ছত্রি ঢাকা নাই। এখানে হিন্দুরা গঙ্গা জলকে বড়ই পবিত্র মনে করে। নিকটে ভাল জল থাকিতে ও বহুদূর হইতে গঙ্গা জল আনে; পান করিবার জন্য যথেষ্ট না হইলেও কিছু গায়ে ছিটাইয়া দিয়া সুস্থ মনে করে। সাতগাঁ হইতে আমি ত্রিপুরার রাজার দেশে গিয়াছিলাম; তাঁহার সঙ্গে মগ ও মোগলদের সর্ব্বদা যুদ্ধ কলহ চলিতেছে। আরাকান ও রামে নিবাসী মগেরা ত্রিপুরার রাজা

(৬) ইহা 'খুঞা' কাপড়ের নাম বোধ হয়। সেকালের কাব্যে এই জাতীয় বস্ত্রের উল্লেখ আছে।

অপেক্ষা বলশালী; তজ্জন্য প্রধান বন্দর (Porto Grande) চাঁটিগাঁ অনেক সময়ে আরাকানের রাজার অধিকারে আইসে (৭)।

পূর্ব্ব কথিত কুচ দেশ হইতে ৪ দিনের পথ ভোটান্ত (Botanter) দেশ এবং সহরের নাম ভুটিয়া; এখানকার রাজাকে (Dermain) ধর্ম্মরাজ কহে। এদেশের লোক দীর্ঘাকার ও বলবান্। এখানে চীন হইতে এবং লোকে বলে তাতার ও মস্কোভিয়া হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া মৃগনাভি, রেশম, জাফরান্ (পারস্যের মত) কম্বল, মূল্যবান্ পাথর (যশব=agates) ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। দেশটি বৃহৎ, তিন মাসের পথ। ইহাতে অনেক উচ্চ পর্ব্বত আছে; একটি পাহাড় এত খাড়াই উচ্চ যে, ছয় দিনের পথ উঠিলেও নীচের স্থান পরিষ্কার দেখা যায়। এই পর্ব্বতের উপর যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহাদের কাণ এক বিঘত লম্বা। কাণ বড় না হইলে তাহারা উহাকে বানর বলে। ইহারা বলে যে, পাহাড়ের উপরে উঠিলে তাহারা সমুদ্রে জাহাজ চলাচল দেখিতে পায়; কিন্তু কোথা হইতে আসে ও কোথায় যায় তাহা জানে না। তাহারা বলে, পূর্ব্ব দেশ হইতে, সূর্য্যোদয়ের স্থানের নীচে হইতে (চীন) বণিকদল আসে; তাহাদের দাড়ী নাই এবং তাহাদের দেশ কতকটা উষ্ণ। কিন্তু পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব অর্থাৎ উত্তর দিক্ হইতে যাহারা আইসে, তাহাদের দেশে অধিক শীত। এই উত্তর দেশের ব্যবসায়ীরা উলের কাপড় ও টুপী, আঁটা পায়জামা এবং মস্কো বা তাতার দেশের বুট পায়ে দেয়। ইহারা বলে এদেশে ভাল

(৭) পার্চাসের বিবরণীতে চট্টগ্রামকে রামু বলা হইয়াছে। রামরী বা রামু এখন চাঁটিগার একটি থানা। এ সময়ে মগ মোগলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। চট্টগ্রাম পূর্ব্বে পাঠানের অধিকৃত হইলেও মোগল পাঠান বিপ্লবের সময়ে ইহার কিয়দংশ আরাকান রাজের করায়ত্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

ঘোড়া পাওয়া যায়; কিন্তু ঘোড়া ছোট। কাহারও কাহারও ৪।৫।৬ শত ঘোড়া ও গরু আছে। তাহারা দুগ্ধ ও মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহারা গাভীর লেজ কাটিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। কারণ এই লেজের কাটতি বেশী এবং লোকে বড়ই আদর করিয়া লয়—(চামর)। এগুলির লোম এক গজ লম্বাও হয় এবং লেজের কর্ত্তিত অংশ বিতস্তি প্রমাণ। ইহারা হস্তীর মস্তকে শোভার জন্য ইহা বাঁধিয়া দেয়। পেগু ও চীনে ইহা অধিক ব্যবহারে লাগে; কুড়ি হিসাবে ইহা ক্রয় বিক্রয় হয়। এখানকার লোকেরা ক্ষিপ্রগামী।

চাটিগাঁ হইতে আমি বাকলায় (৮) গিয়াছিলাম। এখানকার রাজা হিন্দু; তিনি বড় ভাল লোক; বন্দুক দ্বারা শিকারে তাঁহার বড়ই আনন্দ। তাঁহার দেশ প্রকাণ্ড এবং উর্ব্বরা; এখানে বহু পরিমাণ চাউল এবং সূতী ও রেশমী কাপড় হয়। ঘরগুলি সুন্দর এবং উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত। রাস্তা বড় বড়; লোকে উলঙ্গ, কেবল সামান্য একটু কাপড় মাজায় জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা রূপার অনেক হাসুলী বালা গলায় ও হাতে পরে। পায়ে রূপাও তামার মল থাকে এবং হস্তী দন্তের মাকড়ী ব্যবহার করে। বাকলা হইতে আমি শ্রীপুরে গিয়াছিলাম; ইহা গঙ্গা নদীর উপরে। রাজার নাম Chondery (চাঁদ রায়), এখানে সকলে জেলালুদ্দীন্ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এখানে এত বেশী নদী ও দ্বীপ আছে যে সম্রাটের অশ্বারোহীরা উহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে না। এখানে বহু পরিমাণে সূতী কাপড় হয়।

(৮) বাকলা চন্দ্র দ্বীপ, বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এসময়ে রামচন্দ্র রায়ের পিতা রাজা বা ভূঁইয়া ছিলেন।

সোণার গাঁ নগর শ্রীপুর হইতে ৬ লীগ্ (৯ ক্রোশ)। এখানে ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম সূতী কাপড় প্রস্তুত হয়। এই সকল দেশের প্রধান রাজা ইশা খান্। তিনি অন্য রাজাদের অধিপতি এবং খৃষ্টানদের পরম বন্ধু। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও ঘরগুলি ক্ষুদ্র এবং খড়ের চাল। দেওয়ালের চারিদিকে ও দ্বারে মাদুর (ঝাঁপ) দ্বারা ঘেরা; যাহাতে বাঘ ও শিয়াল না আসে। এখানে অনেক লোক ধনবান্, ইহারা মাংস খায় না এবং জন্তুকে বধ করে না। তাহারা চাউল, দুগ্ধ ও ফল খাইয়া থাকে। ইহারা সম্মুখ ভাগে একটু বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া অবশিষ্ট শরীর উলঙ্গ রাখে। বহুতর সূতী কাপড় ও চাউল এখান হইতে চালান হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সিংহল, পেগু, মলাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য অনেক দেশে যায়।

বৈদেশিক পর্য্যাটক ও বণিকদিগের উল্লিখিত বিবরণের সহিত পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের জমিদারবর্গের রণতরীর কথা আলোচনা করিলে সেকালের বাঙ্গালী যে জল যাত্রায় ভীত হইত, এরূপ মনে হয় না। সুবৃহৎ বঙ্গীয় বাণিজ্য পোত সকল একালে বহু দূরদেশে যাইত, এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না; উপকূল-বর্ত্তী স্থানেই ইহাদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল, মনে হয়। মোগল অধিকারকালে বাঙ্গলার বাণিজ্য ও নৌবলের বিষয় পরে বলা যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

সুবাদারী আমল—মগ ফিরিঙ্গী।

জাহাঙ্গীর বাদশাহী মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলার শাসনভার ত্যাগ করিয়া রাজধানী যাইবার আদেশ দিলেন, এবং নিজের ধাত্রীপুত্র কুতবুদ্দীন্ খাঁকে সুবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রথম যৌবনে যাহার অনুপম রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ কল্পনায় পিতার আদেশে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই সুন্দরী-কুল ললাম মেহেরুন্নেসাকে করতলগত করিবার অভিপ্রায়েই নিজের অনুগত লোককে বাঙ্গলার কর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন, একথা জাহাঙ্গীর আত্ম-কাহিনীতে স্বীকার না করিলেও ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করিয়া লইয়াছে (১)। মেহেরুন্নেসা বা ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের জীবন

(১) 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি' গ্রন্থে শের আফ্‌কনের স্কন্ধেই দোষ অর্পিত হইয়াছে। এই পুস্তকে লিখিত আছে যে শের সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে সেলিমের সহিত অসদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও সম্রাট্ হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বাঙ্গলায় জায়গীর দেন। তৎপরে শেরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ হওয়ায় তাঁহাকে দরবারে পাঠাইবার নিমিত্ত কুতবুদ্দীনের উপর আদেশ হয়। কুতবুদ্দীন্ স্বয়ং শেরের জায়গীর বর্দ্ধমানে আসিলে শের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর কুতবুদ্দীন্ শেরকে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিলে শের ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে নিহত করেন। খাফিখাঁর মন্তাখাব্-উল্ লুবাব্ গ্রন্থে আকবর শা শেরকে জায়গীর দেন এই কথা লিখিত আছে। আকবরের সময়ে কার্য্য প্রাপ্তি ও জাহাঙ্গীরের জায়গীর দান সম্ভব মনে হয়। আকবর জায়গীর প্রথার বিরোধী ছিলেন, এবং জাহাঙ্গীর জায়গীর প্রাপ্তি

কথা সাধারণের সুপরিচিত। কিরূপে সম্ভ্রান্ত পারসীক গিয়াসুদ্দীন্ দরিদ্র ভাবাপন্ন হইয়া ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্ত সপরিবারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পথিমধ্যে পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলে বিপন্ন হইয়া সার্থবাহ দলের মধ্যে রাত্রিকালে গোপনে ঐ কন্যা রাখিয়া দিতে বাধ্য হন; এবং কিরূপে দয়ালু দলপতি শিশুর মাতাকেই তাহার ধাত্রীরূপে নিয়োজিত করিয়া ঐ পরিবারকে সঙ্গে আনিয়া আকবর বাদশাহের দরবারে গিয়াসের সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাহা শিশুপাঠ্য ইতিহাসেও বর্ণিত আছে। যুবরাজ সেলিমের দৃষ্টি মেহেরের উপর নিপতিত হইয়াছে শুনিয়া আকবর শা তাহার পিতাকে আদেশ দিয়া অন্যতম বাদশাহী কর্ম্মচারী আলি কুলী শের আফ্‌কনের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া শেরকে বর্দ্ধমানে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। আকবর ভাবিয়াছিলেন, মেহেরুন্নেসাকে দূরে রাখিলে সেলিমের রূপজ মোহ ক্রমে দূরীভূত হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিল না। দূরত্ব ও কালের ব্যবধানে সেলিমের হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। সম্রাট্ হইয়াই জাহাঙ্গীর স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কুতবকে সুবাদার করিয়া বাঙ্গলায় পাঠাইলেন। কুতব বাঙ্গলায় পৌঁছিয়া শেরকে রাজমহলে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য লিখিলেন। শের আফ্‌কন্ জাহাঙ্গীরের অভিসন্ধি বুঝিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না; সুতরাং কুতবউদ্দীন্ রাজকার্য্যের ছলে বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে তলব দিলেন। শের পরিচ্ছদের নীচে বর্ম্ম ও ক্ষুদ্র তরবারি লুকাইয়া, বিশ্বস্ত অনুচর

শেরের পত্নী ত্যাগের সহায়তা করিবে এইরূপ মনে ভাবিতে পারেন। উদয়পুরে যুদ্ধযাত্রার সময়ে স্বহস্তে এক ব্যাঘ্র হত্যার নিমিত্ত সেলিম আলি কুলীকে শের আফ্‌কন্ (ব্যাঘ্র-হন্তা) উপাধি দেন (Tujak-Beveridge)

সঙ্গে সাক্ষাতে গেলেন। কুতব অন্যান্য কথাবার্ত্তার পরে বাদশাহের বক্তব্য জানাইয়া শেরকে পত্নীত্যাগ করিবার অনুরোধ করিলেন। শের এই ঘৃণিত প্রস্তাবে ক্রোধান্ধ হইয়া ছুরিকাঘাতে কুতবের প্রাণ-সংহার করিলেন। কুতবের অনুচরবর্গ চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিয়া শেরেরও প্রাণবিনাশ করিল (২)। মেহেরুন্নেসা অতঃপর রাজধানীতে প্রেরিত হইলেন। জাহাঙ্গীর অবিলম্বে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মেহের সম্ভ্রমে স্বামী হত্যার বিচার ভিক্ষা করিলেন। এবার প্রত্যাখ্যান করিয়াও চারি বৎসর পরে সম্রাটের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া প্রথমে নূরমহল ও পরে নূরজাহান্ নাম পাইয়া তিনি বহুদিন ভারতের ভাগ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বৎসরেক এক অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা কার্য্য চালাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইস্‌লাম খাঁ সুবাদার হইয়া আসিলেন (১৬০৮)। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে আফগান্ পাঠানেরা পুনরায় দলবদ্ধ হইতেছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ মগ ও ফিরিঙ্গী পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়িয়াছিল, সেই নিমিত্ত ঢাকায় রাজধানীর স্থান মনোনীত করিয়া ইস্‌লাম খাঁ তথায় এক প্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। যথাসময়ে তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইল এবং বাদশাহের সম্মানার্থ ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগর রাখা হইল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাণিজ্য ব্যপদেশে সমাগত অনেকগুলি পর্ত্তুগীজ আরাকান ও চট্টগ্রামের উপকূল ভাগে বাস আরম্ভ করিয়াছিল। নাবিকের কার্য্যে সুপটু

(২) খাফি খাঁর গ্রন্থে আহত শেরের অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া মেহেরকে নিহত করিবার প্রয়াসের এবং মেহেরের মাতার নিকট সে পূর্ব্বেই কূপে ঝাঁপ দিয়াছে এই কথা শুনিবার এক গল্প আছে।

হওয়ায় ইহাদের অনেকে সমীপবর্ত্তী দেশীয় রাজগণের অধীনে কার্য্য পাইয়া এবং এইরূপ কার্য্যে সাহস ও দক্ষতা দেখাইয়া উপকূল ও দ্বীপ পুঞ্জে কিছু ভূসম্পত্তিও পাইয়াছিল। কিন্তু এই ফিরিঙ্গীদল শান্তি সুখে বসতি করিবার লোক ছিল না; উপকূলে বোম্বেটেগিরি এবং দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে নিরীহ লোকের উপর অযথা অত্যাচার ইহাদের নিত্য কর্ম্ম ছিল। কার্ভালোর অধিনায়কতায় প্রথমে কৃতকার্য্য হইয়াও শেষে ইহাদের যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইহাদের অত্যাচার ও কৃতঘ্নতায় জ্বালাতন হইয়া আরাকানের রাজা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ্য হইতে ফিরিঙ্গীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনেক ফিরিঙ্গী নিহত হইল; অবশিষ্ট দল পরিবারবর্গ সহ কয়েকখানি ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিয়া গঙ্গা সাগরের মুখে দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় লইল। সেখানে ও অবশ্য তাহারা লুটপাটের অভ্যাস ছাড়িল না। সনদ্বীপের মোগল ফৌজদার ফতে খাঁ এই অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে উৎখাত করিবার অভিপ্রায়ে ফিরিঙ্গী পাইলেই সংহার করিবে এই আদেশ প্রচার করিলেন। তৎপরে ৪০ খানি রণতরীর সাহায্যে ছয় শত সৈনিক সহ বোম্বেটে দলের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ শাবাজপুরের সম্মুখে পর্ত্তুগীজের সাক্ষাৎ পাইয়া মোগলদল সতেজে আক্রমণ করিল; কিন্তু ফিরিঙ্গীর পোত চালনায় সুদক্ষতা এবং কামান প্রয়োগে ক্ষিপ্রতা মোগলের সংখ্যাধিক্যের সুবিধা নষ্ট করিয়া দিল। সমস্ত রাত্রি তুমুল যুদ্ধের মধ্যে ফতে খাঁ অধিকাংশ যোদ্ধা সহ নিহত হইলেন; মোগল রণতরী ফিরিঙ্গীর হস্তে পড়িল।

এই আশাতীত জয়লাভে পর্ত্তুগীজদলের যশঃ সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইল; চতুর্দ্দিক্ হইতে দেশীয় খৃষ্টানেরা ফিরিঙ্গীর সহিত যোগ দিতে লাগিল। ইহারা সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালে নামক পর্ত্তুগীজ নাবিককে অধ্যক্ষ মনোনীত

করিয়া সনদ্বীপ স্বীয় অধিকারে আনিয়া তথায় স্থায়ী ভাবে বসিয়া পড়িবার কল্পনা করিল। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গঞ্জালে চারি শত লোক সহ সনদ্বীপে অবতরণ করিলে ফতে খাঁর ভ্রাতা বিপন্ন হইয়া সেনাদল সহ এক ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় লইলেন। আত্ম সমর্পণ করিলেও প্রাণ রক্ষা হইবে না নিশ্চয় জানিয়া ফতে খাঁর দল অসম সাহসে আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে অতীত হইলে স্পেন দেশীয় এক জাহাজ আসিয়া পড়ায় এবং জাহাজের অধ্যক্ষ পর্ত্তুগীজের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হওয়ায় একদিন রাত্রিকালে মশালের আলোকে রণবাদ্য করিতে করিতে ৫০ জন স্পেনীয় পর্ত্তুগীজের সহিত যোগে মোগলের ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিল এবং দুর্গস্থ সমস্ত লোককে নিহত করিল। সনদ্বীপের অধিবাসীরা পর্ত্তুগীজের বশ্যতা স্বীকার করায় তাহাদিগকে অভয় দেওয়া হইল; সহস্রাধিক মুসলমান এই সময়ে ফতে খাঁর ফিরিঙ্গী বধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে বন্দীকৃত ও নিহত হইয়াছিল। (৩)

গঞ্জালে এখন সনদ্বীপের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন, ফিরিঙ্গী এবং দেশীয় লোকে সকলেই তাঁহাকে স্বাধীন রাজার ন্যায় মান্য করিতে লাগিল। অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার সৈন্যবল এক হাজার পর্ত্তুগীজ দুই হাজার দেশীয় পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহীতে পরিণত হইল; ইহা ব্যতীত কামানে সজ্জিত ৮০ খানি রণতরী প্রস্তুত থাকিল। দেশ শাসন কার্য্যেও গঞ্জালে এরূপ সদাশয়তা দেখাইলেন যে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকেও ব্যবসায়ের নিমিত্ত সনদ্বীপে আসিয়া উহার সমৃদ্ধি ও রাজস্ব বৃদ্ধির সহায়তা করিল। নিকটস্থ দেশীয় রাজারা গঞ্জালের

(৩) Faria De Souza's History as in Stewart.

অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লক্ষ্য করিয়া এবং বিরাগ উৎপাদনে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু গঞ্জালের অদম্য উচ্চাভিলাষ এইরূপ সন্ধির প্রতিকূল হইল। বাকলার রাজা (৪) ইতিপূর্ব্বে ফিরিঙ্গীর দুর্দ্দশার সময়ে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতঘ্ন গঞ্জালে এখন তাঁহার রাজ্যের সীমানায় শাবাজপুর ও পাতিলা ভাঙ্গা বলে অধিকার করিলেন। এইরূপে ফিরিঙ্গীর রাজ্যও দেশীয় অর্দ্ধস্বাধীন রাজাদের অধিকারের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং নদীমুখ ফিরিঙ্গী জাহাজে রক্ষিত থাকায় এই দ্বীপাকার স্থান গুলি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইল।

এই সময়ে আর একটি ঘটনায় ফিরিঙ্গীর অর্থাগম ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল। আরাকান রাজের ভ্রাতা অন্যায় আচরণ করিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া সনদ্বীপে গঞ্জালের আশ্রয় লইয়াছিলেন। নিজের অধিকৃত প্রদেশের পুনরধিকারে সহায়তা করিলে তিনি গঞ্জালেকে প্রচুর অর্থসহ ভগিনী দানের অঙ্গীকার করিলেন। গঞ্জালে কয়েকখানি জাহাজে সৈন্য সামন্ত পাঠাইলেন; কিন্তু রাজার পক্ষের লোকের বাধা অতিক্রম সহজ হইল না। রাজভ্রাতার সম্পত্তি ও পরিবার বর্গকেই উদ্ধার করা হইল মাত্র। সনদ্বীপে পৌছিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত ভগিনীকে খৃষ্টান হইয়া ফিরিঙ্গীর পত্নীত্বে প্রদান করিতে হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থদানও হইল। রাজকুমার অল্প দিন পরে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তিও গঞ্জালের হস্তগত হইল; বিষপ্রয়োগে মৃত্যু ঘটনার সন্দেহও রহিয়া গেল।

পরবর্ষে (১৬১০) আরাকানের রাজা বাঙ্গলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে

(৪) চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রামচন্দ্র রায়।

গঞ্জালের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইলেন, স্থির হইল যে রাজা তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া স্থলপথে অগ্রসর হইবেন, পর্তুগীজেরা সমুদ্রে ও নদীমুখে ক্ষুদ্র বৃহৎ রণতরী দ্বারা সহায়তা করিবে। গঞ্জালের ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া আরাকান-রাজ নিজের রণতরীগুলিও ফিরিঙ্গীর অধীনে এই যুদ্ধে নিয়োগ করিবেন; যুদ্ধযাত্রায় যাহা কিছু লাভ হইবে, উভয় পক্ষ সমান ভাগে লইবেন। এইরূপে মগ ও ফিরিঙ্গীর সম্মিলিত বাহিনী অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মীপুর ও ভুলুয়া অধিকার করিল। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সুবাদারের প্রেরিত বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য আসিয়া পৌঁছিলে মগেরা পরাজিত হইল। পর্তুগীজেরা নদীমুখ গুলি রণতরী যোগে সুরক্ষিত করিতে না পারায় মোগল দল চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত মগের অনুসরণ করিয়া অনেককে নিহত করিল। আরাকান রাজ অতিকষ্টে হস্তীপৃষ্ঠে পলায়ন করিলেন; বাঙ্গালা জয়ের আশা ফুরাইল।

ইস্‌লাম খাঁ এই সময়ে ঢাকায় স্থায়ীভাবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই এই সম্মিলিত মগ ফিরিঙ্গীর উদ্যম এত শীঘ্র বিফল হইল। সুদক্ষ সুবাদার অতঃপর দক্ষিণ বঙ্গের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন; তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী দিয়া সম্মানিত করিলেন। পরবর্ষে ওস্‌মান খাঁর অধীনে আফগান দল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শান্তভাবে বসতি করিতে সম্মত না হওয়ায় যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। বীর প্রবর ওস্‌মান এ যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইলেও ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মোগলের হস্তে নিহত হইলে পাঠানেরা পরাভূত হইল। এই শেষ মোগল পাঠান সংঘর্ষের বিষয় সংক্ষেপে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা কাসেম্

খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া আসিলেন। ইঁহার শাসনকালে ফিরিঙ্গী ও মগের হাঙ্গামা আবার প্রবল হইল। আরাকানরাজের পূর্ব্ব পরাজয় ও পলায়নের পরে বিশ্বাস-ঘাতক গঞ্জালে মগ জাহাজের অধিনেতৃবর্গকে নিজ জাহাজে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিহত করিল এবং তাহাদের জাহাজগুলি আয়ত্ত করিয়া সনদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দুর্ব্বৃত্ত শুদ্ধ এইরূপেই মিত্রতার প্রতিদান করিল তাহা নহে। দলবল সাজাইয়া আরাকানের উপকূলভাগ লুণ্ঠন করিতে গেল। মোগলের নিকট পরাজিত এবং রণতরীগুলি আততায়ীর হস্তগত হওয়ায় উপকূল অরক্ষিত অবস্থাতেই ছিল। ফিরিঙ্গীরা উপকূলের গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া ভস্মীভূত করিল; নদী মুখে ব্যবসায়ীর জাহাজ লুঠ করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল। এখানে ফিরিঙ্গী পরাভূত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। ফিরিবার সময় গঞ্জালে দেখিতে পাইল, তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রতিভূ ভ্রাতুষ্পুত্রকে মগেরা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর শূলে আরোপিত করিয়াছে। এই ঘটনায় দুরাত্মার হৃদয়ে স্বকীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত দুঃখের উদ্রেক না হইয়া প্রতিহিংসাই জাগাইয়া দিল। সে গোয়ার পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষের নিকট আরাকান বিজয়ের প্রস্তাব পাঠাইল। স্বজাতি নিধনের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তই যে সে আরাকান রাজের বিরুদ্ধাচারী, একথা অবশ্য মুখবন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লেখ থাকিল। সমৃদ্ধ ও শস্যশালী আরাকান দেশ সহজেই অধিকৃত হইতে পারে; রাজার সৈন্য বল অতি সামান্য। পর্ত্তুগীজ জাহাজ আসিলে গঞ্জালে নিজের সমগ্র রণতরী ও সৈন্য সামন্ত সহিত যোগ দিবেন এবং ভবিষ্যতে করস্বরূপে এক জাহাজ করিয়া চাউল প্রতি বৎসর গোয়ায় পাঠাইবেন, ইত্যাদি কথা থাকিল। গোয়ার অধ্যক্ষের নিকট গঞ্জালের বশ্যতা স্বীকার অবশ্য এই প্রথম।

গোয়ার পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ ভারতবর্ষের উপকূলভাগে ও দ্বীপপুঞ্জে পর্ত্তুগীজের অধিকার বিস্তার ও প্রভুত্ব প্রসারের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি গঞ্জালের এই প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া ডন্ ফ্রান্সিস্ নামক পোতাধ্যক্ষের অধীনে ক্ষুদ্র বৃহৎ ১৬খানি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলেন। ফিরিঙ্গী বোম্বেটের সহায়তার উপর নির্ভর না করিয়া অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের প্রথমে আরাকানের নদীমুখে উপনীত হইয়া ডন্ ফ্রান্সিস্ গঞ্জালেকে সংবাদ পাঠাইলেন, এবং এই লোক ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই যুক্তি যুক্ত মনে করিলেন। এ দিকে আরাকানের রাজা পর্ত্তুগীজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ওলন্দাজ জাহাজের অধ্যক্ষকে স্বপক্ষে আনয়নে সফলকাম হইলেন। এই সময়ে কয়েকখানি ওলন্দাজ জাহাজ তথাকার বন্দরে ছিল। ১৫ই অক্টোবর একখানি ওলন্দাজ রণতরী ও বহুসংখ্যক মগের জাহাজ পর্ত্তুগীজকে আক্রমণ করিল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পরও কোন পক্ষের জয় পরাজয় নিশ্চিত হইল না; সন্ধ্যার সময় মগ পক্ষেরা ফিরিয়া গেল। এই অবস্থায় প্রায় এক মাস অতীত হইলে গঞ্জালে ৫০খানি রণতরী সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে সংবাদ না দেওয়ার জন্য এবং যোগদানের পূর্ব্বেই নদীমুখে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অনুযোগ করিয়া শেষে পরামর্শ চলিল। ১৫ই নবেম্বর পর্ত্তুগীজ রণতরী দুই দলে বিভক্ত হইয়া নদী মধ্যে প্রবেশ করিল; একদলের নায়ক ডন্ ফ্রান্সিস্ স্বয়ং রহিলেন, অপর দল গঞ্জালের অধীনে থাকিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ইহারা দেখিল ওলন্দাজ ও মগের জাহাজ বাধা দিবার নিমিত্ত সজ্জিত আছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিল। ডন্ ফ্রান্সিস্ গোলার আঘাতে পঞ্চত্ব পাওয়ায় এবং দুই শত পর্ত্তুগীজ নিহত হওয়ায় গঞ্জালে প্রস্থান

করাই যুক্তি যুক্ত বোধ করিলেন। তাটার সময় হটিয়া পড়িলেন; অন্যান্য অধিনায়কদের সহিত পরামর্শে আরাকান জয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করাই স্থির হইল। পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীরা গোয়ায় ফিরিলেন; গঞ্জালের অনেক অনুচর তাঁহাদের সঙ্গ লইল, কারণ তাহার পাশবিক আচরণের জন্য অনেকেই তাহার প্রতি বিরূপ ছিল। পর বর্ষে আরাকান রাজ গঞ্জালেকে পরাভূত করিয়া সন্দীপ অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার পরে গঞ্জালের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ফিরিঙ্গী পর্য্যুদস্ত হইল; আরাকান বাসী মগেরা এখন দক্ষিণ বঙ্গ ছারখার করিতে লাগিল।

সুবাদার কাসেম্ খাঁ মগের উৎপাত নিবারণে অসমর্থ হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দক্ষতর ইব্রাহিম্ খাঁকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করা হইল। ইব্রাহিম্ সৈন্য সামন্ত ও উপযুক্ত রণপোত নিয়োজিত করিয়া কয়েক বৎসর মগ ফিরিঙ্গীর আক্রমণে বাধা দিলেন মাত্র, স্থায়ী ফল কিছুই হইল না। অতঃপর শাজাহান্ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে দক্ষিণ বঙ্গের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। বহুদিন ধরিয়া মগ ফিরিঙ্গী অত্যাচারের ফলে দক্ষিণ বঙ্গ জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইল। ফরাসী পর্য্যটক (৫) বার্ণিয়ে লিখিয়াছেন;—মোগলদের ভয়ে আরাকানের রাজা নিজ রাজ্যের সীমান্তদেশে চাটগাঁও বন্দরে পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে জমি দিয়া বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই পর্ত্তুগীজের ব্যবসা জলপথে এবং স্থলভাগে লুণ্ঠন করা। ছোট বড় নৌকা সাহায্যে উহারা প্রায়ই গঙ্গার শাখা প্রশাখা দিয়া ৬০।৭০ ক্রোশ পর্য্যন্ত দেশের

(৫) Bernier's-Travels বার্ণিয়ে শাজাহানের রাজত্বকালে ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে এদেশে আসেন।

ভিতর প্রবেশ করিয়া লুঠ পাট করিত। তাহারা অকস্মাৎ আপতিত হইয়া বহু নগর, হাট বাজার, ভোজ বা বিবাহসভা প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিয়া লোকজনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ছোট বড় সমস্ত স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া অমানুষিক যন্ত্রণা দিত এবং যে সকল দ্রব্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিত না, তাহা পোড়াইয়া ফেলিত। এই কারণে গঙ্গার মোহানার নিকট অনেক সুন্দর জনশূন্য দ্বীপ দেখা যায়, যেখানে পূর্ব্বে বহুলোক বাস করিত। এখন সেই সকলস্থান বন্য পশুর বিশেষতঃ ব্যাঘ্রের বাসভূমি হইয়াছে।

একজন সমসাময়িক মুসলমান লেখক মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারের যে বিবরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম উল্লিখিত হইল:—(৬)

'সম্রাট আকবরের সময় হইতে সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় পর্য্যন্ত আরাকানের মগ এবং পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ জলপথে আসিয়া বাঙ্গলা লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ ছোট বড় সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত এবং একজনের উপর আর একজনকে চাপাইয়া জাহাজের পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। যেমন লোকে পাখীকে আহার দেয় সেইরূপ তাহারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদের আহারের নিমিত্ত চাউল ছড়াইয়া দিত। যে সকল বন্দী এত কষ্ট পাইয়াও বাঁচিয়া থাকিত, দেশে ফিরিয়া গিয়া

(৬) সাবসুদ্দীন তালিস্ লিখিত বিবরণী; শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Studies in Mughal India পুস্তকে 'চাটগাঁওর ফিরিঙ্গীদস্যু' প্রবন্ধে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

বলের তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে চাস বা অন্য কাজে লাগাইত এবং নানারূপে নির্য্যাতন করিত। অপর বন্দীদিগকে দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে লইয়া গিয়া ওলন্দাজ ইংরেজ বা ফরাসী বণিকগণের নিকট বিক্রয় করিত। কখনও বা উচ্চমূল্য পাইবার আশায় তমলুক বা বালেশ্বর বন্দরেও বন্দী বিক্রয় করিতে আসিত। ফিরিঙ্গী দস্যুরাই বন্দীগণকে বিক্রয় করিতে যাইত। মগেরা বন্দীদিগকে নিজের দেশে কৃষিকার্য্যে ও অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত করে। বহু সৈয়দ ও সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান ভদ্রলোক ঐ সকল দুষ্ট লোকদিগের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং বহু সদ্বংশজাত ও সৈয়দ মহিলা উহাদের দাসী ও উপপত্নী হইয়াছেন। ঐ অঞ্চলে মুসলমানেরা যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, ইউরোপেও সেইরূপ লাঞ্ছনা পাইতে হয় নাই। এই অত্যাচার কোন শাসনকর্ত্তার সময়ে অল্প, আবার কাহারও সময়ে বা বেশী হইত।

'মগেরা বহুকাল ধরিয়া দস্যুতা করার ফলে তাহাদের দেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ক্রমেই জনশূন্য হইয়াছে এবং দস্যুদিগকে বাধা দিবার শক্তিও ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে এই দস্যুদলের যাতায়াতের পথে নদীগুলির উভয় পার্শ্বে একজন গৃহস্থও রহিল না। তাহাদের সচরাচর যাতায়াতের পথে বাকলা অঞ্চল এবং বাঙ্গলার অন্যান্য অংশ পূর্ব্বে শস্যশালী এবং গৃহস্থের পল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিবর্ষে এই প্রদেশ হইতে বহু পরিমাণ সুপারির কর আদায় হইয়া রাজকোষ পূর্ণ করিত। কিন্তু এই দস্যুদল লুণ্ঠন ও নরনারী হরণ করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে তথায় একখানি বসতবাটীও নাই; অথবা একটি প্রদীপ জ্বালাইবার লোকও

নাই। অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইল যে ঢাকার শাসনকর্ত্তা কি উপায়ে ঐ নগর রক্ষা করিবেন এবং দস্যুদলের ঢাকায় আগমনে বাধা দিবেন, কেবল এই চেষ্টায় মন ও শক্তি নিয়োগ করিলেন ;—অন্যস্থান রক্ষা করা ত দূরের কথা। ঢাকা রক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী খালের মধ্যে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লৌহশৃঙ্খল সকল টাঙাইয়া রাখা হইল ও খালের উপর বাঁশের পোল তৈয়ার করা হইল।

'মোগল নাবিকেরা মগদিগকে এত ভয় করিত যে বহুদূর হইতে চারি খানি মগের জাহাজ দেখিলে, একশত মোগল পোত থাকিলেও মোগল নাবিকেরা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই সাহস ও বীরত্বের জন্য প্রশংসিত হইত। আর যদি হঠাৎ মোগল ও মগ পোত কাছাকাছি আসিয়া পড়িত, তবে মোগলেরা অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিত, এবং ডুবিয়া মরাকে ও বন্দীত্ব অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করিত। ব্রহ্মপুত্র হইতে ক্ষুদ্র নদীর মত একটি নালা খিজ্জিরপুরের ধার দিয়া আসিয়া ঢাকার নিয়স্থ নালার সহিত মিলিত ছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে মগেরা এই পথ দিয়া ঢাকা লুঠ করিতে আসিত। ক্রমে এই নালা শুকাইয়া যাওয়ায় এই পথ বন্ধ হয় এবং মগেরাও ঢাকার অন্যান্য পরগণার গ্রাম সকল লুঠ করিতে আরম্ভ করায় সহরের দিকে আসিতে চেষ্টা করিত না। অন্যান্য স্থানের মধ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি মগেরা লুঠ করিতে আসিত ; যথা ভুলুয়া, সনদ্বীপ, সংগ্রাম গড় (অধুনা লুপ্ত), ঢাকা, বিক্রমপুর, যশোর, হুগলী, ভূষণা, সোনার-গাঁও ইত্যাদি।

মগের অত্যাচার ইহার পরেও বহুকাল চলিয়াছিল। এখনও কোনস্থানে অন্যায় অনাচার হইলে লোকে 'যেন মগের মুলুক' এই কথা বলিয়া থাকে। মোগল সুবাদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সৈন্য সামন্ত যুনিক্ত

করিলে ইহারা কিছুকাল সরিয়া পড়িত। আরঙ্গজেবের সময়ে সায়েস্তা খাঁর শাসনে কিছুদিন মগের আক্রমণ নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে আবার ইহাদের উৎপাতের কথা ইংরেজী কাগজ পত্রে পাওয়া যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রনিকল্ পুস্তিকায় (১) নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। "ফেব্রুয়ারী ১৭১৭—বাঙ্গলার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মগেরা আঠার শত নগরবাসী ও বালক বালিকাকে ধরিয়া লইয়া যায়। দশ দিনের মধ্যে তাহারা আরাকান দেশে পৌঁছিল। আরাকান রাজের সম্মুখে বন্দীদিগকে উপস্থিত করা হইল। তিনি শিল্পকার্য্যকুশল লোকদিগকে বাছিয়া লইয়া নিজের দাসরূপে গ্রহণ করিলেন ; ইহারা সমগ্র বন্দীসংখ্যার চতুর্থাংশ। অবশিষ্ট বন্দীদিগের গলায় রজ্জু দিয়া বাজারে লইয়া গিয়া শারীরিক বলের তারতম্যানুসারে কুড়ি হইতে সত্তর মুদ্রা দরে বিক্রয় করা হইল। ক্রেতারা দাসগণকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিল এবং মাসিক ১৫ সের চাউল খোরাকের জন্য দিল। আরাকানের প্রায় চারিভাগের তিনভাগ লোক বন্দীকৃত বাঙ্গলার অধিবাসী বা তাহাদের বংশধর।"

এইরূপে শতাধিক বৎসর ধরিয়া মগের ও ফিরিঙ্গীর উৎপাত ও অমানুষিক অত্যাচারের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গ উৎসন্ন হইয়াছিল। যে সুন্দরবন এখন ব্যাঘ্র গণ্ডার এবং কুম্ভীরের আবাস ভূমি হইয়াছে, তাহা এককালে শস্যশালী জনপূর্ণ স্থান ছিল। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে ভিনিসীয় বণিক কণ্টি গঙ্গার মোহানার নিকটস্থ সমস্ত তীরভূমি নগর ও উপবনে পূর্ণ দেখিয়া গিয়াছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের নিবিড়-তম অংশে প্রাচীন অট্টালিকা সমূহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া

(১) Good old days of Hon. John Company Vol. I, p. 465.

থাকে। পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে দাস ব্যবসায় আরম্ভ করে, মগেরা অষ্টাদশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাহা চালাইয়াছিল। ইংরেজী কাগজ পত্রে উল্লেখ আছে যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দেও আথরা ও বজবজের নিকটবর্ত্তী স্থানে দাস বিক্রয়ার্থ পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী ও মগের জাহাজ আসিত।

সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর সুশাসনে পাঁচ বৎসরের জন্য বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল; কৃষি বাণিজ্যাদির উন্নতিতে লোকের সুখ সাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং শিল্পজাত দ্রব্যের অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন হইতেছিল। ঢাকার সূক্ষ্ম মস্‌লীন এবং মালদহের রেশমী বস্ত্র বাদশার দরবারে সমাদর লাভ করিয়াছিল। রাজ্ঞী নুরজাহান্ মহিলাদের পরিচ্ছদের নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া চিকণ ও ফুলদার কাপড়ের আদর বাড়াইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের শীতলপাটী ও বাঙ্গলার সোণা রূপার অলঙ্কারও অন্যত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মধ্যবঙ্গে অনেক দিন হইতে শান্তি বিরাজ করিতেছিল; এক্ষণে আসামীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এবং মগের বিরুদ্ধে নদীমুখে রণপোত রাখিয়া ইব্রাহিম খাঁ সচ্ছন্দে থাকিবেন, দেশে সম্পূর্ণ সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ভাবিয়াছেন, এমন সময়ে অন্য এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনায় বাঙ্গলায় পুনরায় বিগ্রহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাজাহান্ সর্ব্বাংশে অন্য রাজপুত্রদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজপুতানায় এবং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধকার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি যেরূপ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে তিনিই সম্রাট্ হইবেন, ইহা অনেকেই বুঝিয়াছিল। রাজ্ঞী নুরজাহান্ দেখিলেন, এরূপ হইলে তাঁহার নিজের সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইবে। সুতরাং দুর্ব্বলচিত্ত বাদশাহের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবার

নিমিত্ত সুযোগ পাইলেই শাজাহানের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর উদ্দেশ্য নিজ জামাতা সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র অকর্ম্মণ্য শাহ্‌রিয়াকে ভবিষ্যতে নামে মাত্র সম্রাট করাইয়া সমস্ত শাসন ক্ষমতা স্বয়ং আজীবন পরিচালনা করিবেন। জাহাঙ্গীর শেষ জীবনে তাঁহার হস্তের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া পড়িয়াছিলেন; স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পুত্রের উপর সম্রাটের বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া সেই কারণেই সহজ হইয়াছিল। কিরূপে এই কুমন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা ভারত ইতিহাসের বিষয়। শাজাহান্ দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহী হইলেন। সেনাপতি মহবৎ খাঁ এবং কুমার পরবেজ তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিলে শাজাহান্ বাঙ্গলা অধিকার করিয়া লইবার কল্পনায় উড়িষ্যা হইয়া বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানে কয়েকজন আফ্‌গান্ সেনানী তাঁহার দলে যোগ দিল; তাঁহার পরিচিত মোগল সামন্তদিগকেও সপক্ষে আনিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। শাজাহানের বর্দ্ধমান অধিকার করার পরে হুগলীর পর্ত্তুগীজ কুঠীর অধ্যক্ষ রড্রিগো ভয় পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শাজাহান্ প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কতকগুলি কামান ও গোলন্দাজ সৈন্য চাহিলেন। কিন্তু চতুর পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ কুমারের তাৎকালিক কল্পনা বিফল হইবে ভাবিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, পর্ত্তুগীজগণের উপর এই কারণে শাজাহানের আক্রোশ ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে বাঙ্গলা হইতে দূরীভূত করিয়া তিনি ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

সুবাদার ইব্রাহিম্ খাঁ এই অভাবনীয় আক্রমণের সংবাদে বিব্রত হইলেন। বঙ্গীয় সৈন্যের এক ভাগ তখন চট্টগ্রামে মগদিগের বিরুদ্ধে নিয়োজিত ছিল; আর কয়েকদল এখানে সেখানে রাজস্ব সংগ্রহে

সাহায্য করিতেছিল। যাহাহউক, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সদলে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইয়া সমগ্র সৈন্যদলকে তথায় সমবেত হইবার আদেশ দিলেন। রাজমহল সুরক্ষিত করা সম্ভব নহে দেখিয়া তিনি তেলিয়াগড়ীর দুর্গের দিকে ফিরিলেন; এখানে কতকগুলি ইউরোপীয় গোলন্দাজের অধীনে কামান সজ্জিত ছিল। কিন্তু এস্থানে যুদ্ধদানও নিরাপদ নহে ভাবিয়া গঙ্গার অপর পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন; গঙ্গাবক্ষে সমস্ত তরণী সেই পারেই রাখা হইল। শাজাহান্ বাঙ্গলার সুবাদারকে প্রথমে সপক্ষে আনিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বিফল হইয়া তেলিয়াগড়ীর দিকেই অগ্রসর হইলেন। আফগান্ সেনানীদিগের চেষ্টায় সুতীর নিকটে নৌকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সৈন্যদল গঙ্গা পার হইল। যথেষ্ট উদ্যোগ সত্ত্বেও সুবাদার যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হইলেন: তেলিয়াগড়ীও শাজাহানের আয়ত্ত হইল। বঙ্গের জমিদার ও রাজকর্ম্মচারীবর্গ শাজাহানের বশ্যতা স্বীকার করিল। ঢাকা অধিকার করায় সুবাদারের সংগৃহীত অর্থও তাঁহার হাতে পড়িল।

ঢাকার রাজকোষে ৪০ লক্ষ টাকা পাইয়া শাজাহান্ সোৎসাহে পাটনার দিকে যাত্রা করিলেন। পাটনা সহজেই অধিকৃত হইল; বিহার প্রদেশের রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারবর্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রোটাস্ দুর্গের অধ্যক্ষ ও তাঁহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। তিনি রোটাসে নিজের এবং অনুগত প্রধান সেনানায়কগণের পরিবার-বর্গকে রাখিয়া এলাহাবাদের দিকে সৈন্য চালিত করিলেন। এদিকে মহবৎ খাঁ ও পরবেজ মালবের পথ হইয়া রাজকীয় বাহিনী সঙ্গে এলাহাবাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছিলেন। এলাহাবাদের কয়েক মাইল পূর্ব্বদিকে দুই দলে এক তুমুল যুদ্ধ হইল। শাজাহান্ পরাজিত হইয়া পাটনার দিকে পলাইলেন। বাদশাহী সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিল;

শেষে যে পথে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সেই পথেই শাজাহানকে দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিতে হইল। তথা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতার নিকট পত্র দিলেন; গোলযোগ মিটিল।

অতঃপর মহবৎ খাঁ কিয়ৎকাল অস্থায়ীভাবে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এখানে তিনি অথবা তাঁহার পুত্র খানেজাদ্ প্রজা পীড়ন করিয়া এবং জায়গীর প্রভৃতি হইতে অনেক টাকা রাজস্ব আদায় করেন (৬)। এই ব্যবহার তাঁহার প্রতি সম্রাটের বা নুরজাহানের বিরাগের অন্যতম কারণ বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, মহবৎ দরবারে আসিবার আদেশ পাইয়া সদলে উপস্থিত হইয়া লাহোরের নিকটে সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া ফেলেন। শেষে নুরজাহানের কৃতিত্বে জাহাঙ্গীরের মুক্তি লাভ ঘটে। পরবর্ত্তী দুইজন সুবাদারের সময়ে বাঙ্গলায় উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই।

শাজাহান্ সম্রাট্ হইয়া নিজের প্রিয়পাত্র কাসেম্ খাঁ জোয়ানীকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। হুগলীর পর্ত্তুগীজের সহিত সংঘর্ষ ইহাঁর সময়ের প্রধান ঘটনা। সপ্তগ্রামের নীচে সরস্বতীর প্রবাহ মন্দীভূত হওয়ায় পর্ত্তুগীজ বণিক্ কোম্পানীর লোকেরা বাদশার অনুমতি লইয়া হুগলীর ব্যাণ্ডেলে এক কুঠী স্থাপন করে। এখানে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা যে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, বঙ্গদেশে তাহাই সর্ব্ব প্রাচীন

(৬) ষ্টুয়াট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মহবৎ খাঁ শাজাহানের অনুসরণ করিলে খানেজাদ্ প্রতিনিধি স্বরূপ বাঙ্গলা শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সম্রাট্‌কে করায়ত্ত করিয়া যখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, তখন খানেজাদ্ বাঙ্গলা হইতে দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন; কিন্তু এই টাকা দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহবতের ক্ষমতা লোপ হইয়াছিল।

খৃষ্ট মন্দির। ব্যাণ্ডেলের পর্ত্তুগীজ কুঠী ক্রমে দুর্গে পরিণত হইল। পর্ত্তুগীজ কোম্পানীর লোক অন্যান্য স্থানের মত এ দেশেও সুবিধা পাইলেই অনাচার করিত। প্রকাশ্য ভাবে বোম্বেটিয়ার দলে যোগ না দিলেও ইহারা বাণিজ্যে জোর জবরদস্তী কোন সময়েই ত্যাগ করে নাই। সময়ে সময়ে লোককে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিত, স্থানে স্থানে বালক বালিকা ধরিয়া লইয়া গিয়া অন্যত্র দাসরূপে বিক্রয় করিত। ব্যাণ্ডেলের নীচে দিয়া ব্যবসায়ীর নৌকা গেলে বলপূর্ব্বক মাশুল আদায় করিত। পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা এসময়ে মগের সহিত যোগ দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গে ভয়ানক অত্যাচারও করিতেছিল। এই সমস্ত কারণে সুবাদার কাসেম্ খাঁ বাদশাহের অনুমতি লইয়া (৭) হুগলী হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ষ্টুয়ার্টের গ্রন্থে এই পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী দলন ব্যাপার এক তুমুল যুদ্ধ-কাণ্ডে পরিণত হইয়া 'মশা মারিতে কামান পাতা'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি লিখিয়াছেন, সুবাদার সাবধানে পর্ত্তুগীজগণ যাহাতে এই অভিযানের বাষ্পমাত্র না জানিতে পারে এইভাবে গোপনে ইহা চালিত করিয়াছিলেন। হুগলী ও মুর্শিদাবাদের অবাধ্য জমিদার-দলনের ভাণ করিয়া তিনি তিন দিক্ দিয়া সুদক্ষ সেনানীর অধীনে তিন দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহারা ঘুরিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিক্

(৭) ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে নির্দ্দেশ আছে যে, শাজাহান্ বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ রড্রিগোর সাহায্য চাহিলে তিনি কোনপ্রকার সাহায্য দানে অস্বীকৃত হন। ইহাতে তিনি জাতক্রোধ ছিলেন বলিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সুবিজ্ঞ সম্রাটের পক্ষে এই জাতীয় ক্রোধ সম্ভব মনে হয় না। কোন কোন পুস্তকে পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারকের মমতাজ মহালের দুই কন্যাকে খৃষ্টান করার অদ্ভুত কথা আছে।

বেষ্টন করিল। একদল শ্রীরামপুরের নিকটে নদীতে সেতুবন্ধন করিয়া পর্ত্তুগীজের নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া রহিল। সাড়ে তিন মাস কাল ব্যাণ্ডেলের পর্ত্তুগীজ দুর্গ এইরূপে বেষ্টিত রহিল, এবং উভয় পক্ষে গুলি গোলা চালান চলিল। ইতিমধ্যে পর্ত্তুগীজেরা এক লক্ষ টাকা দিয়া বশ্যতা স্বীকারেরও প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু গোয়া হইতে সাহায্য আসিবার আশা থাকায় তাহারা যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করে নাই।

মোগল দলপতিরা বাহির হইতে আক্রমণের সুবিধা করিতে না পারিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। যেখানে পর্ত্তুগীজ গির্জ্জা আছে তাহার সম্মুখের পরিখা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অগভীর ছিল। তাহার জল সেচিয়া ফেলিয়া নিম্নে বারুদ স্থাপন করিয়া দুর্গ প্রাচীর উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। দুর্গ মধ্যস্থ অনেক লোক যখন ঐ দিক্ আক্রান্ত হইবে ভাবিয়া তাহার উপর যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল, সেই সময়ে অগ্নিসংযোগে ঐ অংশ উড়াইয়া দেওয়ায় বহুলোক নিহত হইল। মোগলদল ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। অনেক পর্ত্তুগীজ জাহাজে উঠিয়া পলায়নের উদ্যমে নিহত হইল। যাহারা জাহাজে উঠিল, তাহাদের উপরেও গোলাগুলি বর্ষিত হইল। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজখানিতে স্ত্রীলোক বালক সমেত দুই সহস্র লোক উঠিয়াছিল; তাহার কাপ্তেন শত্রু হস্তে পড়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়া জাহাজের বারুদ ঘরে আগুন দিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। অন্যান্য জাহাজের লোকেও তাঁহার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিল। ৬৪ খানি বড় জাহাজ ৫৭ খানি গ্রাব্ এবং দুইশত সুলুপের মধ্যে গোয়ার এক গ্রাব্ ও দুইখানি সুলুপ পলাইতে পারিয়াছিল। জাহাজের আগুনে মোগল পক্ষের নীচের সেতু দগ্ধ হওয়াতেই তাহারা পথ পাইয়াছিল। মোগলেরা পর্ত্তুগীজদের যাহা কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিল, সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া

গির্জ্জার সমস্ত মূর্ত্তি ও ছবি নষ্ট করিয়াছিল। প্রায় এক সহস্র পর্ত্তুগীজ এই যুদ্ধ ব্যাপারে নিহত হইয়াছিল এবং ৪৪ শত লোক (স্ত্রীলোক বালক বালিকাদি সমেত) বন্দীভূত হইয়াছিল (৮)। পাঁচ শত সুশ্রী যুবক যুবতী আগরায় প্রেরিত হয়। যুবকদিগকে মুসলমান করা হইয়াছিল; যুবতীরা বাদশার ও আমিরবর্গের হারমে গৃহীত হইল। জেসুইট্ পাদরীদিগকে কিছুদিন পরে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর রাজকীয় অফিস আদালত প্রভৃতি সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে উঠাইয়া আনা হইল। হুগলীতে এক ফৌজদার স্থাপন করিয়া সুবাদারের অধীনে তাঁহাকে এই অঞ্চলের শাসন পর্য্যবেক্ষণের ভার দেওয়া হইল। এই সময়ে সপ্তগ্রামের প্রান্তবাহিনী সরস্বতীর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় ব্যবসায়ীদলও একে একে সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগলীতে আসিয়া কারবার আরম্ভ করিয়াছিল; ক্রমে অন্যান্য অধিবাসীরাও হুগলী এবং গঙ্গাতীরে অন্যান্য স্থানে আসিয়া পড়ায় প্রাচীন সপ্তগ্রাম ধ্বংস মুখে পতিত হইল। পর্ত্তুগীজগণের বাঙ্গলা হইতে তাড়িত হওয়ার কিছুদিন পরে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকে এখানে আসিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান; কিন্তু পর্ত্তুগীজের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া প্রথম প্রথম তাহাদিগকে কোথাও স্থায়ী কুঠী করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা প্রথমে বালেশ্বর অঞ্চলে সমুদ্রতীরে পিপ্‌লী প্রভৃতি স্থানেই ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন। শেষে শাজাহানের পুত্র সুজার অনুগ্রহে দেশের মধ্যে কুঠী করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

কাসেম্ খাঁর অকাল মৃত্যু ঘটনায় আজিম খাঁ সুবাদার হইয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার মত নিরীহ লোকের পক্ষে এসময়ে দেশ

(৮) এত লোক ছিল স্বীকার করিতে হইলে পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খৃষ্টান ব্যতীত অন্য লোকও গণনায় আইসে।

শাসন অসম্ভব ছিল। মগেরা দক্ষিণ বঙ্গে বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল; পূর্ব্বদিক্ হইতে আসামীরা বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়া লুট-পাট করিতে লাগিল। আজিম প্রতিবিধানে অশক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থানে ইস্‌লাম খাঁ সুবাদার হইয়া আসিলেন (১৬৩৭ খৃঃ)। তাঁহাকে যুদ্ধ ব্যাপারেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে মগদিগের মধ্যে গৃহ-বিবাদ চলিতেছিল। চট্টগ্রাম মোগলের অধিকার ভুক্ত হইলেও ইদানীং আরাকান রাজ বলে উহার অধিকাংশ উপভোগ করিতেন। কিন্তু চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার সহিত তাঁহার মনোবাদ হওয়ায় শাসনকর্ত্তা ঢাকায় আসিয়া মোগল সুবাদারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কাহারও কাহারও মতে এই সময় অবধি চট্টগ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে মোগলরাজ্যভুক্ত হওয়ায় ইস্‌লামাবাদ নাম হইল।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইস্‌লাম খাঁ চট্টগ্রামের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত সেই সময়ে আসামবাসীরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের আক্রমণে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতে পাঁচ শত নৌকা ভাসাইয়া ইহারা প্লাবনের জলের মত উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গের নিম্নভূমিতে আপতিত হইল। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী স্থান সকল লুণ্ঠন করিতে করিতে উহারা ঢাকার নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছে এমন সময়ে ইস্‌লাম খাঁর রণতরী তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। মোগল পক্ষের কামানের মুখে আসামী নৌকা ছিন্ন ভিন্ন ও ভস্মীভূত হইলে আসামীরা তীরে অবতরণ করিল। সেখানে মোগল অশ্বারোহী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের চারি শত লোক নিহত হইল; অবশিষ্টেরা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। ইস্‌লাম খাঁ সদলে আসামে প্রবেশ করিয়া ১৫টি দুর্গ অধিকার করিলেন। এই সময়ে

তিনি কুচবেহারের দক্ষিণ ভাগের সুদৃঢ় দুর্গগুলি দখল করিয়া ঐ অংশ মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ষাকাল সমাগত হইলে মোগল সৈন্য বিপদে পড়িল; ইস্লাম খাঁ অতি কষ্টে অধিকাংশ সৈন্য সহ ঢাকার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এখানে আসিয়া জানিলেন তাঁহার স্থানে বাদশার পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া আসিতেছেন।

শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়সে বঙ্গের শাসনভার পাইলেন। সুদূর ঢাকায় ঢাকা থাকা তাঁহার ভাল লাগিল না। পুনরায় রাজমহলে রাজধানী উঠিয়া আসিল। বাসের জন্য রমনীয় নব-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল; ইহার কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান। মানসিংহ নির্ম্মিত দুর্গ প্রাকার পুনঃসংস্কৃত ও সুদৃঢ় করা হইল। সুজা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া রাজমহলকে অন্বর্থনামা করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু পরবর্ষে এক প্রচণ্ড অগ্নিদাহে রাজপুরীর কিয়দংশ ভস্মীভূত হইল। অনেকে প্রাণ হারাইল; সুজা সপরিবারে বহুকষ্টে রক্ষা পাইলেন। আবার এই সময়ে গঙ্গার গতিও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজমহলের দুর্গ প্রাচীর আক্রমণ করিল, যেন সর্ব্বভূতে একযোগে সুজার সাধের নন্দনের উপর বাদ সাধিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুজা সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না; নবার্জ্জিত মোগল বঙ্গে শান্তির সময়ে অর্থেরও অভাব হয় নাই। নগরী ও দুর্গ প্রাকারে প্রস্তরের আকারে প্রভূত অর্থ ঢালিয়া দেওয়া হইল।

সুজা নবীন যুবক বলিয়া রাজকার্য্য বিষয়ে পরামর্শ দানের নিমিত্ত শাজাহান্ বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব সুবাদার আজিম খাঁকে তাঁহার সঙ্গে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। আজিম সুজার শ্বশুর; সুতরাং তাঁহার উপদেশ রাজকুমারের অপ্রিয় হইবে না, ভরসা ছিল। কিন্তু সুজা অধিক দিন এই প্রবীণ গুরু মহাশয়ের শাসন সহ করিতে না পারিয়া তাঁহারই

উপকারের ছলে যথেষ্ট বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে ঢাকায় প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে আজিম খাঁ দরবার করিয়া আলাহাবাদের শাসনভার পাইয়া চলিয়া যান। সুলতান সুজা সদাশয় ও ন্যায়বান ছিলেন। সদাচারে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি বঙ্গবাসীর প্রিয় হইয়াছিলেন।

আট বৎসর বাঙ্গলার শাসন-কার্য্য পরিচালনার পরে সুলতান সুজা বাদশাহী দরবারের চক্রে কাবুলে বদলী হইলেন। দুই বৎসর পরে পুনরায় বঙ্গে ফিরিয়া টোডরমল্ল কৃত রাজস্ব বন্দোবস্ত সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। চল্লিশ বৎসরের মোগল অধিকারে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ আয়ত্ত হইয়াছিল তাহার ব্যবস্থা করার এখন প্রয়োজন ও অনুভূত হইয়াছিল। নবার্জ্জিত বিভাগগুলি পূর্ব্বতন সরকারে (দেশ বিভাগে) সংযুক্ত করিয়া সুজা যে রাজস্ব বন্দোবস্ত সুস্থির করেন পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইবে। সুজার সুবাদারী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনলীলার যেরূপে অবসান হয়, সাধারণ ইতিহাস পাঠকের তাহা অজ্ঞাত নহে।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে শাজাহান কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলে তাঁহার আদেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শাসন পরিচালনের ভারগ্রহণ করেন। অন্য পুত্রেরা সংবাদ পাইলেন, বাদশাহ জীবিত কিনা সন্দেহ। দারা রাজদণ্ড গ্রহণ করিলে অন্যের মঙ্গল নাই। মোগল-কুলে ভ্রাতৃ-প্রেম অজ্ঞাত পদার্থ। সুজা সত্বর সসৈন্যে দারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার লোকবল বা অর্থের অভাব ছিল না। বারাণসীর নিকটে দারার প্রেরিত বাদশাহী সেনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অন্যতম প্রধান সেনাপতি রাজা জয়সিংহ বাদশাহের আদেশে গৃহ-কলহে রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন অনুচিত, ইত্যাদি পরামর্শ দিয়া সুজাকে বঙ্গে

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু দারার পুত্র সুলেমান যুবক সুলভ হঠকারিতায় রাজার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া অতর্কিতে ভিন্ন দিকে গঙ্গা পার হইয়া সুজার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল না; সহজেই পরাজিত ও পলায়নপর হইল।

সুজা প্রথমে পাটনায়, পরে বাদশাহী সেনা অগ্রসর হইলে মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সুলেমান্ মুঙ্গের আক্রমণে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দারার পত্র পাইলেন, আরঙ্গজেব ও মুরাদ একযোগে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, সত্বর সদলে আসিয়া পিতার সাহায্য করুন। সুজা রাজমহলে ফিরিয়া বল সঞ্চয় আরম্ভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সংবাদ পাইলেন, দারা পরাজিত ও পলায়িত, চতুর আরঙ্গজেব বৃদ্ধ বাদশাহকে আগরা প্রাসাদে প্রহরী-বেষ্টিত রাখিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী ও উপযুক্ত পরিমাণ পদাতিক ও কামান সংগ্রহ করিয়া সুলতান সুজা আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন। আলাহাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে খাজোয়ায় আরঙ্গজেবের সৈন্যের অগ্রগামী দলের দর্শন পাইয়া সুজা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে সেনা সমাবেশ করিয়া পুরোভাগ ও বামে গড়-বন্দী করাইলেন। আরঙ্গজেবের বাদশাহী বাহিনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে এক বাধা-বিপত্তি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটাইল; রাজা যশোবন্ত সিংহ আরঙ্গজেবের দল ত্যাগ করিয়া গেলেন, কোন কোন মতে তাঁহার রাজপুত সেনাদল বাদশাহী শিবির লুণ্ঠন করিয়া গেল (১)।

(১) কোন কোন ইতিহাসের মতে যুদ্ধারম্ভের পরক্ষণেই যশোবন্ত দলত্যাগ করিয়াছিলেন। খাফি খাঁর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিনি সুজাকে নিজের

গোলযোগ নিবৃত্ত হইলে আরঙ্গজেবের পক্ষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। ১৫ই জানুয়ারী মধ্যাহ্নে কামান অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুজা সম্মুখের উচ্চভূমির উপর স্থাপিত কামানগুলি সরাইয়া লইলেন। এই ভ্রম আরঙ্গজেবের সুদক্ষ সেনাপতি মীরজুমলা লক্ষ্য করিলেন; নিশাযোগে ঐ স্থানে নবনির্ম্মিত বুরুজের উপরে বাদশাহী কামান সজ্জিত হইল; সুশিক্ষিত পদাতিক দল উহার রক্ষণে নিযুক্ত হইল। প্রভাতে ঐ মৃৎ বুরুজের উপর হইতে একটি গোলা সুজার পট্টাবাস ভেদ করিয়া গেলে মহিলাদিগের চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিবির সরাইয়া লওয়া ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় ছিল না।

আরঙ্গজেব প্রতিপক্ষের শিবিরে গোলযোগ লক্ষ্য করিয়া আক্রমণের আদেশ দিলেন; তাঁহার হস্তিদল সুজার পরিখা পার হইয়া প্রাকারের উপরে চালিত হইল। কিন্তু এই প্রচণ্ড আক্রমণ সুজার সেনাদলকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না; বরং বাদশাহী সৈন্যই স্থানে স্থানে হঠিয়া যাইতে লাগিল। সুজার নিজের রণহস্তী ভ্রাতার হস্তীর দিকে চালিত করিবার আদেশ দিলেন। আরঙ্গজেবকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার জনৈক সেনানী হস্তিপৃষ্ঠে সুজাকে বাধা দিবার প্রয়াস পাইয়া স্বয়ং ভূপতিত হইলেন। কিন্তু সুজার হস্তীও আহত হইয়া থর থর কম্পবান; সে আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। এমন সময়ে সুজার জনৈক হস্তীপক নিজের হস্তীকে এত বেগে আরঙ্গজেবের হস্তীর উপর ধাবিত করিল যে সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। আরঙ্গজেব ত্রস্ত হইয়া হস্তী হইতে অবতরণ করিতে যাইবেন এমন সময়ে অদূরে মীরজুমলা চীৎকার করিয়া বলিলেন "কায়েম্, কায়েম্, হস্তী হইতে নামিলেই সিংহাসন হইতে নামিতে

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না; সুজার পরবর্ত্তী ব্যবহার তাহার প্রমাণ।

হইবে।" সেকালের যুদ্ধে নেতাকে হওদার উপর না দেখিলেই সেনাদল রণে ভঙ্গ দিত। আরঙ্গজেব মহা বিপদ বুঝিয়াই বসিয়া রহিলেন ; তাঁহার সুদক্ষ মাহুত কৌশলে প্রতিপক্ষের হস্তীর মাথায় চড়িয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইল। সুজার ভাগ্য প্রতিকূল ছিল। আরঙ্গজেবের উৎকোচের লোভে সুজার জনৈক সেনানী আলীবর্দ্দী তাঁহাকে আহত হস্তী হইতে নামাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার মন্ত্রণা দিল (২)। সুজার হাওদা শূন্য হইল ; সৈন্যদল তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিচলিত হইল। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আর তাহাদিগকে স্থির রাখিতে না পারিয়া সুজা হতাশ হইলেন। এইরূপে রাজসিংহাসন সম্মুখে পাইয়াও নিজ নির্ব্বুদ্ধিতায় সুজা তাহা হারাইলেন বলিয়া পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাদ ছিল, 'সুজা জিৎ বাজি, আপনে হাৎ হারা'। (৩)

আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নিশাযোগে পলায়িত পিতৃব্যের অনুসরণ করিলেন ; পশ্চাতে সেনাপতি মীরজুমলা সদলে চলিলেন। বাদশাহী সেনাদল মুঙ্গের পর্য্যন্ত সুজার পশ্চাদ্ধাবন করায় সুজা রাজমহলে পলায়ন করিলেন। এখানে ছয় দিন ধরিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া নিশাযোগে পরপারে টাঁড়ায় আসিলেন। হঠাৎ গঙ্গার জল বৃষ্টিতে বাড়িয়া উঠায় প্রতিপক্ষ অনুগমন করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে রাজকুমার মহম্মদ গোপনে নদী পার হইয়া সুজার কন্যার পাণিগ্রহণ করায় পিতার আদেশে সস্ত্রীক বন্দীভূত হইয়া দিল্লী প্রেরিত হইলেন। সুজা ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ রাখিয়া এবং যথাসাধ্য বল সঞ্চয় করিয়াও মীরজুমলার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। ঢাকায় আসিয়া দেখিলেন, সৈন্য সংগ্রহ করা অসাধ্য ;

(২) Manuci storia de Mogor
(৩) Storia de Mogor & Dow's Hindustan.

মীরজুমলার প্রচণ্ড বাহিনী পশ্চাতে ধাবমান। সুতরাং অনুচর ও পরিবারবর্গ সহ চট্টগ্রামের দিকে প্রস্থান করিলেন। এখান হইতে জাহাজে চড়িয়া মক্কায় যাওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু নিয়তির বিধান অন্যরূপ। এখানে কোন জাহাজ মিলিল না। শত্রুহস্তে বন্দীভূত হওয়া অপেক্ষা আরাকান রাজের আশ্রয় ভিক্ষাই মনস্থ হইল। তথাকার রাজা প্রথমে সুজার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেও শেষে বাদশাহী সেনাপতির ভয়েই হউক বা অন্য কারণেই হউক, দুর্ভাগ্য সুজাকে জলমগ্ন করিয়া নিহত করেন।

বাদশাহী সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহের অবসরে বাঙ্গলার উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলের দেশীয় রাজারা বলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইতেছিলেন। কোচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বভাগ কোচ হেজো উত্তীর্ণ হইয়া গোয়ালপাড়া আক্রমণ করিলেন। আসাম রাজ জয়ধ্বজ কন্থং নদী পার হইয়া গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে মোগল ফৌজদার সিরাজী নৌকাযোগে ঢাকায় পলাইলেন। আহোমগণ বিনাযুদ্ধে কামরূপের রাজধানী অধিকার করিল। সম্মুখের গ্রাম নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তাহারা অবিলম্বে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী স্থান আয়ত্ত করিয়া ঢাকার অল্প দূরে হাট চিলা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিল।

সুজার সহিত যুদ্ধশেষে ঢাকায় স্থির হইয়া বসিয়া মীরজুমলা আসাম জয়ের কল্পনা আঁটিলেন। কোন কোন ইতিহাসের মতে সেনাপতির শক্তিবৃদ্ধি আরঙ্গজেবের অভিপ্রেত না হওয়ায় তাঁহার প্রতি দিল্লী প্রত্যাগমনের আদেশ আসিয়াছিল ; কিন্তু আসাম অভিযানে শক্তি সঞ্চয়ের আশঙ্কা নাই, বরং জীবিত ফিরিবার আশা অল্প ইহা জানিয়া তাঁহার আসাম যাত্রার বাধা দেওয়া হয় নাই। কোচবিহারের প্রত্যন্তভাগে এক দুয়ার দুর্গের নিকটে বঙ্গীয় সৈন্য সমবেত হইলে মীরজুমলা স্বয়ং

আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজা প্রাণনারায়ণ প্রাণ লইয়া ভোটানের দিকে পলাইলেন। কোচবিহারের রাজধানীতে নারায়ণের বিগ্রহ স্বহস্তে নষ্ট করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের জয় ঘোষণার পরে পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিয়া ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথমে মোগল সেনাপতি আসাম যাত্রা করিলেন (৪)। এই অভিযান সহজসাধ্য ছিল না; বন কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতে করিতে বৃহৎ বাদশাহী বাহিনী অগ্রসর হইতে লাগিল। পঞ্চরত্ন ও সুন্দর নামক স্থানের যুদ্ধে আহোমগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। দুর্গ, পরিখা বা বংশ প্রাকার কিছুতেই এই প্রচণ্ড সেনাদলের গতিরোধ হইল না। মীরজুমলা ক্রমে গৌহাটী শ্রীঘাট, বেলতলা, কজলী প্রভৃতি অধিকার করিয়া অগ্রসর হইল। আহোমেরা সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও দেখিল, এ বাদশাহী সেনার গতিরোধ তাহাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই দৈব তাহাদের সম্পূর্ণ অনুকূল হইল; বর্ষা সমাগমে নদী নালা ছুটিয়া বাহির হইল। গিরিনদী ভীমবেগে তরঙ্গ-ভঙ্গে শত্রু শিবিরের উপর আপতিত হইয়া আসামীরা আহবে যে ক্ষতি সাধন কখনও করিতে পারিত না তাহাই করিয়া দিল। স্থানে স্থানে আজানু-নিমজ্জিত সেনাদল জলের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইল; উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত শিবির দ্বীপের মত দেখা দিল। প্রথমে অশ্বাদির, পরে মানুষের আহার্য্য সংস্থান কঠিন হইয়া উঠিল। পলায়িত আসাম-রাজ পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সদলে বহির্গত হইয়া জলমগ্ন রাজপথের মুখ ও অন্যান্য ঘাটী বন্ধ করাইলেন। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, এক সের মুগের দা'ল দশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল, এক ছিলিম তামাকের দাম তিন টাকা! দুর্ভিক্ষের সহচর জর পীড়া মড়কের মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ

(৪) Gait's History of Assam.

হইল। তখন অগ্রসর হওয়া বা প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব। আসামীরা সময়ে সময়ে নিশাযোগে আক্রমণ করিত; তাহাদের বিষাক্ত তীর অনেককে হতাহত করিল। বর্ষা শেষে মোগল দল পুনরায় প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেনাপতির স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়ায় কার্য্যে কিছুই হইল না। আমাশয় রোগগ্রস্ত মীরজুম্লা নিজ সেনাদলের মধ্যেই গোলযোগ দেখিয়া আসাম রাজের সহিত সন্ধি বন্ধনে বাধ্য হইলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক আসাম-রাজের ভূরি প্রমাণ স্বর্ণ রৌপ্য এবং রাজকন্যা-দানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। মীরজুমলা কষ্টে-সৃষ্টে মান রক্ষা করিয়া ফিরিলেন; কিন্তু ঢাকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬৬৩ খৃঃ)। সৈন্যদলের মধ্যেও পীড়িতের সংখ্যা এত অধিক ছিল, যে দশের মধ্যে নয় জনের জন্য যান বাহনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আসামী জল বায়ুর জয় হইল।

সুদক্ষ সেনাপতির আসাম যাত্রার পরিণামের সংবাদে সম্রাট্ আরঙ্গজেব দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক টীকা করিয়াছেন, বাহিরে দুঃখ প্রকাশ করিলেও কূটনীতি পরায়ণ আরঙ্গজেব উচ্চাভিলাষী মীরজুমলার মৃত্যু ঘটনায় সুখীই হইয়াছিলেন; আপদ বিপদ দূরীভূত হওয়ায় দক্ষ সহকারীর প্রয়োজন ছিল না। এখন ভূতপূর্ব্ব উজীর নুরজাহানের ভ্রাতা আসফজার পুত্র সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইলেন। কিন্তু শিবাজীর দলে পুনায় নিশাযোগে তাঁহার যে আঙ্গুল কাটিয়াছিল, তাহার ঘা তখনও শুকায় নাই বলিয়া তাঁহার আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। এ সময়ে সায়েস্তা খাঁর মত সায়েস্তা নায়কের প্রয়োজন ছিল।

নবাব ইসলাম খাঁর সময়ে আরাকানের মগ রাজা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেও পূর্ব্ব দক্ষিণ বঙ্গ মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে জন শূন্য

অরণ্যে পরিণত হইতেছিল, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মগেরা চট্টগ্রামকে কর্ম্মকেন্দ্র করিয়া বৎসর বৎসর বাঙ্গলা লুণ্ঠনের নিমিত্ত তথায় রণতরী পাঠাইত। সনদ্বীপের মোগল অধ্যক্ষ ইহাদের আক্রমণ নিবারণে অসমর্থ হইয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেন। কোন কোন লেখকের মতে শেষ মোগল অধিনায়ক দিলওয়ার খাঁ স্বাধীন জমিদারের মত ব্যবহার করিয়া শেষ দিকে মগের অনুকূল হইয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁ সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া চট্টগ্রামের দিকে রণতরী পাঠাইবার কল্পনা করিলেন। দিলওয়ার পরাস্ত ও বন্দীভূত হইলে সনদ্বীপে মোগল রণতরী সুসজ্জিত হইল। এই সময়ে অনেক পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী মগের দল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। বাঙ্গলা হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ ২৮৮ খানি রণতরী মগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। রণতরীর অধ্যক্ষ ইবন্ হোসেন্ জলপথে যাত্রা করিলেন। নোয়াখালির দিক্ হইতে নবাব পুত্র উমেদ খাঁ স্থলপথে সৈন্য চালনা করিলেন। স্থানে স্থানে বন কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া সেনাদলকে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে হইল; রণতরীর সহিত যোগ রাখিতে ইহাদিগকে যথা সম্ভব সমুদ্রতীরের নিকট দিয়া যাইতে হইয়াছিল।

মগের সহিত বঙ্গীয় রণতরীর প্রথম যে যুদ্ধ হইল তাহাতে মগদিগের বৃহৎ রণতরী (খালু ও ধুম্) গুলি তখন অগ্রসর হয় নাই; দূর হইতে সামান্য রূপ গোলা বৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র। মোগল পক্ষ প্রবল হওয়ায় মগ সরিয়া গেল; অনেকে প্রাণভয়ে যুরব্ হইতে লাফ দিয়া জলে পড়িয়া সন্তরণে বাঁচিবার চেষ্টা করিল। পরদিন কর্ণফুলীর মোহানায় উভয় পক্ষ সমবেত হইল। বৃহৎ রণতরীগুলি পুরোভাগে সজ্জিত করিয়া বঙ্গীয় দল কামান গর্জ্জন আরম্ভ করিল। অপরাহ্নে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। মগেরা নিকটবর্ত্তী ফিরিঙ্গী বন্দরে কামান পাতিয়া রাখিয়াছিল; সেখান হইতে

বঙ্গীয় রণপোতের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। মোগল সৈন্য এই যুদ্ধে স্থল হইতে কি সাহায্য করিতে পারিয়াছিল, মুসলমান লেখক তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন! ভীষণ যুদ্ধের পর মোগল পক্ষের জয় হইল; অনেক মগ রণপোত চূর্ণ বা নিমজ্জিত হইল এবং ১৩৫ খানি ধৃত হইল। সমুদ্রে মগের আধিপত্যের অবসান হইল।

তৎপরে মোগল সৈন্য চাটিগাঁর দুর্গ আক্রমণ করিল; এবং তুমুল যুদ্ধের পর দুর্গ অধিকার করিয়া ১০২৬টা লৌহ এবং পিত্তলের কামান, ও অনেকগুলি জামরুক্ বন্দুক প্রাপ্ত হইল (৫)। অনেক মগ নিশাযোগে জলপথে পলায়ন করিল; দুই সহস্র বন্দীভূত হইল। এই সময় হইতে দল বাঁধিয়া মগের উৎপাত নিবৃত্ত হইল। কোন কোন লেখকের মতে চট্টগ্রাম এই জয়ের পর হইতে ইস্‌লামাবাদ আখ্যা পাইয়াছিল।

---

(৫) Sarkar's History of Aurangzeb.

নবম অধ্যায়।

জমিদারী বন্দোবস্ত।

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বহুতর খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রবল প্রতাপ পাল রাজগণের অধিকারেও সমগ্র বঙ্গে বহুতর সামন্ত নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপাল এইরূপ চতুর্দ্দশ সামন্ত রাজের সহায়তায় কৈবর্ত্ত বিদ্রোহীর কবল হইতে পিতৃ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন (১) আটবিক ও প্রত্যন্ত ভাগের সামন্ত দল তখনও অর্দ্ধ স্বাধীন ভাবে ভূমি ভোগ করিতেন ইহা সহজেই অনুমেয়। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন প্রথমে দক্ষিণ রাঢ়ের সামন্ত রাজের উচ্ছেদের পরে তাঁহারই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেন বংশ সমগ্র বঙ্গে প্রভুত্ব স্থাপন করিলেও "নিখিল চক্রতিলক" রূপে স্বীকৃত হইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্ষুদ্র সামন্ত রাজগণ অধীনতা মাত্র স্বীকার করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে স্বাধীন ভাবেই ব্যবহার করিতেন। দক্ষিণে তাম্রলিপ্তিতে ময়ূর রাজবংশের বিলোপে কৈবর্ত্ত সামন্তবর্গের উদ্ভব হইয়াছিল। এই মেদিনীপুরের সীমার মধ্যেই প্রবাদ ও কাব্যবর্ণিত লাউসেন রাজার অভ্যুদয়। লাউসেনের গৌড়েশ্বর পাল-রাজের পক্ষ হইয়া কামরূপ বিজয় এবং বর্দ্ধমান ও বীরভূমির গোপবংশীয় ইছাই ঘোষের উচ্ছেদ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই গৃহীত হয় (২)। প্রাচীন ঢেকুর (বর্ত্তমান

(১) রাম চরিত—সন্ধ্যাকর নন্দী (As.Soc).

(২) আমরা প্রাচীন পঞ্জিকায় কলির রাজ-চক্রবর্ত্তী নামের শেষে লাউসেন নামের নির্দ্দেশ দেখিয়াছি। তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথের গ্রন্থে যে লবসেনের উল্লেখ আছে, তিনি এই লাউসেন হইতে পারেন।

সেন পাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী ত্রিষষ্টিগড় বা শ্যামারূপার গড় এবং অজয় তীরে এখনও দণ্ডায়মান ইছাই ঘোষের দেঁউল গোপরাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মেদিনীপুরে ময়নাগড় এখনও লাউসেনের স্মৃতি বহন করিতেছে। সেন রাজবংশের সময়ে বীরভূমির সেনভূমে ও পঞ্চকোট শেখর ভূমে বিভিন্ন সামন্তবর্গ বর্ত্তমান ছিলেন। পাঠান সর্দ্দারগণ বহু-দিনের যুদ্ধ বিগ্রহের পরে বীরভূমির পশ্চিমাংশ জয় করেন; প্রধান নগর 'নগর' অবশ্য পাঠান-বন্যার প্রথম বেগেই ভাসিয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমান মঙ্গলকোটের হিন্দু সামন্তরাজ পাঠানের প্রভাব সহ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুর বা পঞ্চকোট কোন কালেই পাঠানের পদানত হয় নাই। দক্ষিণে সুন্দর বন ও সাগর দ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ নামে মাত্র অধিকৃত হইয়া পুনরায় হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামীর হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজ পাঠানের অধীনতা স্বীকার দূরে থাকুক, সময়ে পাঠানের অধিকৃত নিম্নভূমি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন। কামরূপ ও কামতার স্বাধীন রাজার সহিত পাঠানের যুদ্ধ কলহ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আহোমগণ পরে কামরূপের পূর্ব্বাংশ জয় করিল; মোগল সেনাপতির অভিযান বিফল হইল, ইহাও দেখা গেল।

কোচ রাজবংশ স্থাপয়িতা বিশ্বসিংহের বীর পুত্র শুক্লধ্বজ বা চিল-রায়ের সহিত সোলেমান্ কররাণীর পাঠান সেনার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামী বুরঞ্জী বলিতেছে যে বন্দীভূত শুক্লধ্বজ সুলতানের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুক স্বরূপ বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, সেরপুর, গয়াবাড়ী ও দশকাহনিয়া যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন (৩)। শুক্ল-ধ্বজের পরলোকান্তে তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বাংশ

(৩) Gait's History of Assam.

কোচহজো নামে কথিত হইত। পূর্ব্ব ভাগে বর্ত্তমান রঙ্গপুর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ীর কিয়দংশ ছিল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে গৃহবিবাদে বিব্রত হইয়া নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ যখন সুবাদার ইসলাম্ খাঁর শরণাগত হইয়াছিলেন, তখনই কোচবিহার রাজ্য প্রকৃত পক্ষে মোগলের আয়ত্ত হইল; রাজা করদ হইয়া পড়িলেন। মীর জুমলা এবং সায়েস্তা খাঁর সময়ে কোচবিহারের অধীনতা শৃঙ্খল আরও একটু শক্ত করিয়া বাঁধা হইলেও মোগলেরা আভ্যন্তরীণ রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

দেশের অভ্যন্তরেও রাজস্ব আদায় কার্য্যে পাঠান রাজ সম্পূর্ণ ভাবে হস্তক্ষেপ করেন নাই; স্থানে স্থানে শাসন এবং শান্তি রক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত জায়গীরদার ছিলেন তাঁহারাও এই ব্যাপারে হিন্দুর উপর নির্ভর করিতেন। এই নিমিত্তই পাঠান অধিকার কালে আমরা বহুতর হিন্দু ভূস্বামী ও অধিকারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। বরেন্দ্র ভূমে সেকালে অনেক প্রবল ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন। শুদ্ধ ভাতুরিয়ার ভূস্বামী গণেশ গৌড়ে বাদশা হইয়া সেকালের হিন্দু জমিদারের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এমন নহে। তাহেরপুরের প্রাচীন রাজবংশ প্রভৃতি পাঠান আমলেই প্রবল প্রতাপে ভূমি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। গৌড় অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের কথা বৈষ্ণব কবির বর্ণনায় পাইতেছি। সেই চরিতামৃতেই মধ্যবঙ্গে সপ্তগ্রামের জমিদার বারলক্ষের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামক কায়স্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ আছে। ভূরশুটের ভূস্বামী ও সমুদ্রগড়ের ব্রাহ্মণ রাজা অর্দ্ধ স্বাধীন মতই ছিলেন। সেকালের জমিদার বর্গের অনেকেরই গড় বন্দী বাটী ছিল; তাঁহারা দেশীয় বিদেশীয় সৈন্যসামন্ত রাখিতেন, বিচার কার্য্যের অধিকাংশ ভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল।

মোগল অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রধান ভূস্বামীরা ভুঁইয়া নামে প্রসিদ্ধ হন। বার ভুঁইয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্য, রামচন্দ্র বা কেদার রায়ের মত ইশা খাঁ প্রভৃতি মুসলমান প্রধান ভুঁইয়া হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা পাঠানের সহিত মোগলের যুদ্ধ কলহের সুযোগে স্বাধীন হইবার কল্পনা আঁটিয়া কিয়ৎকাল প্রবল মোগল পক্ষকে বাধা দিয়া ফলে নূতন জমিদারের সৃষ্টি করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশকে মোগলের অধীনতা শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে হইল।

উপরে সংক্ষেপে যাহা বিবৃত হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে আফগান্ পাঠানদিগের অধিকারে সমগ্র বঙ্গভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। প্রথমে পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজচ্ছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারম্বার বিফল মনোরথ হইয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের শতাধিক বৎসর পরেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় রাজা শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালেও গৌড়ের স্বাধীন পাঠান রাজ্য সমস্ত বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই (১)। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইস্লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলভূমি পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুর স্বাধীন ছিল। দক্ষিণ পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, মেদিনীপুরের কিয়দংশ ও হিজলী বহুকাল উড়িষ্যার হিন্দু রাজার অধিকার ভুক্ত ছিল। পাঠান শাসনের শেষ দশায় সুলেমান কররাণীর সময়ে কালাপাহাড়ের কৃতিত্বে উড়িষ্যার সহিত এই ভূভাগ পাঠান অধিকারে আসিয়াছিল। পূর্ব্বভাগে ত্রিপুরা মণিপুরের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান ভুলুয়া এবং চট্টগ্রামেও পাঠান শাসন রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই বিবাদী ভূমি সপ্তদশ শতকের

১। আমার নবাবী আমলের ইতিহাসেও এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এবং এইস্থানে তাহার অনেক উদ্ধৃত হইল।

মধ্যভাগে মোগলের আয়ত্ত হয়। শ্রীহট্টের কিয়দংশ ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে পাঠানের অধিকৃত হইলেও ত্রিপুরা কাছাড়, জয়ন্তী প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। উত্তরে রঙ্গপুরের উত্তর ভাগের কামতা রাজ্য পাঠান রাজ্য ভুক্ত হইলেও কোচ রাজারা পার্শ্ববর্তী ভূভাগ বহুকাল দখল করিয়াছেন। প্রাথমিক পাঠানযুগে বঙ্গবিজেতা মুসলমান সামন্তবর্গ বিজিত ভূভাগের নানা স্থানে জায়গীর স্বরূপে অনেক স্থান পাইয়া দেশ শাসনে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যন্ত ভাগ রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য ছিল।

পাঠান রাজের অধিকৃত বাঙ্গলার সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে অধ্যাপক ব্লকমানের কথায় নিম্নলিখিত রূপে করা যায়। পশ্চিম সীমায় গঙ্গার দক্ষিণ ভাগে তেলিয়া গড়ী হইতে রাজমহলের দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া দামোদর ও বরাকর নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট দিয়া বর্ত্তমান বীরভূমির মধ্যভাগ হইয়া এক রেখা কল্পনা কর। এই রেখা বর্দ্ধমানে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বর্ত্তমান হুগলী জেলার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া রূপ-নারায়ণের মুখে মণ্ডল ঘাট পর্য্যন্ত আসিলেই পাঠান-বঙ্গের পশ্চিম সীমা নিরূপিত হইল। পূর্ণিয়া জেলার উত্তর সীমা হইয়া বর্ত্তমান নেপাল তরাইএর দক্ষিণ দিয়া কুচবিহারের নিম্নভূমি লইয়া ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বে ভিতরবন্দের উত্তর পর্য্যন্ত এবং পরবর্ত্তী কালে খোন্তাঘাট হইয়া গৌহাটী পর্য্যন্ত উত্তর সীমা। বর্ত্তমান ময়মনসিংহের মধ্যদেশ দিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে শ্রীহট্ট হইয়া ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম হইয়া পূর্ব্ব সীমান্তরেখা। এই সীমার মধ্যেও সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে মুসলমান রাজ শাসন দণ্ড পরিচালনার সুবিধা পান নাই; হিন্দু জমিদারবর্গ স্থানে স্থানে অবসর পাইলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রধান জমিদারগণ পাঠান আমলে অর্দ্ধ স্বাধীন ভাবেই রাজস্ব আদায় ও বিচার আচার করিতেন।

আকবর শার বঙ্গ-বিজয়ের পর হইতে মোগল অধিকারে জমিদারবর্গের স্কন্ধে অধীনতা শৃঙ্খল ক্রমশঃ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়া আসিয়াছে। পাঠান আমলের অর্দ্ধ স্বাধীন ভৌমিকের সহিত মোগল অধিকারের জমিদারের অনেক প্রভেদ। সেকালের সরকারী চৌধুরীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া পরবর্ত্তী জমিদারীর উৎপত্তি।

রাজস্ব আদায়

গৌড়ের পাঠান রাজগণের অধিকারে বাঙ্গলা দেশে ভূমির কর কি প্রণালীতে আদায় হইত, তাহার যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় না। হিন্দু রাজত্বের শেষ অবস্থায় প্রধান রাজার অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন দেখা যায়। পাঠানেরা বাঙ্গলা অধিকার করিলে সীমান্তভাগের হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকে তাহাদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই; আবার কাহারও রাজ্যের কিয়দংশ পাঠান রাজ্যভুক্ত হইলেও তাঁহারা সুবিধা পাইলেই উহা পুনরায় অধিকারের চেষ্টা করিতেন। দেশের মধ্যভাগে এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে মুসলমান জায়গীরদার এবং থানাদারগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদায়কারী জমিদার নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু তখনও তাঁহাদের জমিদার উপাধি হয় নাই। তখন চৌধুরী বা ক্রোরী (১ কোটি দাম রাজস্ব আদায়কারী) উপাধিধারী আদায়কারী ছিলেন। কোন কোন স্থলে এইরূপ রাজনিযুক্ত চৌধুরী বা অধিকারী উপাধির আদায়কারী জমিদার ক্ষুদ্র রাজার মত প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেন। দৃষ্টান্ত স্থলে উত্তর বঙ্গের সাতগড়া এবং তাহেরপুরের জমিদার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজধানী গৌড় বঙ্গের এক প্রান্তে স্থাপিত হওয়ায় এবং সেকালে চলাচলের নানা অসুবিধা থাকায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ

বঙ্গের রাজস্ব আদায়ের ভার এইরূপ আদায়কারী জমিদার বর্গের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ইঁহারা নিজ অধিকারে ভূমির সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া শেষে ভুঁইয়া (ভৌমিক) নামে অভিহিত হন।

আসল জমা তুমার

আফগানগণকে নির্জ্জিত করিয়া বঙ্গবিজয়ের পরে আকবর বাদশার আদেশে রাজা টোডরমল্ল অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শের শার রাজস্ব বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তের কাগজ প্রস্তুত করেন। এই কাগজের নাম হইল 'আসল জমা তুমার'। ইহাতে সমগ্র বঙ্গের খাল্সা ভূমির রাজস্ব ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা এবং জায়গীর ভূমির রাজস্ব ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা মোট ১,০৬,৯৩,২৬০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে জমির আয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই জায়গীর জমা এবং অবশিষ্ট যে আয় রাজকোষে আসিবে তাহাকে খাল্সা জমা বলিত। এই রাজস্ব বন্দোবস্তে সমগ্র বঙ্গ কতকগুলি সরকার বা বৃহৎ বিভাগে এবং প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইয়া এক পরগণা এবং অনেকগুলি পরগণা লইয়া এক সরকার গঠিত হইয়াছিল। অনেক পরগণা পূর্ব্বাবধি ছিল। তোডর মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৯ সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। সংক্ষেপে সরকার গুলির অবস্থান, ইহাদের পরগণা সংখ্যা ও জমা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথমে খাল্সা জমির বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) সরকার জিন্নেতাবাদ বা গৌড় ;— বর্ত্তমান মালদহ জেলায়

গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর সমগ্র ভূভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। ৬৬ পরগণায় এই সরকারের খাল্সা জমা ৪,৭১,১৭৪ টাকা।

(২) সরকার পূর্ণিয়া ;—কুশী নদীর পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার কতক অংশ। ৯ পরগণায় জমা ১,৬০,২১৯ টাকা।

(৩) সরকার তাজপুর :—পূর্ণিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তের ভূভাগ লইয়া ইহা গঠিত ; পরগণা সংখ্যা ২৯ এবং জমা ১,৬২,০৯৬ টাকা।

(৪) সরকার পিঁজরা ;—হাবেলী বা কয়েকটি খাস পরগণা লইয়া দিনাজপুর জেলায় ইহা অবস্থিত ছিল। ২১ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১,৪৫,০৮১ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

(৫) সরকার ঘোড়াঘাট :—কুচবিহারের সীমার দক্ষিণে, তিস্রা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলা লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। ৮৪ পরগণায় জমা ২,০৯,৫৭৭ টাকা।

(৬) সরকার বার্ব্বেকাবাদ ;—সরকার জিন্নেতাবাদের দক্ষিণে পদ্মা নদীর উভয়তীর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার অধিকাংশ লইয়া এই সরকার গঠিত। পরগণা সংখ্যা ৩৮ এবং জমা ৪,৩৬,২৮৮ টাকা।

(৭) সরকার বাজুহা :—বার্ব্বেকাবাদ হইতে পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র পারে শ্রীহট্টের সীমা পর্য্যন্ত ঢাকা জেলা লইয়া গঠিত। ৩২ পরগণায় ইহার সদর জমা ৯,৮৭,৯২১ টাকা।

(৮) সরকার সিলেট্ :—কাছারের প্রান্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শ্রীহট্ট। ৮ পরগণায় ইহার সদর জমা ১,৬৭,০৪০ টাকা।

(৯) সরকার সোনার গাঁ :—বর্ত্তমান বিক্রমপুর হইতে মেঘনার পূর্ব্বতীর ব্যাপিয়া শ্রীহট্টের দক্ষিণ ও ত্রিপুরার পশ্চিম পর্য্যন্ত ভূভাগ লইয়া গঠিত। ৫২ পরগণায় জমা ২,৫৮,২৮৩ টাকা।

(১০) সরকার ফতেহাবাদ :—সোনার গাঁর দক্ষিণ হইতে সমুদ্রকূল

পর্য্যন্ত এবং সন্দীপ, শাহবাজপুর প্রভৃতি দ্বীপ লইয়া গঠিত। ৩১ পরগণায় ইহার সদর জমা ১,৯৯,২৩৯ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

(১১) সরকার চাটগাঁ ;—ফতেহাবাদের দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং ত্রিপুরার দক্ষিণ হইতে বঙ্গসাগরের উপকূলভাগ। চট্টগ্রাম তখন সম্পূর্ণরূপে মোগলের আয়ত্ত হয় নাই। কেবল ৭টি পরগণায় ইহার জমা ২, ৮৫, ৬০৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

(১২) সরকার ওড়ম্বর ঃ—শাকরীগলি হইতে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ লইয়া ভাগীরথীর অপর পারে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত চুণাখালী পরগণা পর্য্যন্ত এই সরকার বিস্তৃত ছিল। ইহার মধ্যে টাঁড়া ও রাজমহল স্থাপিত থাকায় ইহাকে সরকার টাঁড়া বা রাজমহলও বলা হইত। ৫২ পরগণায় ইহার জমা ৬,০১,৯৮৫ টাকা।

(১৩) শরীফাবাদ ঃ—ওড়ম্বরের দক্ষিণ হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমে বর্দ্ধমান পরগণা পর্য্যন্ত ভূভাগ। ইহাতে ২৬ পরগণা এবং জমা ৫,৬২,২১৮ টাকা ধার্য্য ছিল।

(১৪) সেলিমাবাদ ঃ—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র পর্য্যন্ত। ইহাতে ৩১ পরগণার জমা ৪, ৪০, ১৪৯ টাকা।

(১৫) মাদারণ ঃ—বীরভূমি হইতে দামোদর ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থলে মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত, পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের সীমা এবং দক্ষিণে সুন্দরবনের নিকট পর্য্যন্ত এই ভূভাগ। পরগণা সংখ্যা ১৬, জমা ২,৩৫,৮৮৫ টাকা।

(১৬) সাতগাঁ ঃ—উত্তরে পলাশী পরগণা হইতে ভাগীরথীর উভয় তীর ব্যাপিয়া স্থাপিত। বন্দর সপ্তগ্রাম ও হুগলী জেলা ইহার অন্তর্গত। ৪৩ পরগণায় ইহার সদর জমা ৪,১৮,১১৮ টাকা।

(১৭) সরকার মামুদাবাদ বা ভূষণা—সরকার সাতগাঁর পূর্ব্বদিকে

ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। বর্ত্তমান নদীয়া ও যশোরের অধিকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ৮৮ পরগণায় ইহার সদর রাজস্ব ২,৯০,২৫৬ টাকা।

(১৮) সরকার খলিফাতাবাদ ;—সরকার মামুদাবাদের দক্ষিণ সুন্দরবন পর্য্যন্ত, বর্ত্তমান খুলনা ও প্রাচীন যশোর ইহার অন্তর্গত। ৩৫ পরগণায় জমা ১,৩৫,০৫৩ টাকা।

(১৯) সরকার বাকলা—খলিফাতাবাদের পূর্ব্বে পদ্মার পশ্চিম তীরের বদ্বীপ, সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত নিম্নভূমি। ৪ পরগণায় ইহার সদর জমা ১,৭৮,২৬৬ টাকা।

সমগ্র বঙ্গদেশ এই ১৯ সরকারে ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ইহার খাল্‌সা ভূমির রাজস্বের পরিমাণ ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগের মধ্যে আখ্‌তা বা জায়গীর ভূমি বিক্ষিপ্ত ছিল। তাহার পৃথক্ রাজস্ব ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা স্থির হইয়াছিল। এই সমস্ত জায়গীর ভূমি প্রত্যন্ত ভাগে বা অপেক্ষাকৃত বেবন্দোবস্ত ভূভাগেই স্থাপিত ছিল। ফৌজদার, সেনানী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিবর্গের ব্যয়ের জন্য ইহা নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাদের উন্নতির জন্য রাজ কর্ম্মচারিদিগের যত্ন থাকিবে এই কল্পনা ছিল।

শাজাহানের রাজত্বকালে সুলতান সুজা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া তোডরমল্লের বন্দোবস্ত সংশোধন করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলার উত্তরাংশে কতকগুলি স্থান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সুবা উড়িষ্যা হইতে তিনি কতকটা খারিজ করিয়া লন। এই বর্দ্ধিত ভূভাগের রাজস্বের সহিত টাকশাল প্রভৃতির আয় যোগ করিয়া তিনি অতিরিক্ত ১৫টি সরকারে ৩০৭ পরগণায় রাজস্ব ১৪,৩৫,৫৯৩ টাকা নির্দ্দিষ্ট করেন। ইহা ব্যতীত তিনি তোডরমল্লের নির্দ্দিষ্ট জমার উপর ৯,৮৭,১৬২

টাকা বৃদ্ধি করিয়া ঐ বর্দ্ধিত আয় ৩৬১ অতিরিক্ত পরগণা বা মহালে বিভক্ত করেন। এইরূপে সুজার সময়ে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত বন্দোবস্তে বাঙ্গলা দেশ অতিরিক্ত ১৫ সরকার ও ৬৬৮ পরগণায় বিভক্ত হইয়া সদর জমা ২৪, ২২, ৭৫৫ টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। নিম্নে এই ১৫টি সরকারের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(২০) কিস্‌মৎ গোয়ালপাড়া ;—তমলুক ও আর দুইটি পরগণা লইয়া এই বিভাগ ; ইহা একটি সরকারের অংশমাত্র। ৩ পরগণায় ইহার সদর জমা ১, ১৪,৬০৯ টাকা।

(২১) কিস্‌মৎ মালজেঠিয়া :—গোয়ালপাড়ার মত ইহাও কয়টি পরগণা সমষ্টি। নিমক মহাল সহ হিজলী, জালামুঠা, মহিষাদল প্রভৃতি পরগণা ইহার অন্তর্গত। ১৭ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১৮৯, ৪৩২ টাকা।

(২২) মজকুরী কিসমৎ :—বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বালসী প্রভৃতি কয়টি ক্ষুদ্র পরগণা লইয়া এই মজকুরী কিসমৎ পত্তন হয়। ৪ পরগণায় ইহার জমা ২৫,২৮৫৲টাকা।

(২৩) জলেশ্বর ;—সুবা উড়িষ্যার মধ্যে সরকার জলেশ্বরে যে সমস্ত হাবেলী বা খাস পরগণা ছিল, তাহা বাঙ্গলায় খারিজ করিয়া লইয়া এই নূতন জলেশ্বরের সৃষ্টি হয়। ৭ পরগণায় ইহার রাজস্ব ৫৩,৯০১টাকা।

(২৪) সরকার রমণা :—সুবর্ণরেখা নদীর অপর পারে ৩ টি মাত্র পরগণার এই ক্ষুদ্র সরকার, জমা ২৩, ২৭২৲টাকা।

(২৫) বস্তা :—বন্দর জলেশ্বরের নিকট হইতে নীলগিরি পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থান লইয়া কিসমৎ বস্তা ; ইহাও উড়িষ্যার খারিজী মহাল লইয়া গঠিত। ৪ পরগণায় ইহার সদর রাজস্ব ১২,৪২২টাকা।

(২৬) কোচবিহার :—কোচবিহার রাজের নিকট হইতে অধিকৃত তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূভাগ। রঙ্গপুরের উত্তরাংশ ও কুণ্ডী

প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই সরকার গঠিত হয়। ইহাতে ২৪৬ পরগণায় সদর জমা ৩,২৭,৭৯৪টাকা।

(২৭) বাঙ্গালভূম :—রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থিত ; ইহাও পূর্ব্বে কোচবিহার রাজের অধীন ছিল। বাহির বন্দ ও ভিতর বন্দ নামক দুই প্রসিদ্ধ পরগণায় ইহা গঠিত। ২ পরগণায় ১,৩৭,৭২৮টাকা জমা ধার্য্য হয়।

(২৮) দক্ষিণ কোল :—ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে কড়াইবাড়ী প্রভৃতি পরগণা ইহার অন্তর্ভূত। ৩ পরগণায় জমা ২৭,৮২১ টাকা।

(২৯) ধুবড়ী—আসামের দিকে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত—২পরগণায় জমা ৬১২৬টাকা।

(৩০) উত্তর কোল বা কামরূপ :—ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ও উত্তর তীরে, ভুটানের নীচে আসামের প্রান্তে খোন্তাঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ৩ পরগণায় জমা ৩১,৪৫১ টাকা।

(৩১) উদয়পুর—ত্রিপুর রাজের নিকট অধিকৃত ভূভাগ। ৪ পরগণায় জমা ৯৯,৮৬০ টাকা।

(৩২) মোরাদখানি—সুন্দরবনে আবাদের উপযুক্ত ভূমি। ২ পরগণায় জমা ৮৪৫৪টাকা।

(৩৩) পেস্কস্ :—বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে বিষ্ণুপুর পঞ্চকোট প্রভৃতি ঝাড়খণ্ড অর্থাৎ ছোটনাগপুরের রাজারা মোগল সম্রাট্‌কে বার্ষিক কিছু নজরাণা পেস্কস দিতে স্বীকৃত হন। এই আয় সুজার সময় হইতে সরকার পেস্কস্ নাম পায়। ৫ মহালে এই পেস্কসের আয় ৫৯,১৪৬ টাকা।

(৩৪) দার-উল জার্ব অর্থাৎ টাকশাল :—পেস্কসের মত টাকশালের আয়কে এক স্বতন্ত্র সরকার বলিয়া ধরা হইয়াছিল ; ঢাকা ও রাজমহলে দুই টাকশালে ২ মহাল ধরিয়া তাহার আয় ৩,২১,৩২২ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে সুলতান সুজার বন্দোবস্তের অতিরিক্ত সরকার গুলির মধ্যে ১৩টী ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে হইলেও তোড়ল মল্লের বিভাগের মত বৃহৎ নহে। শেষ দুইটি অর্থাৎ পেস্কস ও টাকসালের আয়কে সরকার রূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সুজা জায়গীর জমায় হস্তার্পণ করেন নাই। খালসা বিভাগেই কোন কালে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায় হয় নাই, জায়গীর বিভাগের ত কথাই নাই। যাহা হউক, সুজার সংশোধিত ব্যবস্থার পরে সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং উহার সদর জমা ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

পাঠান শাসন কালে যে সমস্ত ভূমি সরকারের খাসে আসিয়াছিল, তাহার রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত চৌধুরী এবং ক্রোরী নামধেয় হিন্দু কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইতেন। কথঞ্চিৎ কোন স্থলে দক্ষ মুসলমান ক্রোরী চৌধুরী ও ছিলেন। হিন্দুরা বিশেষতঃ বাঙ্গালী কায়স্থগণ বহুকাল হইতে রাজস্ব কার্য্যে অভিজ্ঞ থাকায় তাঁহাদেরই উপর এই ভার অর্পণ করা যুক্তি যুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল (৫)। বরেন্দ্রভূমিতে ব্রাহ্মণ জমিদারেরাই প্রবল ছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে কায়স্থ জমিদার অধিক ছিল বলিয়া আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীগ্রন্থে জমিদারগণ প্রায়ই কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন। তোড়ল মল্লের বন্দোবস্তের পরে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতা-শালী চৌধুরীগণও জমিদারে পরিণত হইয়া অর্দ্ধ স্বাধীন রাজা বা জমিদারের মত স্বীয় দরবার, কর্ম্মচারী ও সেনা নিয়োগ করিতে আরম্ভ

(৫) পাল রাজগণের সময়েও ব্রাহ্মণের মত কায়স্থেরা 'বিষয়ব্যবস্থায়' অভিজ্ঞ বলিয়া 'মহত্তর, দশগ্রামিকাদি' কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, (ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপি)। পরবর্ত্তী কালেও বহুতর কায়স্থ সন্তানের এই সমস্ত কার্য্যে নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কানুনগোর কার্য্য ত কায়স্থের একচেটিয়া মতই হইয়াছিল।

করেন। একালের প্রধান জমিদার গোষ্ঠীর মধ্যে বর্দ্ধমান রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবু রায় মোগলের বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে বাঙ্গলায় আসেন এবং তাঁহার পুত্র বাবুরায় বর্দ্ধমান ও সমীপবর্ত্তী তিন পরগণার (মহালের) চৌধুরীর কার্য্যে নিয়োজিত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরবর্ত্তী বর্দ্ধমান অধিপতিরা রাজা উপাধি লাভ করেন। দিনাজপুরে আকবরশার রাজ্যের শেষ ভাগে বিষ্ণুদত্ত নামক কায়স্থ সন্তান প্রাদেশিক কানুন গো ছিলেন। শাজাহানের রাজত্ব কালে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী দিনাজপুরের জমিদারী প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্ত শ্রীমন্তের দৌহিত্র বংশই দিনাজপুরের রাজা। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দও কানুন গো দপ্তরে কার্য্য করিতেন। পরে রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে সাত বৎসরের মধ্যে ভবানন্দ উখড়া প্রভৃতি অনেক গুলি পরগণার জমিদারী পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যশোর চাঁচড়ায় বংশের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর রায়ও প্রতাপাদিত্যের উচ্ছেদের সময় জমিদারী পান। মানসিংহের কুণ্ডী প্রভৃতি জমিদারীও এই সময়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। বর্দ্ধমান, কুণ্ডী, এবং কৃষ্ণনগরে নূতন জমিদারের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে যে কায়স্থ জমিদার দ্বয়ের বিদ্রোহ দমনের পর কিয়ৎকাল সহকারী মনোহর ভিন্ন অন্য কোন কায়স্থ বড় জমিদারী পান নাই।

শের শাহের ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় পরিদর্শনের এবং প্রজাবর্গের স্বত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতি পরগণায় সরকারী আমিল্, শীকদার ও কারকুন নিযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল। রাজপথে বা নিজ নিজ অধিকারে চুরি রাহাদানী প্রভৃতির নিমিত্ত এই সময় হইতে চৌধুরী ও গ্রাম্য মণ্ডল দিগকে দায়ী করা হইত (৬)। জমিদারী বন্দোবস্তের হিসাব রক্ষার জন্য কানুন্‌গো নিয়োগ পাঠান আমলেই প্রবর্ত্তিত হয়। আকবরী

(৬) Tarikh-i Firojshahi.

ব্যবস্থার শেষে পরগণা কানুনগোর উপরে একজন প্রধান কানুনগো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহালের বন্দোবস্ত পর্য্যবেক্ষণের জন্য ডিহীদার থাকিতেন; ইহারা প্রজারক্ষার ভার পাইলেও সময়ে চৌধুরী ও জমিদারের উৎকোচের লোভে 'ভক্ষক' হইয়া দাঁড়াইতেন (৭)। পাঠান আমলে জমিদারেরা সনন্দ পাইতেন কি না জানা যায় না; মোগল অধিকারের জমিদারী সনন্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকবর শার সনন্দ দেখা যায় না; ভবানন্দের মানসিংহ দত্ত জাহাঙ্গীরের সনন্দ এবং শাজাহানের নামাঙ্কিত কয়েকখানি জমিদারী সনন্দ অদ্যাপি আছে।

জমীদারী সনন্দে মহালের সীমা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়া যাহাতে দেয় রাজকর রীতিমত আদায় এবং সরকারে দাখিল হয় তাহা জমিদারের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজপথ সংস্কার, প্রজাপালন এবং দুষ্টের দমনও জমিদারের কার্য্য ছিল। নূতন জমিদারীর সনন্দ প্রাপ্তির সঙ্গে জমিদারকে এক জামিন নামা ও মুচল্কা কবুলতী লিখিয়া দিয়া সনন্দের নিয়ম পালনে অঙ্গীকার করিতে হইত। যথেচ্ছ জমিদারী উচ্ছেদ মুসলমান রাজের আইন সঙ্গত ক্ষমতা হইলেও দেশাচার মতে কোনও জমিদারের লোকান্তরের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীই ঐ জমিদারী পাইতেন। বিদ্রোহ বা রাজকর আদায় দানে চিরশৈথিল্য উৎখাত হইবার কারণ হইত (৮)। বিক্রয়াদি দ্বারা জমিদারী হস্তান্তরের প্রয়োজন হইলে মোগল সুবাদারের অনুমতি লইতে হইত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিজেতা পাঠান সামন্তবর্গকে তাঁহাদের সেনাদল

(৭) কবিকঙ্কণের ডিহীদার 'মামুদ শরীফ' ইহার দৃষ্টান্ত।

(৮) আমার নবাবী আমলের ইতিহাস হইতে এই অংশ গৃহীত।

রক্ষার ব্যয় স্বরূপ জায়গীর ভূমি দেওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত জায়গীর দার, থানাদার ও ডিহীদার যে সকল স্থানে রাজকর আদায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। কোথাও বশীভূত প্রাচীন হিন্দু ভূস্বামী বংশের লোকের হস্তেই এইভার দিয়া আদায় রীতিমত হইতেছে কিনা, দেখিয়া লইয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন; ক্বচিৎ কোন জায়গীরদার একার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জায়-গীরের এক প্রাচীন সনন্দে দেখা যায়, (৯) পূর্ব্বতন আদায় কারী ও রায়ৎ দিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় লইয়া জায়গীরদার প্রজা বর্গকে সুশাসনে রাখিবেন। এই সনন্দ প্রাচীন পাঠান আমলের নহে, কারণ কানুনগো নিয়োগ পরবর্ত্তী মুসলমান রাজের ব্যবস্থা। আভ্যন্তরিক শাসন বা বিচার কার্য্যে জায়গীর দার হস্তার্পণ করিতেন না। গ্রামিক ও মণ্ডল প্রভৃতির হস্তেই এই সমস্ত কার্য্য ন্যস্ত ছিল। শান্তি রক্ষার ভার প্রাপ্ত এই জায়গীরদার বা থানাদার দ্বারা সময়ে অত্যাচার অনাচার হওয়ায় প্রজা বর্গের মধ্যে অশান্তি উৎপাদিত হইত। কিন্তু প্রথম যুগের পাঠান সামন্তবর্গ দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়ায় অনেক সময়ে যুদ্ধ কলহে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই নিমিত্ত হিন্দু চৌধুরী ও

(৯) জায়গীরের সনন্দের অনুবাদ। "এই খ্যাতাপন্ন সর্ব্বজন মাননীয় আদেশ পত্র দ্বারা আজ্ঞা দেওয়া হইতেছে যে অভিজাত বর্গের মধ্যে কুসুম স্বরূপ অমুকের দখলী.........পরগণায় ভিন্ন ভিন্ন জমির উপস্বত্ব.........টাকা বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ফসল হইতে রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে সবিশেষ অনুগৃহীত.........কে জায়গীর স্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে। চৌধুরী, কানুনগো, প্রজা বা যে কাহারও এই ভূমির সহিত কোন সম্বন্ধ আছে তাহারা যেন ইহাকে জায়গীর দার বলিয়া স্বীকার করে এবং তাঁহাকে বা তাঁহার কর্ম্মচারিকে দেয় রাজস্ব আদায় দেয়। বাকী রাজকর পূর্ব্ব অধিকারীকে দিতে হইবে। ইহাতে যেন কোনরূপ বিঘ্ন না হয় এবং আদেশমত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়"—নবাবী আমলের ইতিহাসে উদ্ধৃত।

প্রজাবর্গের সহিত সদ্ভাবে থাকাই তাঁহাদের স্বার্থ ছিল। ক্রমে তাঁহাদের সহিত লোকের রাজা প্রজা সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া আইসে; এবং স্থায়ীভাবে এদেশে বসতি করায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তারের চেষ্টাও ইহাদের মধ্যে অনেকেই করিতেন। মুসলমান থানাদার ও ডিহীদারের সাময়িক অসদাচরণের কথা কাব্যাদিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর অত্যাচার সাধারণ ছিল না।

জায়গীরদারের অধীনে যে সকল চৌধুরী বা জমিদার ছিলেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট ভূস্বামীদিগের সাধারণ অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেকালের জমিদার বর্ত্তমানের মত ভূমিতে স্বত্ব বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী না হইলেও দেশীয় প্রথা মতে পুরুষানুক্রমে আদায়কারী হওয়ায় ক্রমে মধ্য স্বত্বাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জমিদারদিগের আদায় কার্য্যে সহায়তা করার জন্য সেকালে গ্রামে গ্রামে পাটোয়ারি এবং মণ্ডল বা মির্দ্ধা থাকিতেন। মোগল আমলের প্রথমে রাজস্ব বন্দোবস্ত সুস্থির হইয়া গেলে এই পাটোয়ারিগণ মহালের নিরিখ বন্দী মতে নূতন প্রজা বন্দোবস্ত এবং আদায় করিয়া আসিতেন। মণ্ডল আদায় কার্য্যে সহায়তা করিতেন। অনেক স্থলে গ্রামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিবাদের মীমাংসার ভার তাঁহাদেরই হস্তে ছিল। বড় মোকদ্দমা জমিদার বা থানাদার ফৌজদারের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিত মাত্র। জমিদার কোন অত্যাচার করিলে রাজকীয় কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়া প্রজার অনুগত থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। স্বায়ত্ত-শাসন মণ্ডল পঞ্চায়েতের কল্যাণে তখন পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকরী ছিল। দেশীয় জমিদারের হস্তে উৎপীড়ন সেকালে সাধারণ ছিল না। ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে তখন ছোট বড় সকলেরই মতি ছিল। হিন্দু জমিদারেরা আপন কুটুম্ব, প্রিয় ভৃত্য এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণকে

নিষ্কর ভূমি দান করিয়া প্রতিপালন করিতেন। চৈতন্য চরিতের কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল :—

পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়া বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃ ব্যবহার॥

* * * * *

সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। এই রঘুনাথ দাস শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে শান্তিপুর আসিয়া নিভৃতে বিষয়ত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে তখন "মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাশক্ত হৈয়া"-ইত্যাদি কথায় উপদেশ দিয়া, বাটী প্রত্যাগমনের পরামর্শ দেন। সপ্তগ্রামের জমিদার দ্বয়ের ধর্ম্ম প্রবণতা ও সদাচার সেকালের অন্য হিন্দু জমিদার বংশেও দুষ্প্রাপ্য ছিল না। ধর্ম্মার্থে দান, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎ কর্ম্ম তখনকার আর্য্য হিন্দু সমাজে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণের বাসের বাটী নিষ্কর ছিল। হিন্দু জমিদার স্বয়ং কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে দেবোত্তর নিষ্কর জমি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত। তাঁহাদের অধিকার মধ্যে গ্রাম দেবতার পূজাদি নির্ব্বাহ হওয়ার নিমিত্ত ও নিষ্কর ভূমি দেওয়া থাকিত। হিন্দু জমিদারের

মুসলমান প্রজার ধর্ম্মার্থে এবং মুসলমান জমিদারের হিন্দু দেব-সেবার জন্য ভূমিদান ও অসাধারণ ছিল না; এই কারণেই বাঙ্গলায় দেবোত্তর ও পীরোত্তর জমির পরিমাণ ক্রমে অধিক হইয়া উঠায় দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জমিদারের কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ নিকর কোথায় বা অতি সামান্য কর বিশিষ্ট ভূমি ভোগ করিতেন; এবং উত্তরাধিকার ক্রমে দখলে থাকায় ইহা তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। চৌকিদার প্রভৃতির নিকর চাকরাণ জমি ছিল।

মুসলমান রাজের প্রধান কর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে জমিদারকে বিপন্ন করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে:—

হেন কালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই হয়ত চৌধূরী।।
হিরণ্য দাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া *
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া।।
বার লক্ষ দেয় রাজায় সাধে বিশ লক্ষ।।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ।।
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল,
হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাথে বান্ধিল।।

রঘুনাথ সেই ম্লেচ্ছকে যে ভাবেই বশ করিয়া পিতার সহিত গোল মিটাইয়া দেন, মুসলমান কর্ম্মচারী যে জমিদার বা ইজারদারকে সহজেই গোলে ফেলিতে পারিত, এ কথা উদ্ধৃত উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়। তবে জমিদারের প্রদত্ত উপহারে সকল কালের রাজকর্ম্মচারীই শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

* ঠিকা মোক্তা কথা অদ্যাপি জমিদারি সেরেস্তায় প্রচলিত। চৈতন্য চরিতের টীকায় ব্রজবাসী গোস্বামী মহাশয় 'মোক্তা' মানে ছল বুঝিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

পাঠান অধিকারের সামান্য আদায়কারী বা চৌধুরীর বংশানুক্রমে কার্য্য করায় প্রবল জমিদার রূপে পরিণত হওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বরেন্দ্র বা অন্যস্থানের প্রাচীন প্রভাবশালী ভূস্বামীদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে নিজ নিজ কৃতকার্য্যের দোষে বা রাজপুরুষগণের অকৃপায় সম্ভ্রমের সহিত সম্পত্তিও হারাইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের যে কয়েক জন অর্দ্ধস্বাধীন ভৌমিক মোগলের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে গেলেন, তাঁহারা রাজ্য হারাইলেও যাহারা সুবাদার-দিগের সুনজরে পড়িয়া জমিদারী পাইলেন তাঁহারা ক্রমে বড় জমিদারে পরিণত হইতে লাগিলেন। গড়বন্দী বাটী ফৌজ প্রভৃতি উপযুক্ত উপকরণ তাঁহাদিগকে দুই তিন পুরুষের মধ্যেই পূর্ব্বতন ভূস্বামীদিগের মত প্রভাবশালী করিয়া তুলিল। মোগল অধিকারে রাজকীয় সনন্দে রীতি মত কর আদায় এবং তাহা সরকারে দাখিল করা ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা জমিদারের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও দুষ্টের দমন প্রভৃতি আভ্যন্তরিক শাসন ও বিচারের ভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত থাকায় প্রধান জমিদারেরা ক্রমশঃ প্রকৃত পক্ষে রাজা হইয়া উঠিলেন। জমিদারী উচ্ছেদ মুসলমান রাজের আইন সঙ্গত হইলেও বারম্বার রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতা এবং বিদ্রোহই কেবল উচ্ছেদের কারণ হইত; নিলামের ব্যবস্থা ছিলনা। এই সমস্ত কারণে মোগল অধিকারের জমিদার ক্রমে স্বত্ব বিশিষ্ট ভূস্বামী হইয়া উঠেন।

মুসলমান অধিকারে বাঙ্গালী হিন্দু প্রজার স্বত্ব ও অধিকার কিরূপ ছিল এই বিষয় লইয়া ইংরেজ অধিকারের প্রথম আমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় অনেক জল্পনা কল্পনা ও লেখা লেখি হইয়াছে। হিন্দু রাজত্ব কালে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব ছিল এবং গ্রামাধিকারী প্রভৃতি রাজকীয় আদায়কারীরা পরবর্ত্তী কালের ভূম্যধিকারীর মত ছিলেন না।

পাঠান অধিকারে নানা শ্রেণীর মধ্য স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রজার স্বত্ব ক্রমে সঙ্কুচিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের প্রজাগণ পুরুষ পরম্পরায় একই স্থানে বাস করিয়া উত্তরাধিকার ক্রমে নিজ জমিতে দখলি স্বত্ব ভোগ করিত। পাঠান অধিকারে রায়তের অধিকারের কথা জানা যায় না। মোগল রাজের বন্দোবস্তের সময়ে পরগণা ওয়ারী নিরিখবন্দী প্রস্তুত হইয়াছিল। ভূমির নিরিখ বা রাজস্বের হার নানা রূপ ছিল। 'নিরিখবন্দী' অর্থে গ্রামের বা পরগণার জমির বিঘা প্রতি ধার্য্যকরের হিসাব রেজিষ্টার। গ্রাম্য পাটোয়ারি এইরূপ নিরিখবন্দী অনুসারে ধার্য্য রাজকর আদায় করিতেন; কোন প্রজা জমি ইস্তফা করিলে অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করাও তাঁহার কার্য্য ছিল। গ্রাম্য জমাবন্দী তাঁহার হস্তে থাকিত। তিনি পারিশ্রমিক স্বরূপ চাকরাণ সম্পত্তি ভোগ করিতেন এবং রায়তদের নিকট তহরী ও পার্ব্বণী পাইতেন। মোগল রাজের পক্ষ হইতে পরগণা নিরিখবন্দী এবং জমিদার ইজারাদারের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত পরগণা কানুনগো থাকিতেন। প্রাদেশিক প্রধান কানুনগো সমগ্র জমিদারী বন্দোবস্তের কাগজ রাখিতেন; নুতন বন্দোবস্তে তাঁহার দপ্তরে খারিজ দাখিল করিয়া লইতে হইত। এই কারণে প্রধান কানুনগো প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। এখনও মুর্শিদাবাদের পরপারে প্রধান কানুনগো বংশের বাটী আছে। পূর্ব্বে জমিদারেরা পার্ব্বণী বা অতিরিক্ত কর আদায় করিতেন না। পরবর্ত্তী কালে সরকার হইতে মাথট নামে আবওয়াব্ আদায় আরম্ভ হওয়ায় তাঁহারাও প্রজার নিকট বাজে আদায় প্রচলন করেন। শস্যের মূল্য অল্প হওয়ায় চাষী প্রজার অবস্থা সেকালে সচ্ছল ছিল না; কিন্তু সুখ ভোগের উপকরণ না যুটিলেও উদরান্নের জন্য কাহারও কষ্ট ছিল না।

দশম অধ্যায়।

সেকালের গ্রাম্য সমাজ।

পাঠান বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ভাল করিয়া জানিবার উপায় নাই। মুসলমান ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে উদাসীন। জাতীয় সাহিত্যে সমাজ-জীবনের চিত্র সম্যক্ পরিস্ফুট হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে যুগের সাহিত্য পাওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্ম পূজার পদ্ধতি এ বিষয়ে অতি সামান্যই সাহায্য করে; পরিশিষ্ট নিরঞ্জনের উষ্মায় সদ্ধর্ম্মির প্রতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অত্যাচারের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের যবনরূপী হইয়া দেউল দেহারা ভাঙ্গিবার উল্লেখ আছে :—

ধর্ম্ম হইলা যবনরূপি, মাথা এত কাল টুপী
হাতে শোভে তিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম
দেউল দেহরা ভাঙ্গে, কাড়্যা কিরা খায় রঙ্গে,
পাথড় পাথড় বোলে বোল
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ড গোল'

ইহা প্রথম যুগের মুসলমান আক্রমণের কথা। ধর্ম্ম পূজার বিষয় ভিন্ন অন্য সামাজিক কথা শূন্য পুরাণ নামে উল্লিখিত এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধে ও অন্ধকারে ঢিল মারা হয়। ইদানীং

উত্তর বঙ্গে প্রচলিত কতকুগুলি গীতের আবিষ্কার হইয়াছে। প্রাচীন হইলে মানিক চাঁদ ও গোপী চাঁদের গীত হইতে সেই যুগের আচার ব্যবহারের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ডাক এবং খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি কালে কালে ভাষান্তরিত হইলেও প্রাচীন বাঙ্গলার অনেক সামাজিক আচার ব্যবহার তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ এবং মঠপ্রতিষ্ঠা বহুকাল হইতে হিন্দুগৃহীর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অন্নদান, জলদান, ভূমিদান প্রভৃতি পূণ্যকার্য্য বাঙ্গলার গৃহস্থ চিরদিন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া জানিত।

"ধর্ম্ম করিতে যবে জানি, পোখরি দিয়া রাখিব পানী,
গাছ রুইলে বড় ধর্ম্ম, মণ্ডপ দিলে বড় কর্ম্ম
যে দেই ভাত শালা পানীশালী, সে না যায় যমের বাড়ী।
স্বর্ণভূমি কন্যা দান, বলে ডাক স্বর্গে স্থান। (ডাকের বচন)

পতিভক্তিমতী সুশীলা বাঙ্গালী গৃহস্থবধু অতিথি সেবা পরায়ণা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা, লজ্জাশীলা ও গৃহীর হিতকারিণী ছিলেন :—

অতিথি দেখিয়া মরে লাজে, তবু তার পূজায় সাজে,
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপতি, মিঠা বোল সোয়ামী ভকতি,
রোদে কাঁটা কুটায় রাঁধে, খড় কাঠ বর্ষাকে বাঁধে,
কাঁখে কলসী পানীকে যায়, হেটমুণ্ডে কাহোকে না চায়,
যেন যায় তেন আইসে, বলে ডাক গৃহিণী সেই সে।

আবার খনার বচনে দুষ্টা প্রকৃতি নারীর চিত্রও দেখান হইয়াছে :

ঘরে স্বামী বাইরে বৈসে, চারিপানে চাহে মুচকি হাসে,
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস, তার আর কি জীবনের আশ।
ঘরে আখা বাইরে রান্ধে, অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে
ঘন ঘন চাহে উলটি ঘাড়, বলে ডাক এ গৃহিনী ঘর উজাড়
পানী ফেলিয়া পানিকে যায়, পথিক দেখে আড় চক্ষে চায়
পর সম্ভাষে বাটে রহি, এ নারী ঘরে ত না থুহি।

খনার বচনে চাস বাস ও গৃহ কর্ম্মের যে চিত্র দৃষ্ট হয়, তাহা কালে কালে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া কতখানি প্রাচীন কালের ইহা নির্ণীত হওয়া সুকঠিন। পরবর্ত্তী সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণনের সময়ে উহা উল্লিখিত হইবে।

মানিক চাঁদের গীতে দেখা যায়, বর্দ্ধিষ্ণু লোকে 'বাঙ্গলা ঘরে' (আট-চালায়) বাস করিত (১); পালঙ্কের ব্যবহার অবশ্য অর্থশালী লোকেরই নিমিত্ত। শীতলপাটী বিছাইয়া বালিসে হেলান দিয়া দণ্ড পাখার বাতাস তাঁহাদেরই উপভোগ্য ছিল, অগৌর চন্দন লেপন ও শ্বেত চামরের বাতাসের কথাও আছে।

কার লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর।
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালী।
শীতল পাটী বিছায়া দিমু বালিসে হেলান গাও।
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
(ইত্যাদি মাঃ গীঃ)

"বিনে বান্দি নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া" বাক্যে দাসীরাও মোটা পট্টবস্ত্র পরিত দেখা যায়। ইন্দ্র কম্বল বিলাসীর শয্যায় ব্যবহৃত হইত। "তৈল বিনা শুষ্ক তনু বস্ত্র বিনে কাঁথা' কথায় প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গলা দেশে তেল মাথার ব্যবস্থা ছিল, প্রমাণ হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে পিতৃকার্য্যে গয়ায় পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ সজ্জনের সেবা, দেবতা ব্রাহ্মণ স্থাপন, পুণ্যকার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত। 'দিঘী সরোবর যেবা দিয়াছে জাঙ্গাল, জন্মান্তরে সেই জন হয়ে মহীপাল' একথা সকল যুগেই প্রচলিত। জ্যোতিষি ব্রাহ্মণ

(১) 'বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালী' কথায় খড়ের চাল বুঝা যায়; "পাষাণ দেওয়াল ঘরের লোহার কপাট" (মাঃ গীত—৯৩) উক্তিতে রাজবাটীতে এই প্রকার Strong room থাকার কথাও সূচিত হয়।

পাঁজি হাতে নগরে ভ্রমণ করিত; সকল কাজেই পাঁজির দোহাই দেওয়া বহুদিন হইতে চলিতেছে। জুগী (যোগী, সন্ন্যাসী) ভিক্ষুক দিগকে চাউল, কড়ি, হরিদ্রা, লবণ প্রভৃতি ভিক্ষা দেওয়া হইত। এই জুগীরা মুণ্ডিত মস্তক, কাঁথা ঝুলি কান্ধে ছাই মাথিয়া বেড়াইত। "সুবর্ণের খুড়েতে মুড়ায় মাথার কেশ। কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া হইল জুগী বেশ। বিভূতি মাখিল গায় কটিতে কৌপিন, কাঁথা ঝুলি কান্ধে করি হৈল উদাসীন।" ধনবানের গৃহিনীরা হার, কেয়ুর, কঙ্কন, নাকে বেসর ও পায়ে নুপুর ব্যবহার করিতেন। কর্পূর দেওয়া তাম্বুল বিলাসের বিষয় ছিল।

"মাণিক চাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতী।
হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়,
তার বদলি ছয় মাস পাল খায়।
এত মাণিকচন্দ্র রাজা সরুয়া নলের বেড়া
একতন বেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ার ত ঘোড়া। (মা,চ,গী)

দেড়বুড়ি কড়িতে কৃষাণ একমাস হাল বাহিত এবং ঐ দেড়বুড়ি খাজনা দিয়া ছয়মাস পাল চড়াইতে পাইত, মাণিকচাঁদের রাজত্ব কাল এত সুখের ছিল। যে কোন প্রকারে যাহারা করিয়া খায় তাহাদের দুয়ারেও ঘোড়া বাঁধা থাকিত; বাগড়ী অঞ্চলে এখনও তাই ঘটে। স্ত্রীলোকেরাও তখন পাশা খেলিত; "বংশ হরির গুয়া" উপভোগ্য ছিল। 'রজনী প্রভাতে পড়ে চন্দনের ছড়া' উক্তিতে বাঙ্গলায় বহুকাল হইতে প্রত্যুষে ছড়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, দেখা যাইতেছে। সন্তান হইলে সাতদিন পরে সাদিনা, দশদিন পরে 'দশা' এবং ত্রিশদিন পরে 'ত্রিশা' উৎসব হইত। ষষ্ঠীপূজা সম্ভবতঃ ইহার পরে প্রবর্ত্তিত হয়।

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালে নানা হাতের ছাপ পাইয়াছে,

সুতরাং তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগের সমাজ চিত্র সম্পূর্ণ পরিস্ফুট কিনা, সন্দেহের বিষয়। এখানে সন্তান জন্মিলে

পাঁচদিনে পাঁচটি করিল সুপ্রবীণ।
ছয়দিনে ষষ্ঠী পূজা নিশি জাগরণে,
দিলা অষ্টকলাই অষ্টাহে শিশুগণে।
ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারিজন
করাইল সবাকার ওদন প্রাশন।
পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দেয় খড়ী।

ইত্যাদি যে সব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কোন বঙ্গ কবি লিখিলেও ঠিক্ হইত। রাম বিবাহের অধিবাস, নান্দিমুখ ইত্যাদিও একালের মত। 'হরিদ্রা মাথায় চারি বরে কুতূহলে, অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে' ইহাও ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চলিত। এখন রাজপুত্রের কথা দূরে থাকুক, কোটালের পুত্রও হলুদে নারাজ; বিবাহ বলিয়া কোন প্রকারে স্পর্শমাত্র করেন। বাদ্য যন্ত্রের বর্ণনায় পাওয়া যায়,

দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিস বাজন।
ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডম্ফ কোটি কোটি,
চারিদিকে উঠিল বীণার চট চটি।
কত ঠাঁই বাজাইছে জোড়া জোড়া শানি,
কাঁসি বাঁসি কত বাজে নিয়ম না জানি।

এ বেয়াল্লিশ বাজন বড় লোকের বিবাহে পূর্ব্ব তিন শতাব্দী ধরিয়া বাজিত। 'ঢাক' সাধারণ নহে, জয়ঢাক। চতুর্দ্দোল সাজাইয়া বিশিষ্ট বর লইয়া যাওয়া হইত; সাধারণ গৃহস্থের চৌপালা ছিল। ছায়ামণ্ডপ তলে বরণ পরিহার সাতবার ঘুরাণ, নারী গণের বরণ ও পরিহাস পরবর্ত্তী কালেরই মত। কেশসজ্জায় 'সখীদেয় সীতার মস্তকে আমলকী—ইহা ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে আমরা ও দেখিয়াছি। সুগন্ধি তৈল ও চন্দন ব্যবহার

এবং কর্পূর তাম্বুলে মুখ শোধন পরবর্ত্তী কালেও নূতন নহে। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে বিবাহকালে 'এয়ো আইসে মঙ্গল গাইতে, তারা সব পান খাইতে, আর চাইবে তৈল সিন্দুরে' উক্তিতে এয়োগণের যে গীত গাওয়ার উল্লেখ আছে, সে প্রথা পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। রাঢ় অঞ্চলে, পশ্চিমে চলিত হিন্দুর এই সনাতন প্রথা কতদিন উঠিয়া গিয়াছে, বলা যায়না। 'শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ী, সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি' মুসলমান নাগরের এই উক্তিতে মুসলমানের শাঁখা পরা চলিত হয় নাই এবং মাথার ভূষা সিন্দুরকে ফাউগের গুঁড়া বলা হইয়াছে। 'পরম সুন্দর লখাইয়ের দীর্ঘ মাথার চুল' কৃত্তিবাসের 'পলায় রামের সৈন্য নাহি বাঁধে কেশ' উক্তির মত বাঙ্গলার ভদ্রাভদ্র সকলের দীর্ঘ কেশ রাখিবার ফ্যাসন প্রমাণ করে। বিজয় গুপ্তের 'একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বাঁধে, আর একখান দিলা সর্ব্বগায়' নির্দ্দেশ যদি সেকালের সকল বাঙ্গালীর পরিধেয় সূচিত করে, তাহা হইলে পাগড়ী ও উত্তরীয় ব্যবহার সমর্থিত হয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনা যদি এই যুগের হয়, তবে 'খণ্ড কপালিনী, চিরুণী দাঁতী' হইলে কন্যার 'বিবাহ দিনে খাইলে পতি না পোহাতে রাতি'—এই বিশ্বাস তখন হইতে বদ্ধমূল ছিল। "বালিকা যুবতী বৃদ্ধ পতি যার মরে। বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে"—এই কথায় সমাজে বিধবা বিবাহ ত ছিলই না প্রমাণ হয়; সহমরণও সমাজিক প্রথা ছিলনা দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্য সাহিত্যে (২) বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার অনেকগুলি অষ্টাদশ শতাব্দে ও প্রায় সমান ছিল। চৈতন্য ভাগবতকার সেকালের অনেক কথা কহিয়াছেন, কিন্তু যুগাব-

(২) পঞ্চদশ শকের মধ্যভাগে রচিত চৈতন্য ভাগবত এবং ষোড়শে রচিত চরিতামৃত এবং জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, এই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ।

তারের মহিমা প্রচার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহার বর্ণনা সাবধানে লইতে হইবে।

পুত্র সন্তান জন্মিলে পুরস্কারের লোভে বাটীতে বাদ্যকর আপনি আসিবার প্রথা এখনও আছে। মৃদঙ্গ সানাই, বংশী, এই ছিল সেকালের বাদ্যযন্ত্র। পরে ঢোল সানাই চলিয়াছে। দরিদ্র হইলেও পুত্র জন্মিলে লোকে যথা সাধ্য দান করিত।

কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্র চন্দ্র কান্দে।

মাসেক পূর্ণ হইলে ষষ্ঠী পূজা হইত এবং 'খই কলা তেল সিন্দুর গুয়া পান' দিয়া নারীগণের সম্মান করা প্রথা ছিল। সন্তানের জাত-কর্ম্ম উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবেরা শিরে ধান্য দুর্ব্বা দিয়া আশীষ করিতেন এবং অনেক দ্রব্যাদি উপহার দিতেন; সিন্দুর হরিদ্রা তৈল খই কলা ও নানা ফল দেওয়া হইত। 'যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন, ধন দিয়া কৈল সবার মান' উক্তিতে সাধারণ গৃহস্থও পুত্র জন্মিলে সাধ্য মত দান করিত, মনে হয়। সম্ভ্রান্ত মহিলারা 'বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী' অন্যের বাটী যাইতেন; * পেটারিতে বস্ত্রালঙ্কার ভরা' চির কালই চলিয়া আসিয়াছে। ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইলা নিমাঞি'—উক্তি সেকালের গৃহিণীদের চিন্তা দেখাইয়া দিতেছে। বৃন্দাবন দাসের মতে ইঁহার "অনেক জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা নাঞি' বলিয়া স্ত্রীলোকেরা নিমাঞি নাম রাখিলেন। নাম-করণের সময়ে বালকের সম্মুখে 'ধান্য পুঁথি খড়ি স্বর্ণ' রাখা হইলে বালক ভাগবত ধরিল; রাঢ়ে এই প্রথা এখনও আছে। সুসন্তান জন্মিলে 'ধন ধান্যে ভরে ঘর'—এ বিশ্বাস প্রবল ছিল। 'লক্ষ্মগণি হর্ষমতি'

* চৈতন্য চরিতামৃত।

কথায় জ্যোতিষের গণনায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা সূচিত হয়। পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত এবং 'নৈবিদ্যে সন্দেশ চাল কলা' চিরকাল বিরাজ করিতেছেন। বালকের হাতে খড়ি দিয়া দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিক্ষা ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পক্ষেও খাটিয়াছে।

শিশুর 'কটিতে কিঙ্কিনী বাজে অতি মনোহর' কথায় ঘুমুর দেওয়া কিঙ্কিনী বা বোরের নির্দ্দেশ পাই। অলঙ্কারের লোভে নদীয়ার মত নগরে চোরে বালক লইয়া পলাইত। টোলের পড়ুয়ার বেশ,

ললাটে শোভয়ে উর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর কেশ অতি মনোহর॥
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।

উষাকালে সন্ধ্যা করিয়া টোলের পড়ো চলিতেন। 'যোগ পট্ট ছাঁদে' বস্ত্র বন্ধন করিয়া বীরাসনে বসিবার নিয়ম ছিল। চন্দনের উর্দ্ধ তিলক এবং দীর্ঘকেশ ধারণ প্রথা ছিল। দরিদ্র লোকে 'পঞ্চ হরিতকী' দিয়া কন্যা সম্প্রদান মাত্র করিব স্বীকার করিয়া যথাসাধ্য অলঙ্কারও দিত। অধিবাসে 'গন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা' দিলেই যথেষ্ট হইত। 'গন্ধ মাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন, কজ্জলে উজ্জল' হইয়া নববধূ শশুরালয়ে যাত্রা করিত; অবস্থাপন্ন লোকের বিবাহের অধিবাসে জয়ঢাক করতাল আদিও বাজিত। বিপ্রগণে বেদধ্বনি ও ভাটে রায়বার করিত। গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহে ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্ত খানের ব্যয়ে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীতে এক এক জনকে এক বাটা তাম্বুল দেওয়া হইতেছিল, 'ইতিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে। একবার লৈয়া পুনঃ আর বেশ কাচে। সবাই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে'। 'পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য সে করিলে'—এজন্য প্রভু সকলকে তিনবার মালা চন্দন গুবাক পান দেওয়াইলেন, পাঁচটা বিবাহের অধিবাসের মত ব্যয় হইল। এই বিবাহ সজ্জার বর্ণনায় সেকালের

ধুমধামের বিবাহ কেমন ছিল জানিতে পারি। সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন করিয়া, ললাটে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চন্দনের মধ্য-তিলক দিয়া সুগন্ধি মালায় কলেবর পূর্ণ করিয়া 'দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে' পরাইয়া "নয়নে কজ্জল ও শিরে মুকুট" চড়াইয়া পাত্র সাজান হইত। বড়লোকে সুবর্ণের কুণ্ডল ও নবরত্ন হার পরিত। দিব্য দোলায় চড়াইয়া শোভা যাত্রা করান হইত; পদাতিক পাটোয়ার দোসারি সাজিয়া চলিত;—

নানা বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে,
বিদূষক সকল চলিল নানা কাচে।
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়।
জয় ঢাক, বীর ঢাক, মৃদঙ্গ কাহাল,
দামামা দগড় শঙ্খ বংশী করতাল।
বরগোঁ শিঙ্গা পঞ্চশব্দী বেণু বাজে যত।

শিশুরা, এমন কি, জ্ঞানবানেরাও 'লজ্জা ছাড়ি নাচি' যাইতে লাগিল; 'এমন সংঘট্ট নাহি দেখি কোন কালে'। কন্যা সম্প্রদান একালের মত; 'তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস'—যৌতুক দান লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

সে যুগের ব্রাহ্মণ যজন যাজনাদি ব্যতীত কৃষিকর্ম্মও করিতেন, ইহা রাঢ়ের এক চাকা গ্রামের নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই ওঝার কার্য্যে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবের গৃহে 'বস্ত্র মুদ্গ যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়াপান' দিয়া ব্যাস পূজার প্রথা ছিল। 'ক্ষীর দধি সুনবনী কর্পূর তাম্বুল'—অনেক পূজার উপকরণ। পঞ্চোপচার ষোড়শ উপচার প্রভৃতি এখনকার মত। বড় লোকের আসবাবের কথায়

দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে।

তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে,
পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে।
বড় ঝাড়ি, ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত,
দিব্য পিতলের বাটা পাক পান তাত।

দুইজন লোকে দিব্য ময়ুরের পাখার বাতাস করিতেছে; কপালে উর্দ্ধপুণ্ড তিলক, চন্দনের সহিত ফাগু বিন্দু মিশান, দিব্যগন্ধি আমলকি দ্বারা কেশ্বতার সংস্কৃত; এই হইল বিষয়ীর বেশ। সম্মুখে (মুসলমান বড় লোকের মত) দোলা। এ যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও দিবসে ভোজনান্তে শয়ন দিতেন; 'কতক্ষণ যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া' * পুনরায় পুস্তক লইয়া চলিতেন। সেকালে দূর দূরান্তরের তীর্থ দর্শন সন্ন্যাসীদিগেরই সাধ্য ছিল। বাঙ্গালী গয়া কাশী করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিত। পথিক অতিথি এবং সাধু সন্ন্যাসীর সেবা লোকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মানিত। ভোট কম্বল এবং নেত পাট বস্ত্র মহার্ঘ ছিল। বাঙ্গাল বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের লোককে বিদ্রূপ করা সেকালেও রসিকতা বলিয়া গণ্য হইত।

সেকালে শিবের গানও প্রচলিত ছিল:—'ডম্বরু বাজায়ে গায় শিবের কথন' এবং 'গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে' (চৈঃ ভা), উক্তিতে ভিক্ষুক এইরূপ গান গাহিয়া বেড়াইত দেখা যায়। ভ্রষ্টাচারী তথাকথিত তান্ত্রিক সাধকের মধ্যে কেহ কেহ নিশাযোগে মদ্যপান করিয়া সাধনা করিত। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন; পাষণ্ডী দলে শ্রীবাস অঙ্গনে হরি সভার কথায় ভাবিত ও বলিত যে,

নিশায়ে এগুলা খায় মদিরা আনিয়া।
এগুলা সকল মধুবতী সিদ্ধ জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে॥ (চৈঃ ভা)

* চৈতন্য ভাগবত।

এইরূপ পাষণ্ডীয় দলেরই কোন মহাত্মা,

ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া,
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া।
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল,
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল।
মদ্য ভাণ্ডে পাশে ধরি গেল নিজ ঘরে। (চৈ—চরিত)

এ কালের দুষ্ট লোকের মত ঢিল মারে নাই, এই যথেষ্ট। তখন চীৎকার করিয়া নিশাযোগে কীর্ত্তনাদি করিলে পাছে মুসলমানের বিষ-দৃষ্টিতে পড়িতে হয়, এ ভয়ও ছিল; তাহা দাস ঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন। কাজী সাহেব একদিন সন্ধ্যার সময় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কীর্ত্তনের দলকে শাসাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যদিন সন্ধ্যার পরে দলবল লইয়া কাজীর বাগান নষ্ট করা হইলেও প্রভুর মহিমায় কাজীর ভাবান্তর হইয়াছিল সে কথাও আছে। এই সময়ে ও পরবর্ত্তী কিছুকাল ধরিয়া অনেক লোকে নব বৈষ্ণব দলের নিন্দা ও কুৎসা রটনা করিত, দাস ঠাকুর নানাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি লোকে দোষারোপ করায় বৃন্দাবন দাস মহাশয় বৈষ্ণব হইয়াও চটিয়া লিখিয়াছেন,

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥

নব বৈষ্ণব দলের মধ্যেও পরস্পরের নিন্দা চর্চ্চা চলিতেছিল।

শ্রীচৈতন্য চরিতে প্রেমভক্তির ভাব ভিন্ন সামাজিক কথা আর অধিক কি পাওয়া যাইবে? প্রেমভক্তি জাগাইয়া রাখিবার ঔষধ আহারের কথা অবশ্য অনেক স্থলেই আছে। পানিহাটীতে রঘুনাথ যে মহোৎসব দিলেন তাহাতে 'চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা' প্রচুর যোগাড় করা হইল; বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা (নাদা) পাঁচ সাতটিতে চিড়া ভিজান

হইল, এবং মহোৎসবে আগত লোককে খাওয়াইবার জন্য "শত দুই চারি হোলনা মাগাইল" এবং—

এক ঠাঁঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া।
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল,
চাঁপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল।
ধূতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা
সাত কুণ্ডি বিপ্র তাঁর অগ্রেতে ধরিলা।

প্রভু নিত্যানন্দও শ্রীচৈতন্যের মত 'ভোজন চতুর' ছিলেন।

চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী বন্ধন।
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া আরে দধি চিড়া কৈল।
আর যত লোক সব গোতারা তলানে (চবুতরার নীচে)
মণ্ডলীবন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে॥

সেকালের লোক যেমন ভোজনপটু ও বলিষ্ঠ, আহারের দ্রব্যও সেইরূপ যথেষ্ট ছিল। "অষ্ট কৌড়ীর খাজা সন্দেস" মিলিত। দরিদ্র বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভোজনের কথায় নানা স্থানে "দিব্য অন্ন ঘৃত মুদ্গ পায়স সকল'— লিখিয়া বা ফলাহারের কথায় "দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ'—বলিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। 'দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার' উক্তিই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই অভাব যথেষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন। 'সেকালের আহার' বর্ণনায় ইহা দেখান যাইবে। পুরীতে সার্ব্বভৌম ভবনে "প্রভু বলে বিস্তর নাফরা মোরে দেহ। পিঠা পানা ছেনা বড়ি তোমরা সে লহ'—লিখিয়া 'সে ভোজনের প্রেমরঙ্গ' 'বেদব্যাস

বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ' বলিয়াই দাস ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় পরে ব্যাসরূপে তাহার সুব্যবস্থা না করিলে বর্ণনা নর লোকের চক্ষুর অগোচর থাকিত। তিনি কোথাও "নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া" লিখিয়া বৈষ্ণবের ভোজন ভক্তির প্রমাণ দিয়াছেন, কোথাও রন্ধনের দ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা দিয়া সে যুগের নিরামিষ আহার যে যথেষ্ট তৃপ্তিপ্রদ ছিল, তাহা দেখাইয়াছেন। সেকালের নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব মৎস্য আহার করিতেন না; মাংসের কথা বলাই বাহুল্য। শ্রীক্ষেত্রের কথায় "অতি প্রভাব নির্ম্মল। মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল' বলিয়া দাস ঠাকুর যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে মৎস্যের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দে প্রত্যন্ত প্রদেশে এবং থানাদার প্রভৃতির অধিকার হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে চোর ডাকাইতের উৎপাত ছিল। শ্রীচৈতন্যের উড়িষ্যা যাইবার সময়ে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে বিবাদের সুযোগে 'মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ' হইয়াছিল; 'পথিক পাইলে আশু বলি লয় প্রাণে' ইত্যাদি কথায় মহাপ্রভুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইহার বহুদিন পরে চৈতন্য দেব যখন বাঙ্গালায় ফিরিতেছিলেন তখনও উড়িষ্যার সীমান্তে "মদ্যপ যবন" সামন্তের অধিকার দিয়া আসা নিরাপদ ছিল না। সনাতন গোস্বামী যখন গৌড় হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছিলেন, তখন তেলিয়া গড়ীর নিকটে এক 'ভূমিক' তাঁহার ভৃত্যের কাছে আটটি মোহর আছে জানিয়া "তোমারি মোহর লইতাম আজি রাত্রে' ইহা স্বীকার করিয়াছিল। নবদ্বীপ নগরের মধ্যেই দস্যু দল ছিল; সেই ডাকাইতেরা খাঁড়া, ছুরী, ত্রিশূল লইয়া নিশাযোগে প্রভু নিত্যানন্দের অলঙ্কার চুরির উদ্যম করিয়াছিল। ইহারা মদ্য মাংস দিয়া 'চণ্ডী পূজন' করিয়া বাহির

হইত (*)। 'ডাকা চুরি' কথা এ যুগের সাহিত্যে অনেকস্থলে পাওয়া যায়। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরকে "দস্যুকর্ম্ম করে সদা লয়ে দস্যুগণ" বলা হইয়াছে (†)। শ্রীনিবাস আচার্য্য ভক্তগণ সঙ্গে 'গাড়ী ভরি অমূল্যরতন' গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে অনিতেছিলেন ; পথে হাম্বিরের দস্যুদলে ধনসম্পত্তি মনে করিয়া গাড়ী সমেত লইয়া গেল। পরে রাজা খুলিয়া দেখিলেন, সাধারণ রত্ন নহে 'গ্রন্থ রত্ন' ; শ্রীনিবাস প্রভুর কৃপায় বিষ্ণুপুর সার্থকনামা হইল। রাজা সপরিবারে বহুলোক সহ বৈষ্ণব হইলেন।

'প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়'—ইহা প্রভুর উক্তি কি না, বিচার্য্য। তাঁহার ভক্তি প্রচারের ফলে বৈষ্ণবগণ মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা হ্রাস হইতেছিল সন্দেহ নাই। চরিতামৃতে বৃদ্ধের বিবাহ ও বহু বিবাহের সন্ধান পাই (৩)। বৈষ্ণব গণের মধ্যে সধবার একাদশী প্রচলিত হইতেছিল (৪)।

ধর্ম্ম কর্ম্মের কথায় চৈতন্য ভাগবতকার 'কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার ; ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে' লিখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া নানা স্থানে বলিয়াছেন :—

(*) চৈঃ ভাগ—অন্ত্য, ৫।

(†) ভক্তি রত্নাকর—সপ্তম তরঙ্গ।

(৩) 'বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী (চৈঃ চরিতামৃত—আদি, ১৪)

(৪) 'প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা (চৈঃ চরিত—আদি, ১৫)
সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৭) লেখক ইহা বিধবার পক্ষে বুঝিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

'মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি'
'মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে'
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত,
তাহাই শুনিতে যত লোক আনন্দিত।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে। চৈঃ চরিতামৃত (আদি—১৩)

কিন্তু অন্যত্র :—

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে ঘরে ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥

উল্লেখ করিয়া দুর্গোৎসবের কথা বলিয়াছেন ; বাস্তবিক, সেকালে ঘরে ঘরে বিষ্ণুপূজা, সম্পন্ন লোকের শিব প্রতিষ্ঠা, সাধারণ ছিল। দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা, পুরাণপাঠ ইত্যাদি করান হইত।

যত সব অধ্যাপক তর্ক সে বাখানে,
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে।

ইহাই বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের দুঃখ ও কোপের কারণ। সমাজ ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য ছিলনা ; কৃষ্ণভক্তি শূন্য হইতে পারে। কারণ দাস ঠাকুর বলিয়াছেন ;—

গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখান নাহি তাহার জিহ্বায়।
হেন স্থান নাহি কৃষ্ণ ভক্তি শুনি যথা॥

কৃষ্ণ ভক্তির বন্যা পরবর্ত্তী যুগেই প্রবাহিত হইয়াছিল। জয়দেব বা চণ্ডীদাসের গীতি কবিতায় সেকালের সমাজ মুগ্ধ হয় নাই।

নবদ্বীপ সমাজের শিক্ষা দীক্ষার কথায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাজা

গণেশের কাল হইতে হোসেন শার সময়পর্য্যন্ত পাঠান শাসনের সুপ্রতিষ্ঠার অবস্থায় সেখানে বিদ্যা চর্চ্চার উন্নতির সহিত সমাজের উচ্চ স্তরের লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম বড় মন্দ ছিল না। নবদ্বীপের উদাহরণ সাধারণ বঙ্গীয় সমাজের প্রতি প্রযোজ্য না হইলেও কাব্যাদিতে যে সামান্য উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, সেকালের বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষা যেরূপ ছিল, ৬০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর শিক্ষাও তদপেক্ষা উন্নত হয় নাই। মুসলমানের সংসর্গে এবং রাজকার্য্যে সহযোগিতায় নাগরিক ভদ্র হিন্দু সন্তান কোন কোন বিষয়ে মুসলমানী ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও গ্রাম্য সমাজ সে সংঘর্ষে অল্পই স্পন্দিত হইয়াছিল। মুসলমান রাজ বাঙ্গলার হিন্দু প্রজার ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। রামাঞী পণ্ডিতের উল্লিখিত—'দেউল দেহারা ভাঙ্গে, ক্যাড়া কিড়্যা লয় রঙ্গে, পাখড় বোলে বোল'—ইত্যাদি, পাঠান বিজয়ের প্রথম দশায় ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে স্থানে স্থানে থানাদার ও ডিহীদারের অত্যাচার যে ছিল না, এমন নহে ; এইরূপ অত্যাচারের প্রসঙ্গেই বিজয় গুপ্ত গাহিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে,
কার পৈতা ছিড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে।

কিন্তু এরূপ ব্যবহার বা কুলীনের মেলের কথায় "সেই কন্যা বলাৎকারে হাঁসাই থানাদারে"—এই ভাব সাধারণ ছিল না। দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ প্রকৃতির লোক বিজয়ী দলের মধ্যে চিরকালই থাকে, বিগত মহাযুদ্ধ তাহার দৃষ্টান্ত এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যাচার সে যুগে সকল দেশেই দৃষ্ট হয়। জয়ানন্দের—

পীরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে
ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে"

উক্তির আলোচনা পূর্ব্বেই করা গিয়াছে। চৈতন্য প্রভুর সমকালে নবদ্বীপে কোন অত্যাচার হওয়ার কথা অলীক ; ভাগবত ও চরিতামৃত উহা সমর্থন করে না। চরিতামৃতে সুবুদ্ধি রায়ের মুখে কড়োয়ার অমৃত (পানী) দানের কথা পাই, তাহা নবদ্বীপে নয় গৌড়ে। শাস্তি দিবার জন্য সাময়িক জাতি নাশের কথা অবিশ্বাস করা যায় না ; অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের উক্তি বিশ্বাস করিতে হইলে, হিন্দুরা সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লোককে জাতিতে উঠাইয়াছেন (৫)। বাস্তবিক প্রাথমিক পাঠান যুগে ম্রিয়মাণ বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ বাধ্য হইয়া কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বঙ্গবাসী নানাভাবে উন্নতর পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু একালে অতি কষ্টসাধ্য হইলেও তীর্থ যাত্রায় বিরত ছিল না। গয়ায় পিণ্ডদান, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের দর্শন এবং প্রয়াগে মকর স্নান কেবল শ্রীগৌরাঙ্গই করিয়াছিলেন এমন নহে। দক্ষিণের তীর্থে যাওয়া অবশ্য অনেকের অসাধ্য ছিল, তথাপি বোম্বাই অঞ্চলে মহাপ্রভুর সহিত দুইজন তীর্থ যাত্রী বাঙ্গালার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম নিরত ও সরল স্বভাব ছিলেন। চাপাল গোপালের ন্যায় দুষ্টলোক সকল কালেই থাকে ; জগাই মাধাইএর দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় স্থলে পাওয়া যায় না। বামাচারীরা মদ্য মাংসাদি দ্বারা যে ভবানী পূজা করিতেন তাহা সর্ব্বথা তামসিক ছিল না। সম্পন্ন গৃহস্থ দুর্গোৎসবাদিতে অর্থব্যয় করিয়া

(৫) বল করি জাতি যদি লএত যবনে,
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে।
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেইজন
ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে।
ব্রহ্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ভক্ষণে।" (অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ)

রাজসিক ভাবে লোকের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক মঙ্গলের উপায় চিন্তা করিতেন। আচার সম্ভূত বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডে সাধারণ লোকের ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই তৃপ্ত হইয়া আসিতেছে। বৈদ্যগণ সেকালে জাতীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন; শ্রীখণ্ড বাসী মুকুন্দ রাজবৈদ্য অর্থাৎ বাদশা হোসেন শার চিকিৎসক ছিলেন। কায়স্থ গণের মধ্যে অনেকে যে সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন, তাহা কুলীন গ্রাম বাসী গুণরাজ খাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনায় প্রমাণ হয়। সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম পালক ও সদাচার সম্পন্ন ছিলেন; তবে লেখক ও পাটোয়ারি কায়স্থ এ কালেও সরল স্বভাব নিরীহ লোককে ফেরে ফেলিয়া আসিতেন;—"বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধে অন্তরে করে ডর"। সাধারণ হিন্দুসমাজ একালে ধর্ম্মভীরু এবং বর্ত্তমানের তুলনায় সমধিক সরল স্বভাবই ছিল।

একাদশ অধ্যায়।

গ্রাম্য সমাজ-পরবর্ত্তী যুগ।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য নানা রত্নের আকর। ইহাতে সে যুগের বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের অনেক কথাই পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর রাঢ় অঞ্চলের সামাজিক জীবনের নিখুঁত চিত্র এই কাব্যে যে ভাবে পাওয়া যায় অন্য গ্রন্থে সেরূপ থাকিলে সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলনে কষ্ট পাইতে হইত না। এই সুন্দর আলেখ্য হইতে বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিয়া সেকালের পরিচয় দেওয়া অন্যায় হইবে না। গুজরাট নামক কাল্পনিক নব নগরের জাতিগুলি তাৎকালিক দক্ষিণ পশ্চিম বাঙ্গালার জাতি বিভাগ। কুলস্থানে অর্থাৎ নগরের মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ স্থাপিত হইয়াছিল; প্রাচীন গ্রাম গুলিতে এই ব্যবস্থাই দৃষ্ট হয়। সেকালের রাঢ়ায় ব্রাহ্মণের সমস্ত পরিচয় নিম্নের বিশদ বর্ণনায় পাওয়া যায়।

কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখটি চাটুতি বন্দ্য,
কাঞ্জিলাল ঘোষাল গাঙ্গুলি।
পুতিতুণ্ড বৈসে গুড়, রাই গাঁই কেশরী হড়,
ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলকুলী॥
পারিহাই পীততুণ্ডী, ঝিকরাড়ী মালখণ্ডী,
ঘোষলী বড়াল কুলমাল।
চোটখণ্ডী পলসাঁয়ী দীর্ঘাঙ্গী কুসুম-গাঁয়ী
সাঁই গাঁয়ী কুলভি পারিহাল॥

কুশারি কড়িয়াল পূষলী সিমলাল
পিপলাই বসে পূর্ব্ব গাঁই।
ধনে মানে অতি চণ্ড বাপূলি পিশাচ খণ্ড
করাল নিবসে সিমলাই॥
পালধি হিজল গাঁই মাসচটক ডিঙ্গসাই
কাঞ্জারী সাহরি ভূরিষ্টাল।
বটগ্রাম নন্দী গাঁই ভাটাতি সিদ্ধল দায়ী
নায়েরী কোয়ারী মতিলাল॥
গাঁই নাই গোত্র আছে বসিল বাড়ির কাছে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু নিত্য পড়ে বেদ যজু
বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত॥
দেখিতে তুষার সারি ব্রাহ্মণের আগুসারী
সারি সারি বিপ্রের সদন।
কনক কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
গৃহ শিরে শোভে সুদর্শন॥
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
নানাদেশ হৈতে আসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
দেয় বীর হয় গজদান॥
মূর্খ বিপ্র বসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥

ময়রা ঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধি ভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতারি॥
গুজরাট নগরে নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয় কাহন দক্ষিণা হয়
হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥
গালি দিয়া লণ্ড ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুল পাঁজী করিয়া বিচার।
যে বা না গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥

গ্রামের এক পার্শ্বে আচার্য্য গ্রহবিপ্র, বৈরাগী ও কপালী সন্ন্যাসী বাস করিত ঃ—

গুজরাটে একপাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে
বর্ণ দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্র বিচার করে
বালকের লেখে জাঁওয়াতি॥
মাথার পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কাপালী ঘটা
ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চীন্ ভিক্ষা করি অনুদিন
এক পাশে তারা সব বৈসে॥
সদা লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইনাম
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।

কাঁথা কমণ্ডলু নাটি গলায় তুলসী কাঁঠি
সদাই গোঙায় গীত নাটে ॥
আয়তন ভূমি বাড়ি বীর দেয় বাক্য পড়ি
কুশ নীর তিল করি করে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করিল মুকুন্দ
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥

ক্ষত্রিয় রাজপুত আদি বাঙ্গলায় যেখানে বাস করিয়াছিল, তাহারা 'বিপ্রের পাশে'ই স্থান পাইত; বৈশ্যের উল্লেখ করিয়া পরে বৈদ্য কায়স্থাদির কথা বলা হইয়াছে:—

বীর দেয় বাস যত প্রজা বৈসে শত শত
আপনার ছাড়িয়া নিবাস।
তেসনি ইনাম বাড়ি প্রজা নাহি গুণে কড়ি
সবাকার হৃদয়ে উল্লাস ॥
ক্ষত্রি বসে ভানুবংশ সর্ব্বলোক অবতংস
চন্দ্রবংশে বসে মহাজন।
পুরাণ শ্রবণ আশে বসিল বিপ্রের পাশে
অনুদিন দ্বিজে দেয় ধন ॥
দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপূত
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ দান করে নানা ধন
দেশে দেশে জাহের সুকীর্ত্তি ॥
তুলিয়া আখড়া ঘরে মল্লযুদ্ধ কেহ করে
মালবিদ্যা গুমি চাপগারি।

লইয়া দাণ্ডা ঝাড়া কেহ করে তোলা পাড়া
পশু বধে, কেহ বা শীকারী ॥
আসি পূর গুজরাট নিবাস করয়ে ভাট
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীর দেয় খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল ॥
বৈশ্য বৈসে মহাজন কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ
কৃষিকর্ম্ম করে গো রক্ষণ।
কেহ কলন্তরলয় বৃষে কেহ ধান্য বয়
কালে কিনে রাখে কোন জন ॥
কেহ দর করি তোলা হীরা নীলা মতি পলা
নানা সহর ভ্রমে স্থানে স্থানে।
সাজন করিয়া নায় নানা সফরে যায়
শঙ্খ চন্দন ভরি আনে ॥
চামরি চামর ভোট সকল্লাদ গজঘোট
করতি পট্টিশ অঙ্গরাখি।
এক বেচে এক কেনে নিতি নিতি বাড়ে ধনে
গুজরাটে বৈশ্য-জন সুখী ॥
বৈদ্যজনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত
কর আদি বৈসে কুল স্থান।
বটিকার কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান ॥
উঠিয়া প্রভাত কালে উর্দ্ধ রেখা দেয় ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে।

পরিয়া উজ্জল ধুতি কাঁধে করি নানা পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে ॥
কার দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে হয় যে বিদায় ॥
কর্পূর পাচন করি তবে জীয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে ছলে
সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ ॥
বৈদ্য জনের পাশে অগ্রদানী জন বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজকর নাহি দেয় বৈতরণী ধেনু লয়
হেম রজত তিল লয় দান ॥
ভেট লয়া দধি মাছ ঘৃত কুম্ভ বাঁধি পাছ
কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হৈলা ব্যাধের নন্দন ॥
কায়স্থ মিলিয়া ভাষে আইলাম তোমার দেশে
গুজরাটে করিব বসতি।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
প্রজাগণে করে অবগতি ॥
কোন জন সিদ্ধকুল সাধ্য কেহ ধর্ম্মমূল
দোষহীন কায়স্থের সভা।

প্রসন্ন সবারে বানী লেখা পড়া সবে জানি
সর্ব্বজন নগরের শোভা ॥
অনেক কায়স্থ মেলা দেখিয়া তোমার খেলা
আইলাম তোমার সন্নিধান।
কুলে শীলে হীন দোষ কেহ মাহেশের ঘোষ
বসু মিত্র কুলের প্রধান ॥
তব গুণে হয়া বন্ধী পাল পালিত নন্দী
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ
এক স্থানে করিব নিবাস ॥
বীর কর অবধান প্রজাগণে দেহ পাণ
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন করিবে বিলক্ষেত ॥
ত্যাগ করি কলিঙ্গ লক্ষ ঘর প্রজাসঙ্গ
একস্থানে করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস ॥
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা কাহাকে নাহিক শঙ্কা
দক্ষিণ আওয়াসে কর বাস।
রচিয়া ত্রীপদি ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশ ॥
নিবসে হালিফ * গোপ না জানে কপট কোপ

* হালিক = হলবাহী, হইবে।

ক্ষেতে উপজয়ে নানা ধন।
গোম তিল মুগ মাস বুট সর্ষপ কাপাস
সবার পূরিত নিকেতন ॥
তেলি বৈসে শত জনা কার ঘানী কার ঘনা
কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।
কামার পাতিয়া শাল কোদালী কুঠারী ফাল
গড়ে টাঙ্গী অঙ্গবেধী শেল ॥
লইয়া গুবাক পান বসিল তাম্বুলী জন
মহাবীরে নিত্য দেয় বীড়া।
গুবাক সহিত পান বীড়া বান্ধে সাবধান
কখন না পায় রাজ পীড়া ॥
কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পেটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া।
শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভূনী ধুতি খাদি বুনে গড়া ॥
মালী বৈসে গুজরাটে সদাই মালঞ্চে খাটে
মালা মৌড় গড়ে ফুলঘর।
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজী করিয়া কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।
বারুই নিবসে পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে
মহাবীরে নিত্য দেয় পাণ।
বলে যদি কেহ লয় বীরের দোহাই দেয়।
অনুচিত না করে বিধান ॥
নাপিত নিবাসে তথি কক্ষতলে করি কাতি

করে ধরি রসাল দর্পণ।
আগরী নিবসে পূরে আপনার বৃত্তি করে
অনুচিত না করে কখন ॥
মোদক প্রধান বেণ্যা করে চিনি কারখানা
খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণ ধরয়ে যোগান ॥
সবাক বৈসে গুজরাটে জীব জন্তু নাহি কাটে
সর্ব্বকাল করে নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটসাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিষ ॥
পূরে বৈসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপ ধুনা
পসার সাজায়া চলে হাটে।
শঙ্খবেণে কাটে শঙ্খ কেহ নহে আতঙ্ক
মণি বেণে বৈসে গুজরাটে ॥
কাঁসারী পাতিয়া শাল ঝারা থুরী গড়ে থাল
বাটী খোরা বড় হাণ্ডী সীপ।
সাপড়ী চুণাতি বাটা নির্ম্ময়ে ঘাঘর ঘণ্টা
সিংহাসন পঞ্চ প্রদীপ ॥
স্বর্ণ বণিক বসে রজত কাঞ্চন কসে
পোড়ে কাটে দেখিয়া বিষয়,
* কিছু বেচে কিছু কেনে মনুষ্যের ধন আনে

---

* চুচুড়ার সুবর্ণ বণিক সমাজের মধ্যে সরকার মহাশয় এই পাঠযুক্ত পুঁথি পাইয়াছেন। অন্য পুঁথিতে "পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়' পংক্তির পরেই দেখিতে

পুর মধ্যে যাহার নিলয় ॥

নিবসে পশুতোহর পুর মধ্যে যার ঘর
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সবার ধন
হাত বদলিতে ভাল জানে ॥
পল্লব গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে
বৃষ ভাগ বসায় বাথানে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রী কবিকঙ্কণ রস ভণে ॥
পাইয়া ইনাম ক্ষিতি বৈসে পুরে নানা জাতি
আনন্দিত বীরের নগরে।
বীর করে বহুমান দিল দিব্য পরিধান
নাট গীত সবাকার ঘরে ॥
মৎস্য বেচে চষে চাষ বসে দুই জাতি দাস
তেলিয়া নগরে পীড়ে ঘানী।
বাইতি নিবসে পুরে নানা গীত বাদ্য করে।
পুরে ভ্রমে মাগুরী বিকিনি ॥
বাগুতি নিবসে পুরে বহে হাতে ধনুঃ শরে
মৎস্য মারে খায় নানা রসে।
দরজী কাপড় সীয়ে বেতন করিয়ে জীয়ে
গুজরাটে বসে এক পাশে ॥

দেখিতে জন, হরয়ে সবার ধন, হাত বদলিতে ভাল জানে"—আছে। কিন্তু ইহাতে মিল হয় না। সুবর্ণ বণিকের মধ্যে স্বর্ণকার আছেন, ইহা সম্ভব; কিন্তু পশুতোহর' সংস্কৃত পাঠ না হইয়া 'নির্বসে সে স্বর্ণকার' হইলেই চলে।

সিয়লী নগরে বসে খাজুরের কাটি রসে
গুড় করে বিবিধ বিধানে।
সূত্রধর পূরের মাঝে চিড়া কোটে খই ভাজে
কেহ করে চিত্র নিরমাণ ॥
পাটনি নগরে বসে রাত্রি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকর।
আসিপুর গুজরাটে বৈসে যত রাজ-ভাটে
ভিক্ষা করি ফিরে ঘরে ঘর ॥
চৌহুলি চুণারী মাঝি কোরাঙ্গা ধোয়াড়া ধ্বাজি
মাল বৈসে পুরের বাহিরে।
চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানীফল কেস্থুর পসারে ॥
গোয়াল্লীতে গায় গীতি কয়ালা ফিরিয়ে নীতি
এক দিকে বসে মহারাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে শোলঙ্গে পিলীহা কাটে
ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা।
পুরাণ্ডে নিবসে কোল হাটে বাজে জয় ঢোল
জায় জীবী বসিলা কয়ালে।
কেহ বা বসিল হাড়ী ঘাস কাটি লয় কড়ি
শুঁড়ীর অঙ্গনে যার মেলে ॥
মোজা পনাহি জীন নিরময়ে প্রতিদিন
চামার বসিল এক ভিতে।
বেউনি টাঙ্গনি ঝাঁটি ছাতা টোকা গড়ে নাটি
জীবিকার হেতু এক চিতে ॥

লম্পট পুরুষ আশে বারবধূ জন বৈসে
এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কন রস গান॥

মুসলমানের কথায় কবি বলিতেছেন :—

বীরের লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিক্ বীর দেয় তারে॥
আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোল্লা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী বসাইল হাষণ হাটী
এক মূদনী গৃহ বাড়ি॥
ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বেসাইয়া কেহ হাটে পীরের শীর্ণি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥

না ছাড়ে আপন পথে দশরেখা টুপি মাথে
ইজার পড়য়ে দৃঢ় নাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
আপন টবর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়াত গায় মুছে হাত।
সুর লোহাণি পানী কুড়ানি বটুনি হুনি
পাঠান বসিল নানা মত॥
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়া নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া।
করে ধরি খর ছুরী কুকুড়া জবাই করি
দশগণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেয় মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব খান
মখদম পড়ায় পঠনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
গুজরাটি পুরের বর্ণনা॥

রোজ নমাজ করি কেহ কহাইল গোলা।
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা॥
বলদে বাহিয়া নাম বলায় মুকেরি।
পীটা বেচিয়া নাম ধরাইল পীঠারি॥

মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারি ।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল ।
কাণ হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল ॥
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর ।
জীবন উপায় তার পায়্যা তাঁতী ঘর ॥
পট পড়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে ।
তীরকর হয়ে কেহ নির্ম্মায়েন শরে ॥
কাগজ করিয়া নাম ধরাইল কাগজি ।
কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥ ইত্যাদি ।

রাঢ় নিবাসী চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগের বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বারেন্দ্র সমাজের সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায় 'খাঁই নাই গোত্র আছে' লিখিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বরেন্দ্রভূমে একালের নানা থাক ও পটীর ব্রাহ্মণ চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও বাস করিতেন। হয়ত, পুঁথি নকল কর্ত্তা 'বৈদিক' স্থলে বারেন্দ্র বসাইয়াছেন। 'ব্যবহারে বড় ঋজু' 'বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত' উক্তিতে তাঁহাদের যশোগান আছে। নগর বা গ্রামবাসী মূর্খ ব্রাহ্মণেরা চন্দনের তিলক পড়িয়া ঘরে ঘরে পূজা এবং শ্রাদ্ধাদি করিয়া বেড়াইত এবং টান করিয়া চাউলের বোঁচকা বাঁধিত; এ ভাব একালেও আছে। কিন্তু 'গোপ ঘরে দধি ভাণ্ড, তেলী ঘরে তৈল কুপী ভরি' লওয়ার নিয়ম আর একালে নাই। তাঁহারা সৎশূদ্র যাজী হইয়াছে; গোপ তেলী প্রভৃতির জন্য বর্ণের ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে। কবি তিলি ও তেলী (অর্থাৎ কলু) লইয়া কিছু গোল করিয়াছেন—'তেলি বৈসে শত জনা, কেহ চাষা কেহ ধনা, কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল—একথা তিলির

প্রতিই প্রযোজ্য, কিন্তু সে ঘরে পুরোহিত 'কুপী ভরি' তৈলই কেবল পাইতেন না। 'দধি ভাণ্ড' দাতা পল্লবগোপের ব্রাহ্মণ এখন স্বতন্ত্র। ঘটক ব্রাহ্মণেরা 'কুল পাঁজি বিচার করিয়া' পুরস্কার না দিলে সভায় ব্রাহ্মণ বর্গকে গালি দিয়া বিড়ম্বিত করিতেন; একালে যে দুই চারি জন ঘটক আছেন তাঁহাদের আর সে অধিকার নাই, অনুনয় ও বাক্যব্যয়ে বিবাহ সভায় বিদায়টা পাইলেই তাঁহারা তুষ্ট। 'কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, কোন দ্বিজ কহে কথা, কেহ পড়ে ভারত পুরাণ' এই উক্তিতে সেকালের ব্রাহ্মণ বর্গের ক্রিয়া কর্ম্মের পরিচয় পাইতেছি। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে রত ছিলেন; সমাজও নানা ভাবে তাঁহাদের পোষণ করিত। বৈষ্ণবেরা কাঁথা কম্বল লাঠি লইয়া গলায় তুলসী কাঁঠি পরিয়া 'গীতনাটে' কালক্ষেপ করিত, কবির এই উক্তিতে প্রমাণ হয় যে ৫০।৬০ বৎসর মধ্যে চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব মত রাঢ় অঞ্চলে বহু প্রচলিত হইয়াছিল (৮)

গ্রামের এক পাশে বাস করিয়া গ্রহবিপ্রগণ 'দীপিকা ভাস্বতি' ধরিয়া শাস্ত্র বিচার করিতেন এবং বালকের "জাঁওয়াতি" (জন্ম কোষ্ঠী) লিখিতেন। বর্ণ দ্বিজগণ 'মঠপতি' ছিলেন, অর্থে শিব ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি গ্রাম দেবতার পূজা করিতেন মনে হয়। কুলস্থানের মধ্যেই গুপ্ত, সেন দাস, দত্ত, কর আদি বৈদ্যগণের বাস ছিল। ইহারা প্রভাতে উজ্জ্বল (ফরসা) ধূতি পরিয়া, মাথায় চাদর মুড়িয়া, কপালে ঊর্দ্ধ ফোঁটা করিয়া কক্ষে পুথি লইয়া ফিরিতেন। আমরা পুথির বদলে ঔষধের ঝুলি বাহক ঐরূপ বেশের বৈদ্যকে বাল্যকালে প্রাতে গ্রামে ফিরিতে দেখিয়াছি। অগ্রদানী অবশ্য বৈদ্যের পাশে বাস করিয়া রোগীর

(৮) চণ্ডীকাব্যের শ্রীচৈতন্য বন্দনায় আমাদের সন্দেহ আছে; ইহাতে 'কবিচন্দ্র' ভনিতা রহিয়াছে, এবং শ্রীরাম, লক্ষ্মী এবং চণ্ডী বন্দনার পূর্ব্বে ইহা স্থাপিত হওয়ায় অপর কোন ভক্তের হস্তাবলেপ সুস্পষ্ট।

সন্ধান করিবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু রাজকর না দেওয়াটা আর একালে চলে না। ভেট লইয়া 'মহাজন' কায়স্থ আসিয়া 'বাড়ি ভূমি পাইল' কথায় সেকালের ভূস্বামীরা কায়স্থ বসাইতেন দেখা যায়। ইহারা সকলেই লেখা পড়া জানায় গ্রামের শোভা ছিলেন। 'হালিক' (হল বাহী) কৃষক সদ্গোপেরা (১) বহুদিন হইতে ক্ষেতে নানা ধন উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। এই নিরীহ জাতি সুচিরকাল 'কপট বাঁ কোপ' জানিত না; একালের 'ভদ্র' উপাধিধারী গ্রাম্য লোকের দৃষ্টান্তে কপটতা ক্রমে প্রবেশ লাভ করিতেছে। অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে কবির বিশদ বর্ণনা সকলেই বুঝিবেন; টীকা করা অনাবশ্যক। নাপিতের রসাল 'দর্পণ' পূর্ব্বে কাংস্য নির্ম্মিত ছিল, এখন বাক্স মধ্যে বিলাতী আরসী স্থান পাইয়াছে। তিলিরা কেহ 'চাসি কেহ ঘনা'—কথায় 'ঘানি পাড়িত' বুঝিয়া কেহ কেহ ভ্রম করিয়াছেন। এখানে চাস ও ব্যবসায়ের উল্লেখে নবশাখ 'তিলী' জাতির কথাই বলা হইবাছে; শেষে তেলিরা বা 'কলুরা নগরে পাতে ঘানী' উল্লেখ আছে। তন্তুবায় ভূনী ধুতি ও গড়া খাদি ইত্যাদি বুনিত। 'খাদি' চরকার স্তার পাড় বিহীন কাপড়; 'খদ্দর' কথা নূতন সৃষ্টি নহে। নিরামিষ-ভোজী (বৌদ্ধাবশেষ?) 'সরাক' তাঁতি নেত ও পাটশাড়ী অর্থাৎ তসর ও রেসমের কাপড় বুনিত। সুবর্ণবণিকের বা স্বর্ণকারের কৌশলে হাত বদলাইয়া 'ধন হরণের' কথা আছে। ছুতারেরা চিড়া কোটে, খৈ ভাজে দেখিতেছি; একালে ছুতারেরা খই বিকায়না, কিন্তু চিড়া সম্বন্ধে তাহাদেরই একাধিপত্য। সিউলীর খেজুর রসে গুড় করা নূতন

(১) আমরা ৺ অক্ষয় সরকার মহাশয় সম্পাদিত পুস্তকের পাঠগ্রহণ করিয়াছি; কোনও পুঁথিতে 'বণিক' আছে, এখানে 'হালিক' হইবে, 'হানিক' নহে। কৈবর্ত্তের 'হেলে' ও জেলে বিভাগের মত, গোপ সেকালে হালিক ও পল্লব নামে কথিত হইত।

নহে। 'মৎস্য বেচে করে চাস দুই জাতি বৈসে দাস' বলিয়া কৈবর্ত্তের উল্লেখ হইয়াছে। তখন প্লীহা ছানি কাটা শেলিঙ্গ, ও হাটে ঢোল বাজান কোল ছিল। হাড়ীরা সেকালেও শুঁড়ীর অঙ্গনে মেলা বসাইত। চামারেরা মোজা, পানাহি, জীন প্রস্তুত করিত; এখানে 'মোজা' ঘোড়ায় চড়িবার জন্য নিম্ন পদাবরণ। 'নগরের এক ভিতে' বার-বধূর অধিষ্ঠান ছিল, মধ্যভাগে সদরে নহে।

সেকালের সৈয়দ মোগল প্রভৃতি ভদ্র মুসলমানকে 'বড়ই দানিস বন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ' বলিয়া সুখ্যাতি করা হইয়াছে। "পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ'—'প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে' ইত্যাদি কথায় স্বধর্ম্ম-নিরত মুসলমান প্রজা যে ভদ্রলোক ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। 'ভূঞ্জিয়াত গায় মুছে হাত' 'কেহ নিকা কেহ করে বিয়া'—এ সব চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের ভাল না লাগিতে পারে। 'মখ্ তবে মখ্দম পঢ়না' পড়ানর ব্যবস্থা সেকালেও ছিল। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ব্যবসায় ভেদে যে সকল নাম পাইয়াছিল, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মৎস্য বিক্রেতা কাবারী মুসলমান 'নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ী'; একালের মুর্শিদা-বাদের মৎস্য বিক্রেতা মুসলমান মহলদার দাড়ী রাখিয়াও মিথ্যা কথা বলিতে ভুলে না। 'হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল। কাণ হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল" ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এখনও রাত্রিতে কানা হইয়া ভিক্ষা মাগা চলিত আছে। কাগজ প্রস্তুত করা উঠিয়া গেলেও অদ্যাপি মুসলমান নগরে 'কাগজি পাড়া' আছে; রঙ্গরেজ ও হাজাম, এখনও বর্ত্তমান। দরজী, কসাই ত চিরজীবি; জোলার অভাব নাই।

হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারের কথায় চণ্ডী কাব্য সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভ দিন দেখিয়া গর্ভাধান, সাধভক্ষণ এবং নামকরণাদি সংস্কার

নির্ব্বাহিত হইত ; গর্ভাধানে দম্পতি সূর্য্যার্ঘ্য দান করিত (১০)। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অবস্থা অনুসারে পান ভোজনের আয়োজন হইত। পল্লীগ্রামে সন্তান প্রসবের পরে চালের খড় কাড়িয়া অগ্নি জালিত ; সূতিকা ঘরের দুয়ারে গোমুণ্ড দ্বারা ষষ্ঠী স্থাপনা করিত এবং হুলুধ্বনির সহিত নাড়ী ছেদন করাইত ; দুয়ারে জাল বেত্র ও উপানৎ ঝুলাইয়া দিত (১১)। প্রসবের তৃতীয় দিনে প্রসূতিকে পাচন ও সুপথ্য দেওয়া হইত। ছয় দিনে জাগরণ ষষ্ঠী পূজা, সাত দিনে সপ্ত ঋষির অর্চ্চনা, আট দিনে আটকলাই, নয় দিনে নওা ; ২১ দিনে ষষ্ঠী পূজা হইত।

সেকালেও শিশুর ঘুম পাড়ান গান ছিল। পঞ্চম বর্ষে শুভক্ষণে হাতে খড়ি দিয়া ক খ গ আঠার ফলা পড়ান হইত। অনেক বিত্তশালী

---

(১০) সকল দোষহীন, বিচার করিল দিন, প্রথমে গর্ভের সঞ্চার,
সোঙরি পুরহর দম্পতি যুড়ি কর, মিহিরে দিল অর্ঘ্য দান।
নিদয়ার সাধহেতু, ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু, চাহিয়া আনিল আয়োজন,
'গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু'
পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ বেধণ'
ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী,
বিবাহে সঞ্জয় কেতু দিল অনুমতি' ইত্যাদি।

(১১) কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি।
দ্বারে স্থাপিল ষষ্ঠি স্থাপিল গোমুড়ি।
দুয়ারে বাঁধিল জাল বেত্র উপানৎ
'হুলাহুলি দিয়া কৈল নাড়ীর ছেদন'
তিন দিনে কৈল তার তার সুপথ্য পাচন'
'ছয় দিনে কৈল ষষ্ঠি পূজা জাগরণ'
সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা
আট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা
নয় দিনে নওা কর্য়ে মনের হরিষে ইত্যাদি (ক, ক, চ)

সৎশূদ্রের সন্তানেরাও সংস্কৃত শিখিত ; কেহ কেহ বৈদ্যক জ্যোতিষ পর্য্যন্ত পড়িত, একথা শ্রীমন্তের (শ্রীপতির) শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রমাণিত হয়। বিবাহে একালের গ্রাম্য সমাজের মত তৈল হরিদ্রা, অধিবাস, পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার ও দেবসেনা (ষষ্ঠী) পূজা পূর্ব্বক ঘৃতের বসুধারা দেওয়া সবই ছিল ; বেশীর ভাগ কনের মায়ের বর বশ করিবার জন্য উপযুক্ত ঔষধ করার কথা আছে (১২)। নিম্নশ্রেণীর লোকের বিবাহেও অধিবাসাদি সমস্ত হইত ; পাত্র পক্ষকে সময়ে সময়ে পণ লাগিত। ব্যাধ কালকেতুর বিবাহে 'পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন' ; ইহা এবং কন্যা নিরক্ষণী দিতে হইত। এক্ষেত্রে ফুল্লরার পিতা ব্রাহ্মণকে ঘটকালী স্বরূপে বারপণ, এবং পাত্রপক্ষকে 'পাঁচ গণ্ডা গুয়া দিব গুড় তিন সের। ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের' বলিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। এরূপ বিবাহেও 'বাউড়ি যোগায় দোলা' এবং চেমচা দগড় কাড়া বাজনা ছিল। ধনী বণিক্ ধনপতি খুল্লনার বিবাহ সময়ে ঘটক, কুলীন-পণ্ডিত এবং পুরোহিত সঙ্গে যে অধিবাস সজ্জা পাঠাইলেন, তাহা দেখিবার যোগ্য।

আগু পাছু সারি সারি, সজ্জা লয়ে যায় ভারী,
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।
তৈল সিন্দুর পান গুয়া, বাটা ভরি গন্ধ চুয়া
আম্র দাড়িম্ব পাঁচ কাঁটা,
পাটে করি নিল খই, ঘড়া ভরি ঘৃত দই
সাজায়া সুরঙ্গ মীন বাটা।

---

(১২) খুল্লনার বিবাহ—(কবিকঙ্কণ চণ্ডী) ইহাতে দুর্গাপূজার কাটা মহিষের নাকের দড়ি বরকে কনের নাক বেঁধা পশু করে। এলো চুলে অর্দ্ধ রাত্রে তোলা গাছ বিশেষ, সাপের আটুলি, মঙ্গলবারে রুইমাছের পিত্ত প্রভৃতিও চাই।

ক্ষীর পুলি গঙ্গাজল, কাঁন্দি বাঁধা নারিকেল
চিনির পুরিয়া নিল গাছ।
চাল দালি রাশি রাশি যোড়ে যোড়ে নিল খাশী
সাজুরিয়া ভারে নিল মাছ।
সর্ব্বস্ব পৌটলি হারা বান্ধি দিল কোল সরা
সূতা দিল নাটাই সহিত।
সুরঙ্গ পাটের শাড়ী বিচিত্র রঙ্গের কড়ি
বীজমালা সুবর্ণ জড়িত।
চিনি চাঁপা মর্ত্তমান, করি লয় দিতে দান
হরিদ্রা রঞ্জিত বসন।
গোরোচনা নিল শঙ্খ, চামর চন্দন পঙ্ক
ফুলমালা কজ্জল দর্পণ।

উপরে 'চান্দা' টাঙ্গান, ধূপে আমোদিত সভাস্থলে 'কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, বসিল পণ্ডিত ঘটা, সকন্নাদ চামরী কম্বলে'। এই বিবাহে অধিবাসেরও ধূমধাম আছে, 'দ্বিজগণ করে বেদগান' 'ব্রাহ্মণ পড়য়ে বেদ' বলিয়া দুইবার বেদ পাঠের উল্লেখ আছে; "পটহ মৃদঙ্গ সানী, দগড় কাংসত বেণী, শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী বিল্লুকী; থমক চমক ভেরী, জগঝম্প বাজে তুরী, অঙ্গ ভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী" লিখিয়া কবি ধনশালী লোকের কন্যার বিবাহের ঘটা দেখাইতেছেন। বিবাহের সময়ে "কেহ গায় কেহ নাট, রায়বার পড়ে ভাট, করিবর পৃষ্ঠে বাজে দামা'। 'বুড়িয়া ক্রোশেক বাট, বরযাত্র চলে ঠাট';—আবার বরযাত্র ও কন্যাযাত্রের মধ্যে গণ্ডগোল, 'গালাগালি চুলোচুলী' ও হইয়াছে; এভাব পল্লীগ্রামে ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি। 'বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে'; ভাল কম্বল মহার্ঘ জিনিস ছিল। বরসূতা দিয়া বরের অধর ও দুই কর মাপিয়া কন্যার সূতার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইল, বরের 'গালাগালি দিতে যেন মুখ নাহি চলে'। কনের বেল্লায় কিন্তু কোন কথা নাই! বড় লোকের বিবাহে 'গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী'—এখনও চলে। শয্যা তোলা কড়ি 'পঞ্চাশ কাহন' সেকালে বড় কম নয়। পাত্র কন্যা বিদায়ের সময়ে 'কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী'—'কেহ দেত কেহ শ্বেত কেহ পাট শাড়ী, কুসুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি'। কন্যাকর্ত্তা 'দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত-শংখ দশভার'—সেকালে ইহা মূল্যবান্ বাণিজ্য দ্রব্য ছিল। বন্ধুজনকে বসন কাঞ্চন ব্যবহার দেওয়া হইল। রাজাকেও যথাযোগ্য উপহার দেওয়া হইয়াছে।

প্রৌঢ়া সপত্নী পাটশাড়ী এবং চূড়ি পরিবার জন্য পাঁচ পল স্বর্ণ পাইয়া বিবাহে মত দিয়াছিল; নব বধূ বয়স্থা হইল, সাধু সোণার খাঁচা আনিতে গৌড়ে গেলে দুর্ব্বলা দাসীর কুমন্ত্রণায় সতীনকে বিষ নজরে দেখিল। পরামর্শের জন্য ব্রাহ্মণ কন্যা সই লীলাবতীর কাছে গেল। সে বলিল, এক সতীন দেখিয়া কেন বিমনা হইয়াছ? আমি ফুলের মুখুটির মেয়ে, বাবা 'মহাকুল বন্দ্যঘটী' খুঁজিয়া দারুণ ছয় সতীনের উপরে আমার বিবাহ দিয়াছেন; আমি শাশুড়ী ননদী সকলকে ঔষধে বাঁধিয়াছি, এই বলিয়া নানা ঔষধ করার ব্যবস্থা দিল (১৩)। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় 'অবুদ করার' যে বিশ্বাস ছিল, এখনও পল্লীগ্রামে তাহা একবারে তিরোহিত হয় নাই। কবি শেষে ইঙ্গিত

(১৩) এই সুদীর্ঘ ঔষধের ব্যবস্থার ফর্দ্দ যাঁহার প্রয়োজন হইবে, বঙ্গবাসী-সংস্করণের দুই পৃষ্ঠা-ব্যাপী বর্ণনা দেখিয়া লইবেন। শ্মশানের ক্ষীরা ও কবর বিছাতি হইতে আরম্ভ করিয়া, কাল গরুর গাঁজ, সাপের আটুলি ইত্যাদি কত কি আছে তাহা দেখিবার যোগ্য। ছিনা জোকের ও শ্বেত কাকের শোণিত প্রভৃতি নানা উপকরণে ম্যাকবেথের কবিকেও নতমস্তক হইতে হয়।

করিয়াছেন, 'বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ'—কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা এ পরামর্শ গ্রহন করে নাই। এই সপত্নী কোন্দল ব্যাপারের অন্য সব বাদ দিয়া দেখা যায় যে সেকালের ভদ্র পরিবারে মহিলারা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকার্য্যে নিপুণা ছিলেন; আবার 'চারি পাঁচ সখী মেলে, রাত্রিদিবা পাশা খেলে' কথায় স্ত্রীলোকের মধ্যে পাশা খেলার বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। শেষে 'সেই নারী ভাগ্যবতী, ধনবান যার পতি, বিবাহ করয়ে দুই তিন' বলিয়া প্রবোধ দিবার কথাও আছে।

সপত্নী কোন্দলের মধ্য দিয়া স্বামীর প্রতি সে কালের বঙ্গাঙ্গনার ঐকান্তিক অনুরাগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুদরিদ্র ব্যাধ বনিতা ফুল্লরা বিষম ভ্রম করিয়া ভাবিল, পতি 'কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছে ঘরে'; দুঃখ দৈন্যের দারুণ পীড়নে হৃদয়ে যে আঘাত পায় নাই, সেই শেল সম আঘাত পাইয়াও সে স্বামীর সহিত যে ব্যবহার করিল তাহাই পল্লী বাসী দরিদ্র গৃহস্থ পত্নীর এখনও আদর্শ। ধনবানের বধূ খুল্লনা সপত্নীর চক্রে কষ্ট পাইল; প্রবাসী পতি তাহাকে হীন কর্ম্মে নিয়োগ করিবার অনুমতি পত্র পাঠাইয়াছেন, ইহা কতক অবিশ্বাস কতক বিশ্বাস করিয়াও নিজ অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিল, পতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল না। বঙ্গনারীর ধর্ম্মবিশ্বাস ও শিক্ষা নানা কুসংস্কারের মধ্য দিয়াও তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। পল্লীবাসী পুরুষও এই বিষয়ে প্রশংসা পাইবার যোগ্য ছিল; কিন্তু নাগরিকের বেলায় একথা খাটে না। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের নাগরিক অনেকেই যে প্রবাসে ধনপতি সাধুর গৌড়ের ব্যবহার অনুকরণ করিত (১৪) তাহা বিশ্বাস

(১৪) 'পরস্ত্রীতে যুক্ত হৈয়া, পাসরিলে নিজ জায়া সুখে আছ গৌড় নগরে'। পাশা খেলি গোড়াও দিন, মর্য্যাদা করিলে হীন, ইত্যাদি, সাধুর প্রতি স্বপ্নাদেশ। (ক, চণ্ডী),

করিবার কারণ কাছে। সহর বাজারে সেকালেও অনেক প্রতারক ছিল; সকল কালেই থাকে। কাজেই 'বেণে বড় দুষ্ট শীল, নামেতে মুরারী শীল', যে পাওনাদার দেখিয়া গা ঢাকা দেয়, বা লোক ঠকাইয়া টাকার সোণায় চারি আনা মাত্র দিতে চাহে এবং ভাড়ু দত্তের মত প্রতারক কায়স্থ, সে যুগেও অনেক দেখা যাইত। দুর্ব্বলা ত 'দাসী নীচ কুলোদ্ভবা' তাহার মত ঝি সকল যুগেই থাকে; আদর্শ কবি চাকরাণীর নমুনা তাহাতে দেখাইয়াছেন, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। বাজার চুরিই ঐ শ্রেণীর জীবের একমাত্র কৃতিত্ব নহে; সতীনের সংসারে উপযুক্ত ব্যবহারের আলেখ্য এই চরিত্র চিত্রণে সম্যক্ পরিস্ফুট।

সেকালের নগর ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যস্থলে শিব মণ্ডপ থাকিত; স্থানে স্থানে বিষ্ণু মন্দির, পথিক দিগের নিমিত্ত অতিথিশালা এবং অনাথ মণ্ডপাদি অনেক নগরের শোভা বর্দ্ধন করিত (১৫)। ধর্ম্ম কর্ম্মে সাধারণের মতি গতি ছিল; বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে স্নান দান, নিরামিষ আহার এবং উপবাস করা পূণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। জৈষ্ঠ মাসে 'চন্দন দান সুকৃতির সীমা' ছিল। 'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে। ষোল উপচার দিয়া ছাগল মহিষে'। বৈশাখাদি মাসে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ পাঠ হইত। ফাল্গুণে দোল মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া সম্পন্ন লোকে ফুল দোল উৎসব করিত এবং হরিদ্রা ও কুঙ্কুমের পিচকারী দেওয়া হইত। মাঙ্গলিক কার্য্যে দ্বারে 'রম্ভাতরু আরোপণ' এবং 'গীত নাট বিয়াল্লিশ বাজনা' রীতি ছিল। গন্ধ বণিকেরা

(১৫) 'আওয়াসের পূর্ব্ব দিশে, বিচিত্র কলস বৈসে, সারি সারি বিষ্ণুর দেউল নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথ মণ্ডপ অতিথিশালা' 'বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তথি মেলা।'

গন্ধেশ্বরীর পূজা করিত এবং আপদ বিপদে তাঁহারই দোহাই দিত। পূজা অর্চ্চনা যে ভাবেই চলুক, এযুগের বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রাণতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মহিষ, ছাগ, মেষ, রাজহংস পর্য্যন্ত বলিদানের উল্লেখ থাকায় শক্তি পূজার ঘটা দেখা যায়। মাংসের উপর বাঙ্গালী শাক্তের বড়ই ভক্তি। আশ্বিনে অম্বিকা পূজায় 'দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে' বলা হইয়াছে। ষষ্ঠীপূজাতেও বলিদান দেওয়ার উল্লেখ আছে। শিবপূজা ও চড়কের কথায় কোনও পুঁথিতে 'জীবন অবধি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর' পাওয়া যায়, অন্যত্র,

চৈত্র মাসে পূজে শিব নানা উপচারে,
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।
জিহ্বা কাটে জিহ্বা ফোড়ে করয়ে চড়ক,
অভিমত ফল পায় না যায় নরক।

ইহা পরবর্ত্তী কালের যোজনা কিনা, নিশ্চিত বলা যায় না। চণ্ডিকা পূজা ও জাগরণ এ যুগের পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত, ইহা দেখা গিয়াছে। 'যদি পায় চতুর্দ্দশী, থাকে তবে উপবাসী, নিশাকালে করে জাগরণ'—ইহাও আছে। ব্রত উপবাস বাঙ্গালীর গৃহ ধর্ম্মের অঙ্গ। 'শতেক ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী'; ধনাঢ্যের কথায় 'পূজার দক্ষিণা দিল হেম দশতোলা' পাই; তখন 'কাঞ্চন মূল্য রজত খণ্ড' কি চলেন নাই?

চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধান নায়ক সমুদ্র যাত্রী সাধু (বণিক), কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাঢ় প্রদেশে বাস করিতেন, সমুদ্র যাত্রী বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কি না সন্দেহস্থল; তবে সমুদ্র যাত্রা নিষেধের দলে নহেন এই যথেষ্ট। তাঁহার বর্ণনায় ডিঙ্গা নির্ম্মাণ করিতে বিশ্বকর্ম্মার আগমনের প্রয়োজন হয়। অজয় ও ভাগীরথীর তীরে স্থাপিত কতকগুলি স্থানই তাঁহার পরিচিত; ছত্রভোগ ও হাত্যাগড়

হইয়া গঙ্গার মোহানা দিয়া সমুদ্র কূলে পুরী ভিন্ন অন্য স্থানে যাওয়ার সন্ধান রাখিতেন না, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কবির বিশ্বকর্ম্মা যে প্রণালীতে ডিঙ্গা নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য। "কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল (!) গাম্ভারী তমাল ডহু প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলের পরিচিত কাষ্ঠ হনুমান করাতীর দ্বারা চিরাণ হইল (অবশ্য নখ দ্বারা)। তৎপরে,

শিলে সানায়ে বাশী পাটি চাঁচে রাশি রাশি
নানা ফু বচিত্র কলস,
পিতা পুত্রে দোঁহে আঁটি গজালে পরায় পাটি
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস।
প্রথমে করিল অজ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ,
মকর আকার মাথা, গজের অন্তরে লতা
মাণিকে করিল চক্ষুদান।
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী, নাম যার গুয়া রেখি
আর ডিঙ্গা নামে রামজয়,
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মধ্যে তার ছৈঘর
পাশে গুড়া বসিতে কাণ্ডার
ছুসার বসিতে পাট, উপরে মালুম কাঠ
পিছে গড়ে মালিক ভাণ্ডার।

এইরূপে সে যুগের রাঢ়ী মিস্ত্রীর প্রস্তুত নদীতে চালান নৌকাকে একটু লম্বা চৌড়া করিয়া লইয়া শাল কাঁঠালের 'দণ্ড কেরোয়াল' বানাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহাদিগকে 'ভ্রমরা গাঙ্গে' ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সিংহল 'পাটনের' নাম মাত্র তিনি শুনিয়াছেন; সমুদ্র মধ্যে সর্পাদি তাড়াইতে গুড় চাউলী, ইসর-

মূল ফেলাইবার গল্প লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন ; পূর্ব্ব দক্ষিণ বঙ্গের বা অন্ততঃ সাতগাঁ অঞ্চল বাসী হইলেও আমরা এই উচ্চ শ্রেণীর কবির নিকট সেকালের বাণিজ্যের অনেক কথা শুনিতাম। বাঙ্গাল মাঝি গণের প্রতি "বাফোই বাফোই" ইত্যাদি বিদ্রূপের রসিকতা কবির নিজের হইলে সমুদ্র যাত্রায় তখন তাহারা পটু ছিল ইহা জানা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বাঙ্গালী বণিকেরা উপকূলের বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রচুর ধন লাভ করিত ইহার অন্যান্য প্রমাণ আছে। কবিকঙ্কণের প্রাচীন পুঁথিতে ত্রিবেণীর বর্ণনা মাত্র আছে ; সপ্তগ্রামের কথা পরে যোজিত হইয়া ছাপায় স্থান পাইয়াছে, মনে হয়।

এ যুগের বসন ভূষণের কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। সাধারণের বেশভূষার উল্লেখে কবি বলিতেছেন,

কাহনেক কড়ি দিল ধুতি এক খান।
মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া,
ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাসা জোড়া।

গরীব লোকে খুঞা ধুতী ও খোসলা (যাহা, 'উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা') ব্যবহার করিত। তাহাদের পক্ষে 'তুলি পারি পাছুরী শীতের নিবারণ' ; অন্যত্র সম্পন্ন লোকের জন্য তসর বসনের কথা আছে। 'নগরে নাগর জনা, লম্বমান কানে সোণা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দন চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর বসন পরিধান'। সাধারণ লোকে খোকড়ি বা দোহর মোটা বস্ত্রে (বর্ত্তমান খদ্দর) শীত নিবারণ করিত ; গড়া বাস পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র উভয় কর্ম্মেই দরিদ্রের বন্ধু ছিল। সম্পন্ন ব্যক্তি জুতা পরিতেন ; সাধু রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পা ধুইয়া পাদুকা পরিয়া 'বিনোদ মন্দিরে' গেলেন। তাঁহার বিচিত্র তাম্বু, রাঙ্গা ডাঁটি লাগান 'মণি মুক্তা উপনীত' আতপত্র ছিল ; সাধারণে গুয়া বা

তাল পত্রের ছত্র ব্যবহার করিত। ধনবানের শয্যা রচনা বর্ণনায় আয়াস ঘর সুগন্ধি পুষ্পের দামে ও মনোহর চাঁপায় আমোদিত করিয়া, চন্দনে ভূষিত খট্টা ও মশারি কিরূপে পাতা হইল দেখুন ;—

দড়ি করিয়া আঁটে, প্রথমে বিছায় খাটে,
তুলি মশারি শেজ ঝাঁপা।
শালের দোপাটা পাড়ে, গুয়ার সাপুড়া এড়ে
ফুলের তবক থোপা থোপা।
চৌদিকে সুরষা বাঁধা উপরে টাঙ্গায় চাঁদা
তথি পড়ে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড়
মাঝে মাঝে লাল পাট ডোরা।

দড়ি আঁট করিয়া একা দুর্ব্বলার মত অবলাই বড় লোকের খাট বিছাইতে পারিত। অন্যত্র 'খট্টায় পাড়িয়া তুলি, টাঙ্গায় মশারি জালি আছে ; অতএব ছাপড় খাট তৎকালে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই দেখা যাইতেছে। সুরষা অর্থাৎ রঞ্জিত বা বস্ত্রমণ্ডিত দড়া বাঁধিয়া চাঁদোয়া টাঙ্গাইতে হইত। ধনাঢ্যের পট্ট মশারি খাট হইতে গজ দেড় নামিত ; মশক (এনোফেলিস্ না হউন) সেকালেও তবে 'অপ্রতিহত প্রভাবে' বর্ত্তমান ছিলেন !

স্বীয় বাসস্থান ও তাহার অবস্থা বর্ণনায় কবি মুকুন্দরাম যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সে যুগের অনেক গ্রামের নূতন জমিদার বা ইজারদারের কীর্ত্তি কলাপ এবং প্রজার দুঃখ দৈন্যের কথা জানিতে পারি ;

সহর সলিমাবাজ যাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।

তাহার তালুকে বসি দামিন্যাতে চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে যে বা ভৃঙ্গ
গৌর-বঙ্গ-উৎকলমহীপ।
রাজা মানসিংহের কালে* প্রজার পাপের ফলে
ডীহিদার মামুদ সরিপ ॥
উজির হইলা রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডীহিদার অবোধ খোজ ক দিলে নাহি রোজ
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
জানিন্দার প্রতীত আছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥

* দীনেশ বাবু 'অধর্ম্মী রাজার কালে' পাঠ পাইয়াছেন; তাহাই সঙ্গত।

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ।
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামিন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥

নূতন বন্দোবস্তে প্রজার উপর জুলুম সকল যুগেই হয়, কিন্তু বিপ্লবের পর তোড়ল-মলী ব্যবস্থার অপব্যবহারে মাপ জোপের উৎপাত কোন কোন স্থলে বেশী হইয়াছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অন্যত্র আশ্রয় পাইয়া 'পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান' কথা কৃতজ্ঞ সহৃদয় লোকের মত সানন্দে উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষি-জীবি লোক তখন প্রায়ই দরিদ্র ছিল; উদরান্ন যুটিলেই যথেষ্ট মনে করিত।

কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে কাব্য বর্ণিত বুলান মণ্ডলের গল্প বিবেচ্য। কলিঙ্গদেশ জলপ্লাবনে ডুবিলে,

বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই,
হাজিল বিলের শস্য তারে না ভরাই।
মসিল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি,
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি।

এই হইল তখনকার কোন কোন দুর্দ্দান্ত জমিদারের (দুর্ভাগ্য বশতঃ একালেরও অনেকের) ব্যবস্থা। তাই কবি তাঁহার আদর্শ ভূস্বামীর মুখে বলাইয়াছেন,

আমার নগরে বৈস, যত তুমি চাস চষ
তিন সন রহি দিহ কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা কারো না করিহ শঙ্কা,
পাট্টায় নিশান মোর ধর।

নাহি দিব দাবড়ি, র'য়ে বসে দিহ কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশ গাড়ি, নানা বাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে।
পার্ব্বণী পঞ্চক যত, গুয়া লোণ সানা ভাত
ধান কাটি কলম কস্থুরে।
যত বেচ ভাল ধান তার না লইব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।

কায়স্থ ভাড়ু দত্ত এই উপলক্ষে নিজের কুলশীল এবং বৃহৎ পোষ্যবর্গের তালিকা দিয়া 'ধান্য বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বিছন পুরা' এ কথা নিজের পক্ষে বলিয়া সাধারণ প্রজার বিষয়ে কি পরামর্শ দিয়াছে শুনিবেন? প্রথম কথা, (এখনও ভদ্র উপাধিধারী গ্রাম্য লোকের এই মত) 'নফরের হাতে খাণ্ডা' দেওয়া অর্থাৎ ছোট লোককে বাড়ান ভাল নয়; জমি মাপিয়া বলদ ধান কর্জ্জ দিয়া বসাও, কিন্তু 'যখন পাকিবে ধন্দ, পাতিবে বিষম দ্বন্দ, দরিদ্রের দানে দিবে নাগা' এই হইল জমিদারের সুব্যবস্থা।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বয়ং 'দামুন্যায় চাস চষি' লিখিয়া দেখাইয়াছেন, সে যুগের ব্রাহ্মণদিগেরও অনেকে কৃষিকর্ম্ম দ্বারা পরিবার পোষণ করিতেন; অবশ্য হলবাহী মজুর থাকিত। কৃষিই বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালী গৃহস্থের উপজীব্য; কৃষিলব্ধ দ্রব্য সুলভ, এজন্য উদরান্ন সংস্থান সহজে হইত। আরাম বিরাম সাধারণ লোকের সহজ লভ্য ছিল না। এ যুগের পরবর্ত্তী দুই শত বর্ষ ধরিয়া সমাজ যে এই ভাবের ছিল, অন্য চক্রবর্ত্তীর 'শিবায়ন' তাহা সপ্রমাণ করে। তিনি চাসের ব্যাপারে স্বয়ং শিবকে আসরে নামাইয়া ভীম মুনিসের দ্বারা ভাল করিয়া আবাদ

জমাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত জমির কোণ সেচিয়া মাছ ধরার ভগবতী রূপা বাগ্দিনী রাঢ়ে এখনও গ্রামে গ্রামে দৃষ্ট হয়, এবং কত রুদ্রাবতার চাসা সেই বাগ্দিনীর পশ্চাতে ধাবিত হয় তাহা রাঢ় বাসী আমাদের অজ্ঞাত নাই। সে যুগের অন্য কথা যথাস্থানে বলা যাইবে।

যখন দেশবাসী প্রায়ই দরিদ্র, তখন কড়ি দ্বারা কেনা বেচা হইত বলাই বাহুল্য। কড়ির ব্যবহার পল্লী অঞ্চলে ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে। পল্লীবাসী প্রধানতঃ নিজ দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস লইত। এই ভাব কবিকঙ্কণ সাধুর বাণিজ্য ব্যাপারের চেষ্টায় প্রকাশ করিয়াছেন; সাধু 'বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা'; আবার 'কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব' হইতে আরম্ভ করিয়া যে বদল ব্যাপারের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা ছেলে ভুলান ছড়া হইতে পারে, বৈদেশিক বাণিজ্য নহে। কড়ির সাহায্যে বাজার করা বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বলার বাজার করায় পঞ্চাশ কাহন কড়ি ও দশজন ভারী নিয়োগ করিয়া কবি আদর্শ ধনাঢ্য লোকের হাটের ফর্দ্দ দিয়াছেন। এক বুড়িতে পাকা আম্র; 'মূল্য দিয়া পণ দশ, কিনিল জিয়ন্ত শশ'; আট কাহনে খাসী, এই গুলিতে মাত্র দাম লেখা আছে। হাটের হিসাবের মধ্যে বাজার চুরী বাদ দিয়া দ্রব্যের মূল্য কতকটা বুঝা যায়। পঞ্চাশ কাহণ দিয়া, দরকার হইলে 'তঙ্কা দুই লয়ো অন্য বণিকের বাড়ী' নির্দ্দেশ থাকায় হাটে তঙ্কা (টাকা) ভাঙ্গাইয়া কড়ি মিলিত বুঝা যায়, পয়সা চলে নাই। তখনকার একপণ কড়ি পরবর্ত্তী এক পয়সা ধরিলেই ঠিক্ হইবে; বুড়ি অর্থাৎ পাঁচ গণ্ডায় পয়সা হিসাব শিখিবার নিমিত্ত; বাল্যকালে আমরা পয়সায় এক পণ পাইয়াছি। পঞ্চাশ তঙ্কার বাজার হইলে তঙ্কা দুই অন্যত্র লইবে, এ কথা সাজে না।

হাঁচি জেঠীর বাধা সেকালেও পড়িত। আরও যে বাধার বিষয় কবি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার একটি ঘটিলেই রক্ষা থাকিত না।

ঘর হৈতে বাহিরেতে লাগিল উচোটা।
নেতের আঁচলে লাগে সিয়াকুল কাঁটা।
যাত্রার সময়ে ডোম চিল উড়ে মাথে।
কাঠুরিয়া কাঠ ভার লয়ে যায় পথে।
শুকান ডালেতে বসি কোকিল কাড়ে রাউ।
যোগিনী মাঙ্গয়ে ভিক্ষা অর্দ্ধখান লাউ।
কমঠ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলিরা বেড়ায়।
বাম দিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী। ইত্যাদি।

বর্ত্তমান ছাপা কৃত্তিবাসীর 'বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে' উক্তি অবশ্য প্রাচীন। নানা বাধা বাঙ্গালীর স্কন্ধে বহুদিন ভর করিয়াছে। খেলার কথায় ভেড়া ও পারাব তলইয়া লড়াই, জুয়া, পাশা প্রবীণের মধ্যে দেখা যায়। 'খেলে কড়ি চিকা কোড় ভেটা'—ছেলেদের। 'পাতি খেলে বাঘচালি'—এখনকার বাঘবন্দী। 'বিপক্ষিকা খেলেন সটকা' পাশার পাশাপাশি বলা হইলেও বোধগম্য নহে। ব্যায়াম খেলার মধ্যে পাইকের 'খাণ্ডা, কলা, বিজুলী' লইয়া ক্রীড়া এবং রায়বাঁশ খেলার উল্লেখ আছে।

তুলিয়া আখড়া ঘরে, মল্ল যুদ্ধ কেহ করে,
মাল বিদ্যা গুনী চাপ গারী।
লইয়া দাণ্ডা ঝাড়া, কেহ করে তোলা পাড়া
পশুবধে কেহ বা শিকারী।

যুদ্ধ ও বীরকর্ম্মে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা অন্যত্র বলা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সেকালের আহার।

সেকালের বাঙ্গালীর আহার কেমন ছিল, জানিবার জন্য অনেকের, বিশেষতঃ আমাদের ব্রাহ্মণবর্গের, কৌতূহল উদ্দীপিত হওয়া স্বাভাবিক। এখনও, এই অন্নলের একচ্ছত্র অধিকারের দিনেও ভোজের উপর দশ গোণ্ডা সন্দেশ অক্লেশে উঠিয়া যাওয়ার ব্যাপার পল্লী অঞ্চলে বিরল নহে। নবাবী আমলে বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার রাজস্ব বাকীর দায়ে বন্দীভূত হইয়া গোটা একটা খাসী রাঁধিয়া একাকী নিঃশেষ করায় খাজানা বাকী রেহাই পাইয়াছিলেন। এক বকৃস আলী মিঞা পাকী ৮ সের পোলাও কালিয়া স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করায় তাঁহার তৈল চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল,—উহা এখনও নিজামৎ প্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত। মুনকে রঘু প্রভৃতির নাম এখনও অনেকের স্মৃতিপটে বিরাজমান। অপিচ, আহারের বর্ণনা আমার মত উদরাময়গ্রস্থ ব্যক্তিরও অতৃপ্তিকর হইবে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'জনক ভূপতি' কন্যার বিবাহে যে সকল আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ফর্দ্দ নিম্নে দেওয়া গেল:—

ঘৃত দুগ্ধে জনক করিলা সরোবর
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিলা মনোহর।
রাশি রাশি তণ্ডুল মিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি,
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি।

অন্যত্র, ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা,
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজলা।
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ,
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ।
(আদিকাণ্ড)

এ স্থলে বিবাহের পরে বরের ভোজনের কথা আছে, বিশেষ বর্ণনা নাই। 'দধি দুগ্ধ দিলা রাজা ভোজনাবশেষে' এই নির্দ্দেশে সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রধান লোভনীয় গব্যের উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্তু —

রাজরাণী গিয়া পরে করিলা রন্ধন।
কন্যা বর দুইজনে করিল ভোজন॥

এই উক্তিতে স্বয়ং রন্ধনের কথায় সেকালের প্রথা সূচিত হইতেছে। আহারের অন্য উল্লেখ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বড় পাওয়া যায় না; লক্ষ্মণ ভোজন ইহার বিষয় নহে। কুম্ভকর্ণের কলসী কলসী মদ্যপান এবং পর্ব্বত-প্রমাণ রাশি রাশি মাংস ভক্ষণেও আমাদের কোন লাভ নাই। দুইখানি প্রাচীন মনসা মঙ্গলের পুস্তক হইতে চাঁদ সদাগরের গৃহে কিরূপ রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ ভাগে রচিত মনসা মঙ্গল কাব্যে বিজয়গুপ্ত বলিতেছেন :—

স্নান করিল গিয়া বণিক-সুন্দরী।
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি॥
রাজ্যের ঠাকুর চাঁদ দ্রব্যে দুঃখ নাই।
নানাবিধ দ্রব্য আনি থুইল ঠাঞি ঠাঞি॥

পাতাল সুন্দরের কাষ্ঠ শুক্‌না তেঁতুলী।
পিতলের হাঁড়ি দিয়া হেটে আগ্নি জ্বালি॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান।
মুঞি যেন রন্ধন করি অমৃত-সমান॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন।
ডান দিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন॥
অনেক দিন পরে রান্ধে মনের হরিষ।
বোল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ॥
প্রথমে পূজিল অগ্নি দিয়া ঘৃত ধূপ।
নারিকেল-কোরা দিয়া রান্ধে মশুরীর সূপ॥
পাটায় ছেচিয়া লয় পোল্‌তার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোল্‌তা॥
জ্বর পিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচকলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাচন॥
যমানী পূরিয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক।
সাজা ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিত শাক॥
কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা।
লাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা॥
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের শাক।
সাজা কটু তৈলে রান্ধে কুমারের চাক॥
বেতাক বেগুন কাটি থুইল বাটি বাটি॥
ঝিঙ্গা পোলা কড়ি ভাজে আর কাঁটাল আটি॥
রান্ধিছে রান্ধনী, না দেয় গা মোড়া।
সাজ কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুন পোড়া॥

বাটি বাটি ভরিয়া ব্যঞ্জন থুইল ঠাঞি ঠাঞি।
কলার থোঁড় রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই॥
অত্যন্ত ধবল যেন সাজ দুগ্ধের দৈ।
সরিষা-বাটা দিয়া রান্ধে পানী কচুর চৈ॥
রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটী।
মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবটী॥
মুগের ঝোল রান্ধে আর মাষ-কলায়ের বড়ী।
দুগ্ধ-লাউ রান্ধে আর নারিকেল-কুমারী॥
শুক্তা পাতা দিয়া রান্ধে কলাইয়ের ডাল।
পাকা কলা লেঁবু রসে রান্ধিল অম্বল॥
রান্ধি নিরামিষ ব্যঞ্জন হলো হরষিত॥
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে হয়ে সচকিত॥
মৎস্য মাংস কুটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাচ গাচ।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুন মাছ॥
ভিতরে মরিচ-গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।
তৈলে পাক করি রান্ধে চিঙ্ড়ির মাথা॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ-মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥
ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল চৈ।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন-মৎস্যের কৈ॥
রন্ধনের কাজ থাকুক, ভোজনের কথা।
বারমাসি বেগুনেতে শৌল-মৎস্যের মাথা।

দুই তিন আনাজ করিয়া ভাগ ভাগ।
থোর দিয়া ইচার মুণ্ড, মূলা দিয়া শাক॥
জিরা মরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে মিল।
মসল্লা বাটিতে হাতে তুল্যা নিল শিল॥
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসীর তেল॥
ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপাম।
ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম॥
একে একে যত ব্যঞ্জন রান্ধিল সকল।
শৌল-মৎস্য দিয়া রান্ধে আমের অম্বল॥
মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক পায়স॥
দুগ্ধে পিঠা ভাল মত রান্ধে ততক্ষণ।
রন্ধন করিয়া হৈল হরষিত মন॥

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মনসামঙ্গল কাব্যে দ্বিজ বংশীবদন বলিতেছেন :—

চান্দর আদেশ জানি চলিল সোনাই রাণী
করিবারে রন্ধন সত্বর।
যাবে অতি দূর দেশে কত দিনে ফিরি আসে
না জানি ঘরেত সদাগর॥
ঘাঁট ঘিলা দিয়া স্নান করি বস্ত্র পরিধান
রাঁধিবারে যায় সুবদনী।
বণিক্য ছ-কুড়ি ঘর জ্ঞাতি গোত্র সহোদর
ভোজন করিব হেন জানিঁ॥

কালী কাজলী বালী তেড়ার ভগ্নী মেখলী
দুর্ব্বলী যে লেঙ্গার ভগিনী।
পঙ্কজন দাসী ধায় কেহ সজ্জ জোগায়,
কেহ হস্তে চালায় বিজনী॥
কেহ মৎস্য মাংস কাটে, কেহ বা হরিদ্রা বাটে,
কেহ ব্যঞ্জনের সজ্জ করে।
দুগ্ধ আবর্ত্তন করি কেহ রাখে সারি সারি
গুড় চিনি নানা উপহারে।
এক মুখে দেয় জ্বাল, নব মুখে জলে ভাল,
বসাইল নগোটা পাতিলী।
নব ব্যঞ্জনের তরে বসাইলা একেবারে,
সন্তারিল তৈল ঘৃত ঢালি॥
প্রথমে নালিতা শাকে রান্ধিলেক তৈল পাকে
কচূ-শাকে নারিকেল কাটি।
সাঞ্চা-শাক ঘৃতে ভাজে আদা দিয়া তার মাঝে
মাটা-শাক জিরা লঙ্গ বাটি॥
পালই শাক বসাঞা ভাজে তারে ঘৃত দিয়া,
পরে দিল মরিচ লবঙ্গ।
নাড়িতে বিজ্জল ছুটে খর জ্বালে ধূঁয়া উঠে,
ঘামে সোণার বিরস বদন॥
ঘৃতে ভাজে নিমপাত উদিসা উরসী তাত,
বেত-আগে থউরের ছই।
বাগুন তরই ঝিঙ্গা ভাজে দুগ্ধরাজ ডাঙ্গা,
কাঁচা কলা ভাজে দুধ কই॥

লাউ কুমড়া চাকি হরিদ্রা পিঠালী মাখি
রসবাস জিরা লঙ্গ বাটি।
কাঁঠালের বীজগুলি ভাজিলেক ঘৃতে তুলি
শিম্ব উড়শী-দাল বাটি॥
একে একে নিরামিষ রান্ধিল ব্যঞ্জন ত্রিশ,
শুক্ত রান্ধে আর ডালি নানা।
অম্ল রান্ধে পাকা কলা আদা লেম্বু পৈরা মূলা
দ্বিজ বংশীদাসের রচনা॥

নিরামিষ রান্ধে সব ঘৃতে সন্তারিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল-পাক দিয়া॥
বড় বড় কই মৎস্য, ঘন ঘন আঞ্জি।
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি॥
কাতলের কোল ভাজে, মাগুরের চাকি।
চিতলের কোল ভাজে রসবাস মাখি॥
ইলিশ তলিত করে, বাচা ও ভাঙ্গনা।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল-পোনা॥
বড় বড় ইঁচা মৎস্য করিল তলিত।
রিঠা পুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত॥
বেত-আগ পলিয়া চুচুঁরা মৎস্য দিয়া।
শুকত ব্যঞ্জন রান্ধে আদা বাটিয়া॥
পাব্‌তা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।
পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল॥
কিঞ্চিৎ নলিতা-পত্র, তার মধ্যে আদা।
লাউ দিয়া ঘণ্ট রান্ধে রোহিতের গাদা॥

বাগুন দ্বিখণ্ড করি তাতে লাউ যোগ।
মাগুর মৎস্ত সহ রান্ধে কোঞর-ভোগ॥
নবীন কুম্‌ড়া দিয়া কই মৎস্য সনে।
পিপুল বাটিয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধানে॥
লাফ বাগুন দীর্ঘে করি চারি খণ্ড।
চৈ বাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড॥

মাষ-দাল দিয়া রান্ধে রোহিতের মাথা।
হিঙ্গের সম্ভারে তাতে দিল তেজপাতা॥
জিরা লঙ্গ বাটি দিল মরিচের রসে।
ভুবন মোহিত কৈল ব্যঞ্জনের বাসে॥

আদা জামরের রসে কই মৎস্য ভাল।
পোনা মৎস্য দিয়া রান্ধে করঞ্জ অম্বল।
তিল চালিতা রান্ধে সুখাদ্য কেবল॥

পাকা তেঁতুলে রান্ধে রোহিতের পেটি।
বদরীর অম্ল রান্ধে শোল মৎস্য কাটি॥
সকল ব্যঞ্জন রান্ধে আপনার মনে।
বদরীর অম্ল রান্ধি ঠেকাইল ফেনে॥

হেটে তার ব্যঞ্জন, উপরে ভাসে ফেনা।
নাড়িতে নাড়িতে নড়ে দুকানের সোনা।
পাকা মৌ আলু দিয়া ঘৃত পাক করি।
তাতে কৈল দধি শণ্ড চিনিয়ে সম্ভারি॥

দারচিনি বাটি দিল আর তেজছাল।
পিঠালী বাঁটিয়া তাত মরিচ মিশাল॥

আদা জামিরের রস সৈন্ধব লবণে।
রান্ধিলেক "মনোহর" নাম ব্যঞ্জনে॥
প্রবন্ধে রান্ধে ব্যঞ্জন নাম মনোহর।
খাইতে সুস্বাদ অতি দেখিতে সুন্দর॥
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধি করি অবশেষ।
মাংসের ব্যঞ্জন তবে রান্ধয়ে বিশেষ॥
কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া।
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেত ছাকিয়া॥
কৈতরের বাচ্ছা ভাজে, কাউঠার হাতা।
ভাজিছে খাসীর তৈলে দিয়া তেজপাতা॥
ধনিয়া সলুপা বাটি দারচিনি যত।
মৃগ মাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত॥
রান্ধিছে পাঁঠার মাংস দিয়া খর ঝাল।
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল॥
কত মত ব্যঞ্জন সে নাহি লেখা জোঁখা।
পরমান্ন পিষ্টক যে রান্ধিছে সনকা॥
ঘৃত পোয়া চন্দ্রকাইট আর দুগ্ধপুলি।
আইল বড়া ভাজিলেক ঘৃতের মিশালি॥
জাতি পুলি ক্ষীর পুলি চিতলোটা আর।
মনোহরা রান্ধিলেক অনেক প্রকার॥
অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধি করিল প্রচুর।
ফলারের দ্রব্য কৈল মুগের অঙ্কুর॥
আদা চাকী চাকী আর ভুনা কলাই।
ঘৃতের দুভাজা চিড়া শর্করা মিশাই॥

সুগন্ধী শালির চিড়া গন্ধে আমোদিত।
খণ্ড খণ্ড নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত॥
উত্তম ক্ষীরসা দিয়া গঙ্গাজলী লাড়ু।
ইক্ষুরস রাখিলেক ভরি লোটা গাড়ু॥
এই মত ভক্ষ্য দ্রব্য করিল বিস্তর।
তেড়া আসি জানাইল চান্দর গোচর॥

উল্লিখিত দুইটি বর্ণনা সুদীর্ঘ হইলেও উপভোগ্য। এই বিস্তৃত বিবরণী হইতে সেকালের নানা প্রকার খাদ্যের তালিকা পাওয়া যাইতেছে। এক সনকা এত গুলি না রাঁধিলেও সেকালের অনেক সনকা মিলিয়া নানা ক্ষেত্রে যে সব পরিপাটী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গেল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের রন্ধনের ও খাদ্যের পার্থক্য ও ইহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইবে।

অতঃপর বৈষ্ণব সমাজের নিরামিষ আহারের কথা বলা হইবে। চৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস গরীবের ছেলে এবং সরল প্রকৃতির ভক্ত লোক। তিনি 'শ্রী শাক ব্যঞ্জনে' গৌরচন্দ্রের তৃপ্তির কথায় শাকের ভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন; পটল, বাস্তুক, সালঞ্চা, হেলেঞ্চায় কৃষ্ণভক্তি মিলিবার কথা বলেন। এখনও অধিক শাক ভক্ষণে শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বটে! বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শচীমাতার অদ্বৈত ভবনে রন্ধনের বর্ণনায় বলিতেছেন:—

কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিয়া প্রত্যেকে।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য)

শ্রীশাকের প্রতি গৌরাঙ্গ প্রভুর অনুরাগ যতই থাকুক, দাস ঠাকুরের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্যত্র টোটার শাক তুলিবার এবং তেঁতুল পাতা বাটিয়া অম্বল করার কথাও আছে। চৈতন্য ভাগবতে 'দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল'ও আছে। শ্রীক্ষেত্রে অদ্বৈত প্রভুরা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া দশ প্রকার শাক রন্ধন করিয়া এবং

'ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক
নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক'

দিয়া মহাপ্রভুর তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন ইহাও দেখা যায়। অদ্বৈত ভবনে মহোৎসবের কথায় বৃন্দাবন দাস 'ঘর দুই চারি তণ্ডুল' 'পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠ, ঘর পাঁচেক ঘট ও রন্ধনের স্থালী', 'ঘর দুই চারি মুদেগর বিয়লী' সংগ্রহের কথা বলিয়া লিখিতেছেন:—

'ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক,
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান,
*   *   *   *
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান,
কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ।
সহস্র সহস্র ঘট দেখে দধি দুগ্ধ,
ক্ষীর ইক্ষু অঙ্কুরের সনে কত মুদ্গ।
ইত্যাদি (চৈঃ, ভাঃ অন্ত্য)

কিন্তু দাস ঠাকুর কোথায়ও তাঁহার সময়ের রন্ধনের বিশেষ বর্ণনা দেন নাই। এই অভাব বিজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পূরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম স্থান ঝামটপুর, কাটোয়ার তিন ক্রোশ উত্তরে; বৃন্দাবন দাসের লীলাভূমি দেহুড় কাটোয়ার ছয় ক্রোশ

দক্ষিণে। উভয়েই এক স্থানের লোক, সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনায় কাটোয়া অঞ্চলের সেকালের আহার্য্যের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীচৈতন্য তিন দিন প্রেমবিহ্বল ভাবে অনাহারে ঘুরিলেন। শেষে গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আহার করিলেন:—

'মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মুদ্গ-সূপ॥
বাস্তুক শাক পাক করি বিবিধ প্রকার
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মান কচু আর।
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া আর মূল ফলে
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
কোমল নিম্ব পত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী
পটোল ফুল বড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর,
মোচা ঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর
মধুরাম্ল, বড় অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত কয়।
মুদ্গ বড়া, মাষ বড়া, কলা বড়া মিষ্ট
ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি পিঠা ইষ্ট।
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া।
দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি কুণ্ডি ভরি
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—৩)

শ্রীক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে অনেক সাধাসাধির পরে গৌরচন্দ্র একদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী ষাটীর মাতা সযত্নে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পাক করিলেন। আহার্য্য ও পরিবেষণের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"বত্রিসা কলার এক আঙ্গোটিয়া পাত,
উডারিল তিন মান তণ্ডুলের ভাত।
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল,
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল।
কেয়া পাতের খোলা ডোঙ্গা সারি সারি,
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।
দশবিধ শাক নিম্ব তিক্ত শুক্তার ঝোল,
মরিচের ঝালে ছেনাবড়ি বড়া ঘোল।
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেশারী নাফরা,
মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বিবিধ শাকরা।
ফুল বড়ি ফল মূলে বিবিধ প্রকার,
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ির ব্যঞ্জন অপার।
নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তকী,
ফুলবড়ি পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
ভ্রষ্ট মাষ মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়,
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
মুদ্গ বড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট,
ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি আর পিষ্ট।
কাঞ্জী বড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকী,
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।

ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি,
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তার পরি।
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার,
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।
(চৈঃ চঃ মধ্য—১৫)

অন্যত্র সে কালের জলপানের আয়োজন বর্ণনায় প্রবীণ কবিরাজ মহাশয় শ্রীক্ষেত্রের 'বনগণ্ডী ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত'—তাহা দেখাইয়াছেন :—

"ছানা পানা পৈড়াম্র নারিকেল কাঁঠাল
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর
বজাম্র ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ড খর্জ্জুর।
মনোহরা নাড়ু আদি শতেক প্রকার
অমৃত গোটিকা আদি খিরিষা অপার।
অমৃত মোণ্ডা সেবতি কর্পূর কুলী
রসামৃত শরভাজা আর শরপুলি।
হরিবল্লভা সেবতি কর্পূর মালতি
ডালিমা মরিচা নাড়ু নবাত অমৃতি।
পদ্ম চিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ড সার
বিয়ড়ি কদম্বা তিলা খাজার প্রকার।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার
ফল ফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার।
দধি দুগ্ধ দধিতক্র রশালে শিখরিণী
সলবন মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।

নেম্বু কোলী আদা নানা প্রকার আচার
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।
(চৈঃ চঃ মধ্য—১৪)

বাঙ্গলা হইতে গৌর-ভক্তগণ বর্ষান্তরে শ্রীক্ষেত্রে আসিতেছেন; সঙ্গে প্রভুর ভোগের জন্য কি আনিয়াছিলেন, জানিয়া লইতে আমাদের মত প্রসাদভক্ত লোকের স্বতঃই অনুরাগ হইবে ;—

"নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ,
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপভোগ।
আম কাসন্দি আদা কাসন্দি ঝাল কাসন্দি নাম
নেম্বু আদা আম্র কোলী বিবিধ বন্ধান।
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা,
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ শুকতা।
শুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে
শুকতায়ে যে সুখ প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে।
ধনিয়া মহুরির তণ্ডুল চূর্ণ করিঞা,
নাড়ু বাঁন্ধিয়াছে চিনির পাক করিঞা।
শুণ্ঠি খণ্ড নাড়ু আর আমপিত্ত হর
পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলি ভিতর।
কোলি শুণ্ঠা কোলি চূর্ণ কোলি খণ্ড আর
কত নাম লৈব শত প্রকার আচার।
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল
চিরস্থাই খণ্ড বিকার করিল সকল।
চিরস্থাই খিরসাই মণ্ডাদি বিকার
অমৃত কর্পূরী আদি অনেক প্রকার।

সান্দিকা চুটী ধান্যের অন্ন চিড়া করি
নূতন বস্ত্রের বড় বড় কুথলি ভরি।
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
সান্দি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিঞা
ঘৃত সহিত সিক্ত কৈল চিনি পাক দিয়া।
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।
সান্দি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া
চিনি পাকে উখড়া কেল কর্পূরাদি দিয়া।
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া তার নাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার। (চৈঃ চঃ অন্ত্য—১০)

বঙ্গাগত ক্ষেত্র-যাত্রীদল শ্রীচৈতন্যের নিমিত্ত এই সমুদয় ভোগের দ্রব্য লইয়া যান না যান, বাঙ্গালী বৃন্দাবন-যাত্রীরা যে সময়ে সময়ে ঐরূপ লইয়া যাইতেন, চরিতামৃতই তাহার প্রমাণ। এ স্থলে গৌরচন্দ্রের সেবার বর্ণনায় দেখা যায়,—

'যদ্যপি মাসেকের বাসি রসকরা নারিকেল
অমৃত গোটিকা আদি পানাদি সকল।
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্য স্বাদ
বাসি বিস্বাদ নহে কভু প্রভুর প্রসাদ।
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু এক দণ্ডে খাইল
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল।

তখন সবার সেরা যতনে সাজান রাঘবের ঝালি মাত্র অবশিষ্ট আছে শুনিয়া প্রভু 'আজি রহুক পাছে দেখিব' আজ্ঞা দিলেন। পরে 'একদিন প্রভু নিভৃতে ভোজন কৈল, স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংশিল।' এইরূপে 'চতুর্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে।' পরে 'মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ'—এবং পুনরায় দুই চারিবার অন্ন ব্যঞ্জনের তালিকা। এ হেন চরিতামৃতে যার অরুচি সে নিতান্তই অব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেব কেবল প্রেম ভক্তিই শিক্ষা দেন নাই! বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুমার গৌরচন্দ্রের আহারে অনুরাগ ত স্বাভাবিক; চরিতামৃত গ্রন্থের নানাস্থানে ভোজনের পরিপাটী বর্ণনায় মনে হয়, বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়েরও প্রসাদে বেশ ভক্তি ছিল। যাহা হউক, তাঁহার প্রসাদে সে যুগের অনেক খাদ্যের নাম শুনিয়াও আমরা পরিতৃপ্ত হইতেছি। আমাদের এক সমালোচক বন্ধু শেষ বৈষ্ণব লেখকগণের বর্ণিত আহার্য্যের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য বা সংযমে সন্দিহান হইয়াছেন। লেখক ব্রাহ্মণ; তাঁহার কথায় সায় দিতে নিতান্ত নারাজ। ক্ষত্রিয় বুদ্ধদেবের দৃষ্টান্ত, তথা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর ভোজন পটুতা উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর-প্রসাদ বা নিমন্ত্রণের রন্ধন সাধারণ বৈষ্ণবের আহার্য্যের পরিচয় দেয় না, এটিও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গোস্বামীরা শাক সবজী ও সন্দেশের তালিকা ক্রমশঃ বাড়াইয়াছেন, এই উক্তিও সমীচীন নহে। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় সেকালের প্রথা এবং আহার উভয়ই দেখা যায়; তিনি গৌরাঙ্গের সমসাময়িক। চরিতামৃত ও ভাগবত উভয় গ্রন্থেই বাল্যাবধি চৈতন্যের তথা নিত্যানন্দের ভোজন পটুতার পরিচয় পাইতেছি। কবিরাজ গোস্বামী একস্থলে "যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ; সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ" লিখিয়া "নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি নচাত্যন্তমনশ্নতঃ"—গীতার শ্লোক

তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক বৈষ্ণবদলের ভোজন চতুরতার কথায় চরিতামৃত সমধিক পরিপুষ্ট। দধি এবং ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধের সহিত রম্ভা চিনি সংযোগে চিপীটকের ফলাহারের ঘটা সেকালের বৈষ্ণব সমাজে বিলক্ষণই ছিল। নিত্যানন্দ পাণিহাটিতে রঘুনাথের দ্বারা যে চিড়া-মহোৎসব দেওয়াইয়াছিলেন তাহাতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। চৈতন্য চরিতে হড়ুমের উল্লেখও পাওয়া যায়। একালে, এমন কি কবিকঙ্কণের সময়েও লুচি জন্ম গ্রহণ করে নাই দেখা যাইতেছে। 'পীত ঘৃতসিক্ত অন্নস্তূপ' কেবলই 'ঘি দেওয়া ভাত'; পলান্নের উদ্দেশ পাই নাই।

পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব সমাজের আহার বিহারেও আমরা এই মিষ্টান্ন বহুল বর্ণনা দেখিতে পাই। ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম বিলাসে বহু মহোৎসবের উল্লেখ আছে; আহার্য্য বস্তুর রীতিমত নির্দ্দেশ না থাকিলেও সেই সমস্ত বিবরণ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। মালসা ভোগের চিড়া মহোৎসবই গোস্বামী প্রভুদিগের বিশেষ তৃপ্তিকর ছিল। যে যুগে ঘৃত বিষ, দুগ্ধ গোপ ভায়াদের হস্তে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত; চিনি ব্যবসায়ীর বুদ্ধিকৌশলে বালির সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া অপরূপ আকারে দর্শন দিয়াছেন এবং যে যুগের বাঙ্গালী আমরা নানা কারণে অম্লরোগগ্রস্ত, সেকালে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধুর সহিত লোকের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ বিচিত্র নহে। এখন যে মাংসাহারী নহে সে ভদ্রলোক কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকে। অনেক বৈষ্ণব মহাত্মাও মৎস্যের কথা দূরে থাকুক, গোপনে নিষিদ্ধ আহার্য্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু নিরামিষাশী যে দুই একজন নধরবপু বৈষ্ণব এখনও নয়নগোচর হয়, তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনকাল প্রত্যক্ষ করিয়াও আহার সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা লোপ পায় নাই। তবে সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক

দলের মুখে নিরামিষের প্রশংসা শুনিয়া কেহ কেহ সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক অবনত করিতেছেন বটে।

এক্ষণে সেকালের শাক্ত-সমাজের ও সাধারণ লোকের আহারের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ষোড়শ শতাব্দিতে রাঢ় দেশের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নানা স্থানে সেকালের বাঙ্গালীর ভোজ্য বস্তুর কথা বর্ণনা করিয়াছেন। খুল্লনা চণ্ডীদেবীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া স্বামীর তৃপ্তির উদ্দেশ্যে সর্ব্বমঙ্গলা স্মরণ করিয়া কি রন্ধন করিলেন, দেখুন :—

"বেগুন কুমড়া কড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া
বেশর পিটালী ঘন কাঠি।
ঘৃতে সন্তোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথী
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাঁজা পলা কড়ি, উনটা শাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ী কাঁটাল বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্ত করি পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জাল দিল দুই দণ্ড
সন্তোলিল মহুরির বাসে।
মুগ-সূপে ইক্ষুরস, কৈ ভাজা পণ দশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদা-রসে॥
মসুরি মিশ্রিত মাস, সূপ রাঁধে রস বাস
হিঙ্গু জীরে বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান বড়ি মরিচে ভূষিত॥

*　　*　　*　　*

বোদালি হেলেঞ্চা শাক,　　কাঠি দিয়া কৈল পাক
ঘন বেসার সম্ভোলিল তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খড়া　　চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া
খরসোলা পুটী দশ তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন,　　আম্রে শউল মীন
খর লুন দিয়া ঘন কাটি।
রাধিল পাঁকাল ঝস　　দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রাঁন্ধে জাল করি ভাঁটি॥
কলা বড়া মুগ সাউলি,　　ক্ষীরমোন্না ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।"

(ক, ক, চণ্ডী)

অন্যত্র,ঃ—

*　　*　　*　　*　　*

নিমে শিমে বেগুনে রাঁধিয়া দিবে তিত।
বেশম মাখিয়া রান্ধ সরিসার শাক
কটু তৈলে বেথুয়া করিয়া দৃঢ় পাক।
খণ্ডে মুগের সূপ উতার ডাবরে
আচ্ছাদন থালা খানি তাহার উপরে।
কুড়নীতে কুড়িয়া আনিবে নারিকেল
পিঠালী মিশায়্যা তথি দিবে কিছু জল।
আমড়া সংযোগে তবে রাঁধিবে পালঙ্গ
ঘন কাঠি খর জ্বালে রান্ধ ভাল ঘণ্ট।　　ইত্যাদি

এই হইল সেকালের রাঁঢ় অঞ্চলের ভদ্র গৃহস্থের বাটীর রন্ধন।

গর্ভবতীর সাধের সন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন,—

আপনার মত পাই,　　তবে গ্রাস চারি খাই,
পোড়া মাছে জামিরের রস।
যদি পাই মিঠা ঘোল,　　বদরী শকুল ঝোল
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি।
লতা পাতা ঘন শাক,　　খরজ্বালে করি পাক,
সন্তরিবে জোয়ানী ফোড়ন দিয়া।
সন্তাল লবণ তথি,　　দিবে হিং জীরা মেথি,
বহিন গনি যদি কর দয়া।
নিধান করিয়া থই,　　তাহাতে মাহিষ দই
আমড়া সংযোগে রাঙ্গা শাক।
যদি পাই কিছু পূপ,　　আমে মসূরির সূপ,
আমসিতে প্রাণ পাই রাখ।
আমি যেন পাই সোনা,　　শকুল মাছের পোনা,
পোড়া কাসুন্দি দিয়া তথি।
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জী,　　উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
বন শাকে বড়ই পীরিতি।

অন্য মুদ্রিত পুস্তকে হয়ত কোন পরবর্ত্তী ভোজন-বিলাসী যোগ দিয়াছেন ঃ—

কহি নিজ সাধ শুন গো দাসি,　　পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি।
বাথুয়া টল টলি তেলেতে পাক　　ডগি ডগি ভাল ছোলার শাক।
মীনি চড় চড়ি কুমড়া বড়ি,　　সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ী।
যদি ভাল পাই মহিষ দই,　　ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে থই।
পাকা চাঁপা কলা করিয়া জড়,　　খেতে মনে সাধ করেছি বড়।

কনক থালেতে ওদন শালি, কাঁজির সহিত করিয়া মেলি।
হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায়, কচি কচি মুলা বেগুন তায়।
আমড়া নোয়ারি পাকা চালিতা, আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা।
থোর ডুমুর ইচলা মাছে, খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে।
হিয়া ধক ধক অন্তরে ভোক, মুখে নাহি রোচে এ বড় শোক।
মনে করি সাধ খাইতে পিঠে, নারিকেল ছাঁই খাইতে মিঠে।

* * * * *

দুগ্ধে তিলের গুঁড়ি মিশায়ে লাউ, দধির সহিত খুদের জাউ।
চিড়া পাকা কলা দুধের সর, কহি দুয়া এই শুন গো আর।
ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া, করি আপনার সাধের চুড়া।

এ সমস্ত উপকরণ কাহার সাধের চুড়া, ভুক্তভোগীরা বিচার করুন। কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দাসী দ্বারা প্রথমে শাক সংগ্রহ করাইতেছেন :—

নটে রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা,
তিক্ত ফলতার শাক কলতা পলতা।
সাঁজতা বনতা বন পুঁই ভদ্র পলা,
হিজলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাঁড়ি পলা।
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে,
মহুরী শূলকা ধন্যা ক্ষীর পাই বেতে।
ডগি ডগি তোলে যত সরিষার আড়া। ইত্যাদি।

কাব্যে এক ঋতুতেই সব শাক মিলে! সন্দেহ না করিয়া স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আয়োজন হইলে লহনা কি রাঁধিল দেখুন;

ঘৃতে পুরিয়া এড়ে মাটিয়া পাথর।
ঘৃতে জব জব কৈল নালিতার শাক,

কটু তৈলে বেতুয়া করিল দৃঢ় পাক।
খণ্ডে মুগের সূপ উতারে ডাবরে।
কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল,
রোহিতে কুমড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোলে।
বদরী শকুল মীন রসাল মসুরী,
পণ দুই ভাজে রামা সরল সফরী।
কতগুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ির বড়া,
কচি কচি গোটা কতক ভাজিল কুমড়া। ইত্যাদি।

ব্যাধ পত্নী নিদয়ার সাধের আকাঙ্ক্ষাও বর্ণিত আছে; পোড়া মাছে জামিরের রস তাহারও রুচিকর; পুনশ্চ,

নিধানি করিয়া থই তাহাতে মহিষ দই,
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি,
যদি পাই মিঠা ঘোল, পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসি।
আমার সাধের সীমা, হেলঞ্চা কলমী গিমা,
বোথালি আনিয়া কর পাক,
ঘন কাটি খর জ্বালে, সাঁতলিবে কটু তেলে
দিবে তাতে পলতার শাক।
পুঁই ডগা মুথী কচু ফুল বড়ী তাহে কিছু,
তাতে দিবে মরিচের ঝাল
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জী, উদর পুরিয়া ভুঞ্জী,
প্রাণ পাই পাইলে পাঁকাল।
লুণ দিয়া কিছু বাড়া, নকুল গোধিকা পোড়া,
হংস ডিমে কিছু তোল বড়া,

কিছু ভাজ রাই খরা　　　চিঙ্গড়ীর তোল বড়া,
শর্জাফ্রু করহ শিক পোড়া।
মুলা বার্ত্তকী শিম　　　তাহে দিয়া রান্ধ নিম
আর দিও উড়ম্বর ফল।

এস্থলে মনোরথ কতখানি 'হৃদিলীয়স্তে' হইয়াছিল বলা যায় না। ধর্ম্ম-কেতু ব্যাধ বেচারা ঘরে ঘরে চাহিয়া আনিয়া যথাসাধ্য রাঁধিয়া দিয়াছিল। একালেও বঙ্গীয় পল্লীর গর্ভবতী ললনারা এই ভাবের সময়োচিত রসনার তৃপ্তিকর ভোজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তিন শতাব্দী ধরিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর নিরামিষ আহার্য্যের তালিকার অধিক কিছু প্রভেদ দেখা যায় না। ব্যঞ্জন পাকের ব্যবস্থা শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সমাজেই এক ভাবের ছিল দেখা যায়।

কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার সময়ের ভদ্র-সমাজের পাকের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ভবানন্দ মজুমদারের পত্নী পদ্মমুখী অন্নদার পূজায় ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমিত্ত যে সমস্ত রন্ধন করিলেন, তাহার কিছু রস গ্রহণ করুন ;

"স্নান করি করে রামা অন্নদার ধ্যান
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান।
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক
শড়শড়ী ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক।
ডা'ল রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে।
বড়া বড়ি কলা মুলা নারিকেল ভাজা
দুধ থোর ডাল্না শুক্তানি ঘণ্ট ভাজা।
কাঁঠালের বীজ রান্ধে চিনি রসে গুড়া
তিল পিঠালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া।

নিরামিষ তেইশ রাঁধিলা অনায়াসে
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাঁসে।
কাতলা ভেটুক কই কাল ভাজা কোল
শিক-পোড়া ঝুরি কাঁঠালের বীজে ঝোল।
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই
কই মাগুরের ঝোল, ভিন্ন ভাজে কই।
ময়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার
চিঙ্গড়ীর ঝোল ভাজা অমৃতের তার।
কণ্ঠা দিয়া রান্ধে কই কাতলার মুড়া,
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুড়া।
আম দিয়া শোল মাছে ঝোল চড়চড়ী
আড়ি রান্ধে আদা-রসে দিয়া ফুলবড়ী।
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।
বাচার করিল ঝোল খয়রার ভাজা
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা।
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত।
বড়া কিছু, সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম।
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝোল ঝাল রসা
কালিয়া দোল্মা বাঘা সেক্‌চি সমসা।
অন্য মাংস শিক ভাজা কাবাব করিয়া
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া।

মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রাঁধিলা,
মৎস্য মুলা বড়াবড়ি চিনি আদি দিলা।
আম আমসত্ব আর আমসী আচার
চালিতা তেতুল কুল আমড়া মাদার।
অম্বল রাধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা
বড়া হলো আশিকা পিযুষী পুরী পুলি
চুটী রুটী রাম রোট মুগের শামুলী।
কলাবড়া ঘিওর পাপর ভাজা পুলী
সুধা রুচি মুচি মুচি লুচি কতগুলি।
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিল।
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রাঁধে আর ইত্যাদি।

(অন্নদামঙ্গল—ভাঃ, চঃ)

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমানের নিরামিষ পাকের স্বাদ গ্রহণ করিবেন ? রাধুনীতে কিছু গোলযোগ আছে। তবে বারবণিতারা ও একালের মত খাবার দোকানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত না, বুঝা যায়।

"মন্দ মন্দ জালে ঝালে ব'সে ভাজে ভাজা,
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা।
কুটে রাখে নারিকা লবণ মাখি থালে
নির্জ্জলা করিয়া রামা তপ্ত ঘৃতে ডালে।
মান কচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব,
ফল মূল ভাজে কত ঘৃতে জব জব।
ভাজিল বেগুন সীম নিম দিয়া ফোড়
মুলা আদা বটিকা করলা গর্ভ-থোড়।

সঝাল বক্কাল কত মিছরি মিশাইয়া
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া।
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা
ক্ষীর খণ্ড ছানা ননী পূর দিয়া মিঠা।
ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রাঁধে অবশেষে।"

(ঘনরাম—ধর্ম্ম, মঙ্গল, ৩৮৯)

অন্নদামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলে আসিয়া লুচির উদ্দেশে পাওয়া গেল এ একটা মঙ্গলের সংবাদ। ধর্ম্ম মঙ্গলে জল খাবারের উদ্যোগে অন্যত্র,—

"লাড়ু কলা চিনি ফেনী ক্ষীর খণ্ড খই।
মজা মর্ত্তমান মিছরি খাসা ক্ষীর খণ্ড,
মনোহরা মতিচুর খাসামৃত খণ্ড।"

পাওয়া যায়। একালের ঘৃতপক্কের ব্যবস্থাটা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়া আসিতেছে দেখা গেল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে "মঙ্গলের" কবিদ্বয় রাজবাটীর আহারে পরিপুষ্ট। সাধারণের বেলায় কিছু বাদ পড়িবে।

দেখা গেল, ভারতচন্দ্রের সময়ে নবাব-দরবারে অভ্যস্ত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে 'কালিয়া, কাবাব, দোল্মা' দেখা দিয়াছে। আমাদের একজন বন্ধু কিঞ্চিৎ সভয়ে বলিয়াছেন, "কোর্ম্মা কোপ্তা, কারি, কট্লেট্ প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের প্রকোপে বুঝি বা ঝাল ঝোল, দাল্না চড়চড়ি, আর বাঙ্গালী বাবুর মুখে রুচিবে না"। প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট রন্ধন দেশে দুর্লভ হইয়া পড়িতে চলিল। কারণ বাবুদের মত বাবুর গৃহিণীদেরও এখন আর কষ্টসাধ্য কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি হয় না।

একালের মত অজ্ঞাত কুলশীল রসুয়ে বামুন ঠাকুর বা বাবুর্চ্চী

বাবাজীর অধিকার তখনও আরম্ভ হয় নাই। সে কালের প্রবাসীরা অন্য অনাচারে আপত্তি না করিলেও আহার বিষয়ে বেশ শুচি ছিলেন, অনেকেই এই অবস্থায় স্বপাক খাইতেন; সেবাদাসী যোগাড় করিয়া দিত মাত্র। সেকালে ছোট বড় এমন কি রাজাদের গৃহিণীরাও অন্নপূর্ণা স্মরণ করিয়া সংযতভাবে পরম যত্নে স্বয়ং রন্ধন করিতেন; কুত্রাপি নিজের আত্মীয়া অন্য রমণীকে নিযুক্ত করা হইত। রন্ধন কলায় নিপুণা হইবার নিমিত্ত ইতর ভদ্র সকল মহিলাই প্রাণপণে যত্ন করিতেন। রাণী ভবাণী স্বপাক খাইতেন এবং পর্ব্বাহে স্বয়ং রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। পূর্ব্বকালের রাণীরাও স্বয়ং পাক করিয়া পতি পুত্রকে এবং জ্ঞাতি কুটম্বকে খাওয়াইতেন। শিবায়ণে

*   *   *   *

চটপট চামুণ্ডা চড়ায়ে দিলা পাক ॥
শঙ্করীর হুঙ্কারে কিঙ্করী করে ত্রস্ত।
পায়স পর্য্যন্ত পূর প্রস্তুত সমস্ত ॥
রাজ রাজেশ্বরী বামা রান্ধেন যাবন্ত।
পায়স করিয়া আদি সূপ করি অন্ত ॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ল মধু চতুর্ব্বিধ ব্যঞ্জনের গণ।

এখানেও রাজরাজেশ্বরীর রন্ধন বার্ত্তায় বড় ঘরের রাজেশ্বরীর স্বয়ং রন্ধন সূচিত হতেছে। আহার ব্যবহারে বিলাসিতা সেকালের গ্রাম্য সমাজ মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। রন্ধন কার্য্যে প্রশংসা পাইলে মহিলাগণ উল্লাসিত হইতেন; কেহ ভাল রাঁধিতে জানেন না বলিলে তাহা গালাগালি অপেক্ষাও অধিক লজ্জার বিষয় হইত। যাঁহারা ভোজকাজে রন্ধনশালার ভার পাইতেন, তাঁহাদের শ্লাঘার সীমা

থাকিত না। সংযত চিত্তে অগ্নিরূপী ভগবানের নিকট বিনত হইয়া তাঁহারা রন্ধন আরম্ভ করিতেন। এখনও পল্লী সমাজে এই ভাব কতকটা বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু এ কালে সহরে যে হাওয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইলে বড় অধিক আশা নাই। তবে দুর্দ্দিন সমাগত বলিয়া অন্যান্য দিকের সৎ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীদিগের মতি গতিও ফিরিতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সেকালের বসন ভূষণ।

এটা বসন-ভূষণেরই যুগ। কামিনীকুলের ত কথাই নাই, কারণ, তাঁহাদের এ বিষয়ে চিরকালের মত মৌরসী মোকররী দলিল হাঁসিল করা আছে। আমার মত তথা-কথিত পুরুষবর্গও কারণ অকারণে সময় অসময়ে 'লম্বশাট পটাবৃত' হইয়া দর্শন দিতে পারিলে চরিতার্থ হন। যুবকেরাও চেন চশমায়, তথা চর্ম্মচটিকার বাজুবন্ধ ঘটিকায় ভূষণের সাধ ষোল আনা পূর্ণ করেন। সুতরাং এই পূজার পূর্ব্বে (১) সেকালের বসন-ভূষণের সন্ধানে চলিলে বোধ হয় কেহই অনুযোগ করিবেন না। এক্ষেত্রে প্রধানতঃ প্রাচীন কবিগণেরই আশ্রয় হইতে হয়। বাঙ্গলার প্রাচীন স্থাপত্যের নানা প্রকার নিদর্শন বড়ই অল্প; অনেক দেবমূর্ত্তি এক ছাঁচেই নির্ম্মিত। কয়েকটি সূর্য্যমূর্ত্তিতে ও দুই চারিটি নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাত দেবমূর্ত্তিতে বসন ভুষণের কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু

(১) নারায়ণ পত্রে এক পূজার পূর্ব্বে প্রবন্ধাকারে এই অধ্যায়ের অধিকাংশ ছাপা হয়; এই পুস্তকও পূজার পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়ার কথা।

ইহার সবগুলি যে এদেশেই নির্ম্মিত তাহার প্রমাণাভাব। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে ক্ষোদিত চিত্রসকল যদি কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিবেশী প্রাচীন বাঙ্গলার পোষাকের পোষক হইতে পারে, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখিবার অনেক আছে। যাহা হউক, অনিশ্চিত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুরাণ কাহিনীর অনুসরণ করাই ভাল। সংস্কৃত সাহিত্যের শোভন সাজসজ্জায় গৌড়বাসীর সে যুগের প্রসাধন সূচিত করে কি না সন্দেহ। বর্দ্ধমানভুক্তির এক কোণে কেন্দুলীর কান্তারে বসিয়া কবিকুল-কোকিল জয়দেব অজয়ে যে প্রেমের বন্যা ঢালিয়াছেন, তাহার তোড়ের মধ্যে সেকালের বসন-ভূষণের সন্ধানে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার 'গোপ কদম্ব নিতম্ববতী'দিগের 'শিঞ্জান মঞ্জু মঞ্জীরের' অনুসরণ করিয়া দেখুন; ঐ 'চরণ রণিত' বা 'মুখরিত' নূপুর, চঞ্চল কুন্তল, শ্রীরাধিকার 'বিলোল মৌলীতরলোত্তংস', তথা 'হারাবলী তরল কাঞ্চন কাঞ্চিদাম মঞ্জীর কাঞ্চন মণি' প্রভৃতি সমস্তই প্রাচীন কবিগণের সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। মধ্যমণি বা ধুকধুকি এখনও স্বস্থান অধিকার করিয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন বটে; 'রসনা-রণিত রব ডিণ্ডিম' এখনও বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র রণবাদ্য (ডিণ্ডিম) সন্দেহ নাই। 'নীলনিচোল' অদ্যাপি 'চারু' বলিয়াই আমাদের ধারণা। মুগ্ধ মাধবের 'কনক নিকষ রুচি শুচি' পীত বসন একালে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া 'পাঞ্জাবী'তে পরিণত করি মাত্র; তাঁহার "উরসি তাপিচ্ছ গুচ্ছাবলী' (ফুলের তোড়া) প্রকারান্তরে চলিত আছে; কিন্তু মণিময় মকর বা মনোহর কুণ্ডল অন্তঃপুরে তাড়িত হইয়াছে। কাশ্মীর কস্তুরিকা এখন রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে; মৃগমদ রুচি-রুচিত বপুর বদলে বিলাতী এসেন্সের নূতন নকল স্বদেশী আখ্যায় বাবুর বেশবিন্যাসের বাহার জাহির করিতেছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত বা ভাষায় অবতরণ করিলে দেখা

যাইবে যে, পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ভীষণ দারিদ্র্য দেখা দিয়াছিল; দুর্দ্দম পাঠানদলের তাণ্ডব তাড়নে ম্রিয়মাণ গৌড়ীয় সমাজে শাসনের ভয়ে ভূষণ মহীতলেই আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। দরিদ্র পল্লীর যে দুই একটি বার্ত্তা রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ভূষণের মধ্যে টাড়বালা ও কঙ্কন এবং বসনে নেতের* ধুতী ও পাটযোড়ার উল্লেখ আছে, এগুলি অবশ্য সেকালের বিত্তশালী ব্যক্তিরই ব্যবহার্য্য ছিল। গোপীচাঁদের গীতের ভাষা যদি সেকালের কথা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে তাহাতে পাই, উদুনা রাণী—

"খসাইয়া ফেলে হার কেয়ূর কঙ্কন
অভিমানে দূর করে যত আভরণ।
নাকের বেসর ফেলে পায়ের নূপুর
পুঁছিয়া ফেলিল সব সিঁথার সিন্দুর।

---

* 'নেত' শব্দের ব্যাখ্যায় সুহৃদ্বর নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত শূন্য পুরাণে 'ন্যাকড়া' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। ইহা ন্যাতা' নহে। কৃত্তিবাস আদিকাণ্ডে লিখিয়াছেন;—'নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি। বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী॥' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'নেতবাস গুহারণ দিয়াঁ', 'নেত পাটোল'—এবং চৈতন্য ভাগবতে 'পট্ট নেত শুক্ল নীল সুপীত বসন' পাই।

ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বংশীবদনের মনসামঙ্গলে 'নেতের উড়ানী' আছে। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে 'নেতের আচল ভিজে নয়নের জলে' পাই। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ইন্দ্রের কথায় 'পাটনেত বাস পরে গলে রত্নমালা' দেখিয়া বোধ হয় কেহই মনে করিবেন না যে, দেবরাজ রত্নমালা গলায় দিয়া পাটের ন্যাতা পরিয়া কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। নেত—ক্ষৌম বসন। রাঢ় অঞ্চলে এখনও অনেক স্থানে ক্ষৌম সূতাকে 'নেতা' বা 'নেচা' বলিয়া থাকে। অনেক প্রাচীন কবিই নায়ক নায়িকাকে নেতের বসন পরাইয়াছেন। সংস্কৃতেও নেত্র অংশুবাচক।

প্রেমিকপ্রবর কবি চণ্ডীদাস মরমের কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের ভূষণেরই উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার সিদ্ধহস্তের লেখনীর তুলিকায় আঁকিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডারে বাহ্য বসন ভূষণের সন্ধান না করাই ভাল। কিন্তু এই রস-সাগরের পাশের কিনারায় আসিয়া 'সিঁথার সিন্দুর নয়নে কাজল মুকুতা শোভিত নথে' 'মুকুতা প্রবাল মণিময় হার পোতিক মাণিক যত' পাইতেছি। "বিবিধ কুসুমে বাঁধিল কবরী শিথিল না ভেল ডোরী, কস্তূরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ, দেখিতে অধিক জোরি" ও আছে। উচ্চ কুচমূলে হেম হার, অঙ্গুলির মাঝে যাবক, কনক কাঁচুলিও পাই। 'নাসায় বেসর' ত চির সহচর। নিধুবনের সজ্জায় মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটার সঙ্গে সঙ্গে 'হীরার ছাঁদা প্রবাল মুকুতা, গাঁথনি আঁটনি'—যেন কতকটা পরিমাণে আমাদের গ্রাম্য কবির কল্পনার আঁটুনি বলিয়াই 'ফস্‌কা' মত বোধ হইতেছে। কিন্তু যখন মহাকবি পায়ে ঝামা ঘসিয়া আলতা পরার কথা বা 'আমলকী হাতে ঘষিতে মাগিল কেশ' অথবা লোটন, কানড়ি বা তবল্লকী ছাঁদে কবরী বাঁধা প্রভৃতি সেকালের প্রসাধনের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজের কোটে বসিয়াছেন। নিতম্ব মণ্ডলে ঘাঘর কিঙ্কিনী, গলে গজমতি সাতেসরী হার, অঙ্গদ ভুজ যুগলেও আছে। অন্যত্র চণ্ডীদাস 'চরণকমলে মল্লতাড়ল সুন্দর যাবক রেখা'য় সেকালের মনের সহিত মহিলাকুলের সাধের সাজন রেখার চিত্রও দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে চরণচুর বা চরণপদ্ম অলঙ্কার দেখা দিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস অনেকগুলি অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। 'বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খ চূড়'। 'কাঞ্চুলী ভাঙ্গিয়া তন বিগুতিল, ছিড়ি সাতেসরী হারা' 'বাহুতে বলয়া শোভে পাএত নুপুর' 'খোঁপতে লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল' কাণে হীরাধর কড়ী ইত্যাদি সে যুগের ভূষণের আভাষ পাওয়া যায়।

নিম্নে উদ্ধৃত রামায়ণ ও পদ্মাপুরাণের বর্ণনা হইতে সেকালের বড় ঘরের অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি॥
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ॥
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর।—
(কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

মুক্তা সহকারে বেসর, পাটের পাছড়া, সোণার কাঁচলি, তাড়, কর্ণফুল, কঙ্কন প্রভৃতির ব্যবস্থা অবশ্য রাজকন্যার জন্য। 'বাজন নূপুর' অনেকেরই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত।

পূর্ব্ববঙ্গের সেকালের ভূষণের সন্ধানে গিয়া দেখিতে পাই :—

দুই হাতের 'শঙ্খ' হইল গরল শঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী॥
সুতালিয়া নাগে কৈল গলার সুতলী।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি॥
সিন্দূরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পত্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিংকিনী।
চেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালী কাঁচুলী॥

কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি।
বিষাতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি॥
(বিজয় গুপ্ত, পদ্মপুরাণ)

এখানে গলার 'সুতলী' মালা ও কাকলী কাচুলি ও কর্ণের চাকি ও বলি আছে। পাশুলী ও কিঙ্কিনী সেকালে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা গেল।

বিদ্যাপতির 'মণিময় মঞ্জীর পায়,' 'কঙ্কণ মণিময় হার,' কুণ্ডল ও কর্ণফুল কি সেকালের মিথিলা এবং বঙ্গের বড় ঘরের অলঙ্কারের কথা জানাইতেছে? 'নাসায় বেসর, মণি কুণ্ডল, শ্রবণে দুলিত ভেল' ইহা ত সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে নয়। তবে 'কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন, ঘন ঘন নূপুর বাজে' শব্দটা সাধারণের কর্ণেও বাজিত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণকেলী' নামে রঙ্গীণ বস্ত্র পরিতেন। নবদ্বীপের বাজারে তখন 'পাট নেত ভোট,' সকলাত কম্বল, শ্রীরাম খানি জম্‌কা এবং ভোট দেশের 'ইন্দ্র নীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা'—বিকাইত। অলঙ্কারের মধ্যে টাড় প্যাঁটা কড়ি, হিরণ্য মাদুলী, কেয়ূর কঙ্কণ, রত্ন নূপুর এবং হেমকিয়া পাতা, বিদ্রুম, মুকুতা ও তবক, বেসর, পানকাঁটা দেখা যাইতেছে। হোসেন শার সুশাসনে শান্তির সহিত দেশের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কথা ইতিহাস সমর্থন করিতেছে, সুতরাং কবির কল্পনা সত্যকে অতিক্রম করিয়া অধিক দূর যায় নাই।

অদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী সীতা দেবী যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শিশু চৈতন্যকে দেখিতে আসিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বাসভূমি কাটোয়া অঞ্চলের সেকালের সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের বস্ত্রালঙ্কারের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে:—

"সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজত মুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ,
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।
ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ,
চিত্র বর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনিফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন।
দুর্ব্বা ধান্য গোরচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে করিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লয়ে দাসী চেড়ী
বস্ত্রালঙ্কারে পেটরা ভরিয়া॥
ভক্ষ্যভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার
শচী গৃহে হৈলা উপনীত।" (চৈতন্য—চঃ)

উল্লিখিত কয়েক চরণের 'বস্ত্রগুপ্ত দোলা' বা ডুলি এখনও পল্লীবাসিনী রমণীর প্রধান যান। সেকালের ভদ্র মহিলারা কেবল শাটী মাত্র পরিধান করিয়াই ভিন্ন স্থানে যাইতেন না। তখনকার ভুনিফোতা' একালের চাদর বা ওড়নার ন্যায় আবরণ বস্ত্র ছিল। অলঙ্কারের বর্ণনা অবশ্য কবিকল্পনা।

দানলীলায় রসাবেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাবুক কবি গোবিন্দ দাস "রাই সুনাগরী"র বেশ-বিন্যাসের যে গীত গাহিয়াছেন, তাহাতে বসন-ভূষণ কি কি চাই দেখুন:—

"বেনন পাটের জাদে বাঁধিয়া কবরী বেড়িয়া মালতী মালে।
সীথায় সিন্দুর লোচনে কাজর, অলকা তিলকা চারুভালে॥
চরণ-কমলে, রাতুল আলতা, বাজন নূপুর বাজে।"

পুনরায় কিশোরীর রূপ বর্ণনায়,—

ধনী কাঁনড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী,
বন মালতী মালা তাহি উপরি।
দলিতাঞ্জন গুঞ্জ কলা কবরী,
ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী।
ধনি সিন্দুর বিন্দু ললাটে বনি
অলকা ঝলকে তঁহি নীলমণি।
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ পাতা
ভ্রুভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ লতা।
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরিটা
তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা।
তিল পুষ্পসম নাসা এ ললিতা,
কনকাঁতি ভাতি ঝলকে মুকুতা।
গলে মোতিম হার সুরঙ্গ মালা।
কটি কিঙ্কিণী জানু হেম কদলী।
পদ-পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা,
মণি মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা। ইত্যাদি।

আবার 'কাঁচলী পর নীলমণি হারিণী'।
'রসনা কিঙ্কিনী মণি, বিলোলিতা বরবেণী'
অলকা তিলকা দেই, সীঁথি বানায়ই,
চিকুরে কবরী পুন সাজি।

* * *

মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল উরপর দেয়লি হার।

* * *

নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ,
চরণ-কমল তলে যাবক লেখই কি কহব দাস গোবিন্দ।

পুনশ্চ 'চরণ-কমলে রাতুল আলতা বাজন নূপুর বাজে।
বকুলমালা দিয়া কুন্তল টানিয়া, ময়ুর পুচ্ছের ছাঁদে।
নীল বসন মণি বলয়া বিরাজিত, উচ কুচ কঞ্চুক ভার!
শ্রবণহি টাকট (?) মণিময় হাটক কণ্ঠে বিরাজিত হার॥'
'মণিময় সুরচিত সিঁথে উজারল মোতি'।
ঝুণু ঝুণু মঞ্জীর বাজে—রুণু রুণু নূপুর রাজে।'
"রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সবতনু, কাজরে উজল নয়ান"

'মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল' 'বলয় বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী'
'মকরাকৃতি মণি কুণ্ডল দোলনী' উর পর কিঙ্কিণী, রণ রণি নূপুর পায়
'কাঁচলী পর নীলমণি হারিণী'
'শ্রুতিমূলে চঞ্চল, মণিময় কুণ্ডল, দোলত মকর আকার'

ইত্যাদি নানা স্থানে ন্যস্ত লাসবেশ সমস্ত হইতে কবি কল্পনার অংশ বাদ দিয়াও সেযুগের বসনভূষণের কিঞ্চিৎ আভাস পাই। গোবিন্দ দাস শ্রীখণ্ডে এবং মালদহে জীবনের অধিকাংশই যাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বর্ণনা কতকটা মধ্য বাঙ্গালার বড় ঘরের খবর বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে গঙ্গাজলী শাড়ী, নেতের উড়নী, পাটশাড়ী, ঘুঘরা, নীবিবন্ধ, ইত্যাদির উল্লেখ আছে। তখন সুচেল নামক পট্টবস্ত্র ব্যবহৃত হইত। রাজা শিকারে বাহির হইতেছেন, তাঁহার পরিচ্ছদ :—

'পাগড়ী সুরঞ্জিত, শিরপর শোভিত
শোভন সাজুয়া গায়।

শ্রবণে কুণ্ডল, করিতেছে ঢল ঢল,
মখমলি উপানহ পায় ॥”

ভাটের পোষাকে

‘পরিশোভা ভাল, পুরটে মিশাল
সুচিত্র পাগড়ী মাথে।
তাহার উপর, জরি মনোহর,
মুকুতামণ্ডিত তাথে ॥’

নাপিত বিদায় পাইল—“পট্ট কাপাস ইজার ঘোড়া জোড়া আর”। অন্যত্র “শ্রবণে কুণ্ডল, করে ঝলমল, কিরণ কাবাই গায়। হেম হীরাসহ, উপ উপানহ, অতি অনুপম পায়” পাওয়া যায়। কুণ্ডল তখন এদেশেও স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কর্ণেই বিরাজ করিতেছেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসানে চেলী, মলমল, জোড় ধুতী, ছিট উড়ানী, আনন্দাই শাড়ী, চিকন বনাত, গর্ভসূতী ডুরা্যা, নীল শাড়ী, পাটাম্বর, সালমের থান, জামাজোড়া ও ভোট কম্বলের কথা পাই। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে কাপড়ের রাজা যাত্রাসিধ শাড়ী, অগ্নিফুলশাড়ী মুক্তাফুলশাড়ী, মুক্তাফুল খুঞা, নেত প্রভৃতি বস্ত্রের উল্লেখ আছে। বর্দ্ধমান অঞ্চলের কবি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে ‘কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টী ভাল সাজে। রতন মঞ্জীর রাঙ্গা চরণেতে রাজে” উক্তিতে পশ্চিম অঞ্চলের একটু গন্ধ পাওয়া যায়। কণ্ঠে সুবর্ণের হার, কর্ণে কুণ্ডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বলয় কঙ্কণ, অন্য কবির মত তাঁহার কাব্যেও আছে। পূর্ব্ববঙ্গের বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে হাতে বাউটি, কণ্ঠে হাঁসলী, কর্ণে মদন কড়ি; ইহা ছাড়া তিনি সুবর্ণ ঘাগরা ও শিলমণি কাচের উল্লেখ করিয়া অনেককে গোলে ফেলিয়াছেন। পিতলের খাড়ু ও লোটন খোঁপার কথাও ইহাতে আছে। এই সমস্ত মিলাইয়া গরীবের খাড়ুর

সহিত ধনাঢ্যের গজমতি ও মঞ্জীর মানাইয়া লইলে দেখা যায় যে, এই শতাব্দীতে নাগরিক বাঙ্গালীর বড় ঘরের বসনভূষণের পারিপাট্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে অর্থের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিত্তশালী ব্যক্তির বিলাসবৃদ্ধিও সূচিত হইতেছে।

কবিকঙ্কণ কনক কেয়ূর এবং অঙ্গদ কঙ্কণ হারে অঙ্গ ভূষিত করাইয়া ‘দোছটী করিয়া তসরের শাড়ী’ পরাইয়া ‘কুসুমের গাভা’ কবরী বান্ধিয়া, নয়নে মোহন কাজল দিয়া খুল্লনাকে সাধুর সমক্ষে উপস্থিত করাইয়াছেন। দুর্ব্বলা দাসী লহনাকেও ‘অলক তিলক পর মোহন কজ্জল’ বলিয়া উৎসাহ দিতেছে; গুয়ামুটি কবরী বাঁধিয়া মেঘডম্বুর কাপড় পরিয়া বিনোদ কাঁচুলী আঁটিয়া দোয়ালী কাকালি বাঁধিয়া লহনা কায়ক্লেশে বয়স কমাইয়া আনিল। কিন্তু মুখে ‘মাছিতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়’। যাহা হউক, মণিময় হার, কর্ণপূরাদি চড়াইয়া সেও স্বামী সম্ভাষিতে চলিয়াছে। খুল্লনার বেলায় কবি ‘শ্রবণ উপরে পরে কনক বউলি’ তথা ‘মণি বিরাজিত হেম মধুরা কিঙ্কিণী’ ইত্যাদির ব্যবস্থাও করিয়াছেন। অন্যত্র শিরোমণি, ললাটের সিঁথি, গলার পদক ও হেম পাশুলীও আছে। কালকেতু অর্থলাভ করিয়া “পুরাতে জায়ার সাধ, পাটের কিনিল জাদ, মণিময় সূত্র তায় বেড়ি। হীরা নীল মতিমালা কলধৌত কণ্ঠমালা কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণ চুড়ী”। সাধু গৌড় হইতে সুবর্ণের কড়ি মাছি, মণি, হেমহারও আনিয়াছেন। স্বর্গের নর্ত্তকী রত্নমালার বেশ বিন্যাসই অবশ্য চক্রবর্ত্তী কবির কল্পিত বেশ ভূষার চরম বিকাশ :—

সুরঙ্গ পাটের জাদে, বিচিত্র কবরী বাঁধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা
কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাত ভানুর ছটা,
চৌদিকে চন্দন-বিন্দু শোভা।

* * * *

হীরা নীল মতি পলা, কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক
পীত তড়িত বর্ণে, হেম মুকুলিকা কর্ণে
কেশ মেঘে পড়য়ে বিজলী
রজত পাশুলী ছুটী পরি দিব্য তুলা টুটী
বাহু বিভূষণ ঝলমলি।

"দোছটী করিয়া পরে বার হাত সাড়ী" কথায় মহিলাদের বস্ত্রের দৈর্ঘ্য বুঝা যায়। গরীবের কথায় 'খুঞাধুতী উড়িতে খোসলা' যাহা শেষে গুড়া হইয়া যায়, কবিকঙ্কণে এইরূপ বস্ত্রেরও উল্লেখ আছে; আবার রাজকন্যার যৌতুকের সময়ে 'কেহ নেত কেহ শ্বেত পাটশাড়ী' দিতেছে। মেঘডম্বুর কাপড়ের কথা কবি অনেকস্থলে কহিয়াছেন। গাত্রবস্ত্রের কথায় ধোকড়ির সঙ্গে সঙ্গে খাসা জোড়ারও উল্লেখ আছে। মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া, উল্লেখ বাঙ্গালীর পাগড়ী ব্যবহার সমর্থন করে। 'মাগের বসন পরে ভূমে নামে কোঁচা' কথায় লম্বা কোঁচা করিয়া কাপড় পরার উল্লেখ পাই। অবশ্য ভাড়ু এখানে স্ত্রীর লম্বা চৌড়া কাপড় ব্যবহার করিয়াছে; কলিঙ্গ-রাজ দরবারে কালকেতুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে যাইতেছে, ঘরে যে ভাল কাপড় খানি আছে তাহাই ত পরা উচিত। কিন্তু "পাগ খানি বাঁধে ভাড়ু নাহি ঢাকে কেশ'—এই উক্তি কেবল রাজদরবারে যাইবার জন্যই পাগড়ী বাঁধার প্রয়োজন মনে করিতে হইবে কি? রাজা কালকেতুর "পরিধান খাসা জোড়া" পাটের জোড় ইহা নিশ্চয়, কিন্তু অন্যস্থানে উল্লিখিত 'খাসা জোড়া' শালের জোড়া বলিয়াই মনে হয়। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য সকল প্রকার রত্নের আকর। ইহার নানাস্থান হইতে কুড়াইলে 'মাণিকের অঙ্গুরী' 'মণিময়

কাঞ্চন নূপুর' ও মিলে। এসব ভগবতীর ভূষণ হইলেও অন্যত্র উল্লিখিত 'পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমল'—অনেক বাঁকমল ভূষিতা সে যুগের রূপসীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যাঁহাদের মিসি রঞ্জিত মসী বিনিন্দিত দন্ত বিকাশযুক্ত হাসি সরলা গ্রাম্য যুবতীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ ছিল। 'বিচিত্র কপাল তটি, গলায় সুবর্ণ কাঁটি' 'কটিতটে শোভে আর কনক শিকলি,' রজত পাশলি ও সুবর্ণ কিঙ্কিণী, নানাস্থানে ছড়ান আছে।

এতক্ষণ বঙ্গমহিলার বড়ই আদরের ভূষণ শঙ্খের কথা বলা হয় নাই। সেকালে ইহা রজত কাঞ্চনের অপেক্ষা মূল্যবান্ বিবেচিত হইত। এখন সোনা দিয়া শাঁখা মুড়িয়া বা সোনায় রচিত কাঁটালের আমসত্ব মত শাঁখায় অনেকে সাধ মিটান। সেকালে সধবার সোহাগের, কুমারীর কামনার রাঙ্গা শাঁখা না হইলে সজ্জাই শেষ হইত না। কবিকঙ্কন গাহিয়াছেন—"সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ' 'গলে শতেশ্বরী হার, শোভে নানা অলঙ্কার, করে শঙ্খ শোভে টাড় বালা'—অন্যত্র ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালার বেশভূষার কথায় "পরে দিব্য পাটীশাড়ী. কনকের পরে চুড়ী, দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ" লিখিয়া শাঁখার স্থান অনেকটা উচ্চে স্থাপিত করিয়াছেন। শিবায়নের কবি শাঁখার মহিমায় একটি অধ্যায়ই অর্পণ করিয়াছেন। লাবণ্য, লক্ষ্মাবিলাস, রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি নানা নামের শাঁখা ছিল। ধর্ম্মমঙ্গলে শিবাই দত্ত বারুইয়ের বৌ নয়ানীর অন্যান্য ভূষণের মধ্যে 'করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্ধ ছড়া' ছড়ান রহিয়াছে। তাহার সীমন্তে সুবর্ণের সিঁথী, অলকা-কোলে মুকুতার পাঁতি, প্রবাল পুরট পাতি গজমতি হার, কাণের কুণ্ডল, কনককাটা কড়ি, তথা, পুরট টাড় বিচিত্র বাউলী প্রভৃতি লাসবেশ ঘনরাম কবি অপাত্রেই অর্পণ করিয়াছেন; নটী সুরিক্ষার প্রসঙ্গে হইলে শোভা পাইত। কিন্তু 'বাহ্মিল বিনোদ খোঁপা বাঁদিকে টাসুনী' এবং 'পদ ভুষা পাতা গোটা মল' বা নাকের বেসর বেশ

মানাইয়াছে। যোদ্ধবেশ বর্ণনে 'গায় পরে পট্টযোড়া পুরটে রচিত' ইত্যাদিতে আরম্ভ করিয়া 'শিরে বাঁধে সরবন্দ সুবর্ণের চিরা, বিন্দু ইন্দু বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা' প্রভৃতি মধুরে যাহা সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা একালের যাত্রার দলের বেশের আদর্শ বটে ; বর্দ্ধমান রাজবাটীতে কবি ঐরূপ দেখিয়া থাকিবেন। শিবায়নে 'গিরীন্দ্র গৌরীর গায়ে দিলা অলঙ্কার' বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে কর্ণগড়ের রাজকন্যার বেশে সাধারণ গৃহস্থের ভূষণ খাপছাড়া মত মিশাইয়াছে। 'পায়ে দিলা পাতা মল পাশুলীর পাতি'—সে আবার মুকুতামণ্ডিত! 'গুল্‌ফের উপর গোটা মল', 'ঘাঘরের উপরে ঘণ্টার ঘটা', 'বিচিত্র কাঁচুলী বান্ধা বুকের উপর' এ সব বেশ সাজিল। কিন্তু 'মরকত চুণী মণি মাণিক সহিত' অঙ্গুরীতে অঙ্গুলি ভূষিত করিয়া, সুবলিত ভুজে সুবর্ণের চুড়ী দিয়া সঙ্গে সঙ্গে 'রজতের কঙ্কণ রহিল তার কোলে'। 'হাটকজড়িত হীরা দপ্‌ দপ্‌ জ্বলে' এবং 'আগে সাজে পঁউছি পশ্চাতে বাজুবন্ধ' লাগাইয়াছেন! পাটথোপা ঝাঁপা সুছন্দ বলিয়া ছাড়া হয় নাই ; ভট্টাচার্য্য দাদা রজতের কঙ্কণও ঝাঁপায় অভ্যস্ত!

অলঙ্কারের কথায় পরবর্ত্তী নানা কাব্যে মস্তকে রত্ন মুকুট, চূড়ামণি, কপালে ঝুরি, মুক্তাবলী ও সিঁথি, পশ্চাদ্ভাগে পুরট ঝাঁপা, থোপনা, কর্ণে কর্ণপুর, কুণ্ডল, কর্ণফুলি, চক্রাবলী বা চাকা, নিম্ন কর্ণে 'বলি', নাসায় নাকচনা বেসর ও মুকুতাবলী, গলায় ধনাঢ্যের গজমুক্তার হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতীহার, চন্দ্রহার, কলধৌত কণ্ঠমালা প্রভৃতি আছে। শিশুর গলায় সেকালেও বাঘনখ দৃষ্ট হয়। বাহু ও মণিবন্ধে টাড়বালা, বাউটি বা বাজুবন্ধ; কেয়ূর, অঙ্গদ বলয়, সোনার চুড়ী, খাড়ু, রাঙ্গা রুলী ; কটিতে কিঙ্কিণী ও শিকলী, আঙ্গুলে অঙ্গুরী, পদে পাশুলী, নূপুর (ঘুঙুর দেওয়া) এবং গোটামল প্রভৃতি নানা জাতীয় মল পাওয়া যায়। ক্রমশঃ

কিরূপে একালের রুচির সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারগুলি নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত নহে। একালের এক সুদীর্ঘ যাত্রার গানে শুনা গিয়াছে ঃ—

রমণী যতনে পরে নানা অলঙ্কার ; নানা প্রকার,
গুজরী মাকড়া সোণার চুড়ী আর চিক্‌হার,
মাছ মাদুলী, পাশা পাশুলী, কণ্ঠী পাঁইজোড়
আর চন্দ্রহার।—ইত্যাদি!

পাশা পাশুলি ত বহুদিন পলায়ন দিয়াছে ; গুজরী চিকও তথৈবচ, এখন নূতন ফ্যাসানের হার, ফারফোর বালা অনন্তের অন্ত নাই। সোণার কাণবালা ইংরেজী নামের অন্য ভূষণের অনুকূলে স্বত্ব ত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন।

সেকালের বাঙ্গালী মহিলার নানারঙ্গের কাঁচুলীর কথা সকল কাব্যেই দৃষ্ট হয়। ওড়না ব্যবহারের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; নীবি বন্ধন করিবার কথাও কোন কোন প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। কাঁচুলীর চলন পশ্চিমের মত বঙ্গদেশেও ছিল, কারণ কবি কৃত্তিবাস হইতে ধর্ম্মমঙ্গলের রূপরাম ঘনরাম পর্য্যন্ত সকলেই কাঁচুলীর অল্লাবস্তর বর্ণনা দিয়াছেন। কবিকঙ্কণে ভগবতীর কাঁচুলির উপরে বিচিত্র লেখার কথা সেকালের উৎকৃষ্ট কাঁচুলী লেখার নিয়ম নির্দ্দেশ করে। ঘনরামের চিত্রিত কাঁচুলী রাজবাটীর নমুনা দৃষ্টে রচিত সন্দেহ নাই। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে ৺কার্ত্তিকেয় রায় মহাশয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের কথায় লিখিয়াছেন—"রাজ্ঞা, রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কোষেয় শাটী পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভ কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলী ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।" ঘনরামের পরবর্ত্তী কালে পুরুষের পাগড়ীর সঙ্গে সঙ্গে মহিলা-

কুলের কাঁচলীর এদেশ হইতে অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। পাগড়ী রাজা বা রাজপুরুষের কথার সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়; সাধারণে ব্যবহার করিত কি না বলা কঠিন। কাঁচুলীর স্মৃতি কেবল যাত্রার দলে রক্ষিত হইয়াছে। পুরুষের সুদীর্ঘ কেশের কথার সর্ব্বত্র উল্লেখ আছে। কাহারও বা চাঁচর-চিকন কেশ উন্মুক্ত থাকিত, আবার কেহ কেহ বেণী বাঁধিয়াও সখ মিটাইতেন। বাল্যকালে আমরা এইরূপ আঁচড়ান চাঁচর কেশ দেখিয়াছি; কবি রবিবাবুই এ ফ্যাসনের আবিষ্কারকর্ত্তা নহেন। চৈতন্য দেবের সুন্দর কেশ মুড়াইবার সময়ে কবির কষ্ট ও ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া সেকালে চাঁচর চুলের প্রতি লোকের অনুরাগ বেশ বুঝা যায়; 'পলায় রামের সৈন্য নাহি বাঁধে কেশ' —এই কৃত্তিবাস-উক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল বঙ্গ কবির বর্ণনেই পুরুষের কেশকলাপের কথা আছে।

বর্দ্ধমানের রাজকবি ঘনরাম পোষাকের কথায় শাল দোশালা, সরবন্ধ জোড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদও রাজবাটী যাতায়াতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'জরীর পোষাকপরা বেশ চিরা মাথে'। তিনি বনাত, মখমল, পট্টু, ভূষনাই খাসা, বুটাদার ঢাকাইয়া, মালদই ললাট এবং চিকণ সরবন্দের কথাও বলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনে পোষাকের আরও বাহুল্য আছে, তিনি ভবানন্দকে দিল্লী দরবারের "বিলাতী খেলাৎ" দেওয়াইয়াছেন। এই পোষাকের সংশোধিত অথচ সাধারণ সংস্করণ শেষে দরবারী পোষাকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইঁহার প্রপৌত্রেরা এখনও সময়ে সময়ে দর্শন দিয়া রাজকুলের কৌতূহল তথা আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই জোব্বা ও চোগা চাপকান এখনও কোটের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত আছেন; দুই পক্ষের জয় পরাজয় অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শিল্প-কলা।

পুরাকালে সোণার ভারত শিল্প-বাণিজ্যে সভ্যসমাজে কতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল তাহা সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত নাই। প্রাচীন মিসর ও বাবিলন, পরে গ্রীস্ ও রোম ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য আদরে গ্রহণ করিত। এই শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠার অংশ প্রাচীন বাঙ্গালাও উপভোগ করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্লিনী উল্লেখ করিয়াছেন, "রোমক ললনা প্রাচ্য সুচিক্কণ বস্ত্রের অন্তরাল হইতে স্বীয় অঙ্গরাগ প্রকাশ করিতে ভালবাসেন;" এখানে বাঙ্গালী তাঁতীর হাত সুস্পষ্ট। সুচিক্কণ রেসমী ও সুতী কাপড় প্রস্তুত করার কৌশলে বাঙ্গালী অন্য প্রদেশের অগ্রণী। প্রাকৃতিক কারণে পল্লীবাসী বাঙ্গালীর অধিকাংশই কৃষিজীবি; এই কৃষীবলের আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্যই প্রাচীন যুগের শিল্পীর আবির্ভাব। অভাব বোধের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিল্পের বিস্তৃতি; বিলাসে উহার পারিপাট্য একথা সকলেই বুঝেন। প্রকৃতি দেবীর কল্যাণে বাঙ্গালী পল্লীর গৃহস্থের অভাব অতি অল্পই ছিল। অপেক্ষাকৃত সভ্যযুগে রাজা রাজড়ার বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নগরে শিল্প কুশল লোকের আবির্ভাব বাঙ্গলা দেশেও হইয়াছিল। তাই পাল ও সেন রাজগণের অধিকারে ভাস্কর মণিকারের কৃতিত্বের পরিচয় পাই; বিলাসী মোগল রাজের সময়ে সাত পুরু কাপড়েও কিরূপে উলঙ্গ থাকা যাইতে পারে, বাঙ্গালী তন্তুবায় তাহার নমুনা দেখাইয়াছে। জাহাঙ্গীরের সভায় রো সাহেবের সহযাত্রী পাদরী টেরী যে উৎকৃষ্ট রেসমী কাপড়, জড়ি, ও

বুটাদার রুমাল, রঙ্গীন ফুলদার শাটিন দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ও তাহাতে কিছু ভাগ আছে। দিল্লীওয়ালা মিস্ত্রী তাঁহার সময়ে যে সব সুন্দর খাট, সিন্দুক, বিচিত্র বারকোষ প্রস্তুত করিত, ঢাকায় তাহার অনুকরণ হয় নাই কে বলিবে ? যে হিন্দু জাতির শিল্পীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দরিদ্র ভৃত্যের সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্ম যাজক মোহিত হইয়াছেন, তাহারা পরে সে সব একদিনে হারাইয়া বসে নাই।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস লেখক প্রবীণ বার্ডউড সাহেব ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য জীবন লক্ষ্য করিয়া এক আদর্শ গ্রামের চিত্র নিপুণ লেখনী সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া সানন্দে লিখিয়া গিয়াছেন ;— ভারতে প্রতি গৃহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রামেও গৃহ-কর্ত্রী দৈনিক কার্য্যের অবসরে সূত্র ও বস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যাপৃতা, ছায়া-বহুল গ্রাম্য পথের পার্শ্বে তন্তুবায় স্বকার্য্যে নিযুক্ত। পথিপার্শ্বে কোথাও কর্ম্মকার ও কাঁসারীর কারখানা ; কোথাও স্বর্ণকার স্বভাবের অনুকরণে চাঁদের মত হাঁসুলী, বালা, বা ফুল ফলের মত আভরণ নির্ম্মাণে নিয়োজিত। বিকালে সমস্ত পথ আলোকিত করিয়া রমণীদলের জল আনিতে যাওয়ার বেশ এই কবি লেখকের হস্তে জীবন্ত প্রতিফলিত হইয়াছে (১)। এ সব সুষমা সেকালের বঙ্গেও ছিল।

সে বড় বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসরেরও কম হইবে যখন লেখক বাল্যবন্ধুদিগের দল লইয়া মাঠে গিয়া কাপাস তোলার সহায়তা করিয়াছে। সেই কাপাস বাটীতে আসিয়া মাতৃস্থানীয়া মহিলাদিগের নিপুণ হস্তে চড়কি সাহায্যে সুন্দর তুলায় পরিবর্ত্তিত, আছড়া দ্বারা ফুড়িয়া শর কাঠির সহায়তায় পাঁজে পরিণত, শেষে একালের যুবক

(১) Going and returning in a single file, the scene glows like Titan's canvas and moves like the Stately procession of the Panatheniac frieze—Sir, G. Birdwood—Industrial arts of India.

দিগের পক্ষে অদ্ভুত আবিষ্কার সেই চড়কায় ঘুরিয়া সরু মোটা সূতা প্রস্তুত হইয়াছে। তন্তুবায়ের বাটী গিয়া এই গৃহজাত সূতার লাল পেরে ধড়া লইয়া সানন্দে বাটীতে আসার আহ্লাদ এখনও বেশ মনে আছে। আজ বিদেশী কলের কৌশলে দেশীয় শিল্প নির্জ্জীব হইয়াছে। কলের প্রচলনে সামাজিক ও নৈতিক দুর্গতির কথা আজ নূতন আলোচনা হয় নাই ; বার্ডউড্ বিশেষ ভাবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন (২)।

মাটির সাজ। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুজাতি মৃণ্ময় পাত্র প্রস্তুত করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। স্বভাবের অনুকরণে, অভাব ও আবশ্যকের প্রেরণায় শিল্পকার্য্যের সর্ব্ব প্রথম চেষ্টিত এই মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ জগতের সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভারতে আর্য্যজাতি অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া এই সরল শিল্পে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত নানা স্থানের ভগ্নাবশেষের ভিতর হইতে প্রাপ্ত মৃন্ময় পাত্রের আদর্শে দেখা যায়। অতি প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া সারনাথে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র গুলি পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে এই কার্য্যে হিন্দুরা কত অধিক দক্ষ হইয়াছিল। অজন্তা বা ভুবনেশ্বরে অঙ্কিত কলসের গঠন যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা একথা ভাল বুঝিবেন, এস্থলে

(২) The artisans, for the sake of whose works the whole world had been ceaselessly pouring its bullion for 3000 years into India and who for all the marvelous tissues and embroidery they have wrought, have polluted no rivers, deformed no pleasing prospects, nor poisoned any air, whose skill and individuality the countless generations have developed to the highest pe-fection, these heriditary handicraftsmen are being everywhere gathered from their democratic village communities in hundreds and thousands into the colossal mills of Bombay etc.

কলস বা ক্ষুদ্র ঘট সৌন্দর্য্য বিকাশের নিমিত্ত প্রস্তরে ক্ষোদিত। ভুবনেশ্বরে ক্ষোদিত ক্ষুদ্র কলসের কনিষ্ঠ সহোদর ঘৃত বা মধু রাখিবার সুগঠিত মৃৎ ঘটি এখনও বাঙ্গলায় অপ্রাপ্য নহে। বাঙ্গলায় প্রস্তরের অভাবে মাটির গঠনের কার্য্য শীঘ্রই সভ্য সমাজের আবশ্যক অনুরূপ হইয়া উঠে। সম্প্রতি ধাতু পাত্র, কাচ ও অন্যান্য আপাত-মনোরম আধার মধ্যযুগের সুন্দর মৃৎপাত্রকে অপসারিত করিয়াছে; এখনও মুর্শিদাবাদে কাঠালিয়া প্রভৃতি স্থানে মাটির বাসনে যে সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় তাহা দেখিবার মত চাকের বা হাতের কায়দায় এখনও খুলনা দিনাজপুর ও অন্যত্র যে সমস্ত মাটির পাত্র গঠিত হইতেছে, তাহা অন্যদেশের অনুকরণ যোগ্য। বর্দ্ধমানের কয়েক স্থানে যে প্রকাণ্ড জালা (হাঁড়া) এখনও প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিয়া লোকে অবাক্ হইবে। পূর্ব্বে এগুলি আরও উত্তম হইত; কারণ অবস্থাপন্ন লোকে এখন স্থায়ী ধাতু পাত্রের পক্ষপাতী। এক শত বর্ষ পূর্ব্বের নির্ম্মিত এক হাঁড়া দেখিতেছি, বাজাইলে ধাতু পাত্রের মত শব্দ হয়। ঘৃতের সুন্দর কলসী বা মুড়ী রাখিবার যে সুন্দর হাঁড়ি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং দেখিয়াছি সে জাতীয় দ্রব্য আর এখন প্রস্তুত হয় না। এখন কয়েক স্থানে চায়ের উপকরণ কাপ, কেটলি, ডিস্ নির্ম্মিত হইতেছে; কিন্তু উন্নতির আশা নাই। মুসলমান অধিকারে রঙ্গ দেওয়া হাঁড়ি বা কলসীর প্রচলন ছিল। মীনা করা পাত্র ইটের টালি প্রভৃতির নিদর্শন গৌড় অঞ্চলে আছে; এখনও চীনা মাটির অনুকরণে নির্ম্মিত পাত্র মুর্শিদাবাদ, খুলনা দিনাজপুরে মিলে। ভারতের অন্যত্র মাটির কার্য্যের উন্নতি অধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু হাঁড়ি কলসীর গঠন সৌষ্ঠবে বাঙ্গালা বোধ হয় শীর্ষ স্থানীয়। মুর্শিদাবাদ ও অন্য কয়েক স্থানে বিদরীর ফরসীর অনুকরণে কালো মাটির সুন্দর ফরসীও বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস রচয়িতা বার্ড উড

মহোদয় এদেশের কুম্ভকারের নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-দান শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রতিমা নির্ম্মাণ বিষয়ে বাঙ্গালী কুম্ভকারের নৈপুণ্য বর্ত্তমান যুগে বাড়িয়াছে। প্রাচীন কালের দুর্গা ও অন্য প্রতিমা না দেখিলেও ৫০ বৎসর পূর্ব্বের প্রতিমার সহিত নদীয়া ও পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের বর্ত্তমানে নির্ম্মিত প্রতিমার তুলনায় এই নির্ম্মাণ কৌশল কতটা বাড়িয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। নদীয়া ও কৃষ্ণনগরের এবং তাহাদের দেখাদেখি অন্যস্থানের কুম্ভকারেরা যে সমস্ত সুন্দর পুতুল, জীব জন্তু ও খেলানা নির্ম্মাণ করিতেছে, মুসলমান অধিকারের শিল্পীরা তাহার কল্পনাও করিতে পারে নাই। ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কুম্ভকারও মধ্যযুগের নির্ম্মাণ প্রণালীই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের ধাতু ও প্রস্তরের আদর্শ দেখিয়া আমাদের কুম্ভকার মাটির শিল্পে অন্যের গুরু স্থানীয় হইয়াছে। প্রতিমা এবং ছাব নির্ম্মাণে নদীয়ার রামলাল পাল ও অন্য শিল্পে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর যদুপালের নাম ইতিহাসে অঙ্কিত থাকা উচিত।

কাঠের কাজ। প্রাচীন হিন্দুযুগের সূত্রধর রথাদি নির্ম্মাণেই কৃতী ছিলেন এমন নহে; অনেকের মতে 'সূত' (সূত্রধর জাতিই সারথির কার্য্য করিত। তাহা হইলে তাহারা কেবল বাঁস বাটালির সঙ্গেই পরিচিত ছিল না; অস্ত্রের সহিত যোদ্ধাগণের গলদেশেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ছিল বাঙ্গলায় শেষ দিকে ক্ষত্রিয় জাতিরই অভাব হওয়ায় ছুতারের সম্বন্ধে অস্ত্র হাত পা ছাড়াইয়া গলায় উঠিবার চিন্তা ছিল না। বৃহৎ সংহিতা ও শিল্প শাস্ত্রে গাছ কাটিবার ও কাঠ পাকাইয়া লইবার এবং কোন্ কোন্ স্থানে জন্মান কি প্রকারের গাছে খাট নির্ম্মাণ করা ভাল হয় তাহাও লিখিত আছে। প্রাচীন বাঙ্গলার সূত্রধর নানাশ্রেণীর সিংহাসন বা খট্টা নির্ম্মাণের সুবিধা পাইয়াছিল কি না, তাহা নির্দ্ধারণ

করিবার উপায় দেখি না। তক্তপোষ মুসলমান অধিকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহা নিশ্চয়। কবিকঙ্কণ-নির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বলা দাসীর খাট বিছাইবার কথায় দেখা গিয়াছে, ধনবানেরও ভাল ছাপর খাট ছিল না; চৌকী বহুকালের জিনিস বটে। শাল কাঁঠাল জাম প্রভৃতি কাঠের চৌকী ও সিন্দুক, পিঁড়ি প্রভৃতি গার্হস্থ্য উপকরণ, ইহাতেই সেকালের বাঙ্গালী ছুতারের কৃতিত্ব আবদ্ধ ছিল। লোহার কব্‌জা প্রভৃতির ত কথাই নাই। পল্লী-গ্রামে হাঁসকল, হুম্‌নী অতি অল্পকাল চলিত হইয়াছে। সাধারণ প্রচলিত 'আলের কপাট' ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। এই কপাটের নীচে উপরে দুই দিকের কোণে একটা শূলের মত বাড়াইয়া লইয়া তাহাই উপরের দেওয়ালে এবং নীচের তলগড়ে বসাইয়া দেওয়া হইত; এখন-কার মত চৌকাঠের আবশ্যক ছিল না। এই কপাট প্রাচীন বঙ্গের কপাটের আদর্শ মনে করা যাইতে পারে; পরে বাতাবন্দি, পায়রা-খোপি প্রভৃতি কপাটে ছুতারের কারিগরী বাহির হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের মাটির ঘরে কাঠে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য একালে যাহা দেখা যায় তাহা মন্দ বলা যায় না। মগধের সূত্রধর পুরাকালেও তক্ষণ কার্য্যে নিপুণ ছিল; প্রতিবেশী বাঙ্গালী কি একবারেই অজ্ঞ ছিল! পাটলিপুত্রের সম্রাট্ এবং রাজদরবারের রাজন্য বর্গের উৎসাহে সেখানে কিছু অধিক উন্নতি সম্ভব। বাঙ্গলার সূত্রধরের কোন কোন পরিবার প্রস্তরে ভাস্করের কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, জাতীয় ব্যবসায়ে কিছুই করে নাই ইহাও বলা যায় না। বাঙ্গলার জল বায়ু কাষ্ঠখানকে 'যুগ পরিমাণ' রাখেনা, নতুবা প্রাচীন নমুনা দেখা যাইত। ১১৭২ সালের নির্ম্মিত পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার কড়ির প্রান্তে ক্ষোদিত যে হাতিশুঁড়া ও বাঘের মুখ দেখিয়াছি, একালে কোন বাঙ্গালী ছুতারকে আর তত সুন্দর প্রস্তুত করিতে দেখি না। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের নির্ম্মিত এক মাটির চণ্ডীমণ্ডপের

চারিটী কাঁঠালের খুঁটি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখনও স্পষ্ট মনে আছে, তাহার উপরে ক্ষোদিত অদ্ভুত কারুকার্য্য এদেশে আর দেখা যায় না। নেপাল ও মুঙ্গেরে এখনও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য হয়; শিশুকাঠে পশ্চিমে মিস্ত্রী সুন্দর লতা পাতা ফুল ফলায়; দক্ষিণ অঞ্চলেও কাঠের কাজের উন্নত আছে। সাদাসিধে নকল চেয়ার আলমারীতেই এখন বাঙ্গালী ছুতারের বিদ্যা সীমাবদ্ধ। নৌকা নির্ম্মাণে অবশ্য বাঙ্গালী সূত্রধর বহুকাল হইতে সিদ্ধহস্ত; পূর্ব্বকালে বড় বড় জাহাজ যাহাদের হাতে জন্মাইত, তাহাদের বংশধরেরা পরে ময়ূরপঙ্খী বজরা, পান্‌সী, ছিপ নির্ম্মাণে কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছে। মুসলমান অধিকারে নানা জাতীয় সুন্দর বজরা নির্ম্মিত হইয়াছে; উৎসাহ অভাবে এ শিল্পও এখন মৃত-প্রায়। ৬ বৈঠার ছিপ, দশ ঘোড়ার বল ষ্টীমারের নিকট পরাভূত। ডিঙ্গী এখন নদীকূলের অভাব পূরণ করে। বেহালা, তানপুরা প্রভৃতি সঙ্গীতের যন্ত্র এদেশের মিস্ত্রীতে পূর্ব্বে প্রস্তুত করিত, এখনও করে; একালে অন্যদেশের আদর্শে এই সকল দ্রব্য এবং নানাপ্রকার কাঠের খেলানা নির্ম্মাণে দেশীয় কারিগর কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

লোহার কাজ। গৃহকার্য্যের উপকরণ দা, বঁটি, কাস্তে, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি এবং কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ফাল, কোদাল, বিদে, নিড়ানী ইত্যাদি দ্রব্য বাঙ্গলায় অন্য স্থান অপেক্ষা ভালই হইত। সে কালে দেশে লোহার সচ্ছলতা না থাকিলেও বাঙ্গালী কর্ম্মকার বহুকাল হইতে সাধারণ লোহা ইস্পাতের কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া আসিয়াছে। বলি-দানের ব্যবস্থাটা শাক্ত বঙ্গে বিশেষ প্রচলিত হওয়ায় খাঁড়া, বগি, রাম দা প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট পা'ন দেওয়ায় তাহারা সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল। তলোয়ার টাঙ্গা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের বেলায় ততটা বলা চলে না; লোহার হাঁড়ি কলস বাঙ্গলায় চলে নাই। বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ কামার পাড়া

ও অন্যান্য স্থানের এবং মালদহের কর্ম্মকারেরাই খাঁড়া দা ছুরি প্রভৃতি গঠনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বনপাশে পূর্ব্বে বন্দুক, তরবারি, এমন কি বর্ম্মও প্রস্তুত হইত; এখন সে কাল গিয়াছে। ইস্পাতের পা'নে সিদ্ধহস্ত সেই কর্ম্মকার বংশের লোকে এখন সোণার গহনায় পা'ন দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার বিদ্যা শিখিয়াছে। রঙ্গপুরের খাঁড়া ও দিনাজপুরের জাঁতি কোন্ যুগের?

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের ইস্পাত পাশ্চাত্য সভ্যজগতে সমাদর লাভ করিয়াছিল। বার্ডউড্ প্রমাণ দিয়াছেন যে ডামাস্কসের প্রসিদ্ধ তরবারি ভারত-জাত ইস্পাতে প্রস্তুত হইত; ভারতে নির্ম্মিত তরবারি পারস্য ও তুরস্কে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আরও প্রাচীনে গ্রীকদিগের ভারতের ইস্পাত ব্যবহার করার কথা উল্লেখ আছে। তীর, ধনুক, বর্শা, গদা, টাঙ্গি, তরবারি নির্ম্মাণের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি জানা ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রের নালিকাস্ত্র জিনিষটা কি, তাহা আর নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই; তবে কামান বন্দুক ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পরে ভারতবর্ষেও যে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান। মধ্যযুগে বাঙ্গালী কর্ম্মকার জনার্দ্দন, জন্মেজয়, বিশ্বম্ভর, জাহান্ কোষা দল-মাদল, কালেখাঁ ফতে খাঁ প্রভৃতি যে সকল কামান নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা এখন লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। দিল্লার সুপ্রসিদ্ধ লৌহ-স্তম্ভ যে হিন্দু কর্ম্মকারের অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান সেই শিল্পীর উত্তরাধিকারীরা বাঙ্গলায় যে বার হাত কামান ঢালিয়াছে তাহার লৌহ যেন এখনও নূতন। বাঙ্গালী মিস্ত্রী পিত্তলের কামানও সুন্দর গঠিত করিয়াছে। তরবারি, গুপ্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র এখন জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যেই ভাল হয়, সেখানে ব্যবহার আছে। মধ্যযুগে এদেশেও তলোয়ার হইত।

কাঁসা পিত্তলের দ্রব্য আবহমান কাল প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গালী কাঁসারি যে পূর্ব্বে এ কার্য্যে সুদক্ষ ছিল তাহা বলা যায় না। আচার আচরণ ঘসা মাজার নিমিত্ত সাদা ধরণের পিতল কাঁসার দ্রব্যই হিন্দু গৃহস্থের পছন্দ ছিল; যাহা এঁটো হবে না বা ঠাকুর ঘরে লাগিবে, তাহাতেই কারিগরী দেখান হইত। এই কারণেই কাশী প্রভৃতি তীর্থ-স্থানের পাত্র লতা, ফুল, দেব-মূর্ত্তি প্রভৃতি সাজ পাইয়াছে। মসলমান অধিকারে মালদহে ও ঢাকায়, পরে মুর্শিদাবাদে ও বর্দ্ধমানের দাঁইহাটে কাঁসা পিত্তলের বাসন নির্ম্মাণের উন্নতি হইয়াছিল। খাগড়ার উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন সেকালে জন্মগ্রহণ করে নাই। আমরা যে প্রাচীন গলা-তোলা কাঁসার ফেরুয়া (ঘটি) দেখিয়াছি, তাহার কাঁসা ভাল হইতে পারে, গঠন সৌষ্ঠব দেখিলে এখন লোকে হাসিবে। সেই জাতীয় আ-গড়া কাঁসার তেলের ভাঁড় এখনও দুষ্প্রাপ্য নহে। কালাই করা তামার ডেকচি মুসলমান অধিকারেই পলান্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কোষা, কুশী, তাম্রকুণ্ডেই বাঙ্গালী শিল্পীর তামার বাসনে বিদ্যা প্রকাশ সীমাবদ্ধ ছিল; তাহাও পশ্চিমে ভাল হইত, এখনও হয়। খাগড়াই বা অন্যস্থানের কাঁসার বর্ত্তমান সুন্দর গঠন, একালের বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণে জন্মিয়াছে। কাঁসা পিতলের পাত্রে কারুকার্য্য ভারতের অন্য প্রদেশে যথেষ্ট দেখান হইতেছে। মোগল অধিকারে উৎসাহ প্রাপ্ত দিল্লী ও মুরাদাবাদ অঞ্চলের বিদরীর কার্য্য মুর্শিদাবাদে নকল হইয়া এক কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু দস্তার দ্রব্য নির্ম্মাণ বাঙ্গলায় তত ভাল হয় নাই।

বয়ন শিল্পে বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারত-জাত কার্পাস বস্ত্র গ্রীস রোমে সমাদর লাভ করিয়াছিল, একথা অনেকেই জানেন। রোমক সাম্রাজ্যের

সৌভাগ্যের সময়ে বাঙ্গলায় বস্ত্র-শিল্প কি প্রকারে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মসলিন্ নামের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলিতে চান যে, ইংরেজ বণিকেরা প্রথমে মসলীপত্তন হইতে এই জাতীয় কার্পাস বস্ত্র লইয়া যান বলিয়া ইহার মসলীন নাম হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মতে তুরস্কের সেকালের রাজধানী মোসুল নগরে এই জাতীয় বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়া ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল; পরে সেখানেও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বয়নের উদ্যম হয়। প্রাচীনকালের অবস্থা যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গলার বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র যে দেশ বিদেশে খ্যাত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস রচয়িতা ঐ অঞ্চলের নানা প্রকারের মলমল কাপড়ের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল। (৩)

(১) ঝুনা (হিন্দী ঝিনা = সূক্ষ্ম); ইহা মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম। কোন ইউরোপীয় লেখক ইহা দেবলোকের পরীর কোমল করের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ প্রস্থ ১ গজ ওজন ৮½ আউন্স মাত্র। ধনবান বিলাসী ব্যক্তির অন্তঃপুরে এবং নর্ত্তকী গায়িকা গৃহেই ইহার আশ্রয়। পূর্ব্বকালে এই জাতীয় এত সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত কিনা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। তবে ঢাকাই সূক্ষ্ম মলমলের শ্রেণীর বস্ত্র পরিধান বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজিকাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল এরূপ উল্লেখ আছে।

(২) রং—ইহা প্রায় ঝুনা মসলিনের মত; ইহাকে দ্বিতীয়

(৩) History of the Cotton manfacture of Dacca District. এই পুস্তক হইতে ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দেখিয়াছি।

শ্রেণীর ঝুনা বলা যাইতে পারে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজন উহারই ন্যায়। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১২০০ (প্রতান = টানা; টানার সংখ্যা গণনাই নিয়ম)

(৩) সরকার আলি—নবাবী আমলে সরকার আলি নামে যে জায়গীর নবাবের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার আয়ের টাকা হইতে বাদশা ও নবাবের পরিবারে ব্যবহারের জন্য ইহা ক্রীত হইত বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। প্রতি বর্ষে বহু পরিমাণ মলমল সরকারে প্রয়োজন হইত এবং ইহাতে বহু লোকের অন্ন সংস্থান ছিল।

(৪) খাসা—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মলমল। পারসী কথাকে বিকৃত করিয়া ইংরাজীতে ইহাকে cassah লেখায় অনেকে শেষে 'কসাক' মনে করিয়া লইয়াছেন। সোণার গাঁ অঞ্চল মোগল আমলে উৎকৃষ্ট খাসা মলমলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (৪)। উৎকৃষ্ট খাসাকে 'জঙ্গল খাসা' নাম দেওয়া হইয়াছিল। দৈর্ঘ্য ২০ গজ প্রস্থ ১ হইতে ১৷৹ গজ; ওজন ১০½ হইতে ২১ আউন্স। প্রতান ১৪০০ হইতে ২৮০০।

(৫) সব-নম্—এই জাতীয় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রকে ইংরেজ কবি 'a web of woven wind (বায়ুতে বোনা জাল) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পারসী ভাষায় ইহা evening dew (সান্ধ্য শিশির) নামে কথিত। ঘাসের উপর পাতিয়া দিলে শিশির সিক্ত দুর্ব্বাদল বলিয়া ভ্রম হইত। কথিত আছে যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ একদিন পরীক্ষাস্থলে একখানি সবনম্ মলমল ঘাসের উপর পাতিয়া রাখাইয়াছিলেন; একটি গরু ঘাস খাইতে খাইতে ঐ বস্ত্র খণ্ডও খাইয়া ফেলে (৫)।

(৬) আব্ রোয়ান্ (আব্—জল; রোয়ান্—প্রবাহ) নির্ম্মল জলপ্রবাহের মত স্বচ্ছ। উৎকৃষ্ট আব্ রোয়ান জলে কাচিয়া ফেলিলে

(৪) Ain-i-Akbari; Sunargaon—in this Sircar is fabricated cloth called cassah—Gladwin.

(৫) Bolt's Considerations of Indian affairs. Page 206;

কাপড় আছে বলিয়া বুঝা যাইত না। কথিত আছে, আরঙ্গজেবের এক কন্যা এই জাতীয় বস্ত্র পরিয়া পিতার নিকট যাওয়ায় সম্রাট তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া ভর্ৎসনা করেন। কন্যা উত্তর করিলেন "তবু আমি সাত পুরু কাপড় পরিয়াছি (৬)।

(৭) আলবাল্লে—অতি উৎকৃষ্ট। ডাক্তার ভিন্সেণ্ট ইহাকে abollai নাম দিয়া গ্রীক্ সাটিন হইতে ইহার ব্যুৎপত্তির সন্ধান করিয়াছেন (৭)। দৈর্ঘ্য ২০ গজ প্রস্থ ১ গজ; ওজন ৯৸০ হইতে ১৭ আউন্স। প্রতান সূত্র ১১ শত হইতে ১৯ শত।

(৮) তঞ্জেব্ (পারসী তন্—শরীর; জেব্—অলঙ্কার)। তাঞ্জাব মলমল কথা এখনও অনেকে ব্যবহার করে। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১০ হইতে ১৮ আউন্স. প্রতান সূত্র—১৯০০।

(৯) তুরন্দাম্ (তুরা—রকম; উন্দাম্—শরীর)—অঙ্গ-রক্ষক অর্থে ব্যবহৃত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১৫ হইতে ২৭ আউন্স। প্রতান সূত্র ১ হাজার হইতে ২° শত।

(১০) নয়ন সুখ (আইন্ আকবরী—তন্-সুক)—ইহা সাধারণ মলমল। আবুল্ ফজল সেকালে ইহার মূল্য ৪৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ প্রস্থ ১৷৷ গজ— প্রতান সূত্র ২২ শত হইতে ২৭ শত।

(১১) বদন-খাস্—ইহার সুতাগুলি নয়ন সুখের মত অধিক ঘন নহে। দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ ১৷৷ গজ; ওজন ১২ আউন্স, প্রতান সূত্র সংখ্যা ২২ শত।

(১২) সরবন্দ (শির-বন্ধ)—মাথার পাগড়ীর জন্যই ইহা ব্যবহৃত

(৬) Bolt's considerations.

(৭) Sequel to Periplus of the Erythrean Sea.

হইত। দৈর্ঘ্য ২০ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ অর্দ্ধ গজ হইতে এক গজ; ওজন ১২ আউন্স। প্রতান সূত্র ২১ শত।

(১৩) সরবতি (কুণ্ডলী করিয়া জড়ান)—ইহাও পাগড়ীর জন্য প্রস্তুত হইত। সরবন্দের মত।

(১৪) কামস্ (আরবী, কুমিস্=শার্ট)—এখনও কামিজ নামেই শার্ট জামা কথিত হয়। এইরূপ বস্ত্র পূর্ব্বে কোর্ত্তার জন্য প্রস্তুত হইত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১০ আউন্স প্রতান-সূত্র ১৪ শত।

(১৫) ডুরিয়া—দুই প্রকারের সূতা পাকাইয়া ইহার টানা করা হয়। বুনানো হইলে ডুরিয়ার ন্যায় দেখায়। ডুরিয়া মসলিনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের (বেঙ্গা প্রভৃতি) তুলার প্রয়োজন। ডুরিয়া নানা প্রকারের। রাজকোট, পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, ডাকান, কাগজাহা, কলাপাত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ হইতে ১৷৷ গজ।

(১৬) চারখানা—ইহা ডুরিয়ার মত। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের সূতা দ্বারা নির্ম্মিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ডুরিয়ার মত। ডুরিয়া ও চার খানার 'ডোরা' গুলির আয়তন অবশ্য এক প্রকারের নহে। চারখানা ছয় প্রকার; নন্দন শাহী, আনার দানা, সাকুতা, কবুতর খোপা, বাহাদার, কুণ্ডিদার।

(১৭) জামদানী—ঢাকা অঞ্চলের ফুল তোলা জামদানী বস্ত্রের নাম অনেকে জানেন। তাঁতেই ফুলতোলা এবং অন্যান্য কারুকার্য্য হইয়া থাকে। কাপড় বুনিবার সময়েই তন্তুবায়েরা বাঁশের সূচের সাহায্যে টানার সূতার সংে যথাস্থানে ফুলের সূতা বসাইয়া দেয়। সোজা, বাঁকা সকল দিকেই ফুলের সারি দেওয়া হইতে পারে। বাঁকা

সারির নাম তেড়ছা। স্থানে স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ফুল বসান হইলে তাহাকে বুটাদার বলে। মোগল আমলে জামদানী বস্ত্রের অধিক প্রচলন হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব্ এক এক খানি জামদানী ২৫০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতেন বলিয়া কথিত আছে। তখনকার টাকার মূল্য একালের টাকা অপেক্ষা অনেক অধিক। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ উৎকৃষ্ট জামদানী বস্ত্রের এক এক খানির মূল্য ৪৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট জামদানী প্রস্তুত করিবার খরচাও অনেক বেশী পড়িত। জামদানী সাধারণতঃ ১৭ শত শানায় বোনা হইত। জামদানী নানা প্রকারের ছিল; তন্মধ্যে তোড়াদার, বুটিদার, তেরছা, কারেলা, জলবার, পান্না হাজার, ডুবলি জাল, মেল, ছাওয়াল, বালেয়ার গেদা, ডুরিয়া, সাবুরগা ইত্যাদি প্রধান।

ঢাকার বিবরণ লেখক টেলর সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ২৬ প্রকার মসলীন দেখিয়াছিলেন। উপরি লিখিত ঢাকাই কাপড় গুলির সূত্র নির্ম্মাণে কৌশলের সহিত কত সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় জড়িত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে একখানি ১৫ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া সূক্ষ্ম মসলীন ৯০০ গ্রেণ (অর্দ্ধ ছটাক মাত্র) ওজন হইয়াছিল। এরূপ বস্ত্র চারিশত টাকায় বিক্রীত হইত। ১৮৪০ সালে টেলর সাহেব লিখিয়াছেন যে তখন ঐ মাপের কাপড় আর ১৬ শত গ্রেণের কম ওজনের হয় না। মূল্য একশত হইতে দেড়শত টাকা; শত বর্ষের মধ্যেই অর্থশালী ক্রেতার অভাবে এই অবনতি। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, টাকুতে সূক্ষ্ম সূতা কাটায় বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ কন্যা সিদ্ধহস্ত; শান্তিপুর অঞ্চলেও অনেকে 'সরু কাটনা' কাটিতে পারিত। একালে ঢাকা অঞ্চলে দুই এক জন মাত্র সরু সূতা করিতে পারে; ভাল আঁশের কাপাস ও

মিলে না। লোকে অল্পব্যয়ে সরু বিলাতীতে বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে; বহু যত্নের নকল বিলাতী আবরোঁয়া বা আদ্ধি এখন মসলীনের স্থলাভিষিক্ত। প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্রের প্রসিদ্ধি থাকিলেও ঢাকায় মোগল নবাবদের উৎসাহেই মসলীনের চরম উন্নতি, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বড় লোকের বিলাসেই শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। দিল্লীর বাদশা দরবার আবরোঁয়ার উন্নতি সাধনে প্রধান সহায়। সেই উৎসাহের বলে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী তন্তুবায় দেশী তাঁতে যে কারিগরী দেখাইয়াছে, তাঁতের ঝাঁপে এখনও যেরূপ ফুল তুলিয়া আসিতেছে, তাহা জগতের অন্য জাতির অনুকরণ যোগ্য। গড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সব্নাম বা আবরোঁয়া পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চ স্তরে বঙ্গীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। সেকালে দেশের সর্ব্বত্র সরু মোটা দেশী কাপড় বুনিয়া তাঁত ঘরে ভদ্রলোকের বৈঠক বসাইয়া, আস্তে সুস্থে দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া বাঙ্গালী তন্তুবায় নিরীহ লোকের অগ্রণী হইয়াছে। ভাল মানুষ বলিয়াই ঐ জাতিতে বুদ্ধির অভাব কল্পিত হইয়াছে; শিল্প কলার এই অদ্ভুত বুদ্ধি গণনায় আসে নাই!

সাধারণ সরু মোটা কাপড় ব্যতীত দোসুতী, শতরঞ্চি, সুসী নিমজা, চারখানা প্রভৃতিও বাঙ্গলায় উত্তম প্রস্তুত হয়। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে মধ্যযুগে রেসমী কাপড়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইউরোপীয় বণিকদল রেসমের ব্যবসায়ের লোভেই কাশিমবাজার সৈদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে কুঠী স্থাপন করে। তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া মধ্যবঙ্গের রেসম সূত্র ও রেসমী কাপড়ের সমধিক প্রতিষ্ঠা ছিল। রঙ্গীন রেসমী ও সূতী কাপড় মুসলমান অধিকারেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে; রঙ্গরেজ নামে এক সম্প্রদায় রঙ্গ ব্যবসায়ী মুসলমান এখনও মুর্শিদাবাদ

প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। স্বাভাবিক রঙ্গের রেসমী কাপড়ের নাম কোরা; ক্ষারী করা বা ধোয়া হইলে তার নাম হয় গরদ। এইরূপ পট্ট বস্ত্রই প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে; বিবাহাদি কার্য্যের জন্য ও মহিলা গণের নিমিত্ত লাল, জরদা, ধূপছায়া, ময়ূরকণ্ঠি ও অন্য রঙ্গের কাপড় তৈয়ারী করা হয়। রেসমের হাত ঝাড়া বা যে সমস্ত কোয়া হইতে পোকা কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে তাহার সূতায় যে কাপড় হয় তাহার নাম মটকা। সূতা মিশান দিয়া বুনিলে 'বাফ্‌তা' হয়। গর্ভসূতী, আসমানি প্রভৃতি মিশান কাপড়ও আছে। বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি স্থানের তসর, ক্ষৌম বা নেত বস্ত্র নামে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল। 'এঁড়ি' আসাম হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসে। এখন তসরের ছাট্ কেটে আদর পাইতেছে। রেসম, তসর, তুলা তিন প্রকার বস্ত্র বয়নে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব থাকিলেও জড়িদার বা বুটাদার বস্ত্রে দিল্লী অথবা কাশীর শিল্পীর সহিত এ দেশীয় শিল্পীর কোন কালে তুলনা হয় নাই। বেনারশী শাটী সুদীর্ঘ কাল ভারত প্রসিদ্ধ; পশ্চিমের মত জড়িদার বস্ত্র কোথাও হয় না। কিন্তু সাদা সিধে ফুলে ঢাকাই, শান্তিপুরে প্রভৃতি সুতী ও মুর্শিদাবাদী রেসমী পরাস্ত হয় নাই। সূচের কার্য্যে বঙ্গের খ্যাতি ছিল। সূতার মত রেসমী বস্ত্রাদিতেও বাঙ্গালী এখন পশ্চাতে পড়িতেছে। জাপানী ও ইউরোপীয় আপাত-মোহন সাদা 'সিল্ক' একালে সজোরে সস্তাদরে স্বীয় সৌষ্টব সন্দর্শন করাইতেছে। লাহোর ও বোম্বাই প্রদেশের মহীশূর প্রভৃতি স্থানেও রেসমী শিল্পের উন্নতি আছে; তাহাদের বিবরণ এ পুস্তকের বিষয় নহে।

ভূষণ। অশন বসনের বেলায় বঙ্গবাসী যে ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, ভূষণের বেলায় আর ততটা বলা চলে না। প্রথম কথা, বাঙ্গলার মাটি প্রথম দুইটি উপকরণেরই অনুকূল। কাব্য কলায় 'সোণায়' বাঙ্গলা

বলিলেই যে সোণা রূপার খনি এ দেশে সুলভ হইবে, এমন কোন কথা নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে মানব সমাজে অলঙ্কারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল; তাই লতা পাতা ফুল ফলের হার বালা হইতে জড়োয়া গহনা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ভূষণ এখনও সভ্য অসভ্য নর নারীর কাল্পনিক সৌন্দর্য্য বিধানে নিয়োজিত। পাখীর পালক মৃত জন্তুর হাড়, কাঁড় পলা প্রভৃতি কত শত ছাই ভস্ম রমণীর অলঙ্কারের আসন গ্রহণ করিয়াছে। ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লোহা পিতল সোণা রূপা পর পর দেশীয় রমণীর সাধ পূর্ণ করিয়াছে। প্রাচীন বলিয়াই হাতের লোহা এয়োস্ত্রী চিহ্ন। বৈদিক যুগে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার ছিল; পৌরাণিকে সোণা মাণিক আছে, অমর কোষ নানা অলঙ্কারের নাম দিতেছে, কিন্নরা রাক্ষসীও কবির কথায় নানালঙ্কার ভূষিতা; মধ্যযুগের বাঙ্গালা কাব্যের বর্ণনায়ও সোণা রূপার ছড়াছড়ি আছে, দেখা গেল। কিন্তু বাস্তবিক পল্লীর দরিদ্রা বঙ্গনারীর পক্ষে সে সব "শ্রুতৌ স্মৃতঃ" মতই ছিল; অবস্থা বিশেষে কাঁসা পিতল হইতে রূপা পর্য্যন্ত উঠিত। একালের বাঙ্গলায় ক্রমে উঠিয়া গেলেও প্রতিবেশিনী 'পশ্চিমা' রূপসার হাতে পায়ে দশ পনের সের কাঁসা পিতলের তথা-কথিত অলঙ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বঙ্গপল্লীর অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিগের নধর বপুর শোভা সেকালের ভূষণ কল্পনা করিয়া লইতে পারি। আমরাই বাল্যে যে গোটা এবং বাঁকমল ও গুজরী, পঞ্চম, হাঁসুলী ও গোট, পঁইছে, খাড়ু, কঙ্কণ প্রভৃতি মোটা মোটা রূপার গহনা এবং ছয় অঙ্গুলি ব্যাস যুক্ত সোণার নথ ও বেসর ঝুমকো ঢেঁড়ি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার কারিগর একালে বর্ত্তমান থাকলে কি পুরস্কার লাভ করিত সেকথা নাই ভাবিলাম; কিন্তু সেই সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া উল্কী শোভিত

কপালের উর্দ্ধদেশে সিন্দুরের ঘটার সাজন দিয়া, দাঁতে মিসি, কাজলে নয়ন উজ্জল করিয়া স্বয়ং রম্ভাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেও একালের যুবক দল যে চমকাইয়া উঠিবেন, তাহা হলফান্ বলা যাইতে পারে। সেকালের বঙ্গপল্লীতে কাঁসারি খাড়ুগড়া ও রূপার মল বালা হাঁসুলী, ক্বচিৎ কঙ্কণ নির্ম্মাতা তথাকথিত স্বর্ণকার শিল্পকুশলতা দেখাইবার অবকাশ পাইত। নগরে ‘কল ধৌত কণ্ঠমালা’ বা ‘সতেশ্বরী’ হারের অবকাশ ছিল এবং ব্যবসায়ী ধনাঢ্য লোক ধনপতির মত বাটী ফিরিয়া মানিনী গৃহিণীকে ‘পাঁচ পল সোনা’ দিতে পারিত। কিন্তু ধনবানের দেখাদেখি ধার করিয়াও কাণে সোনা পরা প্রাচীন বঙ্গের রীতি ছিল না। তাই বসন ভূষণে বিলাস মোগল অধিকারের পূর্ব্বে এ দেশের গ্রাম্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; এবং উৎসাহ অভাবে সোণাদানার শিল্প-কর্ম্ম মৃতপ্রায় ছিল অবশ্য দক্ষতর গ্রাম্য শিল্পিরাই নগরে গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। ‘আমরা যাব গৌড়, আন্‌ব সোণার মৌর’ ছেলে ভুলানো গানে ছিল; কাব্যের সাধু সোণার খাঁচা আনিতে কষ্ট করিয়া গৌড়ে গিয়াছিল, হোসেন শার সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহারের কথা প্রবাদমূলক ইতিহাস সমর্থন করে। গৌড়ের কথা যাহাই হউক, ঢাকার রূপার কাযে কারিগড়ী যে পরবর্ত্তী কালের ইহা নিশ্চয়। ঢাকাই শাঁখার শিল্পও আধুনিক; ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও পূর্ব্ব-বঙ্গে হাতযোড়া গালা লাগান রঙ্গীন শাঁখার চল ছিল। সোণা জড়ান শাঁখা বা সোণায় ঢাকা লোহা একালের সৃষ্টি। মীনা করা বা গিল্‌টি ধাতুর গহনাও সেকালে ছিল না বলাই বাহুল্য। প্রকৃতির কৃপায় ‘পুষ্পকলে সমৃদ্ধে’ বঙ্গে কোন কালেই ফুল সাজের অভাব হয় নাই। রাজার বাড়ীর ফুল যোগান ‘হীরা’ মালিনীই যে কেবল মালা গাঁথায় বাহাদুরী দেখাইয়াছে তাহা নহে। গৃহস্থ কন্যাও বেল যুই বকুল সাজে

সিদ্ধহস্ত ছিল, বড় কায কর্ম্মে মালীর সাহায্য আবশ্যক হইত। এখন ‘তিলি, মালী, তামুলী’ ডাক নাম মাত্র শুনা যায়। মালাকার জাতি পশ্চিম বঙ্গে প্রায় দেখা যায় না; তমোলুকে দু দশ ঘর আছে। তাহারাও ফুল মালার কাজ করে না; সহর বাজারে নানা শ্রেণীর লোক এখন একার্য্যে নিয়োজিত।

চিত্র বিদ্যায়ও মুসলমান অধিকারে বাঙ্গলার শিল্পী পশ্চাৎপদ ছিল। বৌদ্ধাধিকারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চিত্র বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইলেও বাঙ্গলায় উহার চিহ্ন দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কালে প্রতিমাদির চাল চিত্রে বা পট নির্ম্মাণে যে টুকু কৃতিত্ব হইয়াছিল, অনুমিত হয়, মুসলমান রাজের উৎসাহের অভাবে তাহাও পাথর চাপা পড়িয়াছিল। বিজেতা পাঠান বিশ্বাস করিত যে, চিত্র বিদ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী; এখনও প্রাণী চিত্রে অনেক মুসলমানের আপত্তি আছে। সেকালের হিন্দু ভূস্বামীবর্গেরও যে ইহাতে বেশ অনুরাগ ছিল এমন প্রমাণ নাই। মনস্বী আকবর বাদশার উৎসাহে দিল্লী অঞ্চলে নানা ভাবের চিত্রবিদ্যার পরিপুষ্টি হইতেছিল, তন্মধ্যে হাতির দাঁতের দ্রব্যের চিত্র প্রসিদ্ধ। রাজপুতানায় ইতিপূর্ব্বেই চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। মোগল অধিকারে পারস্য, ইটালী হইতেও চিত্রকর আনাইয়া শিখান হইত। কিন্তু সে স্রোত বাঙ্গালা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদে দুই চারিটী প্রাচীন চিত্রের যে নিদর্শন দেখা গিয়াছে, তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা সেকালের মুসলমান চিত্রকরেরই দক্ষতা সুস্পষ্ট। শেষে পটুয়া চিত্রকর নামে না হিন্দু না মুসলমান এক শ্রেণীর শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার যে মূর্ত্তি কৃষ্ণনগরে আছে, তাহা এই জাতীয় চিত্রকরের হস্তপ্রসূত; রাজা ও চামর-ধারীর মুখ এক ছাঁচেই রঙ্গান। চালচিত্রে সাধারণ চিত্রকরের নৈপুণ্য সকলেই

দেখিতেছেন ; ইহার অধিক কোন কালেই উঠে নাই। তবে নদীয়া অঞ্চলে প্রতিমার মুখ গঠনির সঙ্গে উহার চিত্রেরও উন্নতি ঘটিয়াছে। বঙ্গের চিত্রকরের খেলানা পুতুল বা রং দেওয়া পাত্রও নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পের নমুনা। রং করার কথায় বলা যাইতে পারে, নীল রঙ্গের সৃষ্টি বাঙ্গালায় না হউক, নীল গাছের চাস ও নীলের উন্নতি এখানেই হইয়াছিল ; তাহা ইউরোপীয় আগমনের পরে নহে।

মীনা ও বিদরী। কালাই ও মীনা করার পদ্ধতি মুসলমানদিগের প্রবর্ত্তিত মনে হয়। তাম্র পাত্রের কালাই করা ডেকচী প্রভৃতি পাত্র পোলাও কালিয়া রান্ধিবার উপকরণ ; হিন্দুর কার্য্যে খাঁটি তামা ভিন্ন লাগেনা। মীনার ব্যবসায়ও সহরে মুসলমানের কার্য্য ছিল। বিদরীর কার্য্যে দিল্লী অঞ্চলে শিক্ষিত মুসলমান কারিগর বাঙ্গালার সেকালের রাজধানীর শিল্পীর গুরু। মোগল অধিকারেই এই শিল্পের সমধিক উন্নতি ঘটে ; এই কারণে মুর্শিদাবাদী মুসলমান শিল্পিই এখনও বিদরীর কার্য্যে প্রসিদ্ধ ; হিন্দু সোণার তাহাদের নিকটেই শিক্ষিত। হাতীর দাঁতের কার্য্য সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। হাড়ের বা দাঁতের পাশা বাঙ্গালীর নিজস্ব হইতে পারে ; কিন্তু এখানে কারু কার্য্যের দৌড় চক্ষুদান পর্য্যন্ত। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের সুন্দর কার্য্য এ কালের।

প্রস্তর শিল্প। মধ্য বাঙ্গলায় প্রস্তরের অভাব। দূর দেশ হইতে পাথর আনাইয়া হর্ম্ম্য ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করা রাজা রাজড়ার কাজ। তাই বাঙ্গলায় প্রস্তর শিল্পের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। তথাপি পশ্চিম-বঙ্গের প্রান্তে, এবং গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা প্রভৃতি সে যুগের রাজ-ধানীতে প্রস্তর শিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নির্ম্মাণ প্রণালীর কথা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য রাখিয়া আমরা ঐ নিদর্শন গুলির উল্লেখ



ষাট গম্বুজ, বাগের হাট (খুলনা)—৩২২ পৃঃ

করিব। গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার মস্জীদ্ গুলির মধ্যে প্রাচীন হিন্দুযুগের শিল্পের নমুনা দেখা যায়। মন্দির বা হর্ম্ম্যের ক্ষোদিত প্রস্তর মস্জীদ নির্ম্মাণে লাগাইয়া দেওয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মুসলমানের রীতি হইয়াছিল। কুতব মিনার বা আল্‌তমিসের মস্জীদ্ নির্ম্মাণে হিন্দু উপকরণের যেরূপ ব্যবহার হইয়াছিল, মধ্যযুগের বাঙ্গলায় তাহার অন্যথা হয় নাই। তাই আদিনা বা সোণা মস্জীদে, বার দুয়ারি বা দখল দরজায় হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন মিলে। ফিরোজ শার মিনার পাঠান স্থাপত্য। মূল্যবান্ কাল কষ্টি পাথর সে যুগের বাঙ্গলার অনেক প্রসিদ্ধ হর্ম্ম্যে লাগান আছে; মস্জীদের খিলানে, গৃহদ্বারে, বা ভিতরে এই জাতীয় পাথর দেখা যায়। মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের প্রাচীন বাটীতে এক কাল কষ্টি পাথরের হাউজ ছিল; সম্ভবতঃ ইহা গৌড় হইতেই আনীত। কিন্তু এই সকল পাথরের কাজে বাঙ্গালী মিস্ত্রীর কতটা হাত ছিল তাহা বলা যায় না। পাঠান পদ্ধতিতে ইষ্টকে নির্ম্মিত মস্জীদ্ গৌড় ভিন্ন অন্যত্রও দেখা যায়। দুই একটির নাম করিব (১) সোণার গাঁ—গোয়াল-ডিতে হোসেন শার সময়ের পুরাণা মস্জীদ—প্রাচীন ইটের, প্রস্তরে ক্ষোদিত মিহ্‌রাব। দ্বারদেশের বেলে পাথরের স্তম্ভ হিন্দু যুগের। (২) হুগলী পাণ্ডুয়ার মিনার ও মস্জীদ্ (৩) সপ্তগ্রামে জমাল উদ্দীনের প্রাচীন মস্জিদ্ (৪) খুলনা বাগের হাটের ষাট গম্বুজ—নির্ম্মাণ প্রণালী একটু পৃথক ধরণের। (৫) ঢাকায় শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত পরি বিবির মস্জীদ। ইহা ভিন্ন দিনাজপুর গঙ্গারামপুরে (১৫ শ শতাব্দী), গোপাল গঞ্জে (বার্বেক শা—১৩৬৫) রঙ্গপুর পীর গঞ্জের হাতি-বাঁধা মস্জীদ। কস্‌বার শা জলাল মস্জীদ প্রভৃতি প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত যে সমস্ত মস্জীদ আছে, তাহার মধ্যেও সেকালের প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণ কার্য্য গাঁথনি

প্রভৃতি বাঙ্গালী মিস্ত্রীর, সন্দেহ নাই। পাঠান পদ্ধতির প্রধান স্থপতিরা পশ্চিমে মুসলমান; হিন্দু ভাস্কর মস্‌জীদের প্রস্তরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল কিনা, বলা যায় না। বরেন্দ্রে যে সকল স্তম্ভ ও প্রস্তর শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হিন্দুকালের।

হিন্দু শিল্পের পরিচয়ে পশ্চিম রাঢ় হইতে আরম্ভ করিব। বর্দ্ধমান, কাঁকসা থানায় গৌরাঙ্গপুর জঙ্গলে ইছাই ঘোষের সুবিখ্যাত দেউল—প্রাচীন ইষ্টকের। শ্যামা রূপার গড়ের বর্ত্তমান মন্দির প্রাচীনের সংস্কার। আসানসোল থানায় কল্যাণেশ্বরী বা দেবীস্থান মন্দির এবং গারুই এর প্রাচীন প্রস্তর মন্দির উল্লেখ যোগ্য। বরাকরের ও কাতরাসের প্রাচীন প্রস্তরমন্দিরের গঠন অসাধারণ ভাবের। বীরভূমির বক্রেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির বৈদ্যনাথ মন্দিরের ধরণে নির্ম্মিত। বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মাণেও বাঙ্গালীর হাত ছিল ইহা অনুমিত হয়। অনেকে ভুবনেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণেও বাঙ্গালীর অংশ চান। বিষ্ণুপুরের পাতলা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির গুলির গঠন প্রণালী ও কারুকার্য্য লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। জোড়-বাঙ্গলা মন্দিরের (১৫৭২ খৃঃ) গঠনে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব লক্ষিত হয়; মল্লেশ্বরের মন্দিরও ঐ প্রাচীন বাঙ্গলা ধরণের। বাঙ্গলা ঘরের অনুকরণে প্রাচীন বাঙ্গলার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইত; এই প্রণালী অন্যান্য প্রদেশের লোকে ও গ্রহণ করায় স্থাপত্যে বাঙ্গলা পদ্ধতির সুনাম আছে। বিষ্ণুপুরের দুর্গদ্বারও সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন। সেখানকার অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে রাসমঞ্চ মন্দির, কালাচাঁদ ও মুরলীধরের মন্দির উল্লেখ যোগ্য। ইহার সব গুলির বাহিরের ইটেই কারুকার্য্য আছে। তমোলুকের বর্গভীমার প্রাচীন মন্দির এক বৌদ্ধ বিহারের স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে, অনুমিত হয়। বাঁকুড়ায় এক্তেশ্বরের প্রস্তর মন্দিরও সুন্দর; ছাতনার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে

ষাট গম্বুজ, বাগের হাট (খুলনা)—৩২২ পৃঃ



কোতোয়ালী দরজা, (গৌড়)—৩২৪ পৃঃ

ষাট গম্বুজ, বাগের হাট (খুলনা)—৩২২ পৃঃ

তারিখ অঙ্কিত ইট পাওয়া গিয়াছে। ডায়মণ্ড হারবারে জাতের দেউল নামে মন্দিরটির নিকটে প্রাপ্ত সংস্কৃত লেখ দেখিয়া রাজা জয়ন্তচন্দ্রের (৮৯৭ শক—৯৭৫ খৃঃ) বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। খুলনা গোপাল-পুরের গোবিন্দ মন্দির প্রতাপাদিত্য নির্ম্মিত বলা হয়। গোয়ালন্দ রাজবাড়ীর চাঁদ রায়ের মঠ ষোড়শ শতাব্দীর নির্ম্মাণ প্রণালীর নমুনা। পরবর্ত্তী কালে যে সব নবরত্ন হইতে একুশ রত্ন পর্য্যন্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ধরণ অন্য প্রকার। অনেক প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টক লক্ষ্য করিবার মত; দিনাজপুর কান্তনগরে কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত ইষ্টক মন্দিরের দৃশ্য চমৎকার ছিল; ভূকম্পের পর আর সে শ্রী নাই।

ভাস্বরের কার্য্যে হিন্দুযুগে বাঙ্গালী শিল্পী যে সুদক্ষ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। উত্তর বঙ্গের ধীমান্, বীতপাল প্রভৃতি ভাস্করেরা যে ভাবে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাই তিব্বতে অনুকৃত হইয়া বৌদ্ধ প্রতিমার বিশেষত্ব রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গলার নানা স্থানে প্রস্তর মূর্ত্তি বা ভগ্নাংশ পাওয়া যাইতেছে; দুইখানি প্রতিমার সুন্দর চিত্র গ্রন্থে দেওয়া গেল। সিংহবাহিনী, চণ্ডী, সূর্য্য ও বিষ্ণু মূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ দেবতাদের মূর্ত্তি আছে। হিন্দু রাজগণের অধিকারে নির্ম্মিত শঙ্খ চক্র গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালী ভাস্করের নিপুণতা কেবল শিব লিঙ্গে ন্যস্ত থাকায় উন্নতির অবকাশ ছিল না। বর্দ্ধমান দাঁইহাটের সূত্রধর ভাস্করেরা পূর্ব্বাবধি প্রস্তর শিল্পে পটুতা দেখাইয়াছে। অল্পকাল পূর্ব্বে নবীন ভাস্করের ক্ষোদিত ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা মূর্ত্তি এবং দুইটি কৃষ্ণ মূর্ত্তি উৎকৃষ্ট প্রস্তর শিল্প বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উৎসাহ অভাবে এই শিল্প এখন মৃতপ্রায়।

ইষ্টক নির্ম্মাণে মধ্যযুগের বাঙ্গালী সমধিক নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। পালবংশের কীর্ত্তি মুর্শিদাবাদ সাগর-দিঘীর দশটি ঘাটের ভগ্নাবশেষের নীচে এবং অন্যান্য স্থানে যাহা দেখিয়াছি সেগুলি গুপ্ত যুগের বা নালন্দার পশ্চিমে বড় ইটের কনিষ্ঠ সহোদর। পরবর্ত্তী কালে গৃহাদি নির্ম্মাণে পাতলা ইট ব্যবহৃত হইত; ইহার কোন কোন গুলি লম্বা চৌড়ায় বেশী ছিল। গৌড়ের মস্‌জিদে, ইছাই ঘোষের দেউলে বা সপ্তগ্রামে ইহা দৃষ্ট হয়। কিয়ৎকাল পরে খোদকারী করা ও রং দেওয়া ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই পাতলা ইট বহুদিনের হইলেও লোণা লাগিয়া তত ক্ষয় হয় নাই, যতটা পরবর্ত্তী কালের লম্বা চৌড়া ইট হইয়াছে; প্রাচীন মুর্শিদাবাদেও এ শ্রেণীর ইষ্টক দৃষ্ট হয়। মীনা করা ইটও গৌড় প্রভৃতি স্থানে দেখা গিয়াছে। কাঁচা ইটের উপর নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করিয়া পরে পোড়াইয়া সুন্দর রং ফলান হইত। এই জাতীয় ইষ্টক গৌড় পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, বাঁকুড়া, দিনাজপুর ভূষণা, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলা হইতে সাহিত্য পরিষদের ভাণ্ডারে আনীত হইয়াছে। কোথাও দেবমূর্ত্তি কোথাও বা সন তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। ইষ্টকের গৃহাদি নির্ম্মাণে সেকালে যে মসলা ব্যবহৃত হইত তাহা একালের চুণ সুরকি অপেক্ষা দৃঢ়তর বোধ হয়। বাঙ্গলার নানাস্থানে ক্ষুদ্র নদীর উপরে যে বাদশাহী সেতু গুলি আছে, তাহারা এত কাল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও যেমন ঠিক্ আছে, শত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত ঐ শ্রেণীর সেতু তত ভাল নাই। খিলান বড় না হউক, পাকা গাঁথনি হইত। বাঙ্গলার নানাস্থানের দুর্গাদির ভগ্নাবশেষের মধ্যেও সেকালের নানাজাতীয় ইটের এবং কোথাও পাথরের থামের গঠন প্রণালী দেখা যায়।

পেটরা পাটী। বেত ও বাঁশের পেটরা এবং ঝুড়ী চুপড়ী নির্ম্মাণে

ষাট গম্বুজ, বাগের হাট (খুলনা)—৩২২ পৃঃ



আদিনা মসজিদের উপাসনা-বেদী—৩২৬ পৃঃ

বাঙ্গালীর দক্ষতা বহুকাল হইতে আছে, কারণ উপকরণ এখানে যথেষ্ট। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মীর হস্তে ন্যস্ত হওয়ায়, এবং তথাকথিত ভদ্রলোকে এসব হীন ব্যবসায় বলিয়া তুচ্ছ করায় বাঙ্গলার পেটরা প্রতিবেশী বিহারী বা উড়িয়ার হস্ত-শিল্পের নিকট শীঘ্রই পরাভূত হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সব সুন্দর পেটরা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রায়ই পশ্চিমের নির্ম্মিত; পূর্ব্ব বঙ্গে এই শিল্পের কিছু উন্নতি ছিল, বেত বনের আধিক্যই তাহার অন্যতম কারণ। শীতল পাটীও পূর্ব্ববঙ্গের শিল্প; মোগল অধিকারে সিলটের শীতল পাটী দিল্লী দরবারেও আদর পাইয়াছিল। মাদুরে মধ্য-বঙ্গ মেদিনীপুরের মছলন্দের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে। 'বেউনী টাঙ্গনি ঝাঁটি, ছাতা টোকা গড়ে নাটি' কথায় কবিকঙ্কণ ডোমের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

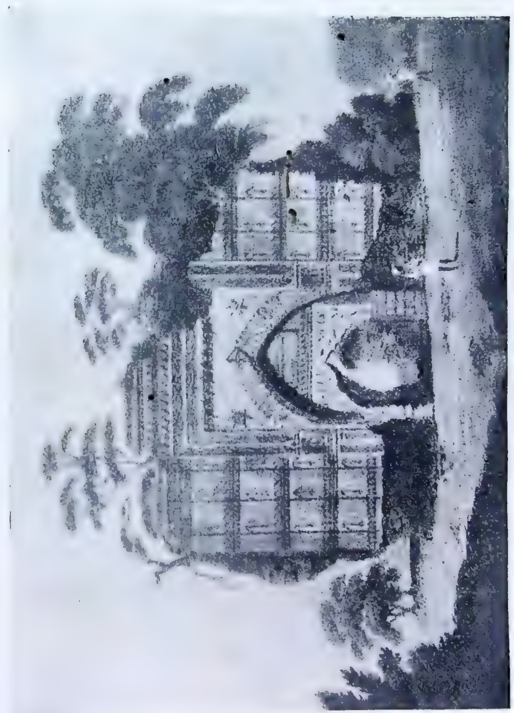
চামড়ার কাজ। চর্ম্মের ব্যবসায় ও শিল্প হেয় কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় বাঙ্গলায় কোন কালেই ইহার উন্নতি হয় নাই। সমৃদ্ধ লোকে প্রাচীন কালেও পাদুকা ব্যবহার করিতেন; পাটলিপুত্রে ফুলদার পাদুকা মেগাস্থিনিস্‌ও লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙ্গালী চামারেরা হিন্দুযুগে এইরূপ পাদুকাদি নির্ম্মাণে কি পরিমাণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে যুদ্ধের উপকরণ চর্ম্মের ঢাল, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি বাঙ্গালী মুচির হস্তেও সুন্দর প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কবিকঙ্কণ গাহিয়াছেন, 'মোজা পানাহি জীন্, নিরময়ে প্রতিদিন, চামার বসিল এক ভিতে'। পাদুকার প্রয়োজন সে যুগে অতি অল্পই হইত। পল্লীবাসী ভদ্রলোকেরও এক যোড়া মাত্র চটি চালের বাতায় তোলা থাকিত; অন্যস্থানে যাইতে হইলে তিনি কখনও হস্তে উঠিতেন, কখনও পায়ে পড়িতেন, ইহা বাল্যকালে দেখা গিয়াছে। খড়ম তখন নিত্য ব্যবহার্য্য পাদুকা ছিল, একালের মত চর্ম্মবন্ধে অশুদ্ধ

হয় নাই। গুড়ের মশক, ভেস্তি ও পেটরা বাঁধার উপযুক্ত চর্ম্মও বাঙ্গালী চামার প্রস্তুত করিত।

নৌ শিল্প। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু কর্ম্মকার ও সূত্রধর নৌশিল্পে সিদ্ধহস্ত ছিল, এই কথার পোষক প্রমাণ এ যুগে ভূরি পরিমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগেও শত দাঁড়যুক্ত তরণী সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপাদিতে গমনাগমন করিত (৮)। রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতিসংহিতা গুলিতেও জাহাজের খবর আছে; বৌদ্ধ জাতক গল্পগুলিতে এবং মহাবংশ দীপবংশাদি পালি গ্রন্থে হিন্দুর সমুদ্র যাত্রার নানা কথা পাওয়া যায়, 'বঙ্গের বাণিজ্য' অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে। বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণের সমকালে যে বাঙ্গালীর জাহাজ রাজপুত্র বিজয় সিংহের 'সাত শত অনুচর' সহিত সিংহল যাত্রা করিয়াছিল, কবি কাহিনী কিঞ্চিৎ কমাইয়া ধরিলেও সেই জাতীয় পোত নির্ম্মাণ-কর্ত্তা বাঙ্গালী মিস্ত্রীর শিল্পকলা সে যুগের জগতের ইতিহাসে অসাধারণ। শিল্প সংহিতা নামে এক সংস্কৃত পুঁথিতে (৯) পূর্ব্বকালের হিন্দুদের নানা শিল্পকলার সহিত তরণী নির্ম্মাণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভোজ নরপতি কৃত শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ হইতে নানাস্থানে বচন উদ্ধৃত হওয়ায় কথিত পুস্তিকা খানি কিঞ্চিৎ অর্ব্বাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু বঙ্গের পাল বা সেন রাজগণের সময়ে ইহা সঙ্কলিত ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হয় না। ইহাতে রাজকীয় হস্ত্যশ্ব যান বাহন, মণি অলঙ্কার প্রভৃতির সহিত নৌ শিল্পের পরিচয় আছে। প্রাচীনেরা কাষ্ঠের জাতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া কোন

(৮) আমার কৃতী ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ হিন্দু বাণিজ্য বিষয়ক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। বাণিজ্য অধ্যায়ে বাঙ্গলার অংশের কথা বলা যাইবে।

(৯) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার সংস্কৃত পুস্তকের পরিচয় বিষয়ক



চাঁদ দরজা, (গৌড়)—৩২৮ পৃঃ

ষাট গম্বুজ, বাগের হাট (খুলনা)—৩২২ পৃঃ



নূতন হাটের মস্‌জিদ্, (মঙ্গলকোট—বৰ্দ্ধমান)—৩২৯ পৃঃ

শ্রেণীর কাষ্ঠে কোন দ্রব্য নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, তাহা লিখিয়াছেন। ভোজের মতে ক্ষত্রিয় জাতীয় সুদৃঢ় অথচ লঘু কাষ্ঠের তরণী সুখ সম্পদ-দায়ী। সমুদ্রগামী পোত এই শ্রেণীর স্থায়ী কাষ্ঠেই নির্ম্মিত হইত। লৌহবদ্ধ তরণীও ছিল; কিন্তু সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন চুম্বক যুক্ত পাহাড়ে লাগিয়া পাছে নিমগ্ন হয় এই ভয়ে সিন্ধুগা নৌকায় লৌহের জোড় বা পাত মুড়িয়া দেওয়া ভোজ নিষেধ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের পক্ষে প্রয়োজ্য নিয়ম পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যুক্তি-কল্পতরুর যুক্তি অবশ্য সূত্রধর সকল সময়ে অবলম্বন করে নাই; তাহাদের সে সব যুক্তি জানা ছিল কিনা তাহাই সন্দেহস্থল। তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন বাঙ্গলায় বহু পূর্ব্বকাল হইতে যে বৃহৎ সমুদ্রগা তরণী নির্ম্মিত হইত ইহা মহাবংশ রাজাবলী প্রভৃতি পালি গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়। এই প্রাচীনের স্মৃতি আবহমান কাল চাঁদ সদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী গুলিতে পোষণ করিয়া আসিয়াছে।

শিল্প সংহিতায় সামান্য ও বিশেষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নানা জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী প্রস্তুত করার বিধান আছে। সামান্যের মধ্যে ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা হইতে মন্থরা পর্য্যন্ত দশ প্রকারের নদীতে চালাইবার নৌকার নাম ও পরিমাণ আছে। বিশেষকে আবার দীর্ঘা ও উন্নতা নামে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। লোলা, সত্বরা, জঙ্ঘলা, গামিনী, প্লাবিনী ইত্যাদি দশ প্রকারের দীর্ঘা তরণীর দৈর্ঘ্য অধিক, কিন্তু উন্নতি অপেক্ষাকৃত অল্প; সম্ভবতঃ এই ধরণের নৌকাগুলি বৃহৎ

মন্তব্যে (Notices of Sanskrit MSS. Vol I, no cclxi) লিখিয়াছেন, "Yukti Kalpataru is a compilation by Bhoja Narapati. কিন্তু ভোজ প্রণীত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশের বিষয়ও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভোজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে। মগধ বা বঙ্গে ইহা রচিত হওয়া সম্ভবপর।

নদী ও উপকূলে চালাইবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইত। উন্নতা শ্রেণীর উর্দ্ধা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিনী, মন্থরা প্রভৃতির দৈর্ঘ্যের তুলনায় উন্নতি অধিক হওয়ায় এগুলি গভীর জলে সমুদ্র-যাত্রায় ব্যবহৃত হইত, বুঝা যায়। এই সমস্ত তরণীর পরিমাণ নির্দ্দেশে 'রাজহস্ত-মিতা' বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট না হইলেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সংহিতায় নির্দ্দিষ্ট নৌকার মধ্যে ১৬ হাত দীর্ঘ পটল চেরা ডেলে ডিঙ্গী হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পোত আছে। এ হিসাবে সিংহপুরের রাজকুমার বিজয়ের সহযাত্রী 'সাত শত' লোককে পুঁথির লিখিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজে স্থান দিতে গেলেও অন্ধকূপ হত্যার প্রথম সংস্করণ বাহির করিতে হয় (১০)। জাতক গল্পে ৮ শত হাত দীর্ঘ, ৬ শত হাত প্রস্থ জাহাজ ও ৫ শত গাড়ী মাল বোঝাই পোতের কথা পাই; কোন গল্পে আবার সেকালের এক জাহাজে হাজার লোক যাত্রার কথা আছে; হয়ত শিল্প-সংহিতার নির্দ্দেশ অপেক্ষা আরও বৃহৎ পোত নির্ম্মিত হইত। যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে এবং পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, চীন প্রভৃতিতে যাইতে হইলে, সুবৃহৎ পোতেরই প্রয়োজন। কলিঙ্গ ও পশ্চিম ভারতের উপকূল হইতে পুরাকালে পোত চলিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহা-জনক জাতকে চম্পা নিবাসী বণিক সহ রাজপুত্রের সুবর্ণভূমি (বর্ম্মা বা শ্যাম আনাম) যাত্রার গল্প আছে; ইহাতে বহুতর বাণিজ্য দ্রব্য ও ভারবাহী পশু পর্য্যন্ত চড়ান হইয়াছে। এ গল্প বাঙ্গলার প্রাচীন বহি-

(১০) 'সাত শত' কথাটি গল্প ও প্রবাদের বড়ই প্রিয়। বিজয়ের সহযাত্রীদের পরিবার বর্গের কথারও মহাবংশ নির্দ্দেশ করিতেছে, উহাদিগকে (ঐ সাত শত পরিমাণ) ঐরূপ জাহাজে চড়াইয়া বিদায় দেওয়া হয়। গল্পের এই অংশ এবং সিংহের পুত্র ইত্যাদি কাহিনী অনেককে মহাবংশের সমগ্র আখ্যায়িকার ঐতিহাসিকতায় সন্দিহান করিয়াছে। কিন্তু গল্প ভাগ বাদ দিয়া সিংহল বিজয় যে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে।



সোনা মসজিদ—৩৩০ পৃঃ

র্বাণিজ্য সমর্থন করে। চম্পা বা ভাগলপুর হইতে বড় জাহাজ চালাইতে হইলে ভাগীরথীর গভীরতা বৃদ্ধি করিতে কলিকালে দ্বিতীয় ভগীরথের অবতারণা করিতে হয়। যাহা হউক, হিন্দুযুগে নিম্নবঙ্গে নদীমুখের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপযোগী জাহাজ যে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই। শিল্প সংহিতায় নৌকা রং করা এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাম্রাদি মণ্ডিত করার বিষয়ও আছে। চারি মাস্তলের জাহাজ শ্বেত, তিন মাস্তলের গুলি লাল, দুই মাস্তলের গুলি হরিদ্রা, এবং এক মাস্তলের নৌকা নীল বর্ণে রঞ্জিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তরণীর অগ্রভাগ ও মুখে সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী, মকর, সর্প ভেকাদি বা ময়ূর হংস প্রভৃতি, পক্ষীর মুখের অনুকৃতি দেওয়া রীতি ছিল। একালেও কলিঙ্গ দেশীয় ক্ষুদ্র পোত, এবং বাঙ্গলার ঢাকা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মকর বা হংসমুখী নৌকায় এবং সাধারণ ময়ূর পঙ্খী বজরায় ইহার নমুনা দেখা যায়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মা বা ভাগীরথী তীরবর্ত্তী স্থানে যে সমস্ত সুন্দর বজরা বা ছিপ নির্ম্মিত হইত, এবং মাল বোঝাইয়ের উপযুক্ত প্রকাণ্ড পাতিলা ও ফুকনী নির্ম্মাণে হিন্দু মুসলমান মিস্ত্রী যে কারিগরী দেখাইত, তাহা আজ ষ্টীমারের প্রচলনে মধ্য বঙ্গে প্রায় লোপ পাইতে চলিল। সংহিতায় রাজতরীর মুখাগ্রভাগ স্বর্ণ ও মণিমালায় মণ্ডিত করার কথা আছে; এ যুগে সাধারণে পিত্তল ও কড়ি পলায় সে সাধ মিটাইত। এখনও বাঙ্গালী মিস্ত্রীর নির্ম্মিত তরণীর সুদৃশ্য মুখাগ্রভাগ ভারতের অন্য প্রদেশে দুর্লভ। দেশজ কাষ্ঠে এই সকল নৌকা নির্ম্মিত হইত; কবির 'শাল পিয়াল কাটে খড়ি তেতুলী' ইত্যাদি বর্ণনা তাঁহার গঙ্গা হইতে দূরে রাঢ়ে বাস করার অনভিজ্ঞতা। পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গের কবি এ ভ্রম করেন নাই। চাঁদ সদাগরের পোত নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে কবি গাহিয়াছেন :—

রাজার প্রসাদ পেয়ে, সূত্রধর চলে ধেয়ে
চিরিবারে লাগিল সত্বর।
পাট কর্ম্ম করি সারা, ছুতার চাঁচিয়া দাঁড়া,
জানাইল চান্দর গোচর।

* * * *

ষোল শত সূত্রধর, ডিঙ্গা গড়ে মনোহর
দিবা রাত্রি নাহি অবসর।

গৌড়ে 'নাঘাটা' ও 'চিড়াই বাড়ী' নৌকা নির্ম্মাণের স্থান ছিল। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান এখনও আছে। সন্দীপ, সোনার গাঁ প্রভৃতি স্থানে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যখন রণতরীর মেলা বসিয়াছিল, তখন নানাজাতীর তরণী নির্ম্মাণের পটুতা যে দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামে হিন্দু মুসলমান শিল্পীর অধীনে বহু সূত্রধর পোত নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকিত। এমন দিন গিয়াছে যখন ইস্তাম্বুলের খলিফা সুলতান মিসরের আলেক্-জন্দ্রিয়ায় নির্ম্মিত জাহাজ অপেক্ষা চট্টলে প্রস্তুত বঙ্গীয় পোতের অধিক সমাদর করিতেন। সুলেমান কররাণীর রাজত্বকালে ভিনিসীয় বণিক্ সিজার ফ্রেডারিক সন্দীপে আসিয়া চট্টগ্রামের তরণী নির্ম্মাণের কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবি কল্পনায় মধুকর ডিঙ্গা হাজার দাঁড়ী হইয়াছে; পরবর্ত্তী যুগে বৃহৎ তরীর প্রয়োজনাভাবে এ শিল্পের অবনতি হইয়াছিল। তবে নদী-বহুল স্থানে বাণিজ্যের উপযোগী তরণী চিরদিনই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তমোলুকে জাহাজ আসা বন্ধ হইলে চট্টগ্রাম, সাগর মোহানায় সন্দীপ এবং নদীমুখের নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রাম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া পড়ে। দেশে শাল, পিয়াল, সেগুণ জারুল প্রভৃতি শক্ত আঁশের কাষ্ঠের কোন কালেই অভাব হয় নাই। এখনও



দখল দরজা—৩৩২ পৃঃ

চট্টলে বহু হিন্দু সূত্রধর 'অবসর না পাইয়া' বড় ডিঙ্গা গড়িতেছে। কবির 'কুশাই কামিলা' পোত নির্ম্মাণে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, এখনও চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান মিস্ত্রী তাহার অংশ পাইতে পারে। এযুগে আবার চট্টলে পোত নির্ম্মাণের শুভ সূচনা দেখা দিয়াছে; নদীবক্ষে মহোল্লাসে বড় জাহাজ ভাসাইবার বর্ণনা কাহারও কাহারও মনে অতীতের স্মৃতি জাগরিত করিয়াছে।

বর্ত্তমান অধ্যায়টির নাম দিয়াছি, শিল্প-কলা। কোনও দেশের উন্নতির সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; শিল্পের উৎকর্ষ কেবল সৌখীনতার পরিচয় নহে। শিল্প অনেক সময়ে ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম অনুভূতির পোষক, অনেক সময়ে জাতীয় উন্নতির সহায় হয়। শেষের দিক দিয়াই সাধারণে শিল্পের বিচার করেন। কলা-বিদ্যা, চিত্র, সঙ্গীত বা কবিতার মধ্যে প্রথম দুইটিতে মধ্যযুগের বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অধিক নাই বলা গিয়াছে; বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতও মুসলমান অধিকারেই পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ব্যবসায়-গত শিল্প রুচি দ্বারা নিয়মিত হয়; কচিৎ রুচির সৃষ্টি করে। ললিত কলা যে অবস্থায় পুষ্টি লাভ করে, তাহা মধ্যযুগে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য ক্রমে এদেশে দেখা দেয় নাই। বৃদ্ধ বয়সে, বিদ্যার অভাবে এই শেষ দিকে কলাবিদ্যার কথায় দেখাইলাম, কলা; পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বাঙ্গলার বাণিজ্য।

সুদূর অতীত কাল হইতে হিন্দু জাতি সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্ত (১)। সভ্য মানবের সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতার নানাস্থানে সমুদ্র যাত্রার প্রসঙ্গ আছে। 'স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়তি' উক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কোথাও বরুণ দেব সমুদ্র পথে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বর্ণিত, কোথাও অর্থ-লোলুপ বণিক্‌দলের বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে যাত্রার কথা লিখিত আছে। অন্যত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় শত দাঁড়যুক্ত জাহাজে করিয়া তুগ্র ঋষির পুত্র ভুজ্যকে সদলে সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। রামায়ণে সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী যব ও সুবর্ণভূমি দ্বীপাদিতে এবং লোহিত সাগরে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। 'ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরান্' এই কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের উক্তির ব্যাখ্যায় 'কোষের তন্তুৎপাদক জন্তুর স্থান' অর্থাৎ চীনদেশ ইহা অনেক কিচকিচি কাণ্ডের মধ্য দিয়া প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে। অযোধ্যা কাণ্ডে শত শত কৈবর্ত্ত যুবক কর্ত্তৃক রক্ষিত শত নৌকা নিয়োগের কথায় যুদ্ধযাত্রার আয়োজনও লক্ষিত হয়। মহাভারত ও মনুসংহিতায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রমাণের অভাব নাই; যাজ্ঞবল্ক্যও

(১) প্রাচীন ভারতের সমুদ্র যাত্রার সমস্ত বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয় নহে। আমার সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এই বিষয়ের বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে সেই গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে সাহায্য পাইয়াছি।

'সমুদ্রগা বৃদ্ধাঃ' অধিক লাভার্থ প্রাণধন-বিনাশ-শঙ্কা-স্থান সমুদ্রে গমন করে, লিখিয়া গিয়াছেন। গৌতম সূত্রে সমুদ্র-বাণিজ্যে রাজ-প্রাপ্য শুল্কের নির্দ্দেশ আছে; বৌধায়ন সূত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে সমুদ্র যাত্রা জাতিনাশক বলা হইলেও উত্তরাঞ্চলবাসী লোকের মধ্যে ইহা অন্যান্য বাণিজ্য ব্যাপারের মত সাধারণ একথা স্বীকৃত হইয়াছে। পুরাণ গুলি নূতন করিয়া লিখিত এই মত চলিত হইলেও পুরা কাহিনীতে পূর্ণ একথা স্বীকৃত। বরাহ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে সমুদ্র-বাণিজ্য সমর্থক বচন আছে। বৃহৎসংহিতায়ও নানাস্থলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। রঘুবংশের পারস্যে যুদ্ধ যাত্রা স্থল-পথে সম্ভব হইলেও 'বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্'—পদ দুই পক্ষেরই রণতরী প্রয়োগ প্রমাণ করে। যাঁহারা স্মৃতি সংহিতা ও পুরাণাদি অর্ব্বাচীন বলিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে বৌদ্ধজাতক গল্প গুলির প্রমাণ ত অকাট্য! এগুলির মধ্যে বাবেরু জাতকে বাবিলন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ দেখাইতেছে; সুপ্‌পরকা জাতকে ভারু-কচ্ছ (বরোচ) হইতে সমুদ্র-যাত্রী 'সাত শত' বণিকের গল্প, এবং শঙ্খ জাতকে আট শত হাত দীর্ঘ ছয় শত হাত প্রস্থ সুগভীর এক তিন মাস্তুল জাহাজের গল্প আছে। শেষেরটিতে কাশীর ব্রাহ্মণকে গঙ্গা বাহিয়া সুবর্ণভূমি যাইতে হইলে বঙ্গের জাহাজের আশ্রয় লইতে হয়। এ সব না হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছে স্বীকার করা গেল। কিন্তু মহাজনক জাতকে চম্পা নগরীর রাজকুমার সদলে সুবর্ণ-ভূমিতে চলিয়াছেন। চম্পা ভাগলপুরে তাহাতে সন্দেহ নাই; সুবর্ণভূমি বর্ম্মা, নিতান্ত না হয় পূর্ব্ব উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে শ্যাম বা আনাম। এই জাহাজ বাঙ্গলার নিজস্ব এবং বাঙ্গলার বন্দর হইতে চালাইতে হইবে; ইহাতে 'সাত দল' বণিক্ মাল পত্র ভারবাহী পশু সমেত

চলিয়াছে। 'দথ (দন্ত) ধাতুবংশ' নামে এক পালি পুস্তিকা সাক্ষ্য দিতেছে, দন্তকুমার সস্ত্রীক তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় সিংহল গমনোদ্যত এক পোত প্রস্তুত; সে জাহাজ দড়ির সাহায্যে দৃঢ় কাঠের তক্তা যোড়া দিয়া সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত; প্রকাণ্ড মাস্তুল, দড়া দড়ি পাল যথেষ্ট, সুদক্ষ চালকের অধীনে রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের দন্ত লইয়া (ওদন্তপুর হইতেই হউক, আর মেদিনীপুরের দাঁতন হইতেই হউক) এই সমুদ্র যাত্রার কথা এবং উল্লিখিত জাতক গল্প গুলি গল্প হইলেও সেকালের হিন্দুর তথা বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।

'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' গীতাংশ আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র পরিচিত। মহাবংশ, দীপবংশ, রাজবল্লী প্রভৃতি সিংহলী পালি-গ্রন্থ প্রমাণ দিতেছে যে, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের সমকালে (পাঁচ শত খৃষ্ট পূর্ব্বে) বঙ্গীয় রাজপুত্র বিজয় সিংহ প্রজা-বর্গের প্রতি অন্যায় আচরণ করায় পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া 'সাত শত' সহযাত্রী অনুচর সমেত পোতারোহণে যাত্রা করিয়া সিংহলে উপনীত হন। বলে ও কৌশলে (হেলায় না হউক) বিজয় যে সিংহল বিজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশের নাম অনুসারে সিংহলের নব নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে সম্প্রতি আর কোন সন্দেহ নাই। অজন্তার বিশাল গিরিগুহার চৈত্যমধ্যে অঙ্কিত সিংহল বিজয়ের চিত্র দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে; কোন কোন দেশপ্রাণ বাঙ্গালী ঐ চিত্র প্রকৃতই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিকৃতি মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন। এই চিত্রে উভয় পক্ষই (পোতের উপরেও) সুসজ্জিত রণ হস্তী চালনা করিতেছে; বর্ম্ম পরিহিত যোদ্ধবর্গ তীর তরবারি অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেছে, ভূমিতে সিংহলী অশ্বারোহীও আছে।

চিত্র পরবর্ত্তী কালের হইলেও ইহা যদি সিংহল বিজয়ের চিত্র হয়, তবে চিত্রাঙ্কণের যুগে বাঙ্গালীর খ্যাতি সমধিক ছিল স্বীকার করিতে হইবে। সিংহল-বিজয় সম্পর্কে পালিগ্রন্থের সমগ্র কাহিনী ইতিহাস গ্রহণ করিতে না পারে, কিন্তু খৃষ্টের অন্ততঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দা পূর্ব্বে যে বাঙ্গলা হইতে অনেক লোক গিয়া সিংহলে বসতি বিস্তার করিয়াছিল, তাহার নানা প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিংহলী ভাষায় এখনও মাগধী প্রাকৃত বা প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার ছাপ রহিয়াছে (২) সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টের সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে আনামে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। লক্ লম্ (লক্ষণ?) নামক বাঙ্গালী নেতা আনামে গিয়া আউকী নাম্নী আনামী যুবতীকে বিবাহ করেন। লক্ লমের নিবাস বং লং; তিনি এবং তাঁহার সহচরেরা নাগ বংশীয় ও বং নামে পরিচিত ছিলেন। অতএব পৌরাণিক বঙ্গ কথা আধুনিক নহে; বাঙ্গলা শব্দও প্রাচীন এবং বঙ্গে আর্য্য প্রভুত্ব বিস্তারের পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর আনাম যাত্রা বিচিত্র নহে। বাঙ্গলা হইতে নাগোপাসকেরা তামিল দেশে (দক্ষিণ দ্রাবিড়ে) গিয়াও বাস করিয়াছিল; তামিল ভাষায় প্রাচীন বাঙ্গলা শব্দ আছে (৩)। চের, চোল রাজ্য যে বাঙ্গলা হইতে উপনিবিষ্ট, তাহার

(২) শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার 'বাঙ্গলা ভাষা' বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। জেরিণী প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকটেই অবশ্য আমরা এই সকল গবেষণার জন্য ঋণী। বৈদিক যুগে বঙ্গে আর্য্য আসে নাই, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে বাঙ্গলার নাম নাই, ইত্যাদি আপত্তি একালে ক্রমশঃ খণ্ডিত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে যে কোনও দেশের নাম থাকিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। আরণ্যক ও সূত্রগ্রন্থে বঙ্গের নাম আছে; তাহাদের সময় লইয়াই যত গোল।

(৩) কনক সহায় পিলে তাঁহার পুস্তকে এই সমস্ত প্রমাণ দিয়াছেন।

যথেষ্ট প্রমাণ সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে; সে যুগে বাঙ্গলায় আর্য্য প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন গ্রীকেরা ঐ তামিল দেশের সঙ্গেই বহুদিন ধরিয়া বাণিজ্য চালাইতেছিল।

বেগবতী নদী, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ, অতি প্রাচীন কালেই দক্ষিণ বঙ্গের লোককে জলযাত্রায় অভ্যস্ত করিয়াছিল। বরুণদেবের তাণ্ডব লীলায় বঙ্গসাগরের বক্ষে প্রচণ্ড উর্ম্মিমালা অনেক সময়ে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে; সাময়িক প্রভঞ্জন সংযোগে ধ্বংসের রুদ্র ভাবও সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার লোকে বহির্বাণিজ্য বিস্তারের নিমিত্ত এই কারণেই সামান্য তরণী হইতে শত দাঁড় সুদৃঢ় পোত পর্য্যন্ত নির্ম্মাণের কৌশল পুরাকালেই শিখিয়াছিল। বৃহত্তর ভারতের রচনায় প্রাচীন বাঙ্গালীর হাত ছিল। যব, সুমাত্রাদি দ্বীপপুঞ্জে পশ্চিম ভারতের অধিবাসীর কীর্ত্তি অধিক থাকিলেও বাঙ্গালীর অংশ সম্প্রতি বাহির করা হইয়াছে। পূর্ব্ব উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনে কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশ যে পাশাপাশি চলিয়াছিল, ইহাতে আর এখন কাহারও সন্দেহ নাই। 'চীন জাপানে করিল উপনিবেশ' কথা কেবল কবি-কাহিনী নহে। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা বাঙ্গলার মধ্যযুগের কথাই আলোচনা করিতে চাই; সুতরাং উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে আর একটু বলিয়া প্রকৃতের অনুসরণ করা যাইবে। সুদূর অতীত কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময়ের বিবরণী হইতে দৃষ্ট হয় (৪) যে, সেকালে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজকীয় ছয়টি বিভাগের মধ্যে নৌ-বিভাগ একটি প্রধান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই বিভাগের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার প্রধান পরিচালক নাবধ্যক্ষের হস্তে

(৪) Megasthenes & Strabo এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

নানা বিষয়ক কার্য্যের মধ্যে 'সমুদ্র সংযান' বিষয়ের ভারও অর্পিত হইত। তন্মধ্যে শুল্ক আদায়, বন্দর রক্ষণের নিয়ম প্রণালী এবং শত্রু ও সামুদ্রিক দস্যুর জাহাজের প্রতি ব্যবহারের বিষয় সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজাধিরাজ অশোকের রাজত্বকালে পূর্ব্ব সাগরে নাগ নামধেয় জল-দস্যুর উৎপাত নিবারণের নিমিত্ত এক তাম্র-শাসন প্রচারিত হওয়ার কথা কবি ক্ষেমেন্দ্র 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৫)। এই রত্ন-চৌর সাগর-বাসী নাগজাতিকে কেহ কেহ চীনা বণিক্ মনে করেন; ইহারাই দ্বীপবাসী মালয় ও মগ জাতির পূর্ব্বপুরুষ মনে করিয়া লইলে অসঙ্গত হয় না। চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের সাম্রাজ্য অবশ্য পূর্ব্বোপকূলে সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁহাদের সময়ের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিম দুই উপকূলের লোকেরই সৌভাগ্য সূচিত করে। কিন্তু পাটলিপুত্রের সম্রাটের প্রধান বন্দর পূর্ব্ব সাগরে হওয়াই স্বাভাবিক। তাম্রলিপ্তি সেকালেও প্রধান বন্দর ছিল, এ কথা হিন্দুর পুরাণের বলে বলিতে গেলে যে সব বৌদ্ধবাদী ভ্রুকুটি করিবেন তাঁহাদের জন্য মহাবংশের প্রমাণ আছে। মহাবংশে 'তাম-লিট্টা' নাম পাওয়া যায়; ইহাতে আবার কেহ কেহ তামিলের গন্ধ পান! 'পেরিপ্লস্' নামে প্রথম শতাব্দীর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে গঙ্গার মোহানার নিকটে এক প্রধান বাণিজ্য-স্থানের উল্লেখ আছে; তথায় অতি চিক্কণ বস্ত্রের ব্যবসায় অধিক ছিল। এ বন্দরও কেহ কেহ 'তমোলুক্' বলিতে চান; কিন্তু তমোলুককে গঙ্গার মোহানার নিকটে আনা কষ্ট সাধ্য। বাঙ্গলার দক্ষিণে অন্য বন্দর আর একটি

(৫) বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, ৭৩ পল্লব। "অস্মাকং তু প্রবহণং ভংক্ত্বা রত্নধনং হৃতম্। কেবলং ভাগ্য দৌর্ব্বল্যান্নাগৈঃ সাগর-বাসিভিঃ।"

কি হওয়া সম্ভব নহে, যেখানে কাপড়ের ব্যবসায় চলিত? সে নগর পরে নদী ও সমুদ্রের পরিবর্ত্তনে সুন্দর-বনের অন্যান্য স্থানের মত ধ্বংস হইয়া যাইতেও পারে। যাহা হউক, প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্তি যে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্থ শতাব্দীর ঠিক প্রথমে চীন পরিব্রাজক ফা হয়েন্ এদেশে আসিয়া এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াছেন; এখানে ২৪টি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ ছিল। দুই বৎসর এদেশে থাকার পরে তিনি তমোলুক বন্দরে শীতকালে এক জাহাজে চড়িয়া চৌদ্দ দিনে সিংহলে গিয়া উপনীত হন। ইহার আড়াই শত বর্ষ পরে সুপ্রসিদ্ধ হুয়েন্ সাং আসিয়া তাম্রলিপ্তির উন্নতির অবস্থাই দেখিয়াছেন; তখনও ১০টি বৌদ্ধ মঠ ছিল ও হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন। বহু উচ্চ এক অশোক স্তম্ভও ছিল। খাড়ীর মুখে সুন্দর স্থানে নগরের অবস্থান; অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী, মূল্যবান্ দ্রব্যের ব্যবসায় ছিল। ইহার পরে ইৎ সিং আসিয়াও নগরের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই তাম্রলিপ্তি হইতেই জাহাজে চড়িয়া চীনে ফিরিয়াছিলেন।

খৃষ্টের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অনেক বৌদ্ধ বাঙ্গালী যে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন, জাপানে গিয়াছিল সে কথা এখন জানা গিয়াছে। তৃতীয় শতকে বঙ্গ সাগরের পশ্চিম উপকূল হইতে একদল বৌদ্ধ গিয়া মার্ত্তাবান অঞ্চলে থেটন্ বা সদ্ধর্ম-নগর স্থাপন করে; ইহাতে বাঙ্গালীর অংশ আছে। জাপানের হরি উজি মঠে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত এক বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহার রীতিমত পূজা উপাসনা চলে। একালের সব-জান্তা পণ্ডিতের দল এই পুস্তক ষষ্ঠ শতাব্দীর বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত, এই ফতোয়া দিয়াছেন। যবদ্বীপের বরোবুদর

মন্দিরে গুজরাট ও কলিঙ্গবাসীদিগের কীর্ত্তির পার্শ্বে বাঙ্গালী ভাস্করের কলা শিল্পও আছে, তাহার কাল সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কের অভাব নাই। কিন্তু চীন দেশীয় পরিব্রাজকদিগের বিবরণী হইতে বাঙ্গলার বহির্বাণিজ্যের বিশ্বাসজনক যে ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তখন তাম্রলিপ্তি হইতে বাঙ্গালী জাহাজ পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানে, সিংহলে পূর্ব্ব উপদ্বীপে, মালয়ে এবং চীনে পর্য্যন্ত চলিত। সিংহলে ত সচরাচর যাইত, সে যে বাঙ্গালীর নিজের স্থান; তাই সিংহল পাটনে বাণিজ্যে যাওয়ার এবং রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিবার উপাখ্যান পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালী কবির মহাকাব্যের বিষয় হইয়াছে। সিংহলের স্মৃতি একালের বাঙ্গালীতেও লোপ পাইতে বসিয়াছিল, অপর বাঙ্গালী কবি পুনরায় জাগাইয়াছেন।

মনসা এবং চণ্ডী মঙ্গলের সমস্ত বাঙ্গালী কবিই দেশীয় সাধুর সমুদ্র যাত্রার ব্যাপার সাধ্যমত বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব, বংশীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ,কেতকাদাস পর্য্যন্ত কবিরা কম বেশী সেকালের বাঙ্গলার বাণিজ্যের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাচীনেরা কাব্য কলায় কম হইলেও সমুদ্র যাত্রার কথা ভাল জানিতেন; আর ভিতর রাঢ়ে শুকনা ডাঙ্গায় বাস করিয়া মহাকবি হইলেও মুকুন্দরাম ইহাতে হাত ফলাইতে পারেন নাই। অনেকে ভ্রমরা বিলের জল হইতে জাহাজ তুলিয়াছেন! বিলে জেলো ডিঙ্গী ও ছোট নৌকা ডুবান থাকে, অনেকে এখনও দেখিতে পারেন। মনসা মাতার প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদ সদাগর অনেক কাব্যের নায়ক; প্রধান কাব্যদ্বয়ে তাঁহার ও ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন প্রায় এক ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে :—ভ্রমরা গাঙ্গ হইতে—

প্রথমে তুলিল, ডিঙ্গা নাম মধুকর,
শুধাই সুবর্ণে তার বসিবার ঘর।
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম দুর্গাবর
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিতে গার্বর।
তবে তোলে ডিঙ্গাখানি নাম গুয়ারেখী
দুই প্রহরের পথে যার মালুম কাঠ দেখি।
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচূড় (বা শূল)
আশি গজ পানি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় কূল।
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নাম সিংহমুখী
সূর্য্যের সমান রূপ করে ঝিকি মিকি।
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম চন্দ্রপাল,
তাথে ভরা দিলে দুই কুলে হয় থান।
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে ছোট মুটি
যাতে চালু ভরা চাহে হাজার এক পুটি।

(বায়ান্ন পউটি-কঃচ)

মম ধুনা দিয়া তবে গাইল সাত নায়।
তড়িৎ গমনে ডিঙ্গা সাজিয়া চালায়।
সাত খানি ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট।
যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট। (বিজয় গুপ্ত)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মুদ্রিত পুস্তকে শেষ দুই পংক্তি বাদ দিয়া 'নাটশালা' নামক ডিঙ্গায় 'গাবরের মেলা' বসাইয়া সপ্তডরী পূরণ করা হইয়াছে।

প্রধান ডিঙ্গা সর্ব্বত্র 'মধুকর' নাম পাইয়াছে; মনসা মঙ্গলের অন্যান্য পুঁথিতে রাজবল্লভ, গঙ্গাপ্রসাদ, হংসরব প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছে। কবিরা সর্ব্বত্র সমুদ্রগামী পোত দেখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। গৌড়ে বড় নৌকা মাত্র সেকালে চলিবার সম্ভব ছিল; সপ্তগ্রামে ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গে বাণিজ্য জাহাজ তিন শত বর্ষ পূর্ব্বেও আসিতে পারিত। চট্টগ্রামের সেকালের কোন কাব্য উদ্ধার করিতে পারিলে জাহাজের খবর পাইতাম। সমুদ্র যাত্রা কলিতে নিষেধ,—প্রথমে ব্রাহ্মণের পক্ষে, শেষে অসাধ্য হওয়ায় সকল বাঙ্গালীর পক্ষেই ঘটিয়াছিল। চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান অন্য যুগের বলিবার উপায় নাই। অন্ততঃ কবিকঙ্কণ তাঁহাকেও সাধু ধনপতির সহিত একালের উজানীর (মঙ্গল-কোটের) রাজার সমকালে আনিয়াছেন। সামুদ্রিক বাণিজ্যে যে সে যুগের বাঙ্গালী লাভবান্ হইত, তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানিতেন; সপ্তগ্রামে অন্যদেশের বণিক্ আইসে, সাত গাঁয়ের বেণে কোথাও যায় না, ইহাও তাঁহার উক্তি বটে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন্ আজাম্-শার সহিত চীন রাজের পত্র ও উপঢৌকন বিনিময় চলিয়াছিল, (১৪০৮—৯)। গিয়াসুদ্দীন্ জীন সমেত ঘোড়া, স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, বিদরীর (চীনা-মাটির বলিয়া কথিত) পান পাত্র, ধাতুর ফুল ইত্যাদি উপঢৌকন পাঠান। কেহ কেহ এই দূত প্রেরণ ব্যাপার স্থলপথে হইয়াছিল, বলিয়াছেন; কিন্তু সেকালে তিব্বত হইয়া এদেশী ঘোড়া পাঠান সহজ ব্যাপার ছিলনা। নানা দ্রব্যাদি সম্ভার পাঠাইতে হইলে জলপথে যাত্রাই সুবিধা। সেকালে চীনের উপকূলে বাঙ্গলার বাণিজ্য-পোত সচরাচর চলিত। ইহার অনেক পরেও বাঙ্গালী মুসলমান বণিকের জাহাজ মিসর পর্য্যন্ত গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকলো

কন্টি আঁসিয়া ভারতের জাহাজ নির্ম্মাণ দেখিয়া চমকিত হইয়াছেন। তিনি ভিনিসের লোক, জাহাজেই অভ্যস্ত। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষের লোকে আমাদের অপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ প্রস্তুত করে। কোন কোন জাহাজে দুই হাজার বড় বস্তা মাল ধরে; পাঁচটি মাস্তুল ও ঐ সংখ্যক পাল আছে। তেহারা কাঠে জাহাজের নিম্নভাগ নির্ম্মিত হয়, যেন ঝড় ঝাঁটিতে কিছু না করিতে পারে। আবার এমন ভাবে নির্ম্মিত যে এক দিক ভাঙ্গিয়া গেলেও অবশিষ্ট অংশ লইয়া জলে চালাইয়া আসা যায়।" গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড বাঁশ দেখিয়া কন্টি অবাক্ হইয়াছিলেন; বাঁশের জেলে-ডিঙ্গীও তিনি দেখিয়াছেন! ভারতের সওদাগরদের অর্থ ও বাণিজ্যপোতের সংখ্যা দেখিয়া তাঁহার চমক লাগিয়াছিল।

পুরাকালে সমুদ্র-বক্ষে দিক্ নির্ণয়ের অর্থাৎ উপকুল কোন দিকে আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত হিন্দু নাবিকেরা জাহাজে 'দিশা কাক' রাখিত, একথা বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে এই কার্য্যের নিমিত্ত শ্বেত পারাবত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; পায়রা পোষ মানে, দিক্ দর্শন করাইয়া ফিরিয়া আসিত। শেষে ভারতীয় নাবিক যে নক্ষত্র প্রভৃতি দ্বারা দিক্ নির্ণয়ে দক্ষ হইয়াছিল, তাহা প্রথম যুগের ইউরোপীয় বণিকের লিখিত বিবরণী হইতে জানিতে পারি। ইহারাই পর্ত্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামাকে পথ দেখাইয়া (আড় কাঠি হইয়া) আনিয়াছিল। খৃষ্টের দশম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সময়ে গভীর সমুদ্রে পোত চালনায় মলবার উপকুলের নাবিকগণই অধিকতর সুদক্ষ হইয়াছিল।

বাণিজ্য ও বৈদেশিকের বর্ণনা বলিয়া সপ্তম অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, এই স্থানে পাঠককে পুনরায় তাহা দেখিবার অনুরোধ করি। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে আগত ইটালিয়ান্ বার্থেমা হইতে আরম্ভ

করিয়া মোগল বাদশাহ আকবরের নামে পত্র লইয়া যে ইংরেজ বণিক রল্ফ ফিচ্ ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গলার বিবরণীর মর্ম্ম উক্ত অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। বহির্বাণিজ্য ও দেশের অবস্থার নানা কথা উহাতে জানা যায়। পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গলায় আসিয়া কি দেখিয়াছে ও কি করিয়াছে তাহারও আভাষ দেওয়া গিয়াছে। ইংরেজের ব্যবসায়ের প্রথম দিকে তাঁহাদের চক্ষে বাঙ্গলা কেমন লাগিয়াছিল, সে কথাও কিছু বলি। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সার টমাস রো লিখিতেছেন, "বাঙ্গলায় উৎকৃষ্ট সুন্দর কাপড় করে বটে, কিন্তু তাহা কিনিবার জন্য সেখানে একটা কুঠী করা কোম্পানীর কোন আবশ্যক নাই; স্থলপথে আনাইলে বরং শস্তা হয়। রেসম ও সুন্দর রেসমী কাপড়ই সে দেশে হয়; উহা আগরাতেও বিক্রীত হয়, তবে অল্প বটে"। সুরাটের কুঠীওয়ালা ইংরেজেরা সার টমাসের স্থল পথে আনাইবার কল্পনায় বিব্রত হইলেন; তাঁহাদের মধ্যেই কোন লোককে পাঠাইয়া তবে ত আনান হইবে? তাঁহারা লিখিলেন, বাঙ্গলা বড় গরম দেশ, তথাকার লোক গরিব; স্থল পথের বাণিজ্যে সুবিধা হইবে না। রো ছাড়িবার পাত্র নহেন; বাঙ্গলার অবস্থা দিল্লী দরবারে তিনি ভাল করিয়া জানিয়া লইয়াছেন। তিনি লিখিলেন, 'বাঙ্গলা গরীব হইবার কোন কারণ দেখিনা। বাঙ্গলাই এদেশকে চাউল, গম যোগাইয়া আহার দেয়, সমগ্র ভারতে চিনি যোগায়, সেখানে অতি সুন্দর কাপড় হয়; তা ছাড়া মৃগনাভি প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য মিলে; পেগুর দামী মাল বাঙ্গলা হইয়া আসে।..... অসংখ্য পর্ত্তুগীজ সে দেশে বাস করে, ইহাই আমাদের তথায় যাইবার পক্ষে যথেষ্ট প্রলোভন' ইত্যাদি (৬)

(৬) That Bengala should be poor I see no reason: it feedes this countrie with wheate and rise, it sends sugar to all India,

এই বিতর্কের ফল কি হইল তাহা ভাল জানা যায় না; কিন্তু কিছু কাল পরেই মসলীপত্তনের দিক্ হইতে ইংরেজ বণিক্ দল বাঙ্গলায় সূচ হইয়া প্রবেশ করিলেন ও নানা যায়গায় কুঠী করিলেন, একথা বালকেরাও জানে। সে কালের ইংরেজ বণিক্ লাভ ও আহারে পুষ্ট হইয়া বাঙ্গলাকে আর দুঃখের দেশ (land of regrets) বলেন নাই। তাঁহাদের চিঠী পত্র ও বিবরণী যাহা লোক-লোচনের গোচর হইয়াছে, তাহাতে বোম্বাই উপকূল অপেক্ষা বাঙ্গলা 'সুখ স্থান' বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল। অন্যত্র, সুবিধা হইলে, তাহা দেখাইবার ইচ্ছা আছে (৭)। একজনের বিবরণী হইতে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বঙ্গদেশকে কোম্পানীর বাগানের 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুম' বলিয়াছেন (৮)। গঙ্গার মোহানা দিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের দিকে নৌকা চালাইবার সময়ে দুই পার্শ্বের স্থান গুলির হেজেস্ এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়াছেন। (৯) তিনি বলেন, এ দৃশ্য দেখিয়া লোকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে

it hath the finest cloth and Pintadoes, musck, cinitt and amber (besides), almost all raretyes from thence by trade from Pegu......The number of Portugals residing is a good argument for us to seek it"—Sir. T. Roe's Journal.

(৭) ভারতীয় হোম গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র (Imperial Records) দেখিবার সুযোগ পাইয়া অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা প্রয়োগ করিবার অভিলাষ আছে। কিন্তু সময় ভাল নয়; কোম্পানীর মুলুকের সব কথা লোকের মাথা ঠাণ্ডা হইলে বলাই যুক্তি-যুক্ত।

(৮) 'The best flower in the Company's garden'—Hedges, in his Diary.

(৯) We continued rowing all day in the most pleasant country that I ever saw in my life' Oct 23. 1682. "the long streches of

পারে না। সুন্দর সমতল শ্যামল শস্যক্ষেত্র, খর প্রবাহিনী নদী মালা, 'বিতত সহস্র শাখ' তরুশ্রেণী, সোণার বাঙ্গলার এ দৃশ্যে মোহিত না হইয়া পারে এমন মূঢ় লোক কে আছে? আর একজন ইংরেজের বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া সেকালের বাঙ্গলায় বাণিজ্যের কথা বলিতে হইল। ইহার নাম টমাস্ বৌরী (বৈরি নয়); ইনি তাৎকালিক বিখ্যাত বন্দর মসলি পত্তন হইয়া বাঙ্গলায় আসেন। সেখানে ও মাদা-পোলামে বিস্তর জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা দেখিয়াছিলেন এবং মাদাপোলামের মিস্ত্রীগণের নৈপুণ্যের এবং ঐ স্থানের কাষ্ঠ ও লোহার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় সে সময়ে নানা শ্রেণীর যে সমস্ত পোত ও সাধারণ নৌকা নির্ম্মিত হইত, বৌরী তাহার এক বিস্তৃত বিবরণী দিয়াছেন। করমণ্ডল উপকূলে লোকে মাসুলা নামে এক প্রকার তরণী নির্ম্মাণ করিত; বড় জাহাজে মাল দেওয়া লওয়া উহাদের কাজ ছিল। পাতলা চওড়া তক্তা নারিকেল ছোবড়ার যোড়া দিয়া এগুলি নির্ম্মিত হইত। উহাদের তলদেশ প্রশস্ত বলিয়া উপকূল বাণিজ্যের বড়ই উপযোগী; কারণ তথায় সর্ব্বদা ঝড় ঝাঁটির উৎপাত আছে। বাঙ্গলায়ও তিনি প্রকাণ্ড, তলা চওড়া, প্রায় সমতল পাতিলা

picturesque green, the fertile fields fed and drained by innumerable streamlets, the level banks dotted over with shady groves of umbrageous trees inviting passers-by to sit &, visoins of swarming peacocks and glimpses of spotted deer"—Hedges Diary.

১১ই এপ্রেল। ১৬৮৩। বাগ অাঁচরার নিকটে সুন্দর স্থানে নামিয়া ইহারা এক জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। "জমিদার তাঁহার ময়ূর ও হরিণ সকল দেখাইলেন; কিন্তু তাহার একটি পাওয়ার সৌভাগ্যও আমাদের হইল না'। সে ত একাল নয়, যখন জমিদার যে কোন সাহেবের নিকট যথাশক্তি উপহার দিবার জন্য ব্যগ্র।

নামে পোত দেখিয়াছেন ; 'এগুলি খুব দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয় এবং চারি হইতে ছয় হাজার মণ মাল ধরে'। এই পাতিলা শ্রেণীর নৌকা এখনও আছে, কিন্তু সমুদ্র উপকূলে আর যাইতে হয় না বলিয়া হাজার মণের উপর বোঝাই ধরে না। নদীতে বজরা, পাগু, বুরা প্রভৃতি শ্রেণীর তরণী তিনি চলিতে দেখিয়াছিলেন। বজরার মধ্য-স্থলে কাঠের ঘর থাকিত ; এখনও তাহাই থাকে। 'হুগলী হইতে পিপ্‌লী, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত জাহাজ হইতে মাল উঠা নামা করিবার নিমিত্ত পাগু ব্যবহৃত হইত। এ গুলি অনেক দিন সমুদ্রে রাখিবার উপযুক্ত ; পেছনে নঙ্গর ফেলা হয়। বুরা গুলি পাতলা তরণী, ২০।৩০ দাঁড় পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এগুলিতে লবণ, মরিচ এবং অন্যান্য মাল বোঝাই হইয়া হুগলী হইতে ভাটির দিকে চালান হয় এবং সময়ে ঢাকা পর্য্যন্ত লবণ লইয়া যায়। এগুলি আবার উজান ভাটি জাহাজের সঙ্গেও বাঁধিয়া দিয়া দাঁড় টানিয়া জাহাজ আনিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত মালয় উপকূলে ব্যবহৃত যুদ্ধ জাহাজের মত বাঙ্গলায়ও যুদ্ধ জাহাজ আছে'। বৌরী যুদ্ধ জাহাজের কথায় সায়েস্তা খাঁর জাহাজ নির্ম্মাণ বাবতে মাসুল আদায়ের বিবরণ দিয়াছেন ; অন্যত্র সেকথা বলা হইবে। 'সায়েস্তা খাঁর ২০ খানি বৃহৎ বাণিজ্য পোত ছিল, এগুলি ঢাকা, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে পূর্ব্ব উপদ্বীপ, সিংহল পর্য্যন্ত যাইত ; ইহাতে হাতীও আনান হইত। আর ৬।৭ খানি জাহাজ প্রতি বৎসর কড়ি, ছোব্‌ড়া আনিতে মালদ্বীপ যাইত।"

যাক্, মধ্যযুগের বাঙ্গলার কথা বলিতে আর বেশী অগ্রসর হওয়া ঠিক হইবে না ; ইংরেজ ও অন্য বণিকের বিষয় গ্রন্থান্তরে লিখিবার কল্পনা

(১০) A geographical account of countries round the Bay of Bengal, 1669—75 by Thomas Bowrey (Hakluyt society publications).

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন দেশীয় ইতিহাসে বঙ্গের বাণিজ্য ও নৌবল সম্বন্ধে যাহা আছে, দেখাইবার চেষ্টা করিব। নৌসাধনোদ্যত বঙ্গীয় বীরের কথা কালিদাস বলিয়াছেন। নৌকা এবং পোত লইয়া কারবার পাঠান আমলেও যথেষ্ট দেখা যায়। মহামোগলের সঙ্গে যুদ্ধেও কেদার রায় ও প্রতাপ নৌ-বল ব্যবহার করিয়াছেন। মগ ফিরিঙ্গীর সময়েও ক্ষুদ্র বৃহৎ বঙ্গীয় তরণী বাণিজ্য ও জলযুদ্ধ চালাইয়াছে। পাঠান রাজের আমলে গৌড়ের সওদাগর সেখ ভিখু তিন খানি জাহাজে রেসমী কাপড় বোঝাই করিয়া রুষিয়া দেশে বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন ; পারস্য সাগরের নিকটে তাহার মধ্যে দুইখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল (১১)। সে আমলে এমন সেখ ভিখু বা চাঁদ সদাগর অনেক ছিল, অবশ্য সকলেই বুঝিবেন ; কিন্তু ইহাদের নাম সম্বলিত ইতিহাস রাখা সেকালের নিয়ম ছিল না। 'বণিক জাহাজে চড়ি করিছে ব্যাপার' এর আবার লেখা পড়া কি থাকিবে? কবি কল্পনায় কাব্য করিয়াছেন। মালদহের গাম্ভীরার গানেও এ স্মৃতি আছে।

হিন্দু বা পাঠান আমলের বাঙ্গলার জাহাজের খবর যা পাওয়া গেল, তাই দিলাম। মোগল অধিকারে আকবরের সময়ের লিখিত বিবরণী মহাত্মা আবুল ফজল রাখিয়া গিয়াছেন। নানা রত্নের আকর আইন্ ই আকবরীতে বাদশাহের নৌবিভাগের ব্যবস্থার কথা বিশদ-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্থ-শাস্ত্রে লিখিত মৌর্য্য সম্রাটের সময়ের নাবধ্যক্ষের বিভাগের মত আকবর বাদশার এক 'মীর বহরী' বিভাগ ছিল। এই বিভাগের কার্য্যাবলী প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকা ও পোত নির্ম্মাণ এবং

(১১) Hunter's Statistical account.

বাণিজ্য বা যুদ্ধকার্য্যের নিমিত্ত তাহাদের প্রয়োগ। রাজকীয় নানা কার্য্যে তরণীর আবশ্যক হইত; মাল পত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম হাতী ঘোড়া পর্য্যন্ত নৌকায় লইয়া যাইতে হইত। জলপথে কোন স্থান আক্রমণ করিতে হইলে তজ্জন্য যুদ্ধ জাহাজ বা ঐ জাতীয় ক্ষুদ্র নৌকা লাগিত। বাদশাহ ও ওমরাদের ভ্রমণের নিমিত্ত ছোট বড় বজরা থাকিত। পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূলে, বিশেষ ভাবে বাঙ্গলায় বিস্তর বাদশাহী নৌকা রাখিতে হইত; নানা স্থানে জাহাজ ও নৌকা নির্ম্মাণের কারখানা ছিল; তজ্জন্য কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহও এই বিভাগের কার্য্য ছিল।

নৌ-বিভাগের দ্বিতীয় কার্য্য ছিল, নাবিক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সংগ্রহ করা। সেকালে ভারতের উপকূলভাগে সুদক্ষ নাবিকের অভাব ছিল না। তাহারা নদীগর্ভে কোথায় ডাঙ্গা, কোথায় খাল, বা উপকূলের কোন অংশ দিয়া পোত চালান নিরাপদ, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিল; জোয়ার বা বাতাসের গতি বুঝিত। প্রতি জাহাজে না-খোদা বা অধ্যক্ষ ব্যতীত নিম্নের লিখিত কর্ম্মচারী থাকিত (১) মৌলিম্ (ইংরেজী মেট্)—জলের মাপ, নক্ষত্রের অবস্থান প্রভৃতি নাবিকের প্রধান কার্য্যে ইহার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; প্রকৃত পক্ষে ইনিই জাহাজ চালাইতেন (২) সারঙ্গ্—জাহাজের উপরে সাধারণ কর্ত্তৃত্ব, এবং জাহাজ ভিড়ান বা খোলা ইহার ভার। একালের ষ্টীমারে সারংই কর্ত্তা। (৩) সুখান্ জিয়ার (বর্ত্তমান সুখানি) হা'ল ফিরান ঘুরাণ ইহাদের কার্য্য; বড় বড় জাহাজে ২০ জন পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর লোক লাগিত। (৪) পঞ্জেরী—মাস্তলের উপরে উঠিয়া, অন্য জাহাজ বা ডাঙ্গা দেখিলে, ঝড় ঝাঁটি উঠিবার সম্ভব বুঝিলে, অথবা অন্য কোন বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় থাকিলে ইহারা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইত। (৫) তুণ্ডীল্ খালাসীদের সর্দ্দার। (৬) গুম্টি—জাহাজের জল সেচিবার খালাসী (৭) খার্ওয়া—সাধারণ খালাসী—পাল টাঙ্গান, নঙ্গর তোলা ফেলা, প্রভৃতি ইহাদের কার্য্য। এই সকল ছাড়া মাল তোলা নামান প্রভৃতি পরিদর্শনের জন্য না খোদা খেসেব্, ভাণ্ডারী, কেরাণী থাকিত। যুদ্ধ জাহাজে গোলন্দাজ রাখা হইত।

তৃতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল, নদী ও নদীমুখ পর্য্যবেক্ষণ করা। এই কার্য্যে নিয়োজিত লোকেরা মালের নৌকা ও খেয়াঘাটের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিত; বিদেশী লোক আসিলে নৌকা ভাড়া করিয়াও দিত। নৌ বিভাগের চতুর্থ কার্য্য মাশুল নির্দ্ধারণ ও আদায় করা; আকবরের সময় হইতে মোগল অধিকারে 'চেহেলে দো' (চল্লিশে দুই) অর্থাৎ শতকরা ২॥ টাকা বিদেশী মালের মাশুল ছিল। নদীতে মালের মাসুল (toll) নানা প্রদেশে নানারূপ ছিল।

রাজা টোডর মল্লের সঙ্কলিত পূর্ব্বে উল্লিখিত ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের আসল্ জমা তুমারে বঙ্গীয় নৌবল রক্ষার যে ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে দেখা যায় যে, নাওয়ারা বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি পরগণা বা মহাল প্রদত্ত হইয়াছিল। আম্লে নাওয়ারা বিভাগের অধীনে প্রথমে তিন সহস্র তরণী ছিল, কিন্তু বঙ্গবিজয়ের পরে শান্তি স্থাপিত হইলে যুদ্ধ জাহাজ, বাণিজ্যপোত এবং সাধারণ নৌকা সমস্তের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ৭৬৮ খানি সরকারী তরণী রাখা হইয়াছিল; ইহা ব্যতীত জমিদারী নৌকা ছিল, আবশ্যক হইলেই তাহাও সরকারী কার্য্যে লাগিত। এই সময়ে ৯২৩ জন ফিরিঙ্গী (পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় খৃষ্টান) নাবিক বাদশাহী নাওয়ারা বিভাগে চাকরী করিত। সমগ্র বিভাগের মাসিক ব্যয় ২৯২৮২ টাকা পড়িত। নূতন তরণী নির্ম্মাণ, পুরাতন মেরামত এবং অন্যান্য বাজে খরচা লইয়া বার্ষিক ,৮৪৩,৪৫২ টাকা

বাঙ্গলার আম্‌লে নাওয়ারার ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১২)। মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুর উৎপাত নিবারণের নিমিত্ত নদীমুখে এবং বঙ্গসাগরের উপকূলে বন্দর বালেশ্বর পর্য্যন্ত স্থান লইয়া বাদশাহী রণতরী রক্ষিত হইত। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হইলে নাওয়ারা বিভাগের সদর অফিস পোতাধ্যক্ষের অধীনে ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে ছিল এবং এই কারণেই ঢাকা জেলার অধিকাংশ ভূভাগ নাওয়ারা জায়গীরে পরিণত হইয়াছিল। নাওয়ারা জায়গীর ভূমি ব্যতীত মীর বহরী নামক শুল্ক হইতে এই বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। নূতন নৌকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে নৌকাধিকারাকে আকারের পরিমাণ অনুসারে ১।০ সিকা হইতে আট আনা শুল্ক দিতে হইত। মীর বহরী কাছারীর কর্ম্মচারিগণ বিদেশ হইতে যে সমস্ত নৌকা আসিত, তাহার উপরও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মাশুল আদায় করিবার ভার পাইত। এইরূপে আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগ হইতে নাওয়ারা বিভাগের সুব্যবস্থা হইয়া আওরঙ্গজেবের সময়ে সুদক্ষ সায়েস্তা খাঁর হস্তে ইহার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সানুচর ঢাকার নবাবগণের জল ভ্রমণের জন্য ক্রমশঃ যে সমস্ত ময়ূরপঙ্খী, বজরা এবং দ্রুতগামী ছিপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তন্মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি তৎকালের বাদশাগণের রাজ্যাভিষেকের দিবসে একবার করিয়া দিল্লীর অভিমুখে শোভাযাত্রা করান হইত। দিল্লী পৌঁছিতে হইবে, এমন কোন কথা ছিল না ; শেষ দিকে ঐ সমস্ত তরণী পদ্মা বাহিয়া ঘুরিয়া মুর্শিদাবাদে আসিত।

মহাবল মানসিংহের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে বিক্রমপুরপতি কেদার রায় জলযুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নৌবল যথেষ্ট ছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। বাক্‌লা বা চন্দ্রদ্বীপাধিপতিগণের জল-যুদ্ধের

(১২) Grant's Analysis—Fifth Report.

উপকরণই অধিক ছিল ; তাঁহারা বলে ও কৌশলে মগ ফিরিঙ্গীদিগকে নিরস্ত করিয়া যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যও 'বাহান্ন হাজার ঢালি' সত্ত্বে নৌবল সঞ্চয়ে অবহেলা করেন নাই ; জাহাজ ঘাটা, চকশ্রী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার তরণী নির্ম্মিত ও নদীমুখে রক্ষিত হইত। জলপথে বল সংগ্রহের আয়োজন তাঁহারও আবশ্যক ছিল ; মগ ফিরিঙ্গী তাঁহার অধিকার ও উপেক্ষা করে নাই। নবাব ইস্‌লাম্ খাঁ একবার মগরাজের সহিত সম্মিলিত ফিরিঙ্গী গঞ্জালের রণতরী বিধ্বস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; পরবর্ত্তী নবাবগণের অমনোযোগে মগের দল সুবিধা পাইলেই সময়ে অসময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ উৎসন্ন করিত, তাহাও দেখা গিয়াছে। আরঙ্গজেবের সময়ে মনস্বী মীরজুমলা শাসনভার পাইয়া পুনরায় বাঙ্গলার নৌবলের উন্নতি সাধন করেন। আসাম যুদ্ধে তাঁহার সংগৃহীত রণতরীই মোগলের প্রধান বল ছিল। ১৫৯ খানি কোশা, ৪৮ খানি জাল্‌বা, ১০ খানি গ্রাব, ৫০ খানি পাতিলা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী লইয়া সর্ব্বসমেত ৩২৩ খানি নৌকা এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল (১৩) মীরজুমলার অকাল মৃত্যু ঘটনার পরে বাদশাহী রণতরীর দৈন্য দশায় মগেরা ঢাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নাবধ্যক্ষ মানোয়ার খাঁকে নির্জ্জিত করিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর আমলে পুনরায় বাদশাহী নৌবিভাগের পঙ্কোদ্ধার সাধন ঘটে। অধ্যাপক শ্রীমান রাধাকুমুদ বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরীর এক পারসী পুথির নির্দ্দেশ হইতে দেখাইয়াছেন যে নবাব সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের নানা স্থানে পেয়াদা পাঠাইয়া সুদক্ষ মিস্ত্রীদিগকে ধরিয়া আনাইয়া নৌকা নির্ম্মাণে নিয়োজিত করেন ; নৌকা গঠনের প্রধান স্থানগুলি হইতেও যথা সম্ভব তরণী

(১৩) "ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া" হইতে অধ্যাপক ব্লকম্যান্ ইহা দেখাইয়াছেন (J. A. S. 1872).

সংগৃহীত হইয়াছিল। এইরূপে অবিলম্বে তিনশত তরণী সংগ্রহ করিয়া তিনি মগ দলনে সমর্থ হন; কিরূপে তাঁহার নিদেশে বাদশাহী নৌবল চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী মুখে মগদলকে নির্জিত করিয়াছিল অন্যত্র তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই যুদ্ধে মোগলের ১৫৭ কোশা, ৯৬ জাল্‌বা অন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী লইয়া ২৮৮খানি রণতরী নিয়োজিত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর আমলে বৃহৎ বাণিজ্য পোতের কথা টমাস বৌরী বলিয়াছেন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। একালেও বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান নাবিকের কার্য্যে সুদক্ষ ছিল, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

ষোড়শ অধ্যায়

সাধারণ অবস্থা

মুসলমান শাসনে বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থার কথা বর্ত্তমান গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে, কিন্তু অনেক কথা বলা হয় নাই। এজন্য এই অধ্যায়ে তাহা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইব। একালে কোন দেশের আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে লোকে প্রধানতঃ সুখ-সাচ্ছন্দ্যই (Comforts) ইহার মানদণ্ড মনে করিয়া লন; কিন্তু কাল্পনিক সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে যে সমাজের সুখবৃদ্ধি হয় না, একথা ভুলিয়া যান। এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালের অবস্থা বড়ই সুখের ছিল কল্পনা করিয়া লইয়া ইহার পোষক প্রমাণ স্বরূপ বলিবেন; যথা, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দৃষ্টান্ত,—ভূস্বামী দত্ত সামান্য জমি ও বৃত্তি তাঁহার সম্বল ছিল; উদরান্নের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে

হইত না, চাকরীর নিমিত্ত ছুটিয়া বেড়াইতেন না। একান্ন-বর্ত্তিতার গুণে আত্মীয় স্বজনেরও পালন হইত; অতিথি অভ্যাগতের সৎকার চলিত; ছাত্র পোষণ করিতেন, আশ্রিতকে অন্ন দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জমিতে ধান, অন্য শস্য ও কাপাস হইত; তরিতরকারীও বাটীতেই প্রায় জন্মিত; ঘৃত দুগ্ধের অভাব ছিল না। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। কায়স্থের কথায় পাটোয়ারি হইতে উর্দ্ধ-তন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটা হিসাব দেখাইয়া সুখ সাচ্ছন্দ্যের সমর্থন চলিবে। কিন্তু সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিষয়ে এই সমালোচক কোন বাঙ্ নিষ্পত্তি করিবেন না। ভদ্রলোক সুখে থাকিলেই দেশের অবস্থা ভাল হইল! সেকালের শিল্প বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত লোকের কষ্ট ছিল না, ইহা বলা যাইতে পারে; কারণ তাহারা নিজ নিজ পরিশ্রম-জাত দ্রব্যের বিনিময়ে সুলভে শস্য পাইতে পারিত। কিন্তু কৃষিজীবি লোকের বেলায় আর সেকথা বলা চলিবে না। কবিকঙ্কণের আত্ম-কথায় দেখা গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মণের ও সর্ব্বথা সুখ ছিল না। কাব্য-কথিত ভাঁড়ু দত্তের শ্রেণীর কৃপা ভিক্ষার্থী কায়স্থও অনেক ছিল; ঔষধের থলি বগলে বৈদ্য-রাজ সম্বন্ধেও ঐ কথা। উচ্চ জাতির সাচ্ছন্দ্য ছিল স্বীকার করিলেও কৃষক এবং শ্রমজীবির যে সুখ ছিল, ইহা কেহই প্রমাণ করিতে পারিবেন না। যে কালে টাকায় পাঁচ মণ ধান্য বিক্রীত হইত, সাধারণ শ্রমজীবির মজুরী চার পয়সারও কম ছিল, তখন তাহারা বস্ত্র ও গৃহের উপকরণ যে ভাল করিতে পারিত তাহা বলা চলে না। বাস্তবিক বিদেশীরা আসিয়া এই শ্রেণীর লোকের কষ্টই দেখিয়াছেন। অন্যান্য সমালোচক আবার সেকালের কষ্টের একটা মসীময় আলেখ্য দেখাইয়া একালের লম্বশাট-পটাবৃত তথা-কথিত ভদ্র বাঙ্গালীর সুখের কথা বলিতে চান।

ইঁহারা ও দেশের ধনাগম এবং সুখবৃদ্ধি বর্ণনায় একদেশদর্শী। অতএব প্রকৃত অবস্থার আলোচনা হওয়া উচিত।

অতীতের চিত্রপট যথাযথ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার উপকরণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নাই ; বাঙ্গলা সাহিত্যেরও সকল পুঁথির এখনও সন্ধান হয় নাই। ভবিষ্যতে দক্ষতর লোকে উহা হইতে অনেক কথা দেখাইতে পারিবেন। এখানে সেখানে খোঁজপাত করিয়া আমার সামান্য শক্তিতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই দেখাইব। প্রথমে প্রাচীন বঙ্গের লোক সংখ্যার কথা ; ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা একবাক্যে বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ বহুজনপূর্ণ ; তাঁহারা অবশ্য নিজ নিজ দেশের তুলনায় এইরূপ মন্তব্য লিখিয়াছেন, একালের হিসাবে জনপূর্ণ নহে। রাজধানী গৌড়ের কথায় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ ডা ব্যারস্ বলেন, তথায় দুই লক্ষ লোক বাস করিত ; বার্ব্বোসা বাঙ্গেলা নগর বহু জনপূর্ণ লিখিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে দুই এক জন মুসলমান লেখক গৌড়ে বার লক্ষ লোক বাস করে বলায় ইহা অত্যুক্তি কি না এই বিতর্ক উঠিয়াছে। কিন্তু মোগলের সৈন্য সামন্ত ও তাহাদের অনুচর বর্গ আসিয়া পড়ায় বর্ত্তমান কলিকাতার মত লোক সংখ্যা হওয়া আশ্চর্য্য নহে ; গৌড় আয়তনেও অল্প ছিল না। অধিক লোক সমাগমে এবং জল খারাপ হওয়ায় মারী ভয়ে উৎসন্নও হইয়াছিল। বঙ্গের পল্লীর লোক সংখ্যা সম্বন্ধে কেহ কিছু স্পষ্ট লেখেন নাই। তবে আবাদ এবং সৈন্য সংখ্যা দেখিয়া লোক সংখ্যার অনুমান চলিতে পারে। বহু জমি পতিত ও জঙ্গলময় ছিল, ইহা বৈদেশিকের ভ্রমণ বৃত্তেই পাই। পূর্ব্বোত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মত ঘন বসতি ছিল না। রাল্‌ফ ফিচ্‌ কুচবেহার হইতে উত্তর বঙ্গের অনেকদূর জঙ্গলময় ও শ্বাপদ সঙ্কুল ছিল, বলিয়াছেন।

ক্রমশঃ আবাদ ও লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছিল। আকবরের সময়ে আইন্ আকবরীতে নির্দ্দিষ্ট মত মহালের রাজস্ব, জমিদারী সৈন্য এবং অন্যান্য বিবরণ আলোচনা করিলে ধারণা হইবে যে, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ বহু জনপূর্ণ ই ছিল। জীবন-সংগ্রাম বা অন্নকষ্ট বঙ্গবাসীকে তত পীড়ন করে নাই।

সাধারণ বাঙ্গালীর আবাস-গৃহ পল্লী প্রদেশে কাঁচা খড়ের চালের ছিল ; এখনও তাহাই আছে। বাঙ্গলা ঘর অর্থাৎ বড় মত চারচালা বা আটচালাই বর্দ্ধিষ্ণু লোকের আবাস গৃহে। মাণিক চাঁদের গীতের উদুনা রাণার মুখে বলান হইয়াছে 'বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালী'। বাঙ্গলা ঘর, কথাটিই বাঙ্গলার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এই বাঙ্গলাও আবার স্থান বিশেষে মাটির, ছেঁচা বাঁশের বা কাঠের দেওয়ালের উপরে গঠিত হইত ; বড় মত ঘর গুলিকেই বাঙ্গলা বলিত, এখনও বাহিরের বৈঠকখানার বড় ঘর খানিকে পশ্চিম বঙ্গে বাঙ্গলা বলে। এই নাম লইয়াই সরকারী চালওয়ালা বড় ঘর গুলি ডাক বাঙ্গলা আখ্যা পাইয়াছে ; এখন অবশ্য ইটের বাঙ্গলা (সোণার পাথর-বাটীর মত) হইতেছে। দরিদ্র লোকের বেড়ার ঘর হইতে বাঁশের ছোট বাঙ্গলা পর্য্যন্ত উঠিত। পশ্চিমের মত খোলায় ছাওয়ান প্রথা একালের। মধ্যযুগে বিদেশীয় লোকে এদেশে আসিয়া বাঁশের ঘরই বেশী দেখিয়াছেন। আইন আকবরীতে আবুল্ ফজল্ লিখিয়াছেন 'বাঙ্গলা দেশের ঘরগুলি বাঁশে নির্ম্মিত ; কিন্তু খুব বড় বড়ও হয় এবং অনেক দিন স্থায়ী হয়। একখানি ঘরে পাঁচ হাজার টাকা বা আরও বেশী ব্যয় পড়িতে পারে।' এখানে একটু গোল আছে, তিনি শুনিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বাসের ঘর প্রায়ই বাঁশের ; আবার চালের ঘরে (কাঠে সাজান) পাঁচ হাজার ব্যয়ের গল্প শুনিয়া থাকিবেন। অনেকের ইহা অসম্ভব মনে হইবে,

কারণ আকবরের সময় পাঁচ হাজার টাকা বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের কাঠের খোদকারী করা দোতালা মাটীর ঘর যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা আশ্চর্য্য মনে করিবেন না। আমার মত লোকেও শালের কাঠ (পাকা চৌকর) খণ্ড খণ্ড করাইয়া এখনও হাজার টাকা বা বেশী খরচে বাঙ্গলা বৈঠকখানা করে। পাটুলীর রাজাদিগের যে প্রাচীন ভগ্নপ্রায় চণ্ডীমণ্ডপ (দেওয়াল ইটের) ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার চালের সাজই দু'হাজার টাকা গ্রাস করিতে পারে। অনেক চাঁলের ঠাট পূর্ব্বে বেতের কারিকরী ও চিত্রাদিতে সজ্জিত করা হইত। সহরে অবশ্য সেকালেও অনেক ইষ্টকালয় ছিল। গৌড়ের সমৃদ্ধি দেখিয়া বৈদেশিক পর্য্যটকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন; টাড়া বা রাজমহলে সাধারণ ভদ্র লোকের বাস তত অধিক হয় নাই। কিন্তু ঢাকায় শত বর্ষ মধ্যে বহুতর ইষ্টকালয় এবং প্রস্তরের মসজীদ, গৃহদ্বার প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাগরিক অর্থশালী লোকের ইষ্টকালয় বা পল্লীর জমিদারের গড়বন্দী প্রকাণ্ড প্রাসাদ বহুকাল হইতে বঙ্গবাসী দেখিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেকালের নগরেও পাকা ঘর অধিক ছিল না। পল্লীতে দরিদ্রের গৃহ দৈন্যদশার যথেষ্ট পরিচয় দিত এ কথা ফিচ্ হইতে বুকানন্ পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর ইংরেজ লক্ষ্য করিয়াছেন। গৃহের আসবাব একালের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মতই কদর্য্য ছিল। নগরগুলি প্রায়ই নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় দৈর্ঘ্যে বেশী ছিল। মধ্যের প্রশস্ত রাস্তা ভিন্ন গলিগুলি নিতান্ত অল্প পরিসর করা হইত; এমন কি সামান্য বলশালী লোকে নগরের ছাদে ছাদে লাফাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারিত। প্রাচীন কাশিম বাজারে ছাদে বাল্যে ঘুরী উড়াইয়া বহুদূর গিয়াছে এমন এক অশীতিপর বৃদ্ধ আমার নিকট গল্প করিয়াছেন; ঢাকার কথাও তাই। নগরের গৃহের দ্বারগুলি ছোট ছিল; জানালা

ত তখন নামে এবং কার্য্যে গবাক্ষ মাত্রই ছিল; এই সকল কারণেই একবার মারীভয় হইলে আর রক্ষা থাকিত না। নগরোপান্তে প্রকাণ্ড উদ্যান-বাটী নির্ম্মাণ সেকালের অর্থশালী লোকও করিতেন; কিন্তু প্রাচীন সহরে নিরাপদে থাকিবার নিমিত্ত প্রায়ই চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইত, নগরের মধ্যে বৃক্ষাদি অতি অল্পই থাকিত। গ্রীষ্মে ধূলির উৎপাত নিবারণের জন্য রাজধানীতে সরকারী ভেস্তি থাকিত; গাড়ী ঘোড়ার অভাবে, ইহাদের কার্য্য সহজ-সাধ্য ছিল।

মুসলমান অধিকারে বাঙ্গলায় রাজপথ নির্ম্মাণে শের শাই যে পথি-প্রদর্শক এমন নহে। হিন্দুযুগের প্রাচীন জাঙ্গাল গুলি অবলম্বন এবং তাহাই দৈর্ঘ্য বিস্তারে বর্দ্ধিত করিয়া গৌড়ের বাদশাহেরা নানা দিকে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমে সৈন্য-চালনার সুবিধার নিমিত্ত পথের প্রয়োজন হইয়াছিল; কালে দেশের দূরবর্ত্তী প্রধান স্থানগুলি লোকের পক্ষে সুগম করিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ বড় বড় রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছিল। এই সমস্ত শরণি মাটি কাটিয়া উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত হইত; বৃহৎ রাজপথ গুলির উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। হোসেন শার সময়ে রাজমহলের দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ প্রাচীন গৌড়ের ঠিক অপর পার হইতে পূর্ব্বকালের রাজপথকে অবলম্বন করিয়া এক সুবিস্তৃত শরণি মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম অংশ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে সপ্তগ্রামের দিকে নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও মুর্শিদাবাদের লোকে উহাকে বাদশাহী শড়ক বলে। সেকালে রাজপথ গুলির দুইপার্শ্বে বৃক্ষ রোপিত হইত, এবং মধ্যে মধ্যে সরাই ও পান্থনিবাস থাকিত। সেখানে রক্ষক নিযুক্ত থাকায় পথিক ও বণিকদল নির্ভয়ে রাত্রি বাস করিতে পারিত। পাকা রাস্তা কেবল সহরের মধ্যেই ছিল, এ কথা বলা বাহুল্য। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই সমস্ত মাটির বড় রাস্তায় গোযান ও অশ্বাদি চলিত।

ভার বাহী বলদ (ছালার গরু) দ্বারা মাল পত্র লইয়া যাওয়াই পল্লী অঞ্চলের ব্যবস্থা ছিল। বহুতর নদী এবং শাখা নদী থাকায় বাণিজ্য এবং দূরে যাতায়াত নৌকা পথেই চলিত। পূর্ব্বকালে হিন্দুর মধ্যে গোযান ব্যবহৃত হইত না; হাঁটিয়া পথ চলা ভদ্র লোকের তখন কীর্ত্তি বলিয়া গণিত হয় নাই। চৌপালা বা তাঞ্জাম এবং সাধারণের দোলা (ডুলি) প্রধান যান ছিল। আবুল ফজল্ এই চৌপালাকেই লাল বা জরদা আচ্ছাদন দেওয়া "সুখাসন" বলিয়াছেন; বাঁশের মধ্যস্থল বাঁকাইয়া তাহারই উপরে কাপড়ের ঘের ও ছত্রি চড়ান হইত এবং সেই বাঁশেরই দুই পার্শ্ব বাহকের স্কন্ধে থাকিত। মোগল অধিকার হইতে পাল্কী চৌপালার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ হিন্দুরা বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে চিরদিন চৌপালা ও ডুলী ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশ বলিয়া ভারতবর্ষে সাধারণ লোকের পরিচ্ছদে কোন কালেই আড়ম্বর বা পারিপাট্যের বাহুল্য হয় নাই। মিগাস্থিনিসের বিবরণীতে একখানি কাপড় পরিধেয় ও অন্যখানি উত্তরীয় স্বরূপে ব্যবহৃত হইত, বুঝা যায়। ইহাও রাজসভার ভদ্র লোকের পক্ষে; পল্লী বাসীর শীত ভিন্ন অন্য সময়ে আরও অল্পে চলিত। চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ণনায় ও বৈদেশিক পর্য্যাটকের নির্দ্দেশেও ইহাই বুঝা যায়। ইউরোপের শীতল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা এ দেশের নগ্নপ্রায় পল্লী-বাসী দরিদ্রলোককে দেখিয়া বিস্মিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই জন্যই ইঁহারা যে প্রদেশে গিয়াছেন, সেখানেই লোকের পরিচ্ছদ বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন। বার্থেমা ও বার্বোসা গুজরাট এবং দক্ষিণ অঞ্চলের হিন্দুদের কথায় বলিয়াছেন, ইহারা প্রায় ন্যাংটা, সামান্য একটু কাপড় মাত্র মাজায় জড়ায়। বার্বোসা দক্ষিণ দেশের লোকের মাথায় এক প্রকার পাগড়ী লক্ষ্য করিয়াছেন। ডি লা ভ্যালে এবং

লিন্‌সকটেন্ কালিকট ও গোয়ার নিকটবর্ত্তী লোকের বিষয়েও ঐ কথাই লিখিয়াছেন। জামা বা উত্তরীয়ের কথা ইঁহারা কিছুই বলেন নাই। রল্‌ফ ফিচ্ দক্ষিণ দেশ এবং কাশী উভয়ের বর্ণনাতেই মাজায় এক খণ্ড বস্ত্র মাত্র স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ, আর কিছু নাই, লিখিয়াছেন। তবে কাশী অঞ্চলে শীতের সময়ে তুলা ভরা জামা ও টুপি ব্যবহার করে বলিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলায় আসিয়া টাঁড়া, বাকলা ও সোণার গাঁয়ের লোকের বর্ণনায় ও ঐ একটু মাত্র কাপড় মাজায় জড়াইবার রীতিই লক্ষ্য করিয়াছেন (১)। ইহা হইতে, উত্তরীয় ব্যবহার ক্রিয়া-কাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল, মনে হয়; বাঙ্গলা কাব্যের জোড়া বর্ত্তমান পাটের জোড় এখন এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলা ঘামের দেশ বলিয়া গামোছা উত্তরীয় স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। কৃষক ও শ্রমজীবি লোককে ধুতি গামছায় সজ্জিত হইয়া কুটুম্ব বাড়ী যাইতে বাল্যকালে লক্ষ্য করিয়াছি। এ যুগে কোট কামিজ ভিন্ন কাহারও চলে না; প্রয়োজন বা অভাব দেখা দেখি শীঘ্রই বাড়ে। পাঠান-বঙ্গে বিশিষ্ট লোকের উত্তরীয় বা দোবজা এবং মহিলারও ভুনী ফোতা ব্যবহারের কথা বাঙ্গলা কাব্যে পাই; 'গরীবের খুঞা ধুতী উড়িতে খোসলা' এবং শীতের খোকড়ি মাত্র আছে (২)। বাবর বাদশা স্বরচিত বিবরণীতে লিখিয়াছেন,—

'এ দেশের কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর লোকে প্রায় উলঙ্গ; লজ্জা নিবারণের

---

(১) Peaple of Gujrat :—Some of them go naked, others cover only their privities' Varthema. They 'go naked, their privy members only coverd with a cloth' Linschoten. Peaple of Tanda go naked with a little cloth round ther waist' R. Fitch.

(২) বৈষ্ণব সাহিত্য ও কবিকঙ্কণ।

নিমিত্ত ইহারা একটু বস্ত্র খণ্ড মাজায় বাঁধে। ইহা নাভি হইতে তুই বিষৎ পরিমাণ নিয়ে পড়ে; এবং আর এক টুকরা উহারা মধ্যভাগ হইতে বাঁধিয়া উরুর ভিতর দিয়া চালাইয়া পিছনে বাঁধে, ইহারা উহাকে ন্যাঙ্গোটা বলে। স্ত্রীলোকে একখানি কাপড়ের অর্দ্ধেকটা পরে এবং বাকী অর্দ্ধেক মাথায় দেয়'। আবুল ফজল এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। শরীরের উর্দ্ধভাগের আবরণ কেহই উল্লেখ করেন নাই; দরকারও ছিল না। হিন্দুরা জামা জোড়া পরা মুসলমানের বিশেষতঃ মোগলের নিকট শিখিয়াছেন। পল্লী বাসী সাধারণ লোক প্রায়ই দরিদ্র ছিল; উদরান্ন এবং লজ্জা ও শীত নিবারণের সামান্য বস্ত্র জুটিলেই তাহাদের যথেষ্ট হইত। নাগরিকেরা রাজসভার মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া পোষাকের ভক্ত হইলেও পল্লীতে ইহার অনুকরণ অধিক হয় নাই; তাই ইংরেজ অধিকারের প্রথম যুগেও ডাঃ বুকানন্ দিনাজপুর রঙ্গপুরে ঐ অর্দ্ধ উলঙ্গ দরিদ্র প্রজা লক্ষ্য করিয়াছেন। শস্তা বিলাতী কাপড়ের যুগেও নগরের ছোঁয়াচে রোগ হইতে দূরে থাকায় গরীব লোকে সাধ্য থাকিলেও বস্ত্রের জন্য অধিক ব্যয় করে নাই, তাই বিদেশীর কাছে অসভ্য আখ্যা পাইয়াছে। বার্বো সা বাঙ্গেলা নগরের লোকে সাধারণতঃ জুতা ব্যবহার করে লিখিয়াছেন। নাগরিক পাদুকায় অভ্যস্ত হইলেও পল্লী অঞ্চলে উহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, বোধ হয় না। ছাতা, তালপাতার এবং ভদ্রলোকের গুয়া পাতার ছিল। বেতের শিক দেওয়া কাপড়ের ছাতা বিশিষ্ট লোকের মস্তকোপরি ভৃত্যে ধারণ করিত; এইরূপ বড় বড় ছাতা নগর সঙ্কীর্ত্তন বা শোভা যাত্রায় ব্যবহৃত হইত।

কৃষিকার্য্যই বঙ্গবাসীর চিরকালের বল ও সম্বল; আবার ধানের চাসই প্রধান চাস। কালিদাসের 'আপাদ-পদ্ম প্রণতা কলমা ইব তে রঘুন্' উক্তির 'কলম' আবুল ফজলের গ্রন্থেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তুই জনেই

বিদেশ হইতে বর্ণনা শুনিয়া লিখিয়াছেন। কবি না হয় পূর্ব্ববঙ্গের কথাই বলিয়াছেন, ধরিয়া লইলাম; আইন আকবরীর বিবরণ এইরূপ ঃ—'বাঙ্গালার প্রধান শস্য ধান্য। ইহা বহু প্রকারের আছে; প্রত্যেকের এক একটি লইয়া একত্র করিলে একটি জালা পূর্ণ হইতে পারে। এক জমিতে বৎসরে তিনবার করিয়া ধান হইলেও উৎপন্ন শস্যের ক্ষতি হয় না। জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান গাছও বাড়ে, সেজন্য শীষ কখনও ডুবিয়া যায় না; অভিজ্ঞ লোকে দেখিয়াছে এক রাত্রিতে ৬ হাত পর্য্যন্ত ধানগাছ বাড়িয়া উঠে (জ্যারেটের অনুবাদে, ৬০ হাত!)। শস্য এদেশে সর্ব্বদাই প্রচুর জন্মে; চাউল এবং মৎস্যই প্রধান খাদ্য, তাহারা যব গম প্রভৃতি তত স্বাস্থ্যকর মনে করে না। এখানে জমি মাপিয়া রাজস্ব স্থির করা হয় না; শস্যের পরিমাণ অনুসারে হয়। গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার মধ্যে শস্যের ভাগ হয় না; প্রজারা কিস্তি মত টাকা বা মোহর খাজানা আদায়ের কাছারীতে দিয়া যায়।' ধান্য প্রচুর হইলেও মূল্য অতি অল্প ছিল বলিয়া এই টাকা মোহরে খাজানা, দেওয়া বড় সহজ ছিল না। ইক্ষু, কার্পাস ও রবিশস্য অল্প বিস্তর প্রায় সর্ব্বত্রই হইত। মোগল অধিকারে রঙ্গপুর অঞ্চলে কিছু পাট জন্মিত; রেসম কোন কোন স্থানে হইত; পরবর্ত্তীকালে ইহার উন্নতি হয়।

তুলার চাস সেকালে বাঙ্গলায় প্রায় সর্ব্বত্রই ছিল। ডাঙ্গা অথচ সামান্য বালুকা মিশ্রিত জমিতেই কাপাস গাছ ভাল হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল স্থানেই অল্প বিস্তর কাপাস জন্মিত; কিন্তু সূক্ষ্ম দীর্ঘ আঁশের কাপাস ঢাকার বর্ত্তমান ভাওয়াল অঞ্চলের মাটীতে ও ময়মনসিংহের দক্ষিণভাগে ভাল হইত। ঢাকার এই স্থান এই জন্যই কাপাসিয়া পরগণা নাম পাইয়াছিল। এখানকার ডাঙ্গার লাল মাটি বালুকাময়; প্রাচীন কাল

হইতে এখানে এক জাতীয় দীর্ঘ আঁশের কাপাসের চাসের উন্নতি হইয়া মধ্যযুগে উহার তুলা হইতে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তত হইত। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার সীমান্তে ব্রহ্মপুত্রের শাখা বানার নদীর তীরে টোক নামক স্থান প্রাচীনকালে তুলা ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ছিল। টলেমির টোগ্‌মা এবং আল এদ্রিসি ও অন্য পর্য্যাটকের টোকা বা টোকেক্ যে এই স্থানে তাহা, একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে; সেকালে ইহা সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র তটে অবস্থিত ছিল। মধ্যযুগেও এখান হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ও তুলা বিদেশে রপ্তানি হইত; তখন সোণার গাঁ, কাপাসিয়া ময়মনসিংহের জঙ্গল বাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে এই দীর্ঘ আঁশের কাপাসের চাস ছিল; সুতরাং এই প্রদেশের তুলায় যেরূপ সরু সূতা কাটা হইত তেমন আর কোথাও হয় নাই। অনেকে মনে করে, গাছ কাপাসেই মসলীনের সূতা হইত; কিন্তু এটি ভ্রম মাত্র। টেলর সাহেব ১৮৩৮ সালেও দীর্ঘ আঁশের কাপাসে সরুসূতা কাটা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে প্রতি তিন বৎসরের পর এক বৎসর জমি পতিত রাখায় কাপাস ভাল হইত এবং তুলা ক্ষেত হইতে সংগ্রহ করিয়া কৃষকেরা উৎকৃষ্ট বীজগুলি বপনের জন্য রাখিয়া দিত। তৈল বা ঘৃতের শূন্য পাত্রে বীজ রাখিয়া বায়ু প্রবেশ না করিতে পারে এমন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিত; বীজপূর্ণ পাত্র সময়ে সময়ে চুল্লীর উপরে রাখিত। এরূপে কীট প্রবেশ করিতে না পারায় বীজ ভাল থাকিত। তাঁহার সময়ে ঢাকা অঞ্চলে বৎসরে একবার কখনও দুইবার একই জমিতে কাপাস লাগান প্রথা ছিল। পশ্চিম বঙ্গে জমি বদল করিয়া কাপাস লাগান দেখিয়াছি। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বটানিকাল বাগানের অধ্যক্ষ ডাঃ রক্সবর্গ মসলিন্ সূতার কাপাসের গাছের একটি বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, এই কাপাসের গাছের রং লাল; পাতার বোঁটা এবং শিরা-

গুলিও লাল বর্ণ; শাখা অল্প সংখ্যক এবং সেগুলি ঠিক সোজা উপরের দিকে উঠে; পাতার ফলকগুলি সূক্ষ্ম। ফুলের পাপ্‌ড়ি গুলির কিনারা রক্তাভ। তুলার আঁশ সুদীর্ঘ, কোমল ও মসৃণ। কুটি, নরমা ও বেরাটি এই তিন প্রকারের ঐ জাতীয় তুলা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই এই তুলার চাসের অবনতি আরম্ভ হয়; তখনই সাধারণ কার্য্যের জন্য মির্জাপুরী কখনও বা আরাকানী তুলার আমদানীর প্রয়োজন ছিল। শেষে বিলাতী কাপড় সুলভ হওয়ায় মস্‌লীনের তুলার বীজ পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিদেশী কাপাসের বীজ লাগাইবার চেষ্টা করিয়া পোকার উৎপাতে বিফল মনোরথ হইয়াছেন; ঐ মাটীতে যে বীজের গাছ জন্মিতে পারে, তাহা পাওয়া যায় নাই।

ধান্য, ইক্ষু, তুলা এই তিন দ্রব্যই বঙ্গীয় কৃষকের ধনাগমের প্রধান উপায় ছিল। শস্যের মুল্য তখন অতি অল্প থাকায় এবং শস্যোৎপন্ন অর্থই জমিদারের রাজস্ব ও অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের উপায় বলিয়া কৃষকের ধনাগমের সুবিধা ছিল না। পাঠান আমলে আলাউদ্দীনের সময়ে এবং মোগল অধিকারে আকবরের রাজত্বকালে দ্রব্যাদির দর ও লোকের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণী পারসী ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে। উহাতে বাঙ্গলা দেশের শস্যের দর নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও, দেশভেদে উৎপন্ন শস্যের হার ধরিয়া একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করা যাইতে পারে। আলাউদ্দীন্ সৈন্য-বিভাগের ব্যয় সঙ্ক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে রাজ্য মধ্যে শস্যাদির মুল্য নির্দ্ধারণ করিয়া এক অনুশাসন পত্র প্রচারিত করেন। জেয়াউদ্দীন্ বারনীর প্রসিদ্ধ ইতিহাস তারিখ্‌ই ফিরোজশাহী হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া নবাবী আমলের ইতিহাসের শেষ ভাগে দিয়াছি; অত্যাবশ্যক বলিয়া পুনরায় এখানে সেই তালিকা দিলাম :—

গম	এক মণ	৭½ জিতাল
যব	”	৪ ”
শালি (ধান্য)	”	৫ ”
মাষ	”	৫ ”
নাখুদ্ (বুট)	”	৫ ”
মটর	”	৩ ”
লবণ	”	২ ”
চিনি	এক সের	১½ ”
গুড়	”	⅓ ”
চর্ব্বি বা ঘৃত	২½ সের	১ ”
তৈল	৩ সের	১ ”

এই জিতালের মূল্য লইয়া কিছু গোল আছে। ঐতিহাসিক ফেরেস্তার নির্দ্দেশ মতে ৫০ জিতালে এক তঙ্কা; মতান্তরে জিতালের ওজন ১⅓ তোলা (৪)। শেষেরটি ধরিয়া লইলেও জিতাল বর্ত্তমান এক আনার অধিক হয় না। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বাদশা আলাউদ্দীন সৈন্যদলের সুবিধার নিমিত্ত যথেচ্ছচার রাজাদেশ প্রচার করিয়া থাকিলেও সেকালে দ্রব্যের মূল্য ইহা অপেক্ষা না হয় কিছু অধিক ছিল ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও চলে। গুজরাট অঞ্চলে এক প্রকারের ২॥০ সেরের মণের মাপ ছিল বলিয়া কেহ কেহ ফিরোজশাহী ইতিহাসের মণের পরিমাণ সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু মণের দর ও সেরের দর এখানে পাশাপাশি থাকায় এই সন্দেহ ভিত্তিহীন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। গমের মণ পাঁচ

(৪) See, Thomas—Pathan Kings P. 159. আকবর বাদশার সময়ের জিতাল এক দামের ২৫ ভাগের ভাগ ছিল। (৪০ দাম = এক টাকা); এ জিতাল হিসাব করিবার উপলক্ষ্য মাত্র; মুদ্রা নহে।

আনা, ধানের মণ সাড়ে চারি আনা সেকালের পক্ষে অসাধারণ নহে। আইন আকবরীর নির্দ্দেশ মতে আকবর বাদশার সময়ের দ্রব্যাদির নিম্নলিখিত মূল্য তালিকা লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

গম	একমণ	১২ দাম	।০ ৻১৬ গণ্ডা
যব	”	৮	৶৪
চাউল	”		২ টাকা হইতে ॥০ আনা
কলাই দাল	”	১৬	।৵৮ গণ্ডা
মুগের দাল	”	১৮	।৶৪
বুটের দাল	”	১৬½	।৵১২
মটর দাল	”	১২	।০ ৻১৬
ময়দা	”	২২-২৫	॥০ ৻১০-।৵০
রেসম	”	২২	॥০ ৻১০
তৈল	”	৮০	২৲
ঘৃত	”	১০৫	২॥৵০
মেষ মাংস	”	—	১॥৵০
ছাগ মাংস	”	—	১।/০
দুগ্ধ	”	২৫	॥৵০
দধি	”	—	।৶৪
চিনি	”	”	৩ ৶৪
গুড়	”	—	১।৵৮

গোল মরিচ একসের ১৭ দাম, আদা এক সের ২½ দাম, জাফরান এক সের ।০ আনা। ফল মূল ও তরকারি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই অনুপাতেই সুলভ ছিল। উক্ত মূল্য তালিকা আগরা দিল্লী প্রদেশের বয়িম চাউল, কলাই মুগের মূল্য বাঙ্গলা দেশের তুলনায়

অধিক ইহা সহজেই বুঝা যাইবে। গুড়, চিনি প্রভৃতির বিষয়েও ঐ কথা। সে কালে তৈল, ঘৃত ও চর্ব্বি সম্বন্ধে মুড়ি মিছরীর একদর মত ছিল। গব্য সুলভ ছিল ; কিন্তু শরিষার চাস একালের মত দেশব্যাপী হয় নাই।

বাঙ্গলায় দ্রব্যাদির দর সেকালের ইতিহাস বা কাহিনীতে লিখে না। অতি সুলভ, দ্রব্যাদি এদেশে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রীত হয়, দেশের লোক ধন ধান্যে পুষ্ট হইয়া সুখে সচ্ছন্দে থাকে, ইত্যাদি সাধারণ কথা বলিয়াই মুসলমান্ ঐতিহাসিক সন্তুষ্ট। বিদেশী ভ্রমণকারী ক্বচিৎ কোথাও দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; অন্যত্র চাউল, চিনি, কাপড় এখানে যথেষ্ট সুলভ এই ভাবের মন্তব্যেই বক্তব্য শেষ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী কবিরাও তথৈবচ ; মঙ্গল কাব্যগুলিতে দুই এক স্থলে যে মূল্য নির্দ্দেশ দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে বিবাহের খুঞা শাটি ৪৷৷০ গণ্ডায় পাওয়া যায় ; কবিকঙ্কনের বাজার হিসাবেও দুই একটি নমুনা দেখা গিয়াছে। রত্নাকর আইন আকবরীতে আসিয়া দর দামের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাই ; বস্ত্রাদির মূল্যের কথায় আবুল ফজল্ বলিতেছেন :—

তসর কাপড়	এক থান	½ হইতে ২৲ টাকা।
বাক্তা (রেসমী)	"	১½ টাকা হইতে ৫ মোহর
উত্তম মলমল	"	৪ টাকা
ঢাকাই মস্লিন্	"	৩ টাকা হইতে ১৫ মোহর
সূতী কাপড়	"	৷৷০ আনা হইতে ২৲
পট্টু	"	২৲ হইতে ১০৲ টাকা
কম্বল	এক থান	।০ আনা হইতে ২৲ টাকা।

সনাতনের উৎকৃষ্ট ভোট কম্বলের দাম তিন টাকা ছিল, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। বস্ত্রাদি সুলভ হইলেও শস্যের বিনিময়ে উহা

লইতে গেলে কি দশা ঘটিত, বিবেচনা করুন। দিল্লী অঞ্চলবাসী প্রজাকে একখানি সূতী কাপড়ের নিমিত্ত প্রায় দুই মণ গম বা তিন মণ যব মাথায় করিয়া নিকটবর্ত্তী নগরে হাঁটিতে হইত। বাঙ্গলায় অনেক কৃষক কাপাসের চাস করিত ; কিন্তু কাপড় বুনাইবার বানীতেও বড় কম ধান লাগিত না। সে কালের বাঙ্গালী কৃষক কাল্পনিক প্রয়োজনের সৃষ্টি করে নাই ; পুরুষের ধুতি বস্ত্র সাত হাত দীর্ঘ এবং দেড় হাত প্রস্থ হইলেই চরম হইত। গৃহস্থলীর উপকরণ সম্বন্ধেও ঐ কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে উত্তর বাঙ্গলার সাধারণ প্রজার গৃহস্থলীর সজ্জার কথায় ডাঃ বুকানন্ যে মাটীর বাসন, চড়কা, দা, বঁটি, কোথাও একমাত্র ঘটি এবং শয্যার মধ্যে খাটিয়া এবং কাঁথা লক্ষ্য করিয়াছেন, পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। পশ্চিম বঙ্গে সর্প ভয় অল্প বলিয়া খাটেরও প্রয়োজন ছিল না। অবস্থাপন্ন লোকের কয়েকটা মাত্র পিতল কাঁসার বাসন বুকানন যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, বহুকাল ধরিয়া বঙ্গের পল্লী তাহাতেই তৃপ্ত থাকিত। চারি আনার কম্বল ক্রয় কষ্টসাধ্য বলিয়া কাঁথায় কাজ সারিত।

মধ্যযুগের বাঙ্গলায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিন প্রধান বিভাগে কি অনুপাতে লোক নিয়োজিত থাকিত তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও মোটামুটি একটা অনুমান করা যাইতে পারে। কৃষকের পরিমাণ অধিক হইলেও দেশে শ্রম-শিল্পের অবকাশ ও সুবিধা একালের তুলনায় অধিক ছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ পূর্ব্বকালে যে ভাবে ভূমি ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছিলেন, পাঠান অধিকারে দেশীয় ভূম্যধিকারীর হস্তে বরং তাহার বৃদ্ধিই হইতেছিল। শস্য বিক্রয় দ্বারা যথা সময়ে রাজস্ব আদায় দেওয়া কষ্ট সাধ্য হওয়ায় যাহাদের উপরি আয় ছিল তাহারাই অধিক জমি রাখিতে পারিত। এইরূপে সেকাল

হইতেই বাঙ্গলায় মধ্য-স্বত্বাধিকারী 'ভদ্র' প্রজার সৃষ্টি হয়। কৃষক দরিদ্র বলিয়াই ভূমির মূল্য অল্প হইয়া পড়িয়াছিল। কোরফা প্রজা অতি অল্পই ছিল; কোরফা প্রজাকে বাকী খাজানার দায়ে বিব্রত হইয়া ইস্তফা পত্র মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাটীতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতে আমরাই বাল্যকালে দেখিয়াছি,—তখন চাউল টাকায় ৩২ সের পাওয়া যাইত। সুতরাং টাকায় তিন চারি মণ দরের সময়ে খাজানা চালান কেমন সহজ ছিল, বুঝা যায়। শ্রম-শিল্পের মধ্যে তন্তুবায়ের কার্য্য ভালই চলিত। পাঠান অধিকারেও বঙ্গের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। সূক্ষ্ম বস্ত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোকেও অল্পই ব্যবহার করিতে পারিতেন। বৈদেশিকের নিকট ধাতুমুদ্রায় বস্ত্রাদি বিক্রীত হইলেও দরিদ্র দেশীয় লোকে টাকা পয়সার অভাবে কড়ি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। বিনিময় সব সময়ে সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

পাঠান আমলের তঙ্কা আমাদের টাকা; রুপেয়া কথা পরে সৃষ্ট। তাম্র মুদ্রা পূর্ব্বকালে না ছিল এমন নহে, কিন্তু রাজকীয় ছাপ কচিৎ থাকিত। যাঁহারা বিহারে গোরক্ষপুরী ঢেপুয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই জাতীয় মুদ্রার কথা বুঝিবেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত জিতাল আমাদের এদেশে কি পরিমাণে চলিত ছিল, বলা যায় না। নগরে প্রচলিত থাকিলেও পল্লীবাসীর পক্ষে কড়িই যথেষ্ট হইত। আকবর বাদশার সময়ে রৌপ্য মুদ্রা বা রুপেয়া ক্রয় বিক্রয়ের সাধারণ মানদণ্ড হইয়া উঠে। তাম্রমুদ্রার নাম হইল দাম; ৪০ দামে টাকা, ১/৮ দামের এক ক্ষুদ্র দামড়ী বা ছিদাম পশ্চিম প্রদেশের নগরে চলিত। কিন্তু সাধারণতঃ স্থায়ী মূল্যের কোন তাম্রমুদ্রা সেকালে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। আকবরের জিতাল (১/২৫ দাম) আমাদের কড়া গণ্ডার মত, হিসাব কার্য্যে ব্যবহৃত হইত মাত্র। দশ টাকায় আকবরের স্বর্ণ মোহর হইত; অনুরূপ মোহরও

মুদ্রাঙ্কিত হইত, কিন্তু সেগুলি বাজারে চলিবার নিমিত্ত নহে। অন্য দেশের সহিত বিনিময়ে বাদশাহী মোহর এবং রুপেয়া স্থায়ী মূল্যের মুদ্রা বলিয়া গৃহীত হইত; অবশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের দরের ইতর বিশেষ হইলে মুদ্রার মূল্যও সেই অনুপাতে কম বেশী হইত। মোগল রাজত্বে মোহরের মূল্য দশ টাকা হইতে শেষে ১৬ টাকায় উঠিয়াছিল।

সেকালে দেশে টাকা অল্প ছিল বলিলেই যথেষ্ট হয় না; টাকার ব্যবহার করিবার সামর্থ্য এবং সুযোগ ও অল্প ছিল। একালের মত সামান্য সামান্য বিলাসের বা উপভোগের পদার্থ তখন সৃষ্টি হয় নাই; আরসী, বোতাম প্রভৃতি ত ছিলই না; ছুরী, কাঁচিও সাধারণের পক্ষে অনাবশ্যক বোধ হইত। আফিং, মদ্যাদি ব্যবহার না ছিল এমন নহে, তবে সে সব নগরে এবং কারণ-কারীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তামাক পাঠান আমলে আসে নাই; মোগল অধিকারে ক্রমশঃ ইহার অধিকার বাড়ে। শিক্ষা-চিকিৎসাদির জন্য সরকারী ব্যবস্থা কচিৎ ছিল; পল্লীবাসী নিজেও এ বিষয়ে অতি অল্পই ব্যয় করিত। ধনাঢ্য লোকে দেবালয় অতিথিশালা স্থাপন করিতেন; সেবা ধর্ম্ম সেকালের বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ত কথাই নাই; সাধারণ বিত্তশালী পল্লীবাসীও সযত্ন-সঞ্চিত অর্থ জলাশয় প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করিতেন। পুকুর কাটার মজুরী বহুকাল ধরিয়া কড়ি দ্বারা দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিয়াছিল। আদালত খরচা প্রায়ই ছিল না; জমিদারী বিচারে সামান্য নজর লাগিত, কাজির আদালতেও সেইরূপ। একালের মত উকীল মোক্তার ছিল না, তবে আদালত করিতে গেলে সামান্য ঘুঁস ঘাঁস ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে এবং রাজদরবারের কার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীর উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে পূজোপহার সেকালেও চলিত। মোগল অধিকারে দরবার অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল; অধিক

সংখ্যক কর্ম্মচারী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দরবারীর ব্যয় বৃদ্ধিও ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে "উকীল" নামে বড় জমিদার গণের আম্‌মোক্তার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বেতন ভোগী ও ভূমি বৃত্তি-ভোগী এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারী পাঠান আমল হইতেই ছিল। ভূম্যধিকারী ও রাজকর্ম্মচারী-বর্গ যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহার সমস্তই দেশের কাজে লাগত; রাজা ও রাজদরবারের প্রধান-গণের অর্থ সম্বন্ধে ও এই কথা। শ্রমজীবির অবস্থা যাহাই হউক, শিল্পী ও ব্যবসায়ার কার্য্যে লাভ মন্দ ছিল না। পল্লীতে শ্রম-শিল্পের বিস্তার অধিক না হইলেও সেকালের বাঙ্গলা সমষ্টি-গত ভাবে এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উন্নতই ছিল। নগরে ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সাধু বণিককে এবং উৎকৃষ্ট শিল্পী দলকে রাজ-দরবারের তুষ্টি সাধনে সাময়িক অর্থ ব্যয় করিতে হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু মোগল অধিকারে কোন কোন বিদেশীয় পর্য্যাটক রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এই শ্রেণীর লোককে 'নিঙ্গরাইয়া লওয়ার' যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না কারণ এরূপ হইলে সে যুগের শ্রম-শিল্পের ততটা উন্নতি হইত না। পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে ভারতের সম্পদের কথা প্রচারিত হওয়াতেই সাত সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপীয় দল এদেশে আইসে। কৃষক ও শিল্পীর কল্যাণেই সেকালের বাঙ্গলার "জিন্নেৎ উল বেলাৎ" (মর্ত্ত্যে স্বর্গতুল্য) উপাধি হইয়াছিল।

পাঠান অধিকারে বাঙ্গলার রাজ-কর্ম্মচারীবর্গের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সম্পূর্ণ রূপে জানিবার উপায় নাই। পাঠান সামন্ত ও সেনাপতিগণের জায়গীর থাকিত, তাহারই উপস্বত্ব হইতে সৈন্য পোষণ করিতে হইত। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধের সময়েই দেখান হইত; অন্য সময়ে আমির সুবিধা মত লাভই করিতেন। রাজধানীতে এবং দূরস্থ দুর্গাদিতে যে সমস্ত রাজকীয় সেনা নিবাস ছিল তথায় বেতন-

ভোগী বিদেশী মুসলমান সৈন্য ব্যতীত দেশীয় মুসলমান এবং নিম্ন শ্রেণীর পাইক হিন্দু সৈন্যও নগদা বেতনে রাখা হইত; অনেক সময়ে এই সমস্ত পাইক নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় নিজ নিজ বাটীতে থাকিয়া অন্যান্য গৃহ কার্য্যের অবসরে গৌড় বাদশার সরকারে কেবল যুদ্ধকালেই বেতন পাইত। পাঠান অধিকারেও হিন্দু সামন্ত এবং জমিদার দিগকে সৈন্য দ্বারা রাজার সাহায্য করিতে হইত; অবশ্য এ ক্ষেত্রে জমিদারী সেনা রাজকীয় সেনানীর অধীনে থাকিত। রাজ-কর্ম্মচারীর মধ্যে থানা ও ডিহীদার দিগের অধীনে পাইক রাখা হইত। থানাদার, কাজির বিচারের আদেশ প্রতিপালিত হইল কিনা, দেখিতে বাধ্য থাকিতেন। হিন্দু কর্ম্মচারীর মধ্যে সেকালে আদায়কারী চৌধুরী ও ক্রোরী মফঃস্বলে প্রভুত্ব করিতেন। শেষ দিকে গৌড় বাদশাহের দরবারে মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চ কার্য্যেও হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন, পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজস্ব-বিভাগে পরগণা কানুন্‌গোর উপরেও আমিল্ নিযুক্ত করা হইত; ডিহীদার অনেক সময়ে এই প্রধান আমিল্-দিগের পরামর্শে কার্য্য করিতেন। মোগল অধিকারের পূর্ব্বেও হিন্দুরা স্থানে স্থানে আমিল, ডিহীদারের ন্যায় বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। ডিহীদার থানাদার প্রভৃতিও ভূমি বৃত্তি ভোগ করিতেন। পাঠান অধিকারে সেনাদলের বেতন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আকবর বাদশা নগদ বেতন দেওয়াই উচিত বিবেচনা করিলেও অনেক ক্ষেত্রে জায়গীর উঠাইতে পারেন নাই; বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বহু জায়গীর নূতন পত্তন করিতে হইয়াছিল। সৈন্যদলের বেতন তাঁহার সময়ে যাহা ছিল, আইন আকবরীতে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে;—সাধারণ অশ্বারোহী মাসিক ৭।৮৲ টাকা পাইত; বিদেশী ঘোড়া রাখিলে ১৩ টাকা। গোলন্দাজের মাসিক বেতন ৩৲ হইতে ৭, বন্দুক ধারীর ৩৲ হইতে ৬,

সাধারণ পদাতিকের ২৲ হইতে ১৫৲, ভৃত্যের ২॥৹ হইতে ৩ টাকা ছিল। দাসেরা দৈনিক ১ দাম হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত। সেনা-বিভাগ অপেক্ষা অন্য বিভাগে বেতন আরও অল্প ছিল সকলেই বুঝিবেন। সে সময়ে সাধারণ শ্রমজীবিরা দৈনিক এক আনা পাইত। শিক্ষা বা চিকিৎসা বিভাগ বলিয়া কিছু নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সরকারী চাকর পুলিস নগরে কোতোয়ালের অধীনে থাকিত, অন্যত্র জমিদারের কর্ত্তৃত্বাধীনে। মুন্সী, কেরাণী মোগল দরবারে অবশ্য নানা জাতীয় ছিল। আমির ও মনসবদার (সেনানায়ক) ভূমি বা উচ্চ বেতন পাইতেন; সেনা বিভাগ হইতেই প্রাসাদের কর্ম্মচারী বাছিয়া লওয়া হইত। আমির ও উচ্চ পদস্থ মনসবদার দিগকে অশ্বারোহী, হস্তী এমন কি নৌকার ব্যয় নিজ নিজ জায়গীর হইতে যোগাইতে হইত।

অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গের তুলনায় সেনানী দলের বেতন অবশ্য অনেক অধিক ছিল। নগরের কোতোয়ালও মোটা মাহিনা পাইতেন। সাধারণ কাজি এবং আকবরের সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত প্রধান নগরের মীর আদল্ (প্রধান কাজি) কি পাইতেন জানা যায় না। বিচারক অপেক্ষা যে শ্রেণীর লোকে বিচারকের নিকট গোপনে ফৌজদারী মোকর্দ্দমার তথ্য বলিয়া দিবে তাহাদের উপরি পাওনা অধিক ছিল। পুলিসের গোয়েন্দা থাকিত; সন্দেহ স্থলেও অপরাধীর নির্য্যাতন হইত। 'কোতোয়াল যেন কাল' কথাটা অনেক স্থলেই খাটিত, শান্তি রক্ষার জন্য অনেক সময়ে কঠোর ব্যবহার করিতে হইত; আবার তাঁহার নিকটেই অনেক ঘটনার সরাসরি বিচার হইত। সেকালে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়েরই আপিল্ রাজ-দরবারে হইতে পারিত। সেখানে বিচার সূক্ষ্ম ছিল; কিন্তু দূর দেশে যাওয়াই দুঃসাধ্য হওয়ায় দরিদ্রের পক্ষে এই প্রতিকার লাভের সম্ভাবনা ছিল না। অপরাধীর শাস্তি সেকালে বড়ই কঠিন হইত।

বারম্বার চুরি করিলে হাতের কতকটা কাটা যাইত; অন্য প্রকারের চুরিতেও আঙ্গুল বা কাণ যাহা হউক একটা যাইত। রাজস্ব-বিভাগের লোকের হস্তে দেওয়ানী বিচার ভার অর্পিত থাকিত; মোগল অধিকারে প্রধান জমিদারেরা ঐ বিষয়ের অনেকটা ভার পাইয়াছিলেন। রাস্তা ঘাটে যাতায়াত কখনও বা নিরাপদ ছিল, আবার রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ বাধিলে বিপজ্জনক হইত। বঙ্গে পাঠান ও মোগল অধিকারে সাধারণ শিক্ষা পল্লীবাসীর নিজের হাতেই ছিল। দরবারে উচ্চ শিক্ষিত লোকের আদর ছিল; দেশীয় কবি ও গ্রন্থকার রাজসভায় পরিচিত হইতে পারিলে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতেন। পারসী নবীস হিন্দু রাজকর্ম্ম পাইতেন। উপাধি, বৃত্তি প্রভৃতি দেওয়া হইত। দাস-প্রথা মুসলমান অধিকারে বদ্ধমূল হইয়াছিল। রাজা বা প্রধানগণের বিলাসের দ্রব্য ডাকে দাস দ্বারা সত্বর আনাইবার ব্যবস্থা হইত; সৈন্যদলে এবং বিশিষ্ট লোকের দাস থাকিত। দরিদ্রের সন্তান হাটে বিক্রীত হইত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বুকাননের রিপোর্টেও দেখা যায় পূর্ণিয়ায় পূর্ণ বয়স্ক দাস (নগরে) ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকায়, ১৬ বৎসরের বালক ১২ হইতে ২০৲ এবং ৮।১০ বৎসরের বালিকা ৫ হইতে ১৫ টাকায় মিলিত। দরিদ্র বিহারে নফর অধিক মিলিত, কিন্তু বাঙ্গলায়ও অভাব হইত না। ছেয়াত্তরে মন্বন্তরায় ত কথাই নাই, লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ের দাস বিক্রয়ের দলিল ও দেখা গিয়াছে। অর্থশালী লোকে নিরাপদ থাকিবার ভরসায় মাটিতে টাকা পুঁতিয়া রাখিত। সার টমাস রো প্রমুখ ইউরোপীয়গণ বলিয়াছেন, লোকে বাহিরে ধনবানের ভাব দেখাইত না; ভয়, যদি রাজকর্ম্মচারীরা লুটিয়া লয়। কিন্তু এ কথা মোগল-বঙ্গে খাটে না; সে সময়ে এ দেশের ধনী হিন্দুর উপর অত্যাচারের কোন প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাব্যে বরং সম্পন্ন লোকের অলঙ্কার ও সাজ সজ্জার আড়ম্বরের উল্লেখ পাই।

আকবর বাদশার আমলে দ্রব্যাদির মূল্য ও লোকের পারিশ্রমিক আলোচনা করিয়া সে যুগের সাধারণ শ্রমজীবির ভরণ পোষণ কি ভাবে নির্ব্বাহিত হইবার সম্ভব ছিল, তাহা নবাবী আমলের ইতিহাসের শেষ-ভাগে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া পুনরায় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে হয় না। পূর্ব্ব-লিখিত বাজার দর এবং লোকের সাধারণ অবস্থা তুলনা করিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সে যুগে বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের কথা কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় না। সাময়িক অজন্মা হইলেও বাঙ্গলাই দিল্লী সাম্রাজ্যের গোলাবাড়ী ছিল; নৌকা যোগে বাঙ্গলার শস্য দিল্লী পর্য্যন্ত বাহিত হইত। বাঙ্গলাই বস্ত্রে অন্য প্রদেশের লজ্জা নিবারণ করিয়াছে, আবার সূক্ষ্মতার চরমে উঠিয়া সেই বস্ত্রের সাত পুরুতেও মহিলার লজ্জা নিবারিত হয় নাই, তাহাও দেখা গিয়াছে। কৃষক প্রজার শস্যের বদলে দ্রব্যাদি পাইবার তত সুবিধা ছিল না; কিন্তু অন্ন-কষ্ট কাহারও ছিল না। অজন্মা হইলে দেশান্তরে শস্য প্রেরণ বন্ধ করিয়া রাজা তৎকালোচিত ব্যবস্থা মত প্রজা রক্ষা করিতেন। মোগল অধিকারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বাঙ্গলায় শস্যাদি "তুচ্ছ মূল্যেই" (বাণিয়ে) বিক্রীত হইত। শেষ সায়েস্তা খাঁর আমলে ঢাকায় টাকায় আট মণ চাউলও পাওয়া গিয়াছিল; চাউলের অনুপাতে অন্য আবশ্যক দ্রব্য শস্তা হইলেও কৃষকের সুখ সাচ্ছন্দ্য এ অবস্থায় কল্পনা করা যাইতে পারে না। 'ভদ্র' লোকের সুখ ছিল, এই কারণেই আমরা এখনও "হায়রে সেকাল" বলিয়া তপ্তশ্বাস নিঃক্ষেপ করি।

বাঙ্গলায় প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবসায়গত জাতির উদ্ভব হইয়াছে। বৌদ্ধ প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত হইবার পরেই এই সমস্ত জাতির বিকাশ। বাঙ্গলার 'নবশাখ' শেষে সংস্কৃত বচনে নয়টি জাতিতে সীমাবদ্ধ হইতেচলিলেও বুদ্ধিমানে উহা 'নূতন' উৎপন্ন হিন্দু শূদ্রের শাখা বলিয়াই

বুঝিবে; বণিক, কাসারী, শাঁখারীও বাদ যাইবে না। স্বর্ণকার' সূত্রধর প্রভৃতির সমাজের চক্ষে অপেক্ষাকৃত হীন হওয়ার কারণ অন্যত্র আলোচনা করা যাইবে। এই সকল ব্যবসায়ী জাতির সংখ্যা মধ্যযুগেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে; কারণ, শিল্পাদি ব্যবসায়ে তখন অর্থাগম এবং তৎসহ বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। অর্থ বা মুদ্রা লোকের পরিশ্রম বা শক্তি প্রয়োগের বিনিময়ের ফল মাত্র। শিল্পী এই বিনিময়ে কৃষকাদি অন্ন-উৎপাদক শ্রেণীর অপেক্ষা লাভবান্ হইত, একথা সাধারণ অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্রের মূল সূত্র হইতেই পাওয়া যাইবে। তবে অন্ন-সংস্থানেই স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ফল জন সংখ্যা বৃদ্ধি ইহা সহজেই অনুমেয়। সাধু বণিক বৃত্তির ব্যবসায়ী দল শ্রম-শিল্প জাত দ্রব্যাদি দেশে বিদেশে বিক্রয় করিয়াই লাভবান হইতেন; 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' বাক্য এই কারণেই বাঙ্গালী বণিকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিত। শেষ দিকে দেশীয় পণ্য স্বয়ং বিদেশে লইয়া যাইবার শক্তি হারাইয়া 'সপ্তগ্রামের বেণে কোথাও না যায়' ইত্যাকার বৃথা গর্ব্বেই দেশীয় বণিকের উল্লাস বাড়িত; পরে সপ্তগ্রামের সরস্বতী মজিয়া গেলে এবং বিদেশী বণিকের বাহুল্য ঘটিলে বণিকদল 'আপনি মজিল আর লঙ্কা মজাইল', মত হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

বঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রভাব।

প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির স্বরূপ নির্ণয়ে একালের পণ্ডিতের দল নানা কল্পনা কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এখন বর্ণ ও করোটি প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানা ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। দ্রবিড় মোঙ্গল কোলাদি সংমিশ্রণে প্রাচীন বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে রং বেরঙ্ প্রবন্ধ প্রচারিত হইতেছে। কেহ বা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দী প্রাচীন বঙ্গীয় সমাজ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ছিল, 'বাঙ্গালী এক আত্ম-বিস্মৃত জাতি', ইত্যাকার মত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা প্রতিপাদনে যত্নবান্। বিশ্লেষণের ক্লেশ স্বীকার করিয়া অন্ততঃ শব্দ-সম্পদে অন্তের বিস্ময় উৎপাদন করিবার শক্তি একালে অনেকেরই দেখা দিয়াছে। প্রতিভার নিতান্তাভাবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার ভাবসাগরের প্রত্ন রত্নোদ্ধারে অক্ষম। আরণ্যকের 'বঙ্গা-বগধচের পাদা'উক্তির মধ্যদেশ বাগদীর স্কন্ধে চাপাইতে শক্তিও অনেকটা আবশ্যক! মধ্যযুগের অর্থাৎ মুসলমানের বঙ্গ বিজয়ের সময় হইতে পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালী সমাজের কথাই বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয় বলিয়া ক্ষোভ করিবারও কিছু নাই। মহাভারতে বঙ্গের নানা বিভাগের কথা জানা যায়; সভাপর্ব্বে পুণ্ড্রাধিপ মহাবল বাসুদেব, কৌশিকি-কচ্ছরাজ, বঙ্গে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি হিন্দু রাজার নাম আছে। তাঁহাদের সভায় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ থাকিবার কথা; কিন্তু কর্ণপর্ব্বে স্বয়ং কর্ণের "প্রাচ্যা দাসাঃ" অর্থাৎ শূদ্রবৎ এই উক্তি দেখিয়া অনেকের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। উত্তরের পুড়ো, পলে, কোচ কৈবর্ত্ত, মধ্যবঙ্গের গোপ ও বাগ্দী, পশ্চিমের মাল প্রভৃতি জাতিরাই যে

প্রাচীন বঙ্গের প্রধান অধিবাসী ছিল, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। পুরাকালে সারস্বত ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া বাস করিলেও পরে আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরাও 'ক্রিয়া-লোপাৎ' এবং ব্রাহ্মণ-অদর্শনে যে পতিত হইতেছিলেন, সে কথাও ত আছে। তারপর বৌদ্ধ প্রভাবের বিষয়ও বিবেচ্য। বৈদিক আচারের অভাব দেখিয়াই পরবর্ত্তী কালের হিন্দু রাজারা কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক প্রবাদ বৈজ্ঞানিকে গ্রহণ না করিলেও সাধারণ নর-লোকে বিশ্বাস করে। প্রাচীন বঙ্গে হিন্দুর যে টুকু প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা বৌদ্ধ প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এই কারণেই ভৃগু কথিত মনুসংহিতায় তীর্থ যাত্রা ভিন্ন বঙ্গে আসিলে 'পুনঃ সংস্কার-মর্হতি' লেখা হইয়াছে; তবে এখানে হিন্দুর তীর্থও ছিল? পরবর্ত্তী যুগের হিন্দু তান্ত্রিকেরা নিজের ধর্ম্ম-সাধনা বৌদ্ধ জৈন এবং নাথ প্রভৃতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অনুকরণে পরিবর্ত্তিত করিয়াও বাঙ্গালীকে হিন্দুস্থান-বাসীর মত সর্ব্বথা হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ে বাঙ্গলায় পশ্চিম অঞ্চলের মত জাতি বিচার সম্ভবপর হয় নাই, কারণে এ দেশে নানা বর্ণের সমন্বয়ে ব্যবসায়গত জাতির উৎপত্তি পূর্ব্বকালেই ঘটিয়াছিল। তবে বৌদ্ধ প্রাধান্য কালেও জাতি-ভেদ ছিল এবং সমাজে ব্রাহ্মণ সম্মানিত ছিলেন। বৌদ্ধগণ জাতি ও বর্ণের একাকার সাধন করিয়াছিল, এরূপ মত ভ্রান্ত হইলেও বাঙ্গলায় নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল না বলিয়া এখানে বৌদ্ধ মত ও ধর্ম্ম সাধনা নানা ভাবে সমাজ শরীরের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বজ্রজানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক দলের প্রভাবে বাঙ্গলার হিন্দুর রীতিনীতি বহু শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম ভারতের হিন্দু রীতি হইতে পৃথক্ ভাবের হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেই বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যক হইয়াছিল ; হিন্দু রাজা বঙ্গীয় সমাজকে আর্য্যভাবে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস পাইবেন ইহা স্বাভাবিক। (১)

স্কন্দ পুরাণে দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে ; পঞ্চ-গৌড় এবং পঞ্চ দ্রাবিড়া। (২) সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল ও মৈথিল, আর্য্যাবর্ত্তের এই পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে পঞ্চ গৌড় বলা হইয়াছে এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ ভূভাগে গুজরাট, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, অন্ধ্র, এবং দ্রাবিড় দেশবাসী ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চ দ্রাবিড়ী আখ্যা দেওয়া

(১) পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয়, মহিম চন্দ্র মজুমদারের গৌড়ে ব্রাহ্মণ এবং সুহৃদ্বর নগেন্দ্র নাথ বসুর জাতীয় ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কাণ্ডে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ আগমনের সকল কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন প্রকাশিত অপ্রকাশিত কুলজী বিস্তর আছে। সমস্তগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও বিচার পূর্ব্বক উহাই অবলম্বনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের কথা জানিতে হইবে।

(২) সারস্বতা কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্তোত্তর বাসিনঃ॥

গৌড় লইয়া কিছু গোল আছে ; কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে 'আদি গৌড়' বলেন। আবার পশ্চিমাঞ্চলের অনেক গৌড় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের বিশ্বাস যে তাঁহারা আমাদের এই 'গৌড় মণ্ডল' হইতেই তথায় গিয়াছেন। কূর্ম্ম ও লিঙ্গ পুরাণে গৌড় দেশে শ্রাবস্তী নগরী'র নির্দ্দেশ আছে ; শ্রাবস্তী অযোধ্যার শাহেত—মাহেত ; এখানে এক কালে কোশল-রাজধানী ছিল। আবার বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে আছে 'অস্তি গৌড বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী'—কৌশাম্বী যে এলাহাবাদের ১২ ক্রোশ পশ্চিমের 'কোশাম' তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। 'পঞ্চগৌড়' কথাটি দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তে পাঁচটি গৌড় ছিল, অনুমিত হয়। 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধি পরে বাঙ্গলার প্রভাবশালী রাজাকে দেওয়া হইত। শেষে সম্মানের উপাধি হইয়া কৃত্তিবাসের কথিত রাজা এবং হোসেন শাও পঞ্চ গৌড়েশ্বর হইয়াছেন। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আকবরও এই আখ্যা পাইয়াছেন ; তাঁহার অবশ্য ইহাতে যথেষ্ট দাবি আছে।

হইয়াছে। আমাদের গৌড়-পুর পানিনির 'পুরে প্রাচাং' সূত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে হয় ; এখানে যে সে কালেও ব্রাহ্মণ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজতরঙ্গিণীতে গৌড়মণ্ডল এবং গৌড় রাজ্যের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন গৌড় রাজ্যের বিশেষ কোন বিবরণ জানা না থাকিলেও অনুমিত হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল ; রাজাদের অনেকেই ঠিক বৌদ্ধ মতাবলম্বী না হউন, বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত প্রচারে সহায়তা করিতেন। সপ্তম শতাব্দে চীন পরিব্রাজক ইয়ুন্ চাং এর বিবরণীতে এবং হর্ষচরিতে জানা যায় যে. পশ্চিম বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ-বিরোধী ছিলেন। তিনি শ্রীহর্ষের দ্বারা নির্জ্জিত হইলে বাঙ্গলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত আরও প্রসার লাভ করে ; শেষে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিতান্ত অবনতি লক্ষিত হয় ; এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ বেদ-বিধান বঞ্চিত হইয়া পড়েন। এই কারণেই গৌড়াধিপ 'আদিশূর' কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনায়ন করেন।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সমস্তগুলিই লক্ষণ সেনের রাজত্বের পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়া ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে উহাতে বড়ই মতভেদ লক্ষিত হয়। এই কারণেই এ কালের 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' অনুসারে ইতিহাস আলোচনা যাঁহাদের অভিপ্রেত তাঁহারা আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও সহচর কায়স্থ আনয়ন গল্প বলিয়াই উপেক্ষা করেন। কিন্তু ইতিহাস (বিজ্ঞান সম্মত না হউক) প্রাচীন প্রবাদে সম্পূর্ণ অনাস্থা করিতে পারে না। রাজকুলের ধ্বজাধারী অনুশাসন পত্র লেখকদিগের কথাও যেমন বাদ সাদ দিয়া লইতে হয়, প্রাচীন জনশ্রুতিরও সেইভাবে ব্যবহার করা উচিত।

কুলগ্রন্থে আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়নের কাল ৬৫৪ হইতে ৯৯৪ শক পর্য্যন্ত লিখিত আছে। (৩) সময় ঠিক্ না মিলিলেই কথাটা একবারে অগ্রাহ্য এমন বলা চলে না; আমাদের দেশের সব পুরা কাহিনীর দশাই এই। বল্লালের সময়ে যখন কুলপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সময়ে কানোজাগত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত ছিলেন, বলিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই উক্তিতেও গোলযোগ্ নাই ইহা বলা যায় না, কারণ কুলজী লেখকেরা প্রাচীন বংশাবলী উদ্ধার সম্বন্ধে একমত নহেন। একজন এক প্রকার বংশলতা দিয়াছেন, অন্যে কিঞ্চিৎ পৃথকভাবের লিখিয়া গিয়াছেন; এখানেও সামঞ্জস্য সাধনের উপায় নাই। মোট কথা, আদিশূর অর্থাৎ শূর বংশের প্রথম রাজা প্রাচীন হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী বলিয়া কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণ আনেন এবং শূর বংশের রাজারা তাঁহাদিগকে ভূমিদান করিয়া প্রথমে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ও পরে তাঁহাদের অনেক বংশধরকে রাঢ়ে স্থাপিত করেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য। পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম লইয়াও কিছু গোলযোগ আছে, কিন্তু এখানে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য। প্রাচীন ঘটক হরিমিশ্র লিখিয়াছেন ঃ—

(৩) রাঢ়ীয় ঘটক কারিকায় "বেদ বাণাঙ্গশাকেতু গৌড়ে বিপ্রা সমাগতাঃ" আছে বলিয়া নগেন্দ্র বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক কুলগ্রন্থে 'বেদ বাণাঙ্ক' আছে। বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকায় এক স্থানে "শাকে বেদ কলঙ্ক ষট্‌কমিতে" ব্রাহ্মণ আনয়নের কল্পনার কথা আছে দেখিয়া 'অঙ্ক' মিশাইয়া বন্ধুবর উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসী। বারেন্দ্র কুলজীর এক পুঁথিতে রাজা ধর্ম্মপাল আদি গাঁই (আদিশূর—আদি গাঁই—এ সব লক্ষ্য করার যোগ্য) ওঝাকে গ্রাম দান করেন লেখা থাকায় নগেন্দ্র বাবু ধর্ম্মপালের কিছু পূর্ব্বে আদিশূরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে আদিশূরকে আনিতে চাহেন। তাঁহার "জয়ন্তই আদিশূর" এই মত কেহই এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই।

কোলাঞ্চ দেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতা সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতীশ মেধাতিথিশ্চ বীতরাগ সুধানিধিঃ।
সৌভরি সচ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড় মণ্ডলে॥

আবার দেবীবরের পরবর্ত্তী রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র লিখিতেছেন ঃ—

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্ট নারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্যঃ শ্রোষ্ঠোহি ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজক গোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোহপি সাবর্ণে যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥ (কুলরাম)

কিন্তু বারেন্দ্র ঘটকদিগের পুঁথিতে দৃষ্ট হয় ঃ—

নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্য গোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুচত্বরাৎ॥
ধরাধরো বাৎস্য গোত্র স্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ম্।
সুষেণ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়া গতঃ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজ গোত্র স্তড়্ঘরাত্তথা।
পরাশরস্ত সাবর্ণো মদ্র গ্রামাৎ সমাগতঃ॥

প্রাচীন মিশ্র কারিকায় ক্ষিতীশের পুত্র শ্রীহর্ষ, বীতরাগের পুত্র দক্ষ, সুধানিধির পুত্র ছান্দড় এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ ছিলেন, লেখা আছে। হরিমিশ্রের কারিকার সহিত মিলাইলে বারেন্দ্র ঘটকদের উল্লিখিত পঞ্চ ব্রাহ্মণও যে ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান ইহা বেশ বুঝা যায়। অবান্তর কথা বাদ দিয়া গৌড়ে ব্রাহ্মণ রচয়িতা যে পরিষ্কার নাম-তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে নাম ঘটিত অনৈক্য পরিহার করা হইয়াছে। (৪)

(৪) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সংস্করণ ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা।

কিরূপে, কোন অবস্থায়, কি বেশে কান্যকুব্জে ব্রাহ্মণেরা এ দেশে আসেন, সে বিষয়ে গাল গল্প যথেষ্টই রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় কুলজীতেই আছে। এরূপ গল্পের সমালোচনা নিরর্থক হইলেও বাঙ্গালীর যে কোন লিখিত বিষয়ে বিশ্বাস অধিক (৫) বলিয়া কিছু বলা ভাল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র কাব্যাদিতে কুশল বলিয়া তৎকালোচিত অতিশয়োক্তির সাহায্যে লিখিয়াছেন 'ব্রাহ্মণ পঞ্চক বর্ম্ম চর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ-ধারী যোদ্ধৃবেশে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে দূত গিয়া রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-বিরুদ্ধ বেশ দর্শনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদী দূর্ব্বাক্ষত মল্লকাষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করিলেন। শুষ্ক স্তম্ভ তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরিত হইল। রাজা এই অপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ব্রাহ্মণগণের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন' (৬)। পশ্চিমে ব্রাহ্মণের

---

(৫) ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে বর্দ্ধমানে 'সুরঙ্গের' উল্লেখ পাইয়া ৺রামগতি ন্যায়রত্নের মত লোকেও তাহার সন্ধান করিয়াছিলেন, এবং সুরঙ্গ মিলিয়াছিল। এখন 'করিয়া যতন' বর্দ্ধমান গমন করিলেই (একা হউক বা না হউক) সুরঙ্গের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। গড় মান্দারণে বিমলার পুথের সন্ধান হইয়াছে! রাণী ভবানী স্বয়ং সিরাজদ্দৌলাকে উৎখাত করার মন্ত্রণা সভায় হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, ইহাতে এখন কোন সন্দেহ নাই।

(৬) পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরীর 'আদিশূর ও বল্লাল সেন'—৪ পৃষ্ঠা হইতে উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। ইহা বাচস্পতি মিশ্রের কুলরামের মর্ম্মানুবাদ। কুলরামের এই সমস্ত কথাই সংস্কৃত কাব্যের ছন্দে লিখিত আছে; মিশ্র মহাশয় বলিতেছেন:—"আযাতা ব্রহ্মরূপা ক্ষিতিবহিরহয়ে পঞ্চ কোলাঞ্চ দেশাৎ।

সেকালের পোষাক লক্ষ্য করিয়া নদীয়া অঞ্চলের মিশ্র মহাশয়ের কল্পনা আর একটু অগ্রসর হইয়া অসি চর্ম্ম ধারণ করিবে ইহা সম্ভবপর; এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণের শাপ বা আশীষের বল অধিক ছিল, একথা পরবর্ত্তী যুগের বামুন জাহির না করিলে সম্মান থাকে কই? যাক্, কুলরামের কথা পাইয়া সঞ্জীবিত মল্ল-কাষ্ঠের সন্ধান যাঁহারা পরে ব্রতী হইলেন, পাল-বংশের অন্যতম রাজধানী বিক্রমপুরের মিলন তাঁহাদের সে অনুসন্ধিৎসার পুরস্কার দিয়াছিল। সেখানে এক গজা(শাল জাতীয়) গাছ এখনও দণ্ডায়মান; ঐ অঞ্চলে ঐরূপ বৃক্ষ আর দেখা যায় না; সুতরাং আর যায় কোথায়? নিশ্চয়ই ইহা সেই সঞ্জীবিত মল্ল কাষ্ঠ; সঙ্গে সঙ্গে হোম কুণ্ডাদি (রাধাকুণ্ডের মত) আবিষ্কৃত হইল! পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসীবর্গ, এ কথা যে বিশ্বাস না করিবে তাহার কণ্ঠী ছিঁড়িতে প্রস্তুত (৭)।

সোষ্ণীষাঃ শ্মশ্রুযুক্তা ধনুরপি সশরং পৃষ্ঠদেশে দধানাঃ। তেষামাশীঃ প্রভাবাৎ ক্ষণমপি কঠিনাদঙ্কুরাণাং সমূহঃ। শুষ্ক স্তম্ভাদকস্মাৎ সমজনি পরিতশ্চিত্রমেতৎ ব্যলোকি'। রাজা "শুষ্কঞ্চ যুগ্মং প্রসমীক্ষ্য সাঙ্কুরং; পপাত তেষাং চরণেষু সত্বরং" এই ভাবে নাটকীয় উপসংহার বড়ই মনোরম হইয়াছে সন্দেহ নাই।

(৭) আমাদের কাটোয়ার দেড় ক্রোশ পশ্চিমে শূরডো নামে এক গ্রাম আছে। তথায় এক 'অচিন' প্রকাণ্ড গাছ সমতল উচ্চ ভূমির উপর দণ্ডায়মান; পার্শ্বে শিকড়ের কোন চিহ্ন নাই, যেন অন্য স্থান হইতে আনিয়া বসান। এই জন্য সাধারণ লোকে উহা ডাকনীর চালান গাছ বলে। 'শূরডো'র শূর-দহ বা এইরূপ শূরযুক্ত কৃষ্ণ-বিষ্ণু হইয়া আদিশূরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সহজ সাধ্য, তাহাতে আবার গ্রীক্ বর্ণিত প্রাচীন কাটদ্বীপের (কাটোয়ার) কাছে; এখানে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ এবং কায়স্থের ঘটকও আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ ক্ষত্রিয়-তিলকেরা আমার পরামর্শ মত মল্ল-কাষ্ঠ আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাচীন রাজধানীর স্থাপনা করিতে প্রস্তুত নন। তবে আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে 'শূরো' গ্রামে ঐ রাজধানী হইয়াছে, আমাদের চিন্তা নাই।

তারপর ব্রাহ্মণ ত আনা গেল, বসাই কোথায়, ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। প্রাচীনেরা গৌড়ের রাজধানীর কাছেই ইহাদিগকে স্থাপনা করিয়াছিলেন; সম্বন্ধ-নির্ণয়-কার রামপালের জীবন্ত স্তম্ভের বলে বেচারি-দিগকে তের নদী পার করিয়া সেথানে লইয়া যাইতেই প্রস্তুত; আদিশূর-রচয়িতা রায় চৌধুরী ত সেই অঞ্চলেরই লোক। প্রাচীন কথা-সরিৎ সাগরে কিন্তু গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্র নগরী গঙ্গা তীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত, লেখা আছে। রামপাল ত ভাসিয়া যায়; কিন্তু পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন কোথায়? ইহা লইয়া একালে এক মহামারী উঠিয়াছে। বরেন্দ্রের বিজয় প্রার্থী অনেক মহারথী ইহাকে পাবনা জেলায় 'মহাস্থান গড়ে' লইয়া যাইতেছেন। গৌড়ের নিকটেই যে সুপ্রাচীন পাণ্ডুয়া রহিয়াছে, ইহা তাঁহারা আমলে আনিবেন না। এখানে মুসলমানের আদিনা ও সোণা মসজিদের উপকরণেও অনেক হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা গৌড় লক্ষ্মণাবতীর মত 'হজরৎ পাণ্ডুয়ায়' প্রাচীন হর্ম্ম্যাদির ধ্বংসাবশেষ, কুত্রাপি বা ধ্বংস করিয়া তাহার মাল মসলা, লইয়া নূতন রাজধানী পত্তন করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মালদহের এ অংশও বরেন্দ্রভূমে, অতএব বারেন্দ্র ভ্রাতাদের দুঃখের কারণ কোথায়? মহার্ণব নগেন্দ্র ভায়া রাজতরঙ্গিণীর তরঙ্গও যোগ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, কাশ্মীর-রাজ জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে, সৈন্য দলকে রাখিয়া ছদ্ম বেশে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্র বর্দ্ধনে উপনীত হন। অত-এব সকলে বল, পেঁড়োতেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রথম আমদানী। পঞ্চ-কোটি কাম-কোটি, প্রভৃতি কাল্পনিক পঞ্চগ্রাম প্রদানে বাঙ্গলা পয়ারের বেশী দেরী হইবার কথা নয়, ইহা সকলেই বুঝিবেন। সম্বন্ধ-নির্ণয়ের বিদ্যা-নিধি সে সমস্ত কথা ভক্তি সহকারে ঘটকের পাতড়া হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হরি-কোটি মেদিনীপুরে, পঞ্চ-কোটি ত সবাই জানে,

কাম-কোটি বীরভূমে ইত্যাদি কথায় যে ভুল হয়, রাজধানী গৌড়েই হউক আর বিক্রমপুর রামপালেই হউক. সেথান হইতে বহুদূরে হওয়ায় গরীব ব্রাহ্মণদের যে নির্ব্বাসন দণ্ডের মত দেখায় ইহা তাঁহার সরল বিশ্বাসে আঘাত করে নাই। মনীষি নগেন্দ্রনাথ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণায় এ কার্য্যেও সফল কাম হইয়াছেন। তিনি মালদহ জেলাতেই কামটি প্রভৃতি গ্রাম পাইয়াছেন। রাজা আদিশূরের পরে পাল বংশ আসিয়া শূরের শূরত্ব নাশ করিয়া গৌড় অধিকার করিলে পলাতক শূর রাজারা পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় লইলেন; আদিশূরের পুত্র ভূশূর রাঢ়ে আসিয়া 'পুণ্ড্র' নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন (৮)। ব্রাহ্মণ দলের অনেকে অবশ্য সঙ্গ লইলেন, বলাই বাহুল্য।

"এই সময়ে গৌড়াগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে যে পুত্র সস্ত্রীক আসিয়া রাঢ় দেশে বাস করিলেন, তাঁহারা সকলেই পরে 'রাঢ়ীয়' নামে পরিচিত হইলেন আর যাঁহারা পূর্ব্ব নিবাস বরেন্দ্রভূমে রহিলেন, তাঁহারা পরে বারেন্দ্র নামে অভিহিত হইলেন। প্রাচীন রাঢ়ীয় কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে, (জয়ন্ত পুত্র) ভূশূরের সময় (৯) পঞ্চ গোত্রজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'রাঢীয়' ও 'বরেন্দ্র' এই দুই শ্রেণী বিভাগ সম্পন্ন হয়। এই সময়ে শাণ্ডিল্য গোত্রে দামোদর কাশ্যপ গোত্রে কৃপা নিধি, ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতম, বাৎস্য গোত্রে ধরাধর এবং সাবর্ণ গোত্রে রত্নগর্ভ বরেন্দ্র ভূমে ছিলেন বলিয়া বারেন্দ্র নামে আখ্যাত হন, এবং শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্ট নারায়ণ কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ. বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রে

(৮) জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড—১১৩ পৃষ্ঠা। হুগলী জেলায় অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োই এই নূতন পুণ্ড্র ইহা অনুমিত হইয়াছে। তখন 'শূরো, বা আমার উল্লিখিত 'শূরডো সম্মুখে আসে নাই।

(৯) "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ"—পাঠ নগেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ ডাঙ্গার ঘটকের পুঁথিতে পাইয়াছেন, বলেন। অন্যে কিন্তু 'আদিশূর সুতেন'—পাইয়াছে!

শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ ইঁহারা রাঢ় দেশে আসিয়া বাস করায় রাঢ়ী নামে অভিহিত হইলেন' (জাতীয় ইতিহাস)।

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-পঞ্চের বংশধরেরা ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূরের সময়ে রাঢ়ে ৫৬ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন বলিয়া ভবিষ্যতে 'পাঁচ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামুন নাই" এই বচন চলিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে বারেন্দ্রেরা এই ৫৬ গাঁই ভুক্ত নহেন এবং বাঙ্গলার পূর্ব্ব কালের ব্রাহ্মণ যাঁহারা ছিলেন তাহারা ত গ্রাম পান নাই। 'যদি থাকে দুই এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর'—এ কথা রাঢ়ের ঘটকেই বলিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন বঙ্গে সারস্বত ও গৌড় দুই সমাজের ব্রাহ্মণই বাস করিতেন। গৌড় মণ্ডলে যাঁহারা বসতি করিতেন, তাঁহাদের কৌশিকাদি উপাধি ছিল; রাঢ় দেশের ব্রাহ্মণেরা সারস্বত, তাঁহারা পরে সপ্তশতী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১০)। সপ্তশতীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও গল্পের অভাব নাই। বাচস্পতি মিশ্র কাব্য কথায় গল্প জমাইয়া আদিশূর দ্বারা বাঙ্গলার সেকালের সপ্তশত সংখ্যক নিরগ্নিক ব্রাহ্মণকে বৃষ-পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ হস্তে সাজাইয়া কাশীরাজ বীরসিংহের রাজ্য হইতে বল পূর্ব্বক পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছেন। এড়ু মিশ্র বল্লাল

(১০) ব্রাহ্মণ ডাক্তার উক্ত বিদ্যারত্ন ঘটক বলিয়াছিলেন 'সারস্বত' কথাই ভাষায় 'সপ্তশতী" হইয়া পড়িয়াছে; প্রমাণ স্বরূপ 'সারস্বত দেশাৎ গৌড়ে রাজ্যে সমাগতাঃ' তুলিয়াছেন। কিন্তু কথিত সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজে ভাষায় এরূপ অপভ্রংশ নামের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। একাল পর্য্যন্ত অনেকেই সাতশতী সম্পর্ক দোষের মনে করিয়া লইয়া নানা প্রকার কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। কান্যকুব্জের এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের সময়ে রাঢ় দেশে সাত শত ঘর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সাতশতী আখ্যা হয়, ইহা সম্ভব। বারেন্দ্র কুলপঞ্জীও এই সাতশতী দিগকে 'ছান্দোগ্য ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতি মন্ত্র বিশারদাঃ' বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন; তবে কেবল কি চন্দ্রমুখীর জেদের জন্যই নব ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল?

সেনের উপর অত্যধিক শ্রদ্ধা বশতঃ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা রাজার দান লইতে অসম্মত হওয়ায়, রাজা পার্ব্বতীর বরে সাত শত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ-রাজের ধ্রুবানন্দ ঘটক বাচস্পতির উপরে টেক্কা দিয়া ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে 'হীন ও অস্পৃশ্য সাত শত' লোককে গবারোহণে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাইতেছেন; গোবিপ্র-বধের আশঙ্কায় হিন্দু রাজ সেনাপতি রণ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিলে সহজেই ব্রাহ্মণ এবং সঙ্গে 'ফাউ' পাঁচজন কায়স্থও লাভ হইয়াছিল। আবার একখানি বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকায় আছে যে, আদিশূর কনোজ রাজকন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন। রাণীর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবার ইচ্ছা হইলে স্বর্ণকৌশিক, ঘৃত কৌশিকাদি পঞ্চ গোত্রের (এখানেও পঞ্চ) দেশীয় ব্রাহ্মণ আসিলেন। রাণী তাঁহাদিগকে বেদ-গান করিয়া অগ্নি জ্বালিতে এবং বরুণকে ঘটে আনিতে বলিলে তাঁহাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইল; তখন তাঁর বাপের বাড়ী হইতে পাঁচটি বাছাই বামুন আনান ভিন্ন আর কি উপায় হইবে? গল্পের গতিতে সাতশতীর উপর সেকালের ব্রাহ্মণের অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সেকালের কোন বারেন্দ্র ঘটক আবার সাতশতী সংসর্গ জন্য রাঢ়ীদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার কথিত গল্প এইরূপ:—

"ভট্টনারায়ণ দক্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মগধ হইয়া গৌড় রাজ্যে আসিয়া-ছিলেন এবং আদিশূর নৃপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন 'যদি আমাদের সহিত আহারাদি করিতে চাহ, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর'। দেশীয় ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শুনিয়া ভট্ট নারায়ণ প্রমুখ বিপ্রগণ কহিলেন, আমরা বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা, আমাদিগকে পাপ স্পর্শ করে নাই। আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিব না; ইহাতে বিরোধ

উপস্থিত হয়। কান্যকুজাধিপাত, যিনি ব্রাহ্মণগণকে গৌড়ে পাঠাইয়া দেন, ব্রাহ্মণগণের বিবাদ হেতু মামাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহাতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃাত ব্রাহ্মণেরা ক্রোধপূর্ব্বক পুনরায় গৌড় দেশে আদিশূরের সমীপে উপস্থিত হন। আদিশূর প্রাতঃসূর্য্য সন্নিভ অথচ তমো-দুঃখার্ত্ত সেই ব্রাহ্মণগণের সমস্ত কথা শুনিয়া গঙ্গার অনতিদূরে বহু ধান্যযুক্ত দেশে তাঁহাদিগকে বসতি করাইলেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা নৃপাজ্ঞা বশতঃ তাঁহাদিগকে কন্যাদান করিলেন; তাঁহারা সপ্তশতী কন্যাতে আত্মসদৃশ পুত্র কন্যা উৎপাদন করিলেন। ক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির অভাব হইলে কান্যকুজ দেশবাসী পূর্ব্ব পক্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দান গ্রহণ কি অন্ন ভোজন না করায় তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রী পুত্র সহিত গৌড়ে আসিলেন। আদিশূর তাঁহাদিগকেও রাঢ় দেশে বাস করার উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ় দেশে বসতি করার অসম্মতি প্রকাশ করিলে গৌড়াধিপ বরেন্দ্রাখ্য দেশে 'শস্য পূর্ণ মনোহর গ্রাম' তাঁহাদিগকে দান করিলেন রাঢ় দেশ বাসী তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ মাতুলাশ্রয়ে বাস করিয়া তাঁহাদের দ্বারাই উপনীত হন। তাহাতেই সকলে সামবেদী হইলেন'—ইত্যাদি

গৌড়ে ব্রাহ্মণকার মজুমদার মহাশয় এই প্রবাদের সমালোচনায় বলিয়াছেন—'ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হয় ভট্টনারায়ণাদি, নয় তাঁহাদের পুত্রগণ কর্তৃক সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করা উপলব্ধি হয়। রাঢ়ীয় কুলে যে উনষষ্টি গাঞি দেখা যায়, সেই ৫৯ গ্রামী ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণাদি বিপ্রপঞ্চকের সন্তান।...৫৯ সন্তানের বিবাহের নিমিত্ত ৫৯ কন্যার প্রয়োজন; সমুদয়ে পাঁচজন ব্রাহ্মণের ১১৮ সন্তান-

সন্ততি হইতে গেলে গড়ে ২৩ জন সন্তানেরও অধিক জন্মে; তদ্রূপ বহু-সংখ্যক সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব। বহুবিবাহ হইলে সপ্তশতী কন্যা ভিন্ন আর কোথায় পাইবেন' ইত্যাদি। ভূশূর রাজার সময়ে বাসস্থানভেদ হেতু রাঢ়ী বারেন্দ্র ভেদ হইলেও রাঢ়ীর ৫৬ গাঞি যে তখনই হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কি? আর নিরগ্নিক সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ 'বেদবিধানবঞ্চিত' হইলেও তাঁহারা কুলাচারী, আভিচারিক-ক্রিয়ানিপুণ, শান্তিকার্য্যে পটু ও গুণবান্ বলিয়া রাঢ়ী কুলজীতে কথিত। বারেন্দ্র কুলপঞ্জীও তাঁহা-দিগকে 'ছান্দোগ্য ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা' স্বীকার করিয়া তাঁহাদের দৌহিত্র রাঢ়ীয়-গণের সামবেদী হইয়া পড়ার কারণটা ঠিক রাখিয়াছে। নগেন্দ্র বাবু জাতীয় ইতিহাসে আমাদের রাঢ়ীয়গণের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া বরেন্দ্রের পূর্ব্বকথিত পঞ্চ-কৌশিক ব্রাহ্মণদলকে 'বারেন্দ্র সপ্তশতী' বলিয়া পাল্টা জবাব গাহিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! নুলো পঞ্চাননের প্রাচীন কারিকায় এই পঞ্চ গোত্র 'উত্তর বারেন্দ্র' বলিয়া কথিত; গৌড়ে ব্রাহ্মণের মজুমদার স্বীকার না করিলেন 'বয়ে গেল'! রাঢ়ীয় পক্ষে অনেকে বলেন, সাগ্নিক ব্রাহ্মণপঞ্চ নিরগ্নিক সপ্তশতীর কন্যা গ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে; যখন তাঁহাদের বংশ-ধরগণ বেদবিধি ত্যাগ করিয়া নিরগ্নিক হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ সপ্তশতীর কন্যা গ্রহণ করিয়া নিন্দিত হইয়া থাকিবেন। নুলো পঞ্চানন কিন্তু সগর্ব্বে বলিতেছেন, 'কান্যকুজ তেজীয়ান্ নয় সপ্তশতী। মূর্খ নিন্দুক দেখুক তার কি ক্ষতি।' আবার 'সাতশতীর প্রভা—কান্যকুজের আভা'। পুনশ্চ :—

শুন রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী বিচার।
কেহ আগে কেহ পাছে এই মাত্র সার॥

কহে সাতশতী গণে সে ব্রাহ্মণ্য পেয়ে।
কান্যকুজের বিবাহে সাতশতীর মেয়ে॥
অতএব সাতশতী হেয় নয় মান্য।
সুবুদ্ধি এই কথা নাহি গণে অন্য॥

বারেন্দ্রের কথায়—

এরা আদান প্রদানে সাতশতী দলে,
মিশে বৈদিক বারেন্দ্র আর উত্তরে বলে।
কৌশিক স্বর্ণকৌশিক রজতকৌশিক।
ঘৃতকৌশিক আর যে কৌণ্ডিন্য-কৌশিক।
পঞ্চ দ্বিজ সপ্তশতী মিশে উত্তরেতে।
উত্তরে বারেন্দ্র. তারা রৈল দক্ষিণেতে,
বারেন্দ্রের কন্যাদানে কৌশিকাদি বংশ।
ক্রমে দক্ষিণে দিয়ে হয়ে যায় ধ্বংস।
আজ উত্তরে বারেন্দ্র কাশ্যপাদি গোত্র।
সেহেতু কৌশিকাদি যে আর নাই তত্র।

এই বৈমাত্র রাঢ়ী-বারেন্দ্র ঝগড়া অনেক কাল চলিয়াছিল ; এখনও অনেক বুদ্ধিমান্ এ কথা লইয়া তুল করেন। সেকালের 'পাগড়ী-পরা ছাতুখোর' আমাদের অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের দলের কেহ কেহ যদি ভাগীরথী তীরের জল-হাওয়ায় সুপুষ্টা "সাতশতীর প্রভায়" (অবশ্য উল্কী-পরা) মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে দোষ কি ? সমাজ-সংস্কারক মহাশয়েরা দৃষ্টান্তটা দেখিয়া রাখুন। কেহ কেহ গম্ভীরভাবে বলিবেন, বৌদ্ধ-সংস্পর্শে আচার-ভ্রষ্ট প্রাচীন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদলের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া 'শোণিত-সমাবেশ' ঘটাইয়া তাঁহাদিগকে আর্য্য-

ভাবে অনুপ্রাণিত করা ত পূর্ব্ব পিতামহদলের কীর্ত্তি। কীর্ত্তি কুকীর্ত্তি যাহা হউক, ইহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের গাঞি সম্বন্ধে মতান্তর আছে :—কাহারও মতে ২৮, আবার কোন মতে ৪২½ ; গাঁইগুলির নাম লক্ষ্য করিবার যোগ্য, দুই চারিটি ভিন্ন অন্যগুলিতে আর্য্যামি নাই। কেহ কেহ বলেন, বাচস্পতি মিশ্রাদি প্রাচীন কুলজ্ঞের নির্দ্দেশমতে ঐ সপ্তশত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বৃষারোহণাদি কুকর্ম্মজনিত পাতক হেতু পঞ্চত্ব পাইলে, তন্মধ্যে কেবল ২৮ জন জীবিত ছিলেন ; রাজা (কোন মতে আদিশূর, কোন মতে ধরাশূর, আবার কাহারও মতে বল্লাল সেন) সেই ২৮ জনকে গ্রামদান করেন। গ্রামগুলির নাম ;—সাগাই, সুরাই, নালুসি, জলাই, হেলাই, কালাই, দাই, বান্‌সি, বাণ্টুরী, ধান্‌সী, কাটানি, কুশল, উজ্জল, কাশ্যপ কাঞ্জারী, লতারি, পিথারি. বাতারী, চেরু, বাগরাই, উলুক, ঝর্ঝর, মণ্ডুক, ফর্ফর, কস্থপ, যড়ল, চেরচেরাই, যাস, বালথুবি। পরবর্ত্তী কালে নগড়ি, দগড়ি, হামু, বাপাড়ি, কেয়ু, কড়ারী, বৈজুড়ী প্রভৃতি সুশ্রাব্য সুমিষ্ট নাম সংযোগে ৪২½ পূর্ণ করা হইয়াছে. তন্মধ্যে বেলাড়ী আধখানি।

এই প্রসঙ্গে ভট্টনারায়ণাদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশাবলী হইতে দুই দশটি নাম শুনাইয়া দিলে অনেক অনঙ্গমোহন, সরোজিনী-কান্তের চমক লাগিবে। ভট্ট নারায়ণের পুত্রই (১১) ত বন্দ্যঘটী

(১১) ভট্ট মহাশয় কেবল বেণী-সংহারই করেন নাই। তাঁহার ষেঠের কোলে ষোলটি সুপুত্র ছিল :—বরাহ, বাটু, রাম, নান, নিপো, গুঞি, গুণ, গূঢ়, বিক, শুণ্ঠ, নিনো, মধু, দেবা, সোম, কাম, দীন—ইহার মধ্যে বরাহই আমাদের বন্দ্য বা বাঁড়ুরী গাঞি। কুলজ্ঞ মহাশয়েরা ৫৬ গাঁই এবং লোক মিলাইতে ভট্টনারায়ণের মস্ত বড় নামের সঙ্গে এই ষোড়শ পুত্র আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন। এক পত্নীতে এই পুত্র ছাড়া কন্যাগুলিও অসম্ভব ভাবিয়া তাঁহারই স্কন্ধে সপ্তশতী চালাইবার চেষ্টা ঠিক্ নয় ; এমন পণ্ডিতের পক্ষে পশ্চিমের আমদানী ব্রাহ্মণী জুটিতেও পারে।

'বরাহ' (অবতার নহেন), তার পর সুবুদ্ধি পুত্র বৈনতেয়, তাঁহার পৌত্র আউ, গাউ, হংস, পরবর্ত্তী পুরুষে হাকুর. তৎপুত্র জিতাই পশো, পিথো প্রভৃতি আছেন। পশোর পুত্র শকুনি, তৎপুত্র জাহ্লন ; ইহার পরে সংস্কৃতমূলক নাম। দক্ষের বংশও হারো, নারো, বরাহ, চলহ আছেন। শ্রীহর্ষের বংশে (মুখটি) আবর, প্লাবর, সাবর তিন ভাই। আবরের পুত্র, শত, নখো, ইহাদের এক' কাক' ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন (তাঁহার উড়নের দৌড় কতটা, জানা যায় না)। কাকের তনয় ধাঁধুর, জিয়ো, গুয়ো তৎপর পুরুষে কোলাহল উৎসাহের সঙ্গে ঠোঠ, শঠ, আহিত, বাদলী আছেন। বহু পরবর্ত্তী কালের ঘটকেরা এই সকল বরাহ, পশো (পশু নয়), হংস, কাকের সন্ধান কিরূপে পাইলেন, ইহা চিন্তার বিষয় ; তখন বংশাবলী লেখা থাকিত বলিলেও সন্দিগ্ধ নরলোকে মাথা নাড়িতে ছাড়িবে না। যাক্, ভূশূরতনয় ক্ষিতিশূর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে ৫৬ খানি গ্রাম দিলেন। এই গ্রামগুলির নামও জানিতে হয় ; আমরা এখনও অমুক গাঁই বলিয়া আস্ফালন করি। আমার এক বাল্যবন্ধুকে পথে এক ভদ্রলোক 'তোমরা কোন গাঁই' জিজ্ঞাসা করায় সেই ভবিষ্যৎ উকীল অম্লানবদনে 'কুসুম গাঁই' বলিয়া ব্রাহ্মণকে 'থ' করিয়াছিল, এখনও বেশ মনে আছে। গাঁই তাহার জানা ছিল না, এবং আমাদের পরিচিত এক কুসুম গাঁ আছে, এ কথা হয় ত বলা দরকার। এখন দেখা যায়, কুসুমকুল একটা গাঁইও আছে, তাহা কিন্তু বাঁড়ুর্য্যের ভাগে। বন্ধু চাটুর্য্যে। মেল্ জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন মহারথী পঞ্জাব মেল বলিয়াছেন, শুনিয়াছি।

একালে আমাদের অক্লান্তকর্ম্মা সিদ্ধান্তবারিধি ভায়া অনেক যত্নে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের দান-প্রাপ্ত গ্রামগুলির অবস্থান নির্দ্দেশ (দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ প্রভৃতির অংশ. পর্য্যন্ত দিয়া) করিয়াছেন (অবশ্য এ দলীলের

বলে আদালতে নালিশ করিলে আর তাহা পাইব না)। সেখানে এখন যদি ভাল ব্রাহ্মণ না থাকে বা তুমি বিশ্বাস্ না কর, দোষ তাঁহার নহে। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, গাঞি সকল রাঢ়ে বীরভূমি ও পশ্চিম মুর্শিদাবাদ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত স্থানেই মিলিয়াছে ; দুই একটি গ্রামের জন্য গঙ্গাহীন মানভূমে যাইতে হয়, কাহারও বা অবস্থান ঠিক হইল না বলিয়া তিনি কবুল জবাব দিলেও আমরা তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে উহার সন্ধান পাইতে পারি। যা হৌক, গাঁইগুলির নাম লইব ; বালকেরা হনলুলু, ক্লিচুভেস্কা প্রভৃতি সরস নাম যখন মুখস্থ করিয়া পাশ করিতে সমর্থ, তখন বৃদ্ধেরা কি গাঁয়ের নামেই ভয় পাইবেন ? গাঁইগুলি এই,— (১) বন্দ্য বা বাঁড়ুর, ২ কুসুমকুল, ৩ কুলভ, ৪ গড়গড়, ৫ ঘোষল, ৬ সেউ, ৭ দীর্ঘ, ৮ কর্ডী, ৯ মাস, ১০ বড়া, ১১ কেশরকোণা, ১২ পারি, ১৩ বসু, ১৪ কুশ, ১৫ ঝিকড়া, ১৬ বোকট্ট, ১৭ ডিণ্ডী, ১৮ রায়, ১৯ মুখটি, ২০ সাহুড়া, ২১ চট্ট বা চাটুতি, ২২ গুড়, ২৩ শিমলা, ২৪ পালধি, ২৫ হড়, ২৬ দগ্ধবাটী, (পোড়াবাড়ী), ২৭ পোষ, ২৮ তৈলবাট বা তিলোড়া, ২৯ অম্বুল, ৩০ ভূরি, ৩১ পলসা, ৩২ পর্কট, ৩৩ মূল, ৩৪ পীতমুণ্ড, ৩৫ পিপ্পল, ৩৬ ঘোষ, ৩৭ পূর্ব্ব, ৩৮ পূতিতুণ্ড, ৩৯ বাপুল, ৪০ হিজ্জল, ৪১ কাঞ্জি, ৪২ কাঞ্জা, ৪৩ চতুর্থ, ৪৪ মহন্ত, ৪৫ শিমুল, ৪৬ গাঙ্গো, ৪৭ ঘণ্টা, ৪৮ পালি, ৪৯ বালি. ৫০ কুন্দ, ৫১ নন্দি, ৫২ সিদ্ধ, ৫৩ সান্তা, ৫৪ দায়া, ৫৫ শির বা শিহর, ৫৬ নাঞি। বাচস্পতি মিশ্র কোয়ারি, ভট্টগ্রাম ও পুংসিক এই নামের সাতশতীর আর তিনখানি গ্রামও দিতে চাহেন। আমাদের মনে হয়, গ্রামগুলি রাজদত্ত হইলেও পরবর্ত্তী কালেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ দেখিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু অনুমিত হয় বলিলে চলিবে না। কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের মতে ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে প্রথম ১৬ খানি ভট্টনারায়ণের

১৬ পুত্রকে, তার পরের ৪ খানি শ্রীহর্ষের চারি পুত্রকে, পরবর্ত্তী ১৪ খানি দক্ষের ১৪ পুত্রকে, তার পরের ১১ খানি ছান্দড়ের ১১ পুত্রকে এবং শেষ এগারখানি বেদগর্ভের ১১ পুত্রকে প্রদত্ত হয়। এই হরি মিশ্র সেন-বংশের শেষ রাজা দনুজমাধবের সমকালীন লোক, (১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) এবং তিনি সেই রাজার সংশোধিত কুলবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন। রাজা ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাসের জন্য গ্রাম দিবার সময়ে সপ্তশতীদিগকেও ২৮ খানি গ্রাম দিয়াছিলেন, এই কথা কোন কোন কুলাচার্য্য লিখিয়াছেন। মেলবন্ধনের পরে বাচস্পতি মিশ্রের কুল রাম যখন রচিত হয়, তখন অনেক সপ্তশতী রাঢ়ীর দলে স্থান পাইয়াছেন।

সপ্তশতী সম্পর্কে নুলো পঞ্চানন বলেন, '১৩শ পর্য্যায়ে অর্জ্জুন মিশ্র পিতাড়ীর কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন, সেই হইতে রাঢ়ীয় কুলীনগণের অনেকে সপ্তশতী দলে মিশিয়াছেন।' তৎপরে দেবীবরের মেল-বন্ধনকালে অনেক কুলীন সপ্তশতী-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ মুলুকজুড়, সুরাই, কাশ্যপ কাঞ্জারী প্রভৃতি সপ্তশতীর ঘরের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবীবর সেই সকল দোষকে গুণ বলিয়া গণ্য করেন। তৎকালে কুলীনগণ সপ্তশতী-সংশ্লিষ্ট হওয়াতে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই (১২)। কুলকারিকায় লিখিত আছে :—

> উলোর মধ্যে শিবশঙ্কর সপ্তশতী পায়।
> বুড়োনের বিষ্ণুরামে ভাগ্য বলি ধায়॥

প্রসিদ্ধ চতুঃসাগরী মেলও সপ্তশতী-ভাবাপন্ন ; কুলচন্দ্রিকায় কথিত আছে :—

(১২) জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড—১ম সংস্করণ ৯৩ হইতে ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

> শুদ্ধ হতে অতি শুদ্ধ সপ্তশতী ভাব'
> যাহা হইলে মেল সব পাইল স্বভাব॥
> সপ্তশতীভাবাপন্ন সাগর হইতে।
> চারি মেলের নিস্তার শুনি কুলজাতে॥

আবার সাগরপ্রকাশে আছে যে, ভাদাড়ী বা ভাদুড়ী, ভট্টশালী, করঞ্জ, আদিত্য এবং কামদেব এই পাঁচ গাঁই সাতশতী বারেন্দ্রের সহিত মিশিয়াছে। চম্পটিরা আদিতে উত্তর-বারেন্দ্র দলের। কোন্ গ্রামী সাতশতী কোন্ মেলের রাঢ়ীয় বংশে কন্যা দিয়াছে, ইহা গাঞি-মালায় দেখান হইয়াছে। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যেরা প্রাচীন বঙ্গের ব্রাহ্মণসংস্পর্শ সহজে স্বীকার করিতে চান না, কিন্তু কৌশিক-পরাশরাদি তাঁহাদের দলে অনেক মিশিয়াছে, পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে। নুলো পঞ্চানন তাঁহার ব্যঙ্গ-কাব্যে দেখাইয়াছেন, সাতশতী শূদ্রযাজী 'চক্কত্তি মশায়' মুকুজ্যেকে ভগ্নীপতি পাইয়া উল্লসিত হইয়াছেন। চাকলাযাজী বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা শূদ্রে অনেক গোত্র পাইয়াছিল। তাঁহাদের কৌণ্ডিন্য, সাগাঞি, সুগাঞি, পরাশর, হারীত, আলম্যান, অত্রি, মৌদ্গল্য আদি গোত্র ছিল; কন্যাদানে তাঁহারা গোষ্ঠিপতি হইয়া বসিতেন। "কান্যকুব্জের শ্রী গেল, সাতশতী মান্য হ'ল, তার কন্যায় করয়ে রন্ধন",---যাহারা মিশে নাই, তাহাদের কথায় নুলো বলেন, "এখনও পৃথক্ যারা, ব্রাহ্মণ্যেতে খাটো তারা,চক্কত্তি গোসাঞি রাই বলে। পাল্‌সী কর্কর ছাতায়, কুড়্যানে হেলনী ধায়, বাতাড়ী পিতাড়ীর উজ্জ্বলে।" নবাগত কানুজে দল বাঙ্গলার পুরাণ ব্রাহ্মণের অনাচার দেখিয়া প্রথমে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবেন না, ইহা স্বাভাবিক ; পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল। অযাজ্য-যাজী এবং শূদ্রের শ্রাদ্ধে প্রতিগ্রাহী প্রাচীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দল এখন অগ্রদানী, ভাট, বর্ণের

ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। খাঁটি সপ্তশতী দেশে অনেক স্থানে এখনও আছেন।

ক্ষিতিশূরের বহু পরে তাঁহার প্রপৌত্র ধরাশূরের সময়ে রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হয় (১৩)। এই কুলবিধির সময়ে আদিবরাহ প্রভৃতির পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে সকল ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত হইতেন। এই সময়ে কেবল রাঢ়ীয় গণই কুলাচল ও সচ্ছোত্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। বন্দ্য, মুখোটি, চট্ট, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলী, ঘঁড়, গড়গড়ি, পূতিতুণ্ড, ঘোষাল, কুন্দলাল, চতুর্থী, রায়ী, কেশরকুণি, দীর্ঘাঙ্গী পারিহাল, কুলভী, মহিন্ত্যা, গুড়, পিপ্পলী, ঘণ্টা, দিণ্ডা ও পীতমুণ্ডী এই ২২ গাঞিও 'কুলাচল' হইলেন। আর ৩৪ টি গাঁই (কঠোর নামোল্লেখে আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছা নাই) সচ্ছোত্রিয় হইয়াছিলেন। কুলাচলেরা অবশ্য সচ্ছোত্রিয় অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইলেন; কিন্তু একালে কুলাচল এবং সচ্ছোত্রিয়ের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান চলিত; সচ্ছোত্রিয়ের ঘরে কন্যা দিলেও কুলাচলের কুলক্ষয় হইত না। কিন্তু এ সময়েও রাঢ়ীয় ও সাতশতীর মধ্যে আদান-প্রদান প্রচলিত হয় নাই। যাক্, বল্লালের স্কন্ধে প্রথম কুলীনত্ব-স্থাপনের অপরাধ আর চাপান চলিবে না; এটি শূরেরই শূরত্ব। শূর-

(১৩) জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড। গৌড়ে ব্রাহ্মণকার আধুনিক কুলাচার্য্যের পাতড়ার বলে আদিবরাহ প্রভৃতির কুলীন বলিয়া গৃহীত হওয়ার যে বিবরণ লিখিয়াছেন. নগেন্দ্র বাবু হরিমিশ্রের কারিকা হইতে সংস্কৃত বচন তুলিয়া ও অনুবাদ দিয়া তাহার ভ্রম দেখাইয়াছেন। মজুমদার মহাশয় রাঢীয়গণকে কুলীন করার কথায় তাঁহাদের মধ্যেই সে সময়ে 'অনাচার প্রবিষ্ট হওয়ায় রাজনিয়মের আবশ্যক হইয়া উঠে'—বারেন্দ্রের মধ্যে দোষ ঘটে নাই, এই মন্তব্য লিখিয়া যে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন. নূতন প্রত্নতত্ত্বের জোরে শূরগণকে রাঢ়ে তাড়াইয়া গৌড়ে পাল প্রতিষ্ঠা করিয়া, বারিধি ভায়া তাহা ভাসাইয়া দিয়াছেন।

বংশের পরে সেন-রাজগণ দক্ষিণ-পশ্চিম, ক্রমে সমগ্র গৌড় বঙ্গ অধিকার করিলেন। "আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন-বংশ তাজা; বিশ্বক্ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা"—ইত্যাদি কুলজীর পাতড়ার বলে আমরা কর্ণাটাগত (?) 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সোমবংশপ্রদীপ'দের উজ্জ্বল আলোক জাতির গভীর অন্ধকারে আনিতে চাহি না (১৪)। তাঁহারা কুলের কলম কাটিয়া আমাদের ব্রাহ্মণবর্গের সুখের আরামে কি কণ্টকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই এখানে আলোচ্য।

মহারাজ বল্লালসেন নিজ ভুজবলে সমগ্র বঙ্গের অধিপতি হইলেন; বিদ্যাবত্তা এবং ধর্ম্মপরায়ণতায় প্রকৃতিপুঞ্জকে আকৃষ্ট করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। সমাজে শুদ্ধিস্থাপনের অভিপ্রায়ে অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের উন্নতি করিবার প্রয়াস পাইলেন। পরবর্ত্তী কালের, বিশেষতঃ এ যুগের কোন কোন লেখক বিচারশক্তির প্রভাবে বল্লাল সেনের ব্যবস্থাই, মেলবন্ধনের কুফল গুলির মূল কারণ এই ভ্রান্ত মত প্রচারিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা সনাতনধর্ম্ম এবং নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সমাদর-বৃদ্ধির অভিপ্রায়েই নূতন করিয়া কৌলীন্য-প্রথার সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। ধরাশূরের সময়ে 'কুলাচল' ও সচ্ছোত্রিয় এই দুই ভাগে রাঢ়ের সদ্‌ব্রাহ্মণ রাজ-সম্মান পাইয়াছিলেন, ইহা লিখিত আছে। বল্লাল সেন ২২ গাঞি কুলাচলকে বাছিয়া গুণানুসারে

(১৪) বল্লালের জাতির কথা তুলিতে গেলে একদিকে বৈদিক বৈদ্য উমেশ দাদার 'মুদ্গার' ও অন্যদিকে নবক্ষত্রিয় নগেন্দ্র ভায়ার 'কোদণ্ড' উত্থিত হওয়ার আশঙ্কা ত আছেই। ইহা ভিন্ন সম্প্রতি প্রদর্শিত সমাজতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-কারিবর্গের ভীতি-উৎপাদক Cautarisation, trans-mogrification. প্রভৃতিও অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দুর্ব্বল লেখকের মস্তকে চাপিতে পারে!

৮ টিকে মুখ্য কুলীন এবং ১৪টি গাঁইকে গৌণ কুলীন আখ্যা দিলেন (১৫)। শাণ্ডিল্য গোত্রে বন্দ্যঘটীয় 'উদারধীঃ' জাহ্লন ও মহেশ্বর, দেবল, বামন, মকরন্দ (সকলেই ১০ পর্য্যায়) এবং ঈশান (১১ পর্য্যায়) এই ছয় জন, কাশ্যপ গোত্রে চট্ট বহুরূপ (৮ পর্য্যায়), শুচ (৭প), অরবিন্দ (৭ প), হলায়ুধ ও বাঙ্গাল (৭ বা ৯) এই পাঁচজন, বাৎস্য গোত্রে গোবর্দ্ধন পূতি (১১ প) শিরো ঘোষাল (১১ প) এবং কাঞ্জিলাল কানু ও কুতুহল (১১ প) এই চারিজন, ভরদ্বাজ গোত্রে মুখবংশীয় উৎসাহ ও গরুড় (১২ পর্য্যায়) দুই জন এবং সাবর্ণ গোত্রে শিশু গাঙ্গোলী (১২ প) ও কুন্দ রোষাকর এই দুই জন সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ জন সর্ব্বগুণসম্পন্ন হওয়ায় মুখ্য কুলীন হন। গৌণ কুলীন ১৪ জনের নাম লইতে গেলে 'পুঁথি বেড়ে যায়'— পাঠক যে কোন ব্রাহ্মণ-কুলজী দেখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রোত্রীয় অপেক্ষা হীন, এ কথা পরবর্ত্তী কালের শ্রোত্রিয় ঘটকেরা সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। একালে যেমন ভঙ্গ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন 'ভাঙ্গিয়া যান', সেকালে গৌণ কুলীনের সহিত আদান-প্রদানে মুখ্যের সেরূপ দোষ হইত না। মহাকুলীন বন্দ্য মহেশ্বর অতিরূপ পিপ্পলী ও রুদ্র চোৎখণ্ডী এই দুই গৌণ কুলীনের সহিত পরিবর্ত্ত করেন, এ কথা

(১৫) বাচস্পতি মিশ্রের কুলরামে বল্লাল সেনের সময় হইতে কুলীনের যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা প্রামাণিক। মুখ্য কুলীনদিগকে "রাজ্ঞা প্রপূজিতঃ পূষ্টং প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখাঃ"--বলা হইয়াছে। একালের ঘটকেরা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি মতে কৌলীন্য স্থাপনের যে আষাঢ়ে গল্প বলিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের কল্পনার মত। বল্লাল সেনের মত পণ্ডিত রাজা গুণ বিচার না করিয়া, সকালে যে ব্রাহ্মণ সভায় গেল, তাহাকে অকুলীন, আর ২॥০ প্রহরে যাহারা গেল, তাহাদিগকে কুলীন বলিয়াছিলেন, (কেননা তাহারা নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া গিয়াছিল) এইরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা আমাদের দেশেই হইতে পারে। প্রাচীন কুলাচার্য্যেরা কেহই এত নির্ব্বোধ ছিলেন না যে, কৌলীন্য প্রথা স্থাপনের এই 'প্রামাণিক' ইতিহাস দিবেন!

ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে আছে। মেলসৃষ্টির পরে ভাঙ্গাভাঙ্গির সৃষ্টি হইয়াছে। বল্লালের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত কুলীনেরা সকলেই প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া রাজা তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন, এ কথা নগেন্দ্র বাবু হরিমিশ্রের কারিকা হইতে পাইয়াছেন। কুলার্ণব নামে ঘটকের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ২২ গাঞি কুলাচলের মধ্যে কতকগুলি এবং গৌণ কুলীনের মধ্যে কয়েক জন লোভী ব্রাহ্মণ বল্লাল-প্রদত্ত সুবর্ণ-ধেনু খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহারা সমাজে হেয় হইয়াছিলেন। (এই অবকাশে সুবর্ণ-বণিকের অধঃপতনের কারণ ঐ ধেনু-কর্ত্তন, ইহাও পরবর্ত্তী কালে আবিষ্কৃত হয়!)

কুলীনের গুণের পরিচয়ে বাচস্পতি মিশ্রের কুলরমায় নির্দ্দেশ আছে ঃ—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

আচারের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি লিখিয়াছেন ঃ—'কুলানুক্রমতো জুষ্ট-স্বীয়বর্ণাশ্রমোচিতঃ। ধর্ম্মশ্রুতিস্মৃত্যাদিতঃ স এবাচার ঈরিতঃ।' বিনয়ের ব্যাখ্যায় 'গুরৌ জ্যেষ্ঠে কুলাচার্য্যে নম্রতা প্রিয় ভাষণং' ইত্যাদি থাকায় কুলাচার্য্য মহাশয়দের নিকটও বিনয়ী হওয়ার আবশ্যক! এইরূপে বিদ্যা প্রভৃতিরও স্বরূপ বর্ণনা আছে (১৬)। ইহা কতটা মিশ্র মহাশয়ের কপোলকল্পিত, তাহা বলা যায় না; হরি মিশ্রের গ্রন্থে গুণের সংজ্ঞা

(১৬) 'পুণ্যোঘগুণদোষাদি সদসৎসু বিচারণম্। ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পাণ্ডিত্যং সা বিদ্যা সমুদাহৃতা' বলিয়া বিদ্যার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হইয়াছে; এইরূপে নিষ্ঠা, তপ, ও দানের কথায় ধর্ম্মজ্ঞান প্রধান স্থান পাইয়াছে। 'পরোপকৃত্যে যত্ত্যাগঃ' দান-সংজ্ঞায় প্রধান স্থান পাইয়াছে।

দেওয়া নাই। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে 'নিষ্ঠা শান্তি' আছে, আবৃত্তি বা পরিবর্ত্ত তাঁহাদের সমাজে নবগুণের মধ্যে ধরা হয় নাই। বল্লাল সেনই রাঢ়ী-বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ করেন, এই ভ্রান্ত মত বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ীর মধ্যে যেমন কুলপদ্ধতি স্থাপিত হয়, বারেন্দ্রের মধ্যেও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া 'কুলীন' করা হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও ৮ গাঞি কুলীন হইয়াছিল বলিয়া মিলাইতে গিয়া সারণ 'ভাদড়'কে পাদপূরণে ধরা হইয়াছে। সাধু ও রুদ্র বাগছি, ক্রতু ভাদুড়ী, মৈত্রেয় মৈত্র, লক্ষ্মীধর সান্ন্যাল, জয়মান মিশ্র, ভীমকালী হাই—এই সাত জনই প্রথম বারেন্দ্র কুলীন হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রের গাঁই সময়ে সময়ে নূতন নূতন সৃষ্টি হইয়াছে; সেই সকলের নামগ্রহণ অনাবশ্যক, পাঠকের প্রয়োজন হইলে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' দেখিবেন। রাঢ়ী বারেন্দ্রের বংশলতা অপেক্ষা মেল বা পরিবর্ত্ত মর্য্যাদাই সামাজিক হিসাবে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া সংক্ষেপে সেই বিষয়ের কোন কোন কথা বলা যাইবে। ঘটকদিগের দাবি এই যে, রাজা বল্লাল সেন কুলীনের আচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেশ্যে কুলাচার্য্য নিযুক্ত করেন এবং ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, কুলীন আদান-প্রদান (পরিবর্ত্ত) দ্বারা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবেন; কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দিলে কুলক্ষয় হইবে। 'দানধ্যান-পরাঙ্মুখ, রিপুর বশীভূত, লুব্ধ, মূর্খ, দ্বিজের কুল থাকে না; বংশলোপে এবং রক্ত ও পিণ্ডদোষে কুল থাকে না। বলাৎকার দূষিত এবং বিবাহ-বর্জ্জিত হইলেও কুল যাইবে' (হরিমিশ্র)। কুলমঞ্জরী নামক অর্ব্বাচীন কুলগ্রন্থে কুল করার গল্প বর্দ্ধিতাকার হইয়া পরিবর্ত্ত এবং অংশ প্রভৃতির নির্দ্দেশ হইয়াছে। বল্লালের সভায় কুলবন্ধনের সময়ে উপরি-লিখিত ২২ গাঞি ব্রাহ্মণ তাঁহার মতে মত দেওয়ায় কুলীনত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু

বিকর্ত্তন প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ সে ব্যবস্থায় মত না দিয়া চলিয়া যান। ত্রিশঙ্কুর মত ইঁহাদের গতির কথা পুঁথিতে লিখে না।

অতঃপর কুলীনের মধ্যে পদমর্য্যাদা লইয়া গোল উঠিলে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে একবার ও শেষে দনৌজা মাধবের সময় কয়েকবার সমীকরণ হইয়াছিল, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যক্তি সমান কুলীন, তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিয়মিতরূপে আবৃত্তি অর্থাৎ আদান-প্রদান যাঁহাদের মধ্যে হয় নাই, তাঁহারাই শেষে 'বংশজ' বলিয়া খ্যাত হন; কিন্তু তখনও দোষ ধরিয়া থাক্ করা হয় নাই। মুসলমান অধিকারের প্রথম দিকের বিপ্লবে অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলে গিয়া বাস করেন; অনেকে স্বঘর না পাইয়া অকুলীনের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে বাধ্য হন, আবার পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের উৎপাত হইলে অনেকে মধ্যবঙ্গে ভাগীরথীসমীপে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন, ইহা কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায়। একালে, এই কারণে প্রধান কুলাচার্য্যেরা সময়ে সময়ে সম্মিলিত হইয়া নূতন নূতন সমীকরণ করিয়া সমাজ-রক্ষার কালোচিত ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন। বাসস্থানের নাম অনুসারে গাঁইএর উপর আবার অন্য গাঞি যোগ হইয়াছিল; যেমন আমাদের বংশে দুর্ব্বলীর পুত্র অনন্ত গয়ঘর গ্রামে বাস করায় আমরা গয়ঘর অমুকের সন্তান বলি; এইরূপে কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী, ফুলিয়া বা কাঁচনার মুখুটি, পাটুলির চট্ট, ইত্যাদি। বিপ্লবের সময়ে বারেন্দ্র কুলে কি পোকা লাগিয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া জানা যায় না; তাঁহাদের কুলপঞ্জীর শত গাঁই সৃষ্টির গল্পের কোন মূল্য নাই; সে সব গাঁই বাস অনুসারে পরে হইয়াছিল, নির্ব্বোধেও বুঝিতে পারে। মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে বরেন্দ্র ভূমির উপরেই চাপ বেশী পড়িয়াছিল; অনেক জায়গীর ঐ প্রদেশেই স্থাপিত ছিল, হিন্দু জমিদারেরা এখানে

মুসলমান প্রভাবের সংস্পর্শে আসিয়া আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও সামাজিক অবনতি এখানে সম্ভবপর। কিন্তু এ বিষয়ের বিশ্বাস-যোগ্য কোন লিখিত প্রমাণ নাই। মেল বন্ধনের সময়ে ও পরে রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ, বাচস্পতি প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলীনের অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন মিশ্র গ্রন্থের প্রবাদ সমূহ প্রবাদ হইলেও পুরাতন কাহিনী। সুতরাং রাঢ়ী সমাজের অবস্থা ব্যবস্থা কতকটা জানা যাইতে পারে; তাহাতে দোষ গুণের সমাবেশ দেখিয়া সেকালের অনেক কথা কল্পনা ও সমালোচনা চলে। নিম্নে যথা জ্ঞান তাহাই করা গেল।

পাল রাজগণের সময়ে বঙ্গীয়-সমাজ বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে, কনোজাগত ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার সেইকাল হইতেই আর্য্য ব্রাহ্মণের আদর্শ অপেক্ষা অবনত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু পাল রাজগণের দ্বারাও যে এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অনেকে সমাদৃত ও দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রামাণিক বিবরণ একালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধ সমাজ সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে। বৌদ্ধ ভাবের চরম বিকাশের কালেও ভারতে জাতির প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা পূর্ববৎ ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণের প্রতি ততটা সম্মান দেখান হয় নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে না যে, সমাজে ব্রাহ্মণ প্রভাব একবারে অস্তমিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ প্লাবনে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রাধান্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিলেও সমাজে ব্রাহ্মণ-শাসন একেবারেই ভাসিয়া যায় নাই। জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধ গল্পে এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধ গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃত না হইলেও উহাদের মধ্যেই প্রমাণ আছে যে, ব্রাহ্মণেরাই তখনও রাজকীয় অনেক প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন; মন্ত্রী, সেনাপতিও ব্রাহ্মণ থাকিত। ব্রাহ্মণকে

চিকিৎসকের এবং ভাণ্ডারের কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেও দেখা যায়। বঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের সময়ে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ বা জৈন ভাবাপন্ন জন-সাধারণের পৌরহিত্য কার্য্য করিতেন। বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ নিতান্ত অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিকল্পে রাজা আদিশূর কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে পাল অধিকারে নবাগত ব্রাহ্মণদিগের বংশধরেরা অনেকেই পথভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া রাজা শ্যামল বর্ম্মাকে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হয়। কাল বশে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকামী এই সমস্ত নৃপতি-বর্গের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। নবগুণান্বিত ব্রাহ্মণ বাছিয়া বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে কুলীন করিলেন, কিন্তু বংশমর্য্যাদা লইয়া পুনরায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। লক্ষ্মণ সেন পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা দৃঢ়তর করিয়া কুলের বিশুদ্ধি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরিবর্ত্ত অর্থে যে ঘরে কন্যা দান করা হইবে, আবার সেই ঘর অর্থাৎ সমান ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে। কিরূপ বংশে আদান প্রদান চলিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সমীকরণ দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কুল-বিধি দৃঢ়তর করেন; রাজা দনুজ মাধবের সময়েও পুনরায় কয়েকবার ঐরূপ সমীকরণ হইয়াছিল। এইরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলীন গৌণ কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন। শ্রোত্রিয়গণকে আচার ব্যবহার অনুসারে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইল। কুলীন দল যাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই প্রথম তিন শ্রেণীতে গৃহীত হইলেন; যাঁহারা আচার-ভ্রষ্ট তাঁহাদিগের সংজ্ঞা 'অরি' (কুল নাশক) হইল। যে কুলীন সন্তানের পুরুষানুক্রমে যথারীতি আদান প্রদান ছিল না তাঁহাদিগকে 'বংশজ' নাম দেওয়া হইল। এই সময় হইতে কুলাচার্য্য বা ঘটক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অংশ বংশ দোষাদি নির্ণয় করাই কুলাচার্য্যের কার্য্য হইল।

কন্যাপক্ষে সম্বন্ধ নির্ণয়কে অংশ বলিত, বরপক্ষে সম্বন্ধ নির্ণয় বংশ; উভয় পক্ষের দোষ নির্ণয় লইয়াই পরবর্ত্তী কালে গোল বাধিয়াছে। নিষ্ঠাবান্ ও সৎকর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠাই সেন রাজগণের কাম্য ছিল। সমীকরণ এবং কুলাচার্য্য দ্বারা দোষাদি নিরূপণ সেকালে শুদ্ধি রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে হিন্দু রাজার অভাবেও ঘটক দ্বারা অনেকবার সভায় সম্মিলিত কুলীন দলের সমীকরণ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সদাচার ও আত্মোন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে বংশগত গৌরবই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিতেছিল।

আবৃত্তি বা পরিবর্ত্ত নিয়ম সকল ক্ষেত্রে চলা দুষ্কর দেখিয়া রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ পরিবর্ত্তের নববিধান করিয়া লইয়াছিলেন। বাগ্ দান, কন্যা অভাবে কুশময়ী কন্যাদান, কন্যা আদান প্রদান এবং ঘটকের সমক্ষে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা এই চতুর্ব্বিধ রূপে পরিবর্ত্ত হইবার নিয়ম প্রচলিত হইল। ঘটকেরা প্রথমে প্রায়ই কুলীন সন্তান ছিলেন; কালে গৌণ কুলীন শ্রোত্রীয় ভাবাপন্ন হইলে শ্রোত্রিয় ঘটকও অনেক হইয়া পড়িল। একালে বংশাবলী রক্ষা এবং শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার রীতিমত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত। দত্ত খাস্ উপাধিধারী কোন হিন্দু মুসলমান— রাজ-মন্ত্রীর সভায়ও একবার কুলীনের সমীকরণ হইয়াছিল। অতঃপর পণ্ডিতবর দেবীবরের আবির্ভাব। পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। নানা স্থানে যবন রাজপুরুষদল বল প্রয়োগে লোককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। (১৭) ধর্ম্মশিক্ষায় এবং নিষ্ঠা দেখাইয়া

(১৭) জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ উৎসন্ন করার প্রবাদের ভিত্তি বোধ হয় এইরূপ কোন স্থানের মুসলমান অত্যাচার; কিন্তু "ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়"—ইহা হোসেন শার সময়ে হওয়া সম্ভব নহে, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

আউলিয়া পীর ও ফকির দল অতি অল্প সংখ্যক হিন্দুকেই মুসলমান করিতে পারিয়াছেন। গাজী পীর অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা এবং ভয় প্রদর্শনে মুসলমান করিবার নিমিত্ত যে 'সাধু'র দল বহির্গত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে। শ্রীহট্টের শা জলাল্ এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গের সোণাগাজী প্রভৃতি কয়েক জন পীর এই শ্রেণীর। সমাজের শীর্ষস্থানীয় জাতি ব্রাহ্মণ সহজে মুসলমান ত হনই নাই; পরন্তু লোকের মুসলমান হইবার পক্ষে ব্রাহ্মণই প্রধান অন্তরায় স্বরূপ ছিলেন, এই কারণেই স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বিশেষ অত্যাচারের কথা কাব্য ও প্রবাদে পাওয়া যায়। হোসেনশার পরবর্ত্তী সময়ে কয়েক জন গৌড় বাদশা সমদর্শিতার গুণে হিন্দু প্রজার শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। কবি জয়ানন্দের কথিত "খড়্গ খর্পর-ধারিণী দিগম্বরী কালী' মাতার স্বপ্নাদেশে হউক বা না হউক, ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষের হিন্দু প্রজার প্রতি মমতা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে পরিস্ফুট দেখা যায়। এসময়ে উচ্চতম রাজকার্য্যে হিন্দু কর্ম্মচারী অবাধে নিয়োজিত হইতেন। ব্রাহ্মণের আদর্শে বঙ্গের সৎশূদ্রের ও একালে স্বধর্ম্মে মতি গতি ফিরিতেছিল। পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে বঙ্গীয় সমাজে তথা অনেক ব্রাহ্মণ বংশে স্থানে স্থানে যবন সংস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছিল। সৎ কুলীনের বংশধরগণও বিদ্যাদি অন্যান্য গুণের প্রতি তত লক্ষ্য রাখেন নাই, যতটা আচার ও বংশ মর্য্যাদার প্রতি ছিল। কে বড় কে ছোট ইহাই লইয়া পরস্পর দ্বেষ ও বিবাদ বৃদ্ধিই চলিতেছিল। এমন সময়ে দেবীবর বিশারদের অভ্যুদয়। ইনি বন্দ্য বংশে সঙ্কেত হইতে ষষ্ঠ পুরুষ এবং সর্ব্বানন্দের

কৃত্তিবাসের পূর্ব্ব পুরুষেরা এইরূপ উৎপাতে বিক্রমপুর ত্যাগ করেন; বরেন্দ্র ভূমেও এরূপ অত্যাচার প্রবল ছিল। এরূপ সাময়িক অত্যাচার অনাচার যে হইত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পুত্র ; কুলীন হইলেও মর্য্যাদায় সেকালের বিচারে প্রধান মুখ্য কুলীনের মধ্যে ইঁহাদের স্থান একটু নীচে ছিল।

কুলাচার্য্য বংশে তাঁহার জন্ম ; স্বয়ং নানা শাস্ত্র বেত্তা বলিয়া 'বিশারদ' উপাধি-প্রাপ্ত। এইরূপে বিদ্যাদি নবগুণান্বিত অসাধারণ মানসিক শক্তি সম্পন্ন তাৎকালিক ঘটক সমাজের নেতা বন্দ্য দেবীবর ষোড়শ শতাব্দীর কুলাচার্য্যদিগের এক মহতী সভায় তাঁহার কল্পিত মেলবন্ধের ব্যবস্থা করেন। এই সভায় সেকালের মুখ্য কুলীন সন্তানের অনেকেও উপস্থিত ছিলেন (১৮)। সেনরাজ প্রতিষ্ঠিত কুলপ্রথা যথাযথ প্রতিপালিত না

(১৮) ১৪০২ শকে মেল বন্ধন হয় একথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। প্রাচীন ঘটক সুলো পঞ্চানন রঘুনন্দনের কিছু পরে মেল করা হইয়াছে বলেন। কুলের মধ্যে মেল প্রচলনের ইতিহাস দিতে গিয়া অনেক ঘটক গাল গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশে ইতিহাসের নামে 'মজার গল্প' বলা বহুদিন চলিতেছে। ঘটকের পুঁথিতে আছে যে দেবীবরের মাসতুতো ভাই মহা কুলীন যোগেশ্বর পণ্ডিত একদিন মাসীর বাড়ী গিয়া সেখানে অন্ন গ্রহণ করেন নাই। দেবীবর বাড়ীতে ছিলেন না, মাসী নিম্ন ঘরে পাড়িয়াছেন, সেখানে খাওয়া যায় না, আবার স্বপাক খাইতে ইচ্ছা করিলে মাসীর অপমান করা হয়। দেবীবর বাটী ফিরিয়া এই কথা শুনিয়া এবং মাতার দুঃখ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যোগেশ্বর সাধিয়া আসিয়া তাঁহার বাটীতে চাহিয়া খাইবে, নতুবা প্রাণ রাখিবেন না। অতঃপর দেবীবর ভগবতীর (কোন মতে কামাখ্যার) আরাধনা করিয়া বাকসিদ্ধ হইলেন ; সেই অবধি নাম হইল দেবীবর (পূর্ব্বে অবশ্য অন্য নাম ছিল!)। তৎপরে কুলীন ও ঘটকের মহাসভায় তিনি কূটতর্কচ্ছলে যোগেশ্বর মুখোর কুল বিচার কালে বলিলেন, "শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি। সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলম্"। যোগেশ্বর পণ্ডিত তখন তাঁর পায়ে পড়িয়া মাসীর রান্না খাইতে দৌড়িলেন। দেবীবর লুপ্ত অকার বাহির করিয়া 'যোগেশ্বরেঽকুলং' বলিয়াছি বলিয়া বাক্‌সিদ্ধি স্থির রাখিলেন ; (পণ্ডিতগোঽবিনীয়তে— গোছের)—ঘটকের কথাটি ফুরালো। আবার দেবীবরের গুরু শোভাকর চট্টোর

হওয়ায় রাঢ়ীয় সমাজে নানা দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। সংশোধনই উদ্দেশ্য হইলেও যে ভাবে তাঁহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইল, তাহা পরবর্ত্তী কালের ঘটক ও ব্রাহ্মণ সমাজের অদূর-দর্শিতায় কুফল প্রসব করিয়াছিল বলিয়া দেবীবর এযাবৎ সয়তানের আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। কুলের কথা বিচার বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয় না হইলেও কুলবিধি মধ্যযুগের বঙ্গীয় সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল বলিয়া আমরা সংক্ষেপে মেলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি। দেবীবরের সময়ে অনেকে নবগুণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরিবর্ত্ত বিবাহে বংশের বিশুদ্ধি সাধনই কুলীনের কার্য্য মনে করিতেন। বাস্তবিক আবৃত্তির জুজু কুলীন-সমাজকে জড়ীভূত করায় পরবর্ত্তী রাঢ়ীয় ঘটকেরা 'নিষ্ঠা শান্তি'র স্থলে 'নিষ্ঠাবৃত্তি' বসাইয়াছেন, একথা আমরা গৌড়ে ব্রাহ্মণ-কারের মতই স্বীকার করি, পূর্ব্বে ইঙ্গিত করা গিয়াছে। সেন রাজগণের শুদ্ধাচার রক্ষার উপায় 'আবৃত্তি'র এ দশা পরে ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, দেবীবর ও তাঁহার মতাবলম্বীরা দেখিলেন, যবন ও অন্ত্যজসংস্পর্শে অনেক কুলীন দোষাশ্রিত হইয়াছেন, অনেকে আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বাদ দিলেও 'শিবহীন যজ্ঞ' হয়। সমাজে গণ্য মান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের লইয়াই প্রকাশ্য সভায় দেবীবরের মেল বন্ধন হইয়াছিল ; তাঁহার প্রায় সমসাময়িক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী আলোচনা করিলে মনে হয়, রাঢ়ীয় কুলীনের যে

অহঙ্কারের নিমিত্ত দেবী তাঁহাকে নিষ্ফল করেন, গুরুও শাপ দিলেন, সেইজন্যই দেবীবরের বংশ নাই, এ কথা সংগৃহীত 'কুলরামে' দেখান হইয়াছে। ঘটকগণের বিশ্বাস ও বিদ্যার দৌড় লম্বা ছিল ; অনুষ্টুপ অনেকেই লিখিতে পারিতেন, এবং লিখিলেই শাস্ত্র হইয়া উঠিত। কালে এইরূপ শাস্ত্রের দৌরাত্ম্যেই 'কুল-কালিমা' লিখিবার প্রয়োজন পড়িয়াছিল। দেবীবরের মতে মত না দেওয়ায় অনেকে 'বংশজ' হন একথাও আছে।

ছত্রিশটি মেল দেবীবর কৃত বলিয়া কথিত আছে, তাহার অনেকগুলি পরবর্ত্তী কালে পর্য্যায়-বদ্ধ হইয়াছিল। দেবীবর কেবল দোষ দেখিয়া মেল করেন, অর্থাৎ এক ভাবের দোষযুক্ত লোককে এক পর্য্যায়-ভুক্ত বলেন, এ উক্তির অর্থও সকলে অন্যরূপে বুঝিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রধান পণ্ডিত এবং সদাচারী ধার্ম্মিক কুলীন লইয়া দেবীবরের কুলবিধি প্রস্তুত হয়। প্রামাণিক কুলাচার্য্য দনুজারি মিশ্র লিখিয়াছেন:—

শৌর্য্যে বীর্য্যে দানে ধর্ম্মে বিদ্যায় পূর্ণিত।
পুনঃ কৃতিত্ব মেল করিলা পণ্ডিত॥ (মেল রহস্য)

দেবীবর কৃত 'দোষ নির্ণয়' বা দেবীবরের 'বচন' ও মেলবন্ধ বলিয়া যাহা অন্য ঘটকেরা চালাইয়াছেন, তাহা যে দেবীবরের নহে, তাল করিয়া পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। কোথাও তাঁহার কোন কোন বচন মাত্র উদ্ধৃত করিয়া ঘটক প্রবরেরা মনঃকল্পিত কুলশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। অবশ্য দেবীবরের প্রদর্শিত পথেই পরবর্ত্তী কালে সমশ্রেণীর লোক বাছিয়া মেল বাঁধা হইয়াছে; কিন্তু রণ্ড পিণ্ডাদি অথবা জাতিগ, কুলগ, শ্রোত্রিয়গ ইত্যাদি যে সব দোষ দেবীবরের মত মনীষির নির্ব্বাচনের সাধ্য ছিল, তৈল-বট-লোভী পরবর্ত্তী কুলাচার্য্য মহাশয়গণের হাতে পড়িয়া তাহা "ভাঙ্গে হীরাধার" মত হইয়াছে। মহারাজ বল্লাল সেনের মত দেবীবরের আনত মস্তকে অনেক লগুড়পাত হইয়া আসিয়াছে। দেশ কাল পাত্র অনুসারে তিনি কি ভাবে সমাজের সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। রক্ষণশীল বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কুলীন সন্তানের সমাদর বলবৎ ছিল; তাঁহাদের সম্মান রাখিয়া দোষ সংশোধনের উপায় না করিলে গত্যন্তর ছিল না। এই কারণেই দোষের সমতায় মেল-বন্ধন। অদূরদর্শিতার দোষ দেওয়া যত সহজ, সামাজিক সমস্যার সমাধান তত সহজ নহে। সে যুগের বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণত্ব ও

পাণ্ডিত্যের তত অভাব হয় নাই। পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যেরা বাহাদুরী দেখাইবার অভিলাষে অনেক অকথ্য দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন। হরি কবিন্দ্রের এবং অন্যান্য কুলাচার্য্যের দোষ-সংগ্রহে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে কুলে যথেষ্ট পোকা লাগিয়াছিল। নির্দোষ কুলীন নির্ব্বাচন করিতে গেলে 'ঠগ বাছতে গাঁ উজার' মত হইত।

বঙ্গীয়সমাজের হিতার্থে কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই স্মার্ত্ত শ্রীনাথ রঘুনন্দনাদি স্মৃতির ব্যবস্থায় সমাজ সংশোধনের একটা পন্থা দেখাইয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারও প্রয়োজন ছিল; আদর্শ স্থির না থাকিলে আচার কাহাকে অবলম্বন করিবে? পরবর্ত্তী কালে মেলের দোহাই দিয়া অনাচার প্রবেশ করায় যত গোল হইয়াছে। নহিলে যে যুগে রঘুনাথের ন্যায় মনীষি শ্রোত্রিয় কুল, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন গৌণকুল এবং যোগেশ্বর, দেবীবর মুখ্য কুল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তখন বাঙ্গলায় আদর্শের অভাব ঘটে নাই। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার বার্ত্তা ঐ দিক্ হইতেই লইতে হইবে; পশ্চিম পানে মুখ ফিরাইয়া নত জানু হইয়া নহে! কবিকঙ্কণের যুগেও বিবাহ-সভায় বেদপাঠক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা উল্লেখ করা গিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে মেলের জোরে জয়পত্র কপালে আঁটিয়া গুণ হীন কুলীন গৌণের বা অসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা পণের লোভে গ্রহণ আরম্ভ করিলে নিস্তেজ কুলাচার্য্যদল 'বাহবা নন্দলাল' বলিয়া তাঁহার 'স্বকৃত ভঙ্গ' উপাধি দিয়াছে। ভঙ্গের বংশধরেরা পালটী খুজিয়া কন্যা দিয়া কুল রক্ষা হইল, মনে করিয়া লইয়াছে; পচা হইলেও 'উয়ো' ছাড়ে নাই। পূর্ব্ববঙ্গে রক্ষণ-শীল সমাজে বাড়রি, মুখটি বলিয়া খাট করার প্রথা হইলেও পশ্চিমবঙ্গের ডাঙ্গায় 'উন্নত' ব্রাহ্মণ সমাজ কথায় 'ভঙ্গ' বলা হইলেও কার্য্যে উহা স্বীকার না করিয়া 'মচ্‌কান' মতই দেখাইয়াছে। ত্রিকুলের থাক্, নবগ্রহ, ত্রিদোষী ইত্যাদি

নূতন নূতন নাম করণ করিয়া কুলীনত্বের অভিমানকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে (১৯)। ক্রমে প্রকৃতি বা পালটী না যোটায় 'স্বজনা'দি কত অদ্ভুত ধরণের দোষ ঘটিবার ভয়ে কন্যা বড় হইলেও ঘরে রাখিতে হইয়াছে; তখন 'গুণহীনে দিবে না' ইত্যাদি মনুর দোহাই দিয়া অনেক দরিদ্র কুলীন বয়স্থা কন্যাকে অনূঢ়া রাখায় দোষ দেখেন নাই। কখনও বা যে কোন 'উচ্চ' কুলীন পাইলে একদল কন্যাকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে; বয়স বাছেন নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে 'কুলীন কুল সর্ব্বস্বে' বিদ্রূপ ছলে উল্লিখিত বিবাহের বিশ বছর পরে প্রথম শ্বশুর বাটী যাত্রীর নিজ 'তথা-কথিত' পুত্রের সহিত সাক্ষাতের অভিনয় কি অসম্ভব? অথচ শত দোষ সত্বেও বংশজ পিতা কুলীন বরে কন্যা দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। দুই শত বৎসরের মোহনিদ্রার পরে পশ্চিমবঙ্গে কিঞ্চিৎ চেতনা সঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থল এখনও 'যে তিমিরে, সেই তিমিরেই' আচ্ছন্ন আছে।

বারেন্দ্র সমাজে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপনের কর্ত্তা বলিয়া কথিত। অদ্বৈতাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়ুলী (রাজা গণেশের মন্ত্রী) মধু মৈত্রেয়কে যে ভাবে কন্যাদান করেন ও যে-রূপে কাপের উৎপত্তি হয় তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। মধু মৈত্রের

(১৯) বড় বড় কুলীনেরা ঘটকের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিলেও ভঙ্গজবের মহা-প্রধির দল কুলাচার্য্যের শাসনের মধ্যেই ছিলেন; ঘটকদল পরামর্শ করিলে লোককে সমাজে উঠাইতে পড়াইতে পারিতেন। কুলাচার্য্য মধ্যস্থ না হইলে সেকালে বিবাহ সংঘটনই কঠিন ছিল। মেলী কুলীন নানা স্থানী হওয়ায় বিবাহে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। বৃহৎ লোকের কে কোন মেল, কাহার কোন ভাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়াই ঘটকের অন্ন সংস্থান হইত। দোষ ঢাকিতেও ঘটকের সাহায্য প্রয়োজন ছিল।

পিতামহ নরসিংহ মৈত্রেয় উদয়নের সমসাময়িক; এইরূপে গণনা করিয়া ১২৫০ শকের সমকালে উদয়নাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমিত হইয়াছে। দনুজমাধবের ব্যবস্থা এবং রাঢ়ীয় সমীকরণের অনুকরণে বারেন্দ্র সমাজেও কুলীনের করণ কারণ স্থির হইয়াছিল, মনে হয়। বারেন্দ্র সমাজে 'যবনাঘাত' প্রথম ও অধিক হইয়াছিল, বলাই বাহুল্য; গৌড় এবং পশ্চিমবঙ্গ অধিকৃত হইলে অনেক রাঢ়ীয় পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করেন, বরেন্দ্রে এরূপ প্রস্থান অধিক ঘটে নাই। আবার মুসলমান রাজের প্রসাদে বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণ সমাজে বর্দ্ধিষ্ণু ভূস্বামারও অভ্যুদয় হইয়াছিল। এক-টাকিয়া ভাদুড়ী, প্রসিদ্ধ সান্যাল বংশ এবং তাহেরপুরের প্রাচীন রাজ-বংশ এইরূপেই উন্নত হন। তাঁহাদের উৎসাহে বরেন্দ্র সমাজে বিদ্যা ও সদাচারের প্রসার হইয়া বরেন্দ্র নাম সার্থক হইয়াছিল। তাহেরপুর রাজ কংসনারায়ণ বারেন্দ্র সমাজে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে করণ কারণ স্থির করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ঔদার্য্য ও সংস্কার প্রয়াস লক্ষিত হয়। গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিত আছে;—"উদয়নাচার্য্য ও মধু মৈত্রের ত্যক্ত পুত্রগণের সন্তান এবং যাবনিক দোষাক্রান্ত আঘাত যুক্ত কুলীনগণ যাঁহাদের কুলভঙ্গ হয়, তাঁহাদিগকে লইয়া কাপ সমাজ নাম গঠিত হইয়াছিল। তাৎকালিক কুলীনেরা কাপদিগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন; বারেন্দ্র কুলে কাপের কোনরূপ সম্মান অথবা স্থিতিস্থান ছিল না। কাপের সহিত সম্বন্ধ, ভোজন প্রভৃতিতে কুলপাত হইত। এইরূপে কুলীনের সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ কুলীন, কুলজ্ঞ, শ্রোত্রিয় এবং কাপ সকলকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অবধারণ করেন;—

১। কুলীনের সহিত কাপের কুশবারি যুক্ত করণ হইয়া কুলীন

কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে কি কাপে কন্যা দান করিলে কুলীনের কুলপাত হইবে, অন্য প্রকারে কুলপাত হইবে না। (*)

২। যখন শ্রোত্রিয়গণ নীচ পটী হইতে শ্রেষ্ঠ পটীতে যাইবেন অর্থাৎ কন্যা দান করিবেন, তখন কাপে কন্যাদান করিতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, অধম পটীর দোষ কাপের স্কন্ধে দিয়া শ্রোত্রিয় নির্ম্মল হইয়া অন্য পটীতে যাইবেন। (প্রধান শ্রোত্রিয়গণ এই নিয়ম পালন করেন নাই; এখন কাপে কন্যা সম্প্রদানের পরিবর্ত্তে কাপের ললাটে ফোঁটা দিয়া কাপ ব্যবধানের নিয়ম দেখা যায়। তেজস্বী কুলীন শ্রোত্রিয়গণ তাহাও মানেন না।)

৩। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কৃত পরিবর্ত্ত নিয়মে কন্যা অথবা ভগিনীর অভাব হইলে পরিবর্ত্ত হইতে পারিত না, সেই কাঠিন্য নিবারণ জন্য কুশময় পাত্র কন্যার ব্যবস্থা হয়।

৪। শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিলে কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন। যদিচ যাবনিক আঘাতাদি দ্বারা ভঙ্গ কুলীনেরা কাপদলে প্রবেশ করিয়া কুলীনগণের নিতান্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু কাপগণের দৌরাত্ম্যে কুলীন সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়াতেই সমাজ রক্ষার্থ রাজা কংসনারায়ণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কাপের স্থান দিয়া, সাধারণের বিশ্বাস এবং কাপগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বয়ং আপনার এক কন্যা জিবাই ধাপাড় সিংহে, দ্বিতীয় কন্যা সদানন্দ সান্যালে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ কাপের সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়া শ্রোত্রিয়গণকে সিদ্ধ, সাধ্য এবং কষ্ট এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যাঁহারা

(*) কুশবারি যুক্ত করণ বিনা, শ্রোত্রিয়ের নিয়মানুসারে যদি বরের ললাটে ফোটা দিয়া কোন কাপ কুলীনে কন্যাদান করেন, তাহা হইলে কুলভঙ্গ হইবে না। কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন, এইরূপ ঘটনাও হইয়াছে।

শুদ্ধ বংশজ এবং ক্রমাগত কুল কার্য্য করিতেন, তাঁহারা সিদ্ধ এবং যাঁহারা কুলার্চ্চন দ্বারা সমাজে পরিচিত, তাঁহারা সাধ্য এবং অন্যেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন। রাজা কংসনারায়ণ কাপ এবং শ্রোত্রিয়গণের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে কুলীনের সহিত একত্রে ভোজন দিয়াছিলেন, সেই হইতে কাপের অপর নাম "সুগিদ কুলীন" বলা হয়।

কাপ এবং শ্রোত্রিয়ের কুল উঠাপড়া হয়, অর্থাৎ কাপেরা উত্তম কাপের সহিত করণ করিয়া কন্যা দিতে পারিলে তাঁহাদের কুল গৌরব হয়। কুলীনের কন্যা গ্রহণ এবং করণ করিয়া কুলীনে কন্যা দান করা কাপের পক্ষে সমধিক গৌরবের বিষয়। কুলীনে কন্যাদান এবং কুল ক্রিয়া যাঁহাদের আছে এ মত সৎ-শ্রোত্রিয়ের কন্যাগ্রহণ শ্রোত্রিয়ের কুল গৌরব বৃদ্ধির হেতু। যিনি শ্রোত্রিয় কর্ত্তৃক আদৃত, তিনিই মান্য শ্রোত্রিয়। কুলীন এবং কাপ ইহাঁরা ভঙ্গ হইলে আর কখনই পূর্ব্বাবস্থা পাইতে পারেন না। কাপের সহিত করণ দ্বারা কুলীন কাপ হন, শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে কুলীন শ্রোত্রিয় হন।"

রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈদিক আখ্যাধারী অনেক সৎ ব্রাহ্মণও বাঙ্গলায় বাস করিতেছেন। পাশ্চাত্য বৈদিক সম্বন্ধে গল্প আছে যে, ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের শ্যামলবর্ম্মা নামক নৃপতির অনুরোধে একাদশ শতাব্দীতে প্রথমে বঙ্গে আসেন। সে রাজার প্রাসাদ-শীর্ষে গৃধ্রপতনের শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত বারাণসী অঞ্চলের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যশোধরকে আনা হইয়াছিল। কানোজের ব্রাহ্মণেরা শুষ্ক মল্ল-কাষ্ঠকে পল্লবিত করিয়াছিলেন; এ গল্পের যশোধর মন্ত্র বলে শকুনিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার মাংস যজ্ঞে আহুতি দিয়া পুনরায় তাহাকে জীবিত করেন এবং বর্ত্তমান ফরিদপুরের সামন্তসার গ্রাম প্রাপ্ত হন। তিনি একাকী বঙ্গে বসতি করিতে অসম্মত হওয়ায় অন্য চারি গোত্রের চারিজন

ব্রাহ্মণকেও সপরিবারে আনিয়া গ্রাম দান করা হয়। এইরূপে পাশ্চাত্য বৈদিকের বেলায়ও পাঁচে মিল করা আছে। পরে দুই গোত্রের সামবেদী এবং চারি গোত্রের যজুর্ব্বেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া ভূম দান পাইয়া বাস করেন। প্রথমে ফরিদপুর জেলার কয়েক খানি গ্রামে, ও যশোরে কোটালিপাড়ে বৈদিকের বসতি ছিল। বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডে ইঁহারাই এ দেশের অনেক ব্রাহ্মণের পুরোহিতের কার্য্য করিতেন, এবং এই শ্রেণীর মধ্যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গুরু ও হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে পাশ্চাত্য বৈদিক বলা হয়। দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আন্ধ্র বা উৎকল ব্রাহ্মণ যাঁহারা পরে আইসেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। এখন ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) পাশ্চাত্য বৈদিকের প্রধান স্থান; ব্রাহ্মণোচিত সদাচারে ইঁহারা এখনও বঙ্গীয় সমাজে এক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মর্য্যাদা অনুসারে ইহাদের মধ্যেও এক ভাবের কৌলিন্য প্রবেশ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা কুলীন, বংশজ ও মৌলিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

এইবার মধ্যযুগের বাঙ্গলায় জাতি প্রতিষ্ঠার কথা সাধারণ ভাবে পুনরায় আলোচনা করিতে চাই। কানোজ বা কোলাঞ্চ হইতে যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ আসিয়া বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয়। যে হিন্দুরাজা গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিয়া এ দেশে হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম আদিশূর না হউক, পাল বংশীয় নরপতি গণের পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। অন্ন সংস্থানের জন্য সপরিবারে শস্তশালী বাঙ্গলায় আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণদল কেবল হিন্দু নরপতিগণের নিকটেই ভূমিদান পাইয়াছিলেন এমন নহে, বৌদ্ধ পাল রাজগণ ও তাঁহাদের মধ্যে অনেককে দানাদি দ্বারা পোষণ করিয়াছেন।

ইহার প্রমাণ আছে। 'ক্ষত্র-চারিত্র চর্য্য' ধীমান্ বল্লাল সেন বৈদিক সদাচার প্রবল রাখিবার উদ্দেশ্যে, এবং ব্রাহ্মণের আদর্শে বঙ্গীয় সমাজকে উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে 'গুণ' দেখিয়া কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পরবর্ত্তী সেন রাজগণ সময়ে সময়ে সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সম্মান বাড়াইয়া আদর্শ স্থির রাখিবার উপায় করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বৌদ্ধ-জৈন ভাবাপন্ন গৌড় এবং সারস্বত অথবা সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও 'আচার বিনয়োবিদ্যা' সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গণের অনুকরণ করিয়া এবং সুবিধা পাইলে উহাদের দলে মিশিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের পুষ্টি সাধন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বিজেতা মুসলমান আসিয়া দেউল দেহারা ভাঙ্গিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল; এই ঘোর অশান্তির যুগে আর্য্যাবর্ত্তের অন্য স্থানের মত এদেশেও, সমাজ বিপ্লব ঘটিবে, ইহা স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সৎ জাতিরও বসতি বিস্তার হইয়াছিল। প্রথম যুগের পাঠান শাসনে সাময়িক অত্যাচারে হিন্দু সমাজ ত্রস্ত ছিল; অনেক বংশে যবন সংস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম এবং সদাচার স্থির রাখিবার নিমিত্ত বাঙ্গালী স্মৃতিকারেরা নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আর্য্য সদাচারের ব্যষ্টিগত রক্ষণ পালনের নিমিত্ত দেশ কালোচিত সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কুলীন ব্রাহ্মণ গণ সদাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্তই সাময়িক সমীকরণের ব্যবস্থা করেন; এই কার্য্যে কুলাচার্য্য দলের সৃষ্টি হয়। শেষ দেবীবর ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যেই গুণ দোষ বিচার করিয়া জাতির বিশুদ্ধি রক্ষার নিমিত্ত 'মেল' বন্ধন করেন। পূর্ব্বে এক মেল হইতে অন্য মেলে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না; শেষদিকে মূর্খ কাণ্ড-জ্ঞানহীন ঘটক এবং কুলীনেরা মেল ভঙ্গ করা জাতিপাতের ন্যায় বিবেচনা

করায় সমান থাকে কন্যাদান অবশ্য কর্তব্য স্থির করিয়া লইয়া কুলীন সমাজের পরবর্ত্তী অধঃপতন ঘটাইয়াছে।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রচয়িতা মজুমদার মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন:— "বারেন্দ্র শ্রেণীর বংশাবলী এবং ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, কুলীনেরা নির্ধন, অলস, উৎসাহহীন এবং বিবাহ-ব্যবসায়ী। অনেক কুলীন শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন, পক্ষান্তরে শ্রোত্রিয়েরা উৎসাহী, বিদ্বান্, বড় মানুষ এবং জমিদার'। এ কথা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের পক্ষেও আংশিক ভাবে খাটে; মেল বন্ধের পরে দুই তিন পুরুষ হইতেই কুলীনের অধঃপতন আরম্ভ। বিদ্যাদি কুল-গুণের আর প্রয়োজন ছিল না; শ্রোত্রিয়ের আদরে পুষ্ট কুলীন-সন্তান ক্রমেই অকর্ম্মা বিবাহ-ব্যবসায়ী হইয়া পড়িয়া পিতৃ পুরুষের মহৎ আদর্শ বিচ্যুত হইতেছিল। অথচ অধঃপতিত সমাজ এই শ্রেণীর অলস, বিবাহ-ব্যবসায়ী ধর্ম্মের ষাঁড়গণকে বহু দিন অবধি চরিয়া খাইতে দিয়াছে। ইহারি কারণ হিন্দুজাতি ব্রহ্মণ-শীলতার অপব্যবহারেই সুচিরকাল অভ্যস্ত। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রমতে ব্রহ্মণ্য পালন করিলে তবে নমস্য। অতীতের মহামনস্বী, শম দম তিতিক্ষাদির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ-কুল আমাদের নিমিত্ত যে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, অধঃপতিত ব্রাহ্মণ আমরা তাহাই লইয়া আস্ফালন করি। নারায়ণাবতার ভট্ট নারায়ণ, অন্বর্থ নামা দক্ষ বা শ্রীহর্ষ (নৈষধের কবি নাই হউন) বঙ্গে যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া গিয়াছেন, সত্বরে তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই। নবগুণের সমাবেশ দেখিয়াই মহামনস্বী বল্লাল কুলীন নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন; কুলীন সন্তানগণের আদর্শেই সেকালের অপর ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাবান হইয়াছেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সৎশূদ্রেরা সেই আদর্শেই নিজ নিজ আচার পবিত্র করিয়া লইয়াছে; সংযম ও ত্যাগের জলন্ত

দৃষ্টান্ত অন্যের অন্ধকারের বর্ত্তিকা স্বরূপ হইয়াছে। দেশীয় নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, সময়ে অব্রাহ্মণ দলও ব্রাহ্মণ সমাজে আশ্রয় লইয়া উন্নত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে। মেলের কুলীন অধঃপতিত হইয়াছিল বলিয়াই এ কালের তুলাদণ্ডে তাহাদিগকে মাপিবেন না; সারল্য, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ বহু-বিবাহকারী দিগের মধ্যেও অভাব হয় নাই। বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত আমাদের অঞ্চলের সিঙ্গীর গয়ঘর 'ঘেটে কালাচাঁদ' বন্দ্যোকে যিনি ভাল জানিতেন তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার ন্যায় শিবতুল্য লোক এ প্রদেশে দেখা যাইত না। ঘর না পাইয়া বিপদাপন্ন কুলীন যখন সেই দেশমান্য 'স্বকৃত ভঙ্গ' কে পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলেও পায়ে ধরিয়া বয়স্থা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভিক্ষা মাগিয়াছে, তখন এই কলির 'কালাচাঁদ' কন্যার সহিত আলাপে তাহাকে বুঝাইয়াছেন, যদি গোপীভাবে তাঁহাকে পাইয়া সন্তুষ্টি হয়, তবেই তাহার পিতৃকুলের সম্মান রক্ষার্থ বিবাহ হইতে পারে। এমন কুলীন কন্যা আমরাও দেখিয়াছি যাহারা বিবাহের পর আর স্বামী দর্শন পায় নাই; নিত্য ইষ্ট পূজার সঙ্গে স্বামী দেবতার উদ্দেশ্যে ফুল দিয়া সগর্ব্বে সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার ব্যভিচারও অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে; ধর্ম্মের আদর্শ ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিয়াছে। মুসলমানের বঙ্গ বিজয়ের তিন শত বর্ষ পরেও 'ছাত্রস্যাধ্যয়নং তপঃ' এই আপ্ত বাক্য স্মরণ করিয়া শ্রোত্রিয় কুমার রঘুনাথ শিরোমণি শাস্ত্র চিন্তায় বৃক্ষতলে বসিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আবার বর্ত্তমান সময়ের দেড়শত বর্ষের পূর্ব্বেও অধ্যাপক 'বুনো' রামনাথ সেই নদীয়ার তেঁতুল তলায় বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথিত 'অনুপপত্তি' শব্দের ত কথাই নাই, 'অভাব' কথারও পার্থিব অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া

ভাব পদার্থের বিষয়ে জটিল আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, এই সত্য গল্প অনেকেই জানেন। দেবীবরের পরেও বন্দ্য বংশে চারি চক্রবর্ত্তী (রুদ্র রাম, পাঠক, প্রভৃতি) চট্টে অবসথ গঙ্গানন্দ, মুখটিতে কবি কৃত্তিবাস ভিন্ন আরও অনেক সাত্ত্বিক মহা পণ্ডিতের নাম এখনও বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ সমাজ বিস্মৃত হয় নাই; অধীনের সাত পুরুষ উর্দ্ধেও এক 'ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী' উপাধিধারী গয়ঘর কুলপ্রদীপের নাম কুলাচার্য্যেরা গৌরবের সহিত উচ্চারণ করেন। কিন্তু 'তেহি নো দিবসা গতাঃ';—কুলীন শব্দই এখন ঘৃণার্হ।

একালে কায়স্থ বৈদ্যাদি ভদ্র জাতির সামাজিক অবস্থার নিরপেক্ষ আলোচনা করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। তবে যে ভদ্র জাতি যে পরিমাণে ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক আচার অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহারা সেই পরিমাণে সমাজে সম্মানিত হইয়াছে, ইহা যে কোন প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি পড়িলেই বুঝা যায়। বৈদ্য জাতির কুলজীর কথা যতদূর প্রামাণিক হউক না হউক, পাঠান রাজত্বে তাঁহাদের আচার ব্যবহারের বিষয়ে কি ইঙ্গিত আছে, দেখুন। কবিকঙ্কন কুলস্থানের সীমার মধ্যে ব্রাহ্মণের পার্শ্বে তাঁহাদের আবাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বৈদ্য মহাশয় (বঙ্গদেশে বেজ) 'পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি, বসনে মণ্ডিত করি শিরে' প্রাতে পঞ্চগ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া 'বুকে ঘা মারিয়া' অর্থ চাহিয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতেন; কিন্তু সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। এ যুগে মাধব নিদানে সামান্য মাত্র জ্ঞানই ভরত মল্লিকের স্থলাভিষিক্ত ভিষকের সম্বল হইয়া পড়িয়াছিল। 'ধনি, জানি কেবল নিদানে' কবি দাশু রায়ের এই উক্তি অন্ত ভাবে তিন শতাব্দী কাল বঙ্গ বৈদ্যের প্রতি খাটিত। সেন ভূমি এবং শ্রীখণ্ড সমাজের বৈদ্য দ্বিজাতির উপনয়ন সংস্কার পূর্ব্বাবধি পালন

করিয়া আসিতেন; চৈতন্য পরিকর শ্রীখণ্ড বাসী প্রসিদ্ধ নরহরি সরকার কৈশোরে নবদ্বীপে গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতেন; গোবিন্দ দাস প্রভৃতি ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। পূর্ব্বদেশের সে যুগের বৈদ্যের আচার অনুরূপ ছিল। সে দিকে সেন রাজবংশের জ্ঞাতি কুটুম্বেরা বৈবাহিক সম্বন্ধে কেহ বা বৈদ্যের, কেহবা কায়স্থের সহিত মিশিয়াছিলেন। বৈদ্য কায়স্থে বিবাহাদি নোয়াখালী, ত্রিপুরায় এখনও চলে; পূর্ব্বে বিক্রমপুর অঞ্চলেও এ ব্যবহার ছিল বলিলে যদি কেহ খড়্গহস্ত হন, তবে নাচার। বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ শ্রীখণ্ড সমাজে দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণের সময়ে উপবীত গ্রহণ করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। রিজলী প্রবর্ত্তিত নব-বিধানে জাতিতত্ত্বের সমালোচনার পরে সে দিন বৈদ্য কায়স্থে ভেদ-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অনেকেই জানেন।

কায়স্থ 'সদাচারে উন্নত সৎশূদ্র' স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের এই বিচার বঙ্গীয় সমাজ তিন শত বৎসর মাথা পাতিয়া লইয়াছে; কারণ, সমাজের আচারের উপরেই শাস্ত্রীয় মত প্রতিষ্ঠাপিত। একালে ইংরেজী লেখকগণের ভ্রান্ত মত মুখস্থ করিয়া অনেকেরই ধারণা যে অনার্য্যেরাই শূদ্র। বেদের জাতি বিভাগ বুদ্ধি-যোগ সহ পাঠ করিলেই জানা যায় যে, ব্যবসায় ভেদে আর্য্যজাতিই তখন চতুর্ধা বিভক্ত ছিল; 'মুখ হইতে উৎপন্ন' প্রভৃতির ব্যাখ্যা সহজ-সাধ্য; তবে অনার্য্যদের অনেকে শূদ্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই। শূদ্র কার্য্যগুণে উন্নত হয়, ব্রাহ্মণ কর্ম্মদোষে পতিত হয়, এ উক্তি হিন্দুর স্মৃতিতে থাকিলেও পরবর্ত্তী যুগের সামাজিক ব্যবহার জাতির গণ্ডীকে আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই কায়স্থ জাতি লেখক এবং হিসাব পরিদর্শকের কার্য্য নিজস্ব করিয়া লইয়া সমাজে ভয়-বিমিশ্রিত সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন (বিষ্ণু স্মৃতির নির্দ্দেশ অনেকে জানেন)। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কায়স্থ

সৎশূদ্র নামে আতঙ্কিত হন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পাটুলীর রাজা বলিয়া কথিত, সুপণ্ডিত ‘মহাশয়’ জমিদার নৃসিংহ রায় কাশীতে ভূকৈলাসের ঘোষাল-দত্ত ‘শূদ্রমণি’ উপাধি গৌরবের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। মহা-মনস্বী রাজা রাধাকান্ত দেবের মত তাঁহার বিখ্যাত কল্পদ্রুমের পাকা ফল; আজ ঝাড়া চাড়া দেওয়ায় পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা আমরা জ্ঞান বৃদ্ধ, এই অহঙ্কার কেবল পাশ্চত্য দেশের প্রবচনেই সীমাবদ্ধ নাই। বাঙ্গলায় কায়স্থের স্থান সমাজে বড় নীচে নহে; সম্মান লাভের আকাঙ্খায় অনেক জাতি কায়স্থ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে, সুবিধা পাইলে আজও হইতেছে। সদাচার পালনই যে কায়স্থের সম্মান অর্জ্জনের মূলীভূত কারণ, একথা ভুলিয়া গিয়া অনেকে একালের আদর্শে অর্থকেই প্রধান বা নিমিত্ত কারণ কল্পনা করেন। মধ্যযুগের কায়স্থ ভূস্বামীবর্গের অনেকে স্বধর্ম্ম-পালনে আদর্শ হিন্দু ছিলেন; কুলীন গ্রামের বসু বংশ, দিনাজপুর রাজবংশ, বঙ্গাধিকারী কানুনগো বংশ রাজকার্য্যে দক্ষতায় ধন সঞ্চয় করিলেও অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া তবে সমাজে বরণীয় হইয়াছেন। কালবশে গুণহীন ব্রাহ্মণের যেরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে, বৈদ্য কায়স্থাদিও দানধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তে অভিমানে বড় হইবার ভাব দেখাইয়া স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। উপবীতের সূত্র অবলম্বনে ভোজবাজীতে উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা হইতেছে; ব্রাহ্মণ ত দিগ্‌বাজী খাইয়াছে!

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঙ্গলার সেকালের সমাজ দেখিয়া ব্রাহ্মণেতর ভদ্র জাতিকে ‘সৎ শূদ্র’ আখ্যা দিয়াছেন; বাঙ্গলাদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সে যুগে ছিল না, লক্ষ্য করিয়াছেন। নূতন প্রণালীতে ভট্টপল্লী হইতে আবিষ্কৃত ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়া কথিত, আনন্দ ভট্টের ‘বল্লাল চরিত’ নামক সংস্কৃত পুস্তিকায় লিখিত আছে;—

গোপো মালী চ তাম্বুলী কাংসার তন্ত্রিশাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নব শায়কাঃ॥
তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্যঃ সচ্ছুদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতা।
সচ্ছুদ্রানান্ত সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ॥

আবার যশোর হইতে ‘বারুজীবি’কে ক্রোড়গত করিয়া লইয়া অন্য বচন বাহির হইয়াছে। ‘তিলি মালী তামুলী, গোপ নাপিত গোছালি, কামার কুমার পুঁটুলী’—নবশাখের এই ভাষা বচন অনেকেই জানেন। এই সকল সৎ জাতির মধ্যে যাঁহারা যে পরিমাণে ব্রাহ্মণের আচার অনুকরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে সমাজে আদৃত হইয়াছেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অধিকারী ভেদে বেদাদি পাঠের বিধি নিষেধ ব্রাহ্মণদিগের গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অবশ্য ক্রিয়ার অভাবে ক্রমে নিজেও অনধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পাঁচ শত বর্ষ ধরিয়া উপাসনা এবং সদাচার পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই সমাজের অধঃপতন ঘটাইয়াছে, এই জ্ঞান অধঃপতিত বঙ্গীয় সমাজে শোভনীয় হইলেও ইতিহাসে স্থান পাইবে না। ব্রাহ্মণ অন্য জাতিকে ধর্ম্ম কর্ম্মের সুযোগ দেয় নাই, এ কথা বিচার-সহ নহে।

ধর্ম্ম কর্ম্মের দিক্ দিয়া কানোজাগত ব্রাহ্মণের উত্তর-পুরুষগণ বঙ্গীয় সমাজকে কি পরিমাণে চালিত করিয়াছেন, তাহার আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যথাজ্ঞান করা যাইবে। বৌদ্ধ তন্ত্রকে নবভাবে আত্মসাৎ করিয়া পৌরাণিক মতের সহিত সামঞ্জস্য সাধন যে এই ব্রাহ্মণদলের কীর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বতন সারস্বত বা সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের অনেকে বৌদ্ধ জৈনের পৌরহিত্য করিয়া কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেন, তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা গিয়াছে। বৌদ্ধ বা জৈন মত

বাঙ্গলায় নবভাবে প্রসারিত হওয়ার মূলে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের শক্তিও নাথ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কৃতিত্বের সহিত সংযুক্ত ছিল, তাহা অনুমান ভিন্ন অন্য প্রমাণেও আসিতেছে। বৌদ্ধতন্ত্রের অনুকরণে শক্তি পূজার প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর হইলেও পুরাণ বর্ণিত শক্তি উপাসনা যে আধুনিক তাহা সাহস করিয়া বলা চলে না। দেশের নানা স্থান হইতে একালে যে সকল মহিষমর্দ্দিনী প্রতিমা আবিষ্কৃত হইতেছে, মূর্ত্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদের কাল সম্বন্ধে একমত না হইলেও শৈব এবং শাক্ত মতের বহুল প্রচারের নিমিত্ত গৌড়দেশ যে কান্যকুব্জে ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে উক্ত প্রস্তর প্রতিমাগুলি গ্রাম দেবতা রূপে পূজিত হইতেন; গৃহস্থ বাটীতে প্রস্তর বা মৃত্তিকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে। তথাপি, অজ্ঞ লোকে বাঙ্গলায় দুর্গা পূজা প্রচলনের যে কাল নির্দ্দেশ করে, তাহা যে প্রকৃত নহে একথা চৈতন্য ভাগবতের "মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে ঘরে ঘরে; দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে"—এই উক্তি যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে। বাঙ্গালী গৃহস্থ মূর্ত্তি পূজার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ দ্বারাই উপদিষ্ট ও চালিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী।

বাল্যে 'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব' নামক প্রহসনে পড়িয়াছিলাম,—যে ডিন্ হইতে টুমরা ব্রাহ্মণ সকল, টুমরা চোর সকল নিষেড্ করিয়াছে খাইটে গরু ও শুয়ার, সেই ডিন্ হইতে হরণ করিয়াছে আমাদের জোর এবং ছাটি';—এই রকমের ভাবের ভাষা অন্ততঃ বটে। এখনও অনেক মনীষির বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ দেশের বীর্য্যহানির প্রধান কারণ; অপরাধ, ব্রাহ্মণেরাই রাজার প্রধান মন্ত্রণা দাতা, ব্রাহ্মণ 'জগৎ মিথ্যা' এই শিক্ষা দিয়া দেশ মজাইয়াছে, আরও কত কি! সংসার অনিত্য বলার বেশী দোষ বৌদ্ধের কি বামুনের, একথার বিচার যে না হইয়াছে তাহা নয়। ধর্ম্ম শিক্ষায় 'জগৎ মিথ্যা' বলায় পুরাকালের হিন্দু কি শক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছিল, না ক্ষত্রিয় শক্তির বিনাশের অন্যান্য কারণ ছিল? পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করার প্রবাদ কি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ততদুর উঠিবে? এ সব কথার বিচার এখনও ভাল হয় নাই। নব ক্ষত্রিয় রাজপুত সমাজের লোকে কি ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী নহে? আবু পর্ব্বতে যজ্ঞ কুণ্ড হইতে প্রমারাদি অগ্নিকুল গল্পের অর্থ কি? এ প্রশ্নগুলিও বিবেচ্য। আর্য্যাবর্ত্তের মত প্রকাণ্ড দেশে ক্ষাত্র শক্তির অবনতির 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। এখানে আমরা ঐতিহাসিক পুরাকথার উল্লেখ মাত্র করিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালীর বাহুবলের বিষয়ে কিছু বলিব।

মহাভারত বা হরিবংশের পৌণ্ড্রাধিপ বাসুদেব এবং তৎপুত্র সুদেব, কৌষিকী কচ্ছপতি, বঙ্গের সমুদ্র সেন, চিত্রসন এই কয় জন যোদ্ধ, পুরুষ পৌরাণিক ইতিহাসে বাঙ্গালীর নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি স্বয়ং পুরাণ রচনা করিলে অবশ্য আরও অনেক ক্ষত্রিয় বীরের পরিচয় পাইতাম; নিজের ঢাক সকল যুগেই নিজে বাজান প্রথা (১)। মহাবল ভগদত্তকে বঙ্গীয় বীর বলিবার বাধা নাই; মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্যও আংশিক ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু নিজ বিত্তার পরিচয়ে শুদ্ধ 'বাপের বড় বড় দপ্তর' বলিলে চলিবে না। বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনী ও বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। তবে কথা চলিতে পারে, সে যুগে বঙ্গে ব্রাহ্মণ-প্রভাব বিস্তৃতি-লাভ করে নাই, তখনও 'জগৎ মিথ্যা'র জয় ডঙ্কা নিনাদিত হয় নাই। কালিদাসের কাব্যে বঙ্গবাসী পরাজিত, কিন্তু সে দিগ্বিজয়ী রঘুরাজের নিকটে,—কিছু পরে ঐরূপ সমুদ্রগুপ্তের নিকটে. (বৈজ্ঞানিক ঐতি-হাসিক বলিবেন, ইহার প্রথমটি দ্বিতীয়ের প্রতিধ্বনি মাত্র); ইহাতে বঙ্গীয় যোদ্ধার সম্মানের হানি হয় না। গুপ্ত রাজগণের সময়ে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি এক বাক্যে স্বীকৃত। পরবর্ত্তী কালেও হিন্দু রাজ গৌড়-ভুজঙ্গ শশাঙ্ক মগধ পর্য্যন্ত জয় করিয়া বোধিদ্রুমের মূলদেশ উৎখাত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হর্ষবর্দ্ধনের মত প্রবল পরাক্রান্ত চক্রবর্ত্তী রাজার সহিত বড়বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের পর শশাঙ্ক নিজ ভুজবলে কলিঙ্গের প্রান্তে

(১) এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য সঙ্কলিত 'বাঙ্গালীর বল' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য; ঐ পুস্তকের সকল মন্তব্য ঐতিহাসিক সমালোচনায় আঘাত-সহ না হইলেও লেখকের উদ্দেশ্য এবং লিপিকুশলতা প্রশংসনীয়। নাটোর মহারাজ সত্যই বলিয়াছেন, ইহাতে "ঐতিহাসিক মতবাদের অবসর যদি থাকে, তাহাতেও গ্রন্থের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না"।

মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং গৌড় হস্তচ্যুত হইলেও দক্ষিণ বিভাগে আজীবন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ সম্প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত গৌড় বঙ্গের ক্ষাত্রতেজ নিষ্প্রভ হইবার উপক্রম হইলে দক্ষিণ অঞ্চল হইতে বর্দ্ধন-রাজ আসিয়া পুণ্ড্রাজ্য অধিকার করিয়া লন। আর এক সময়ে কনোজ-রাজ যশোবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মগধ জয়ের পরে অসংখ্য হস্তী ও সেনার নায়ক বঙ্গাধিপকে পরাভূত করেন। কিন্তু কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মাকে পরাভূত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া অগ্রসর হইলে গৌড় মণ্ডলের রাজা বহুতর হস্তী উপঢৌকন দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পরে স্বদেশে প্রত্যাগত ললিতাদিত্য গৌড়পতিকে নিজ রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া পরিহাস কেশব বিগ্রহ সাক্ষাতে সৌহার্দ্দ্য রক্ষার শপথ করিয়াও প্রত্যা-গমন কালে পথে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করাইলেন। গৌড়-রাজের মুষ্টিমেয় শরীর রক্ষীদল প্রভুহত্যার পরিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীর রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সাক্ষী-দেবতা কেশব ভ্রমে রজত নির্ম্মিত রাম স্বামী বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। রাজসেনাগণ উহা-দিগকে আক্রমণ করিলে ঐ 'শ্যামবর্ণ গৌড়ীয়দল' অস্ত্রাঘাতে নিহত হইল। রাজতরঙ্গিণীর প্রসিদ্ধ কবি পণ্ডিত কহ্লন উহাদের অসাধারণ প্রভুভক্তির প্রশংসা করিলেও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া প্রতিশোধ লইবার কথায় উহাদিগকে পাহাড়িয়া 'গুর্খা' শ্রেণীর লোক মনে হয়। যাহাই হউক, এ যুগের

(২) বাক্‌পতির 'গউর বহ' কাব্য; গৌড় রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ; বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়; গৌড় লেখমালা, ইত্যাদি হইতে বাঙ্গালীর বলের গ্রন্থকর্ত্তা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য বলিয়া টীকা ভাগ ভারাক্রান্ত হইল না।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা লোকের বীরত্বের বাধা স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তারপর কান্যকুব্জে ব্রাহ্মণের পালা; ইঁহারা কি যশোবর্ম্মার যুগেই আসেন? যশোবর্ম্মা বিজয়মাত্র করিয়া ফিরিয়াছিলেন, উৎখাত করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে 'মাৎস্য ন্যায়' 'অর্থাৎ বিপ্লবের অবকাশে গোপাল গৌড়ে রাজা নির্ব্বাচিত হন, এ কথা এখন সর্ব্বজন পরিচিত। পাল রাজগণের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ কার্য্যে কৃতী; তখন বাঙ্গালীর বাহুবল ছিল, পশ্চিমে কানোজ, কাশী পর্য্যন্ত তাহারা জয় করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মপাল বা দেবপাল শুদ্ধ দেবধর্ম্মই পালন করিতেন, এমন নহে। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেদার মিশ্র কামরূপ বিজেতা বৈদ্যদেব এবং সোমেশ্বরাদিও তাম্র-শাসনে সমর-পটুতার স্থায়ী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ 'ছাতি' হরণ করা দূরে থাকুক, 'ছাতি' দিয়া দেশের মাথা রাখিয়াছে। এ ব্রাহ্মণ শুধু মন্ত্রণায় বৃহস্পতি ছিলেন এমন নহে; পাল বংশের সাম্রাজ্য গঠনে ইঁহারা নানা ভাবে প্রধান সহায় ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

ধর্ম্মপাল এবং দেবপালের বিজয়-দৃপ্ত বঙ্গ বাহিনীর যশোগাথা স্তম্ভ-লিপি এবং তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে পাল রাজগণ দুর্ব্বল হওয়ায় পশ্চিমের চন্দেলা রাজপুত-রাজ এক সময়ে গৌড় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এই কালেরই কোন সময়ে ঢেকুরে ইছাই ঘোষ স্বাধীনতা অবলম্বন করায় সামন্ত-রাজপুত্র লাউসেন গৌড় রাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নির্জ্জিত করেন; সুতরাং সে যুগের বাঙ্গালী যুদ্ধ কার্য্যে বিমুখ হয় নাই। গোপ এবং ডোম জাতীয় সৈনিকদল ইছাই ঘোষের সম্বল ছিল। পার্ব্বতীয় কাম্বোজ জাতির আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা বিগ্রহপাল পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বীরপুত্র মহীপাল অত্যল্প কাল মধ্যেই কেবল যে পিতৃরাজ্য গৌড়মণ্ডল পুনরধিকারে সমর্থ হইলেন এমন নহে, তাঁহার

বিজয়-কেতন পশ্চিমে বুদ্ধ গয়ায় এবং দক্ষিণে উৎকলে পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়াছিল। প্রৌঢ় দশায় বিশ্রুতকীর্ত্তি মহীপাল বৌদ্ধ সাধনার আশ্রয় লইয়া বীরধর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যামন্দির মঠ জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত রাজ-ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি সারনাথের প্রাচীন বিহারের সংস্কার করাইয়া তথায় এক 'গন্ধকুটী' নির্ম্মাণ করাইলেন; নালন্দার মঠ ও ছাত্রা-বাস পুনর্নির্ম্মিত হইল। দিনাজপুরে মহীপাল দিঘী, উত্তর রাঢে সাগরো-পম সাগর দিঘী ও নানাস্থানে আরও অনেক প্রকাণ্ড জলাশয় খাদিত হইল। প্রজাবর্গ সানন্দে রাজার কীর্ত্তিগাথা 'মহীপালের গীত' রচনা করিল। সাগর দিঘীর উত্তরে নবনির্ম্মিত মহীপাল নগরে এক রাজধানী হইল। সামন্ত রাজগণও তাঁহার অনুকরণে প্রজার সুখশান্তি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতেছিলেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ রাজেন্দ্রচোল দেবের বিপুল বাহিনী 'ওড্রবিষয়' অধিকার করিয়া দণ্ডভুক্তির (বর্ত্তমান মেদিনী-পুরের দক্ষিণভাগ) সামন্তরাজ ধর্ম্মপালকে পরাভূত ও নিহত করিল। দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর এবং 'বঙ্গাল' এর গোবিন্দচন্দ্রকে নির্জিত করিতে উহাদের অধিক সময় লাগিল না; শেষে মহীপালকে পরাভূত এবং উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়া রাজেন্দ্রচোল 'গাঙ্গে কোণ্ডা' (গঙ্গা বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিলেন। রাজেন্দ্র চোলের মত পরাক্রান্ত সম্রাটের নিকট পরাভব অপমানের বিষয় না হইলেও এই সময়ের বাঙ্গলার ইতিহাস হইতে আমরা সে যুগের বিধি-ব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারি। পাল বংশীয় রাজারা বিদেশ জয় করিয়াও পুরাকালের নিয়ম মানিয়া পূর্ব্বাধিকারী রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন নাই; নতুবা নির্জীব শূর বংশ দক্ষিণ রাঢ়ে বর্ত্তমান থাকিতেন না। দক্ষিণ বাঙ্গলার ধর্ম্মপাল এবং বঙ্গালের গোবিন্দ পাল-রাজের আত্মীয় ও সামন্ত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। বিভক্ত-কর্ত্তৃত্ব কখনই সাংসারিক ব্যাপারে

সুফল প্রদান করে না ; এই জন্যই মহীপালের পরাজয় এবং পরবর্ত্তী পাল রাজাদের শতাধিক বর্ষের অবনতি ঘটিয়াছিল। রাজা এবং উচ্চ-শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুর সামরিক দক্ষতা তখন বৌদ্ধ-সাধনার প্রভাবে অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হইতেছিল, ইহাও স্বীকার্য্য। এ সমস্ত সত্বেও এক সময়ে 'প্রলয় কালাগ্নিরুদ্র' দিগ্বিজয়ী চেদীরাজ কর্ণ তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কন্যাদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই চালুক্য নরপতির যোগ্যপুত্র বিক্রমাঙ্ক, গৌড়েশ্বর এবং কামরূপাধিপতিকে পরাজিত করিয়া উহাদিগকে চালুক্য সম্রাটের করদ-রাজ করিলেন। চালুক্য রাজের দ্বারাই সেনরাজ দিগের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট-সামন্ত সামন্ত সেন রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। (৩) পূর্ব্ববঙ্গে সেইকালে বর্ম্ম ও চন্দ্র বংশের রাজাদিগের প্রতিষ্ঠার কথাও কেহ কেহ ইঙ্গিত করিতেছেন।

পাল রাজারা কিছু দিন গৌড়মণ্ডল এবং দক্ষিণ-মগধ লইয়াই রহিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে গৃহ-কলহে পাল রাজপুত্রেরা যখন হীনবল, তখন বারিন্দার কৈবর্ত্ত সেনানায়ক দিব্বোক্, তাঁহাদের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই রাজপুত্র রামপাল রাঢ় বাগড়ী, দক্ষিণবঙ্গ ও উৎকলের সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র সামন্ত ভূপতিকে সাহায্যার্থে সমবেত করিয়া বিপুল চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালী যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ অভ্যস্ত ছিল দেখা যাইতেছে। নৌকা-মেলক (নৌ-সেতু) যোগে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া

(৩) গৌড় রাজমালার এই অনুমান সন্দেহ-জনক; কারণ রামচরিতে উল্লিখিত রামপালের সহিত সম্মিলিত রাঢ়ীয় সামন্তবর্গের প্রভূত সৈন্য সামন্ত অন্য 'সামন্ত' সেনের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতিকূল প্রমাণ। 'নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ' বলিয়া এক সামন্তের নাম আছে ; ইনি আগ্রত 'বিজয় সেন' হইয়া উঠাও সম্ভবপর নহে।

কুমার কুমার-পালের দক্ষিণবঙ্গের এই প্রচণ্ড সৈন্যদল উত্তর বঙ্গের বাঙ্গালী কৈবর্ত্ত নায়ক সার্থক-নামা ভীমকে পরাভূত করিয়া আবার গৌড় মণ্ডলে পাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। রাজমাতুল রাঠোর মহন সেনাপতি হইলেও বাঙ্গলার তাৎকালিক সামন্ত ও সেনাদলের শৌর্য্য বীর্য্য স্বীকার রাখিতে হইবে। মহনের অকাল মৃত্যুর সংবাদে রামপালের 'হারিকুরী' করিয়া গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জ্জন এ কালে যে ভাবেই বিবেচিত হউক, সেকালের বীর সমাজে গৌরব বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। কুমার-পালের রাজত্ব কালে কামরূপাধিপতির দলন-ব্যাপারে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব যেরূপ বিক্রম দেখাইলেন, তাহাতে অশ্বত্থামার 'চিরজীবি' থাকিবার পৌরাণিক প্রবাদ সমর্থিত হইয়াছিল। মন্ত্রীর অপর পুত্র বুধদেবও বিখ্যাত যোদ্ধা পুরুষ ছিলেন ; তখনও ব্রাহ্মণ 'চাল কলা' খাইয়া নির্জীব হয় নাই। অতঃপর খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত সে কালের আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগে যাহা ঘটিয়াছিল, বাঙ্গলার দশাও তাহাই হইল। চতুর্দ্দিকে সামন্ত রাজারা স্বাধিকার বর্দ্ধন আরম্ভ করিলেন ; দেশব্যাপী বিপ্লবের সুযোগে সামন্ত-সেন রাঢ় ভূভাগে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। জাতি প্রতিষ্ঠার ও শক্তি সংগ্রহের সমবেত চেষ্টা এ দেশে কোন কালেই হয় নাই ; শক্তিশালী সম্রাটের বংশ হীনবল হইলে ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা স্বপ্রধান হইয়া প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন ; ইহাই হিন্দুর ইতিহাস এবং এজন্য ব্রাহ্মণের 'গরীব মার' ঘটিবার 'আইন' সঙ্গত কারণ নাই !

শিলালিপি এবং তাম্রশাসনে সেনরাজগণের যে সমস্ত দীর্ঘ সমাসান্বিত বিশেষণ আছে, তাহা সাবধানে গ্রহণ করিলেও সকলেই স্বীকার করিবেন সামন্ত-পৌত্র বিজয় সেন বাঙ্গলার খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণকে ক্রমশঃ বিজিত ও উৎখাত করিয়া শেষে স্বয়ং 'বৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর' হইয়া-

ছিলেন। কাটোয়ার সমীপবর্ত্তী সীতাহাটী গ্রামে প্রাপ্ত বালহিট্টা (বালুটে) গ্রামদানের তাম্রশাসনে বল্লালসেনের মাতার ব্রতের নির্দ্দেশে বোধ হয় যে, নিকটে ভাগীরথীতীরে কোন স্থানে সেন রাজগণের প্রথম রাজধানী হইয়াছিল (৫)। বিজয়-পুত্র বিজয়ী বল্লাল সেনের সময়ে সমগ্র বাঙ্গলা সম্পূর্ণরূপে এবং মিথিলার অধিকাংশ সেন-রাজের করতলগত হইয়াছিল। যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গ বিজয় করিয়া সেন রাজ্যের যশঃসৌরভ আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন; এই কালে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর 'জয়স্কন্ধাবার' রূপে কথিত। অনিরুদ্ধ নামক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বল্লালের অন্যতম মন্ত্রী হইলেও হরি ঘোষ (জাতি অজ্ঞাত) সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে কামরূপ, কাশী, কান্যকুব্জের রাজারা বঙ্গীয় সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ অনুশাসন দিতেছে। রাজা লক্ষ্মণসেন যৌবনে দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক ছিলেন। স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সভায় মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধের পরে পশুপতি, শূলপাণি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এবং জয়দেব, ধোয়ী প্রভৃতি সুকবিগণ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বর্গের প্রাধান্য বা পরামর্শ যাঁহারা সেন রাজকুলের অধঃপতনের অন্যতম কারণ বলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে পবন-দূতে উল্লিখিত নাগরিক সমাজের বিলাস বা চরিত্রহীনতা লক্ষ্য করিতে বলি। এই বিষয়ে কাব্যের বর্ণনা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইলেও প্রণিধান-যোগ্য; প্রশস্তি ও পরবর্ত্তী তাম্রশাসনের উক্তিও সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যৌবনের

(৫) বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গোদাগাড়ী অঞ্চলে 'বিজয় রাজার বাড়ী'র মত কাটোয়ার নিকটে আমাদের 'বীজনগরা'কে বিজয়নগর প্রতিপন্ন করিবার জন্য রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির কোন উদ্যোগ দেখা যায় না! শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় ভায়া বিজয়পুরের উদ্দেশ পাইয়াছেন, শুনিয়াছি। 'পবন দূত' এ খবর দিতে পারিলে মন্দ হয় না।

প্রারম্ভ অবধি সমগ্র রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন, যাঁহার উৎসাহে গৌড় রাজসভা প্রবাদ-বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের সভার সহিত তুলিত হইবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারই জীবনের শেষ দশায় সান্ধ্যগগনে ঘনঘটার সহিত ঝটিকাবর্ত্তের মত দুর্ম্মদ পার্ব্বতীয় মুসলমান বিজেতৃগণ গৌড় জনপদে আপতিত হইয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তীকালে পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে অনেকে স্বকপোল-কল্পিত মত প্রচারিত করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর ধর্ম্মাধিকার পশুপতি নভেল নাটকে কূটনীতির অবতার, কোথাও বা স্বদেশদ্রোহী পাষণ্ডের মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছেন এবং এই গল্পই ইতিহাসের আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিকের কথিত, জ্যোতিষিকদিগের তুরস্ক হইতে দুর্দ্ধর্ষ জাতির আগমনের ভবিষ্যৎ-বাণী গল্পের উজ্জ্বল রঙ্গে নব ভাবে চিত্রিত হইতেছে। অপরাধী কে, এ কথার বিশদ ব্যাখ্যায় সর্ব্বদোষের আকর ব্রাহ্মণের শিখায় হস্তার্পণ চলিতেছে। কিন্তু সে যুগে অন্য ভাবে প্রভাব বিস্তার করিলেও ব্রাহ্মণ যে রাজনীতিক মন্ত্রণায় লক্ষ্মণসেনের প্রধান সহায় ছিলেন না, একথা এখন ভাল করিয়াই জানা গিয়াছে। সমর-কুশল বটুদাস মহাসামন্ত (সেনাপতি) পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দিগ্বিজয়ে লক্ষণ সেনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন; নারায়ণ দত্ত মহা সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন, (তাঁহাকে যজ্ঞদত্ত, ব্রহ্মদত্তাদির মত ব্রাহ্মণ বলিলে নাচার)। বৃদ্ধদশায় মহারাজ লক্ষ্মণসেন যখন পুত্রের হস্তে গৌড়ের রাজ্যভার দিয়া নদীয়ায় গঙ্গাবাস করিতেছিলেন, তখন হয়ত ঐ সমস্ত প্রাচীন মন্ত্রী ও সেনাপতি পরলোকে; কিন্তু তাঁহাদের মত নায়ক থাকিলেও প্রবল পাঠান সেনার গতিরোধ সম্ভবপর হইত, মনে হয় না।

রাজা কেশবসেন চাটুকার তাম্রশাসন লেখকের লেখনীমুখে "বজ্র-পঞ্জর' হইয়া উথিত হইলেও 'সেন কুল কমল বিকাশ ভাস্কর' (৬) যে

(৬) কেশব সেনের তাম্রশাসন—J. A. S. B, (N..S) Vol. X.

ছিলেন না, ইহা নিশ্চয়। তাঁহার সময়ের 'সান্ধি-বিগ্রহিক' নিজ উপাধির অনুরূপ কর্ম্মঠ ছিলেন, তাহাও মনে হয় না; সেরূপ হইলে মুসলমান সৈন্য অতর্কিতে অন্যপথ হইয়া বিনা বাধায় নদীয়া পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে, একালে উত্তর-ভারতের খণ্ড রাজ্যগুলি একে ত স্বাভাবিক কারণেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আবার প্রত্যেক খণ্ড রাজ্য নানা সামন্তের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন-যন্ত্রে পরিণত হওয়ায় সংহতি শক্তির হ্রাস হইয়াছিল। রাজা দুর্ব্বল হইলে সকলকে সংযত করিয়া সমগ্র শক্তি প্রয়োগের সুবিধা ছিল না। স্বাতন্ত্র্যের সহিত হিংসা দ্বেষাদিও প্রবল ছিল; একতা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় মহাবলশালী পার্ব্বত্য ঘোর ও আফগান্ জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কত দিন চলে? মহারথি পৃথ্বিরাজ ও সংগ্রামসিংহ সমুন্নত সুদৃঢ় স্তম্ভদ্বয়ের ন্যায় একবার মাত্র এই পার্ব্বত্য পাঠান বন্যার গতিরোধ করিলেন; দ্বিতীয় আঘাতের বেগে ভগ্ন সেতুর নিম্নস্থ উপল খণ্ড সকল কোথায় ভাসিয়া গেল কে তাহার সন্ধান রাখে? শক, হুণ, গথ ভ্যাণ্ডালাদি জাতির আক্রমণে পৃথিবীর সভ্যতর শাসনযন্ত্র সকল দেশেই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল; হিন্দুর জীবনীশক্তি যতদিন প্রবল ছিল, তত কাল শকাদি জাতির দুর্দ্দমনীয় বেগ স্বাভাবিক নিয়মে হ্রাস হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে ক্রোড়গত করিয়া লইতে পারিয়াছিল। কালবশে ক্ষাত্রশক্তির বিনাশ ঘটিলে উহারাই আবার নব-ক্ষত্রিয়রূপ ধারণ করিয়া ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

তাম্রশাসনের 'অকাট্য' উক্তির পক্ষপাতীর দল এ কালে মহম্মদ বখ্তিয়ারের আগমনে সন্দেহ প্রকাশ করেন, অবতরণিকায় তাহা দেখান হইয়াছে। কিন্তু পরাজিত কেশব পলায়নে বাধ্য হইয়া যে অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবিষয়ে দেশীয় ঘটকের প্রবাদ রহিয়াছে। বৃদ্ধ পিতার মত বিব্রত হইয়া না পলাইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বলিয়া যদি "অরিরাজ অসহ্য শঙ্কর" হন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকে না।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদের আক্রমণ ছয়শত বর্ষ পূর্ব্বের হুণ উৎপতনের মত আকস্মিক ব্যাপার বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পঞ্জাব হইতে মুসলমানের উচ্ছেদ আর সম্ভবপর হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যবর্গ ঐক্যস্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে দেশরক্ষার কোন উপায় করিতে পারেন নাই। এখানে সেখানে বীরধর্ম্মা সেনানায়কের তখনও অভাব ঘটে নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ঘরের ভেড়া মারিয়াই শিকার করিতেছেন, সে জ্ঞান ছিল না। আত্মকলহে দুর্ব্বলীকৃত রাজপুত রাষ্ট্র-শক্তি অচিরে ঘোরীর বিজয়দৃপ্ত সেনানায়কদিগের তরবারির মুখে চূর্ণীকৃত হইল। আপতিত শত্রুকে দুই একবার বাধা দিয়া লক্ষ্মণসেনের অন্য পুত্র "গর্গ যবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্র" উপাধি অর্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের সামন্তবর্গ ক্রমশঃ ঐ দক্ষতর 'যবনের' পদানত হইয়া পড়িলেন।

বৌদ্ধ ভাবাপন্ন বঙ্গীয় সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মের নামে 'সহজ পন্থার' ব্যভিচার, কনোজগীত নব ব্রাহ্মণ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু মুষ্টিমেয় পৌরাণিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকাণ্ড দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সংশোধন কি সম্ভব ছিল? সেন রাজগণের উৎসাহে স্থানে স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, বাসুদেব বিষ্ণু এবং শিব পূজার প্রচলন দ্বারা তাঁহারা বৌদ্ধ দেব দেবীর ভক্তের সহিত দ্বন্দ্ব বাধাইতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতায় ধর্ম্ম প্রচার তাঁহাদের ব্যবসায় ছিল না। সময়ে তাঁহাদের প্রেরণায় 'সদ্ধর্ম্মি' গণের প্রতি রাজনিগ্রহও সম্ভব; সেই জন্যই 'যবনরূপি' ধর্ম্মের আগমনে ডোম পণ্ডিত রামাই (বা তাঁহার পরবর্ত্তী যোজনাকার) উল্লসিত হইয়াছেন, 'দেউল দেহারা' ভাঙ্গায় আহ্লাদই বাড়িয়াছে। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রীয়-শক্তির অবনতি ঘটাইয়াছে, একথার প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; রাজপুরুষদিগের বীর্য্যহানির কারণ

অন্যদিকে সন্ধান করিতে হইবে। বিহারে পালবংশের দুর্ব্বল শেষ রাজা পাঠান ঝঞ্জাবাতের অগ্রভাগে তৃণের মত উড়িয়া গেলেন; সংঘারামের নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল কেহ বা নিহত কেহ বা পলায়িত হইলেন। পশ্চিম-বঙ্গ বিজেতার প্রথম তরঙ্গ সহ করিল; ক্রমে পশ্চিমোত্তর ও উত্তর বঙ্গ মুসলমানের অধিকৃত হইল। কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ ব্যাপারের পরে 'দেবকোট হইতে লক্ষ্ণৌর পর্য্যন্ত' অধিকৃত হইয়াছিল একথা ইতিহাসে স্বীকৃত। আরও অনেক পরে সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত মুসলমান শাসন বিস্তৃত হয়; প্রতিপদে যুদ্ধব্যাপার এবং দেবমূর্ত্তি ও দেউল ভঙ্গ ব্যাপার চলিয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র যে সমস্ত অর্দ্ধভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা এই যুগের দ্বন্দ্বের পরিণাম; কালাপাহাড়ের স্কন্ধে সমগ্র অপরাধ ভবিষ্যতে ন্যস্ত হইয়াছে।

গৌড়ের মুসলমান সুলতানগণ যখন দিল্লীশ্বরের অধীনতা শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে বাঙ্গলার যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোককে স্বপক্ষে আনিতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড় এবং সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তাদিগের পরস্পর সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান পাঠান সামন্তদিগের দল পুষ্টি করিয়াছিল। সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাকে পর্য্যুদস্ত করিবার প্রয়াসে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শা যখন অগণিত সৈন্য লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করেন, সে সময়ে বাঙ্গলার রাও, রাণা (জমিদার) গণ কেহ বা তাঁহার পক্ষে আবার কেহ বা ইলিয়াস্ শার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন (৭)। একডালার সুদৃঢ় দুর্গের সম্মুখে ২২ দিন তুমুল যুদ্ধ

(৭) তারিখ-ই ফিরোজশাহী (Elliot Vol. III). গৌড়ের সমীপে বর্ত্তমান সাহুল্লাপুরের নিকটে একডালার দুর্গ ছিল। ঐতিহাসিক আফিফ্ এখানে বাঙ্গালীকে 'রণভীরু' বলায় অনেক স্বদেশ-প্রাণ লোকের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে। কেহ বা 'স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থ'—বাঙ্গালী যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, ইহাও বলিতে প্রস্তুত।

চলিয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক এ ক্ষেত্রে বঙ্গীয় পাইক সৈন্যের ভীরুতার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের পরাভবের কারণ নির্দ্দেশে তিনি যে কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনেক কথা কাব্য ভাবেই গ্রহণ করিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, একডালা যুদ্ধে বাঙ্গালী 'পাইক' প্রথমে বাহ্বাস্ফোটন করিলেও যুদ্ধকালে ভূমি চুম্বন করিয়া প্রাণরক্ষার্থ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু তারিখ মোবারক-শাহীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী সেনাপতি সহদেও এবং অন্য অনেকে নিহত হইয়াছিলেন। আবার ফিরোজ-শাহীর পৃষ্ঠাতেই লিখিত আছে যে, নিহত বাঙ্গালীর মস্তকের জন্য এক এক রৌপ্য তঙ্কা দিবার আদেশ হইলে দিল্লীশ্বরের সমগ্র সেনাদল মাথা কুড়াইতে লাগিল; সপ্তক্রোশী যুদ্ধস্থলে সমস্ত দিন কুড়াইয়া এক লক্ষ আশী হাজার মস্তক স্তূপীকৃত হইয়াছিল। ইলিয়াস্ শা এখানে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত হইয়া একডালা দুর্গে সদলে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্গ-প্রাসাদের শিরোভাগে সাশ্রুনয়না মুসলমান-রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া এবং যুদ্ধ চলিলে আরও মুসলমান নিহত হইবে বলিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ সদয়-হৃদয় ফিরোজ শা যে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে হইলে অনেকটুকু কবিত্বের প্রয়োজন। আবার চৈত্রমাসে মশকের উৎপাতে ও পরে বন্যা আসিয়া দেশ ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া দিল্লীশ্বর প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক মহাশয় অতি-মাত্রায় কল্পনার প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রকৃত কথা, সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে হঠাইয়াও একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকারের আশা

ইঁহারা রণদুর্ম্মদ মধ্য এসিয়াবাসীকেও যুদ্ধকার্য্যে সেকালের বাঙ্গালীর অগ্রে স্থান দিবেন না। ইতিহাসের আলোচনাটা অন্ততঃ খুব জোরে ত চলিতেছে!

সুদূর-পরাহত দেখিয়াই সুবিজ্ঞ ফিরোজ শা সে বার মান লইয়া ফিরিয়া যান। ইলিয়াসের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি বাঙ্গলা আক্রমণ করিলে ইলিয়াসের সুযোগ্য পুত্র সেকেন্দর শা আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন; বাদশাহী দলের মঞ্জনিকাদি যন্ত্রপ্রয়োগে (তখন কামানের সৃষ্টি হয় নাই) মৃণ্ময় প্রকাণ্ড দুর্গ-প্রাকারের এক অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে নিশা-যোগে উহার সংস্কার হইল। সেকন্দরের সেনাদল অসম-সাহসে যুদ্ধ করিলেও তিনি বুঝিলেন যে, এবার দুর্গ রক্ষা অসম্ভব হইবে। এ দিকে ফিরোজ শা দেখিলেন, প্রথমবারের মতই গোলযোগ, পিতার যোগ্য-পুত্র সেকন্দর নাম সার্থকই বা করে; এমন সময়ে বাঙ্গলার সুলতানের পক্ষ হইতে দূত আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দিল্লীর বাদশাকে নামে মাত্র প্রভু স্বীকার করিয়া 'খোৎবা' পাঠ হইবে, সেকন্দর স্বাধীনই থাকিবেন, এই ভাবে সন্ধি হইয়া গেল।

বাঙ্গলার সামন্ত হিন্দু ভূস্বামীদিগের মধ্যে অনেকে এই যুদ্ধ ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন, এ কথা পারসী ইতিহাসেও স্বীকৃত। গৌড়ের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বহু অনুসন্ধানে এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কৃতিত্বের বিবরণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস্ শা বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপে স্বপক্ষের হিন্দু যোদ্ধবর্গকে উপাধি দান করিয়াছিলেন। "তিনি চট্টবংশীয় দুর্য্যোধনকে 'বঙ্গভূষণ' এবং মুবারক পক্ষীয় হিন্দু জমিদারগণকে পরাস্ত করায় পূতিতুণ্ড বংশীয় চক্রপাণিকে 'রাজজয়ী' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু জমিদারেরা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাগরদিয়ার মহাধনী উদয়ণ কবিকঙ্কন এবং মুরারি, মাধব প্রভৃতি তাঁহার সপ্ত বীর পুত্র প্রধান ছিলেন। সম্রাট্ রাঢ়ীয় কুলীন বিকর্ত্তন চট্টোকে 'রাজা' ও মনোহর বঙ্গভূষণের পুত্র শ্রীরামকে 'খান'

উপাধি দিয়াছিলেন" (৮)। সেকন্দর শাও পিতার মত হিন্দু-ভূস্বামীবর্গকে স্বপক্ষে লইয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান তখন দেশীয় লোকের সহায়তা ভিন্ন সম্ভবপর ছিল না; ইলিয়াসের সময় হইতেই সুলতানদিগের চেষ্টা থাকে, যাহাতে হিন্দু প্রজার সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাওয়া যায়। আবার প্রত্যন্ত ভাগে হিজলীর হিন্দু-ভূস্বামী হরিদাস এই যুদ্ধে সাহায্য দান করেন নাই বলিয়া সেকন্দর যে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা একবার পরাস্তও হয়। নবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী পুবছলের (এখন সংস্কৃতে পূর্ব্বস্থলী) মুকুট রায় নামক জনৈক বীরধর্ম্মা বৈদিক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী বাদশা ফিরোজ শার নিকট 'পাঞ্জা' পাইয়াছিলেন বলিয়া গৌড়ের ইতিহাসে লিখিত আছে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই ব্রাহ্মণ যোদ্ধ-পুরুষ নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগড়ের সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নায়ক। সমুদ্রগড়কে কেহ বা সমুদ্রসেনের কেহ বা সমুদ্রগুপ্তের নামের সহিত সংযুক্ত করিতে চাহেন। এই প্রাচীন স্থান কাটোয়া হইতে কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'সাতসইকা' (সপ্তশতিকা) পরগণার রাজধানী; সাতশতী ব্রাহ্মণ জমিদার সুদীর্ঘকাল ইহা অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। মুকুট রায়ের সহিত পাঠান জায়গীরদারের সংঘর্ষ, তাঁহার প্রাণনাশ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করার প্রবাদ এখন নানা ভাবে কথিত হইয়া থাকে (৯)। এখনও সমুদ্রগড়ের ক্ষুদ্র ভূস্বামী হিন্দু

(৮) গৌড়ের ইতিহাস; ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

(৯) গৌড়ের ইতিহাসে লিখিত আছে, মুকুট রায় বর্ত্তমান পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বর্দ্ধমান এই সব জেলার জমিদার ছিলেন। ইহা ভ্রম মাত্র, এতদূর বিস্তৃত জমিদারী সে যুগে অসম্ভব ছিল; জমিদার কথাটাও সে যুগের ভূস্বামীর প্রতি প্রয়োগ ঠিক্ নয়। অন্য স্থানের মুকুট রায়ের প্রবাদ এই মুকুটে শোভিত হইয়া গোল বাধাইয়াছে, মনে হয়। রাজা গণেশের পুত্র জনার্দ্দনের সদলে মগরাজের সাহায্যে যাত্রা গল্প মাত্র।

ও মুসলমানী দুইটি নাম গ্রহন করেন, এবং তাঁহার অধিকারে হিন্দু দেব-পূজার জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। সমুদ্রগড় এবং ভূরশুট এই দুই স্থানের প্রাচীন ব্রাহ্মণ ভূস্বামীবংশই যুদ্ধাদিকার্য্যে কৃতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদিগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ইঁহাদের অনেকে গৌড়-রাজের সহায় ছিলেন; শেষে গণেশ নিজ ভুজবলে গৌড়ে বাদশা হন। সুতরাং ব্রাহ্মণ বল হরণ করা দূরে থাকুক, বল আহরণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। সেকালে সকল জাতির বাঙ্গালীকেই বীরকর্ম্মে নিয়োজিত দেখা যায়; সমৃদ্ধ লোকের পুত্রেরা অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে কুস্তি, লাঠি খেলা প্রভৃতি অভ্যাস করিতেন, ইহা অল্পকাল পূর্ব্বেও লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সম্প্রতি যদু জালালুদ্দীনের সমকালবর্ত্তী (১৪১৬-১৮ খৃঃ) দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জল্পনা কল্পনা বাদ দিয়া একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইঁহারা মুসলমান রাজের প্রতিকূলে অভ্যুথান করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন হইয়াছিলেন। সুতরাং এ কালের বাঙ্গালী কেবল পাঠান-রাজের সহায়তা করিবার নিমিত্তই অস্ত্র ধারণ করিত এমন নহে; হিন্দু রাজা বঙ্গদেশ ভাগে ভোগ করিতেন এবং সময়ে পাঠানদলকে নির্জ্জিত করিয়া স্বাধীনও হইয়াছেন। হাব্‌সী প্রভৃতি বিদেশীয় সৈন্যের সাহায্যে পাঠান-রাজের আত্মরক্ষা করিবার উদ্যোগের ফলে শেষে হাব্‌সীরাই গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়া পড়িয়াছিল। হোসেন শা হাব্‌সী ও দেশীয় পাইক সৈন্যের অধিকাংশকে বিদায় দিয়া বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান দ্বারাই তাঁহার প্রচণ্ড বাহিনীর একাংশ পূরণ করিয়াছিলেন। কেশব ছত্রী তাঁহার শরীর রক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক থাকায় হিন্দু-সৈন্যই ঐ কার্য্যের ভার পাইয়াছিল, উহার অনেকে বাঙ্গালী ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। হোসেন শার 'বঙ্গাল' এবং 'গৌর মল্লিক'

উপাধি-ধারী সেনাপতি যুগলের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য; বাঙ্গালী সৈনিক তাঁহার বড় অল্প ছিল না। বঙ্গের প্রত্যন্ত ভাগের হিন্দু-রাজগণ সেকালে বলবীর্য্য হীন হন নাই। কামরূপ কামতা ও ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধ ব্যাপার ইহার প্রমাণ। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে একালে 'উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম। মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম' নির্দ্দেশ দেখিয়া কেহ কেহ উত্তর বঙ্গের স্বাধীনতা কল্পনা করেন। এ অর্জ্জুন বাঙ্গলার কি কামরূপের তাহা স্থিরতর হয় নাই। কামরূপ ও আসাম বিজয়ের নিমিত্ত হোসেন শার সময় হইতে মীরজুমলার শাসনকাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান রাজা বহু রণতরী প্রয়োগ করিয়াছিলেন; ইহার মাঝি-মাল্লা মাত্রই বাঙ্গালী ছিল, সৈনিক বিদেশী এ কথা বলা যায় না।

সুবিখ্যাত শের খাঁর বঙ্গবিজয়ের সময়ে যে যুদ্ধ সংঘটন হয় তাহাতে ঐতিহাসিক বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান সেনার রণকৌশলের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন (১০)। কৌশলী শের খাঁ সম্মুখ যুদ্ধে পলায়নের ভাণ করিয়া বঙ্গীয় সৈন্যকে প্রথমে বিশৃঙ্খল করিলেন; শেষে অন্তরালে সুসজ্জিত অপর সেনাদল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইলেন। হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে শের দেশীয় জমিদারের সাহায্য পাইয়াছিলেন; তাঁহার মত রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে সত্বর দেশীয় লোকের সহানুভূতি লাভ সহজ হইয়াছিল। কথিত আছে, গণেশের বংশধর ভাতুড়িয়ার রাজা অনুপনারায়ণ পাঁচ হাজার জমিদারী সৈন্য দিয়া শের খাঁর দ্বিতীয় বার যুদ্ধাভিযানে সহায়তা করেন এবং কনোজের নিকটবর্ত্তী এই যুদ্ধে শেরের জয় হইলেও রাজপুত্র মুকুন্দনারায়ণ নিহত হন (১১)। শের শার সদয় ব্যবহারে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘকাল তাঁহার বংশের হিতকামনা

(১০) Tarikh—i—Sher Shahi—Elliot vol IV.

(১১) গৌড়ের ইতিহাস—১৭২ পৃঃ।

করিয়াছে; কাহারও কাহারও মতে আদিলের হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী হিমু (হেমচন্দ্র) বাঙ্গালী।

সোলেমান কররাণী দেশীয় হিন্দু-মুসলমানের সহায়তায় বিহারের রাজ-দণ্ডের সঙ্গে বঙ্গের ভাগ্যও সংযোজিত করেন, দেশীয় প্রবাদ এবং কররাণী বংশের হিন্দু-প্রীতি এ কথার সমর্থন করে। সোলেমান্ গৌড় হইতে রাজমহল যাইবার পথে টাঁড়ায় নূতন রাজধানী ও দুর্গ স্থাপন করেন, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; গৌড়ের জলবায়ু তখনই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। সোলেমান্ এবং দায়ুদের সুযোগ্য সেনাপতি কালাপাহাড়ের বিজয়-বার্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত নানা গল্পের মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস নিষ্কাশিত করা দুরূহ হইলেও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শ্যামবর্ণ সুদীর্ঘ বপু 'কালাপাহাড়' নামের জনক হইলেও গল্প তাঁহাকে "বুদ্ধিমান্, মেধাবী, পরম বৈষ্ণব, সাহসী, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ"—ইত্যাদি বিশেষণে অদ্ভুত করিয়া তুলিয়াছে! বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুমার গৌড়ে রাজ-কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, ওথেলোর মত বীরত্ব গুণে গৌড় রাজবংশের কোন ডেস্ ডেমোনা পাইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে সঞ্জাত অতিরিক্ত গোঁড়ামি দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন ব্যাপারে তাঁহার কুকীর্ত্তিকে অমর করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত প্রামাণিক প্রবাদ। শেষে এক-টাকিয়া ভাদুড়ী বংশে তাঁহার জন্ম এবং সুলতান-দুহিতা 'দুলারী' তাঁহার প্রণয়পাত্রী, এইরূপ নাটকীয় সংযোগে তাঁহার গল্প আরম্ভ হইয়া বধ্যভূমিতে পাঠান রাজকুমারী কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন; হিন্দুত্বের গণ্ডীতে ফিরিতে জগন্নাথে হত্যা দিয়া বিফল-মনোরথ হওয়ার পরে সমগ্র হিন্দু-সমাজের এবং দেবদেবীর উপর তাঁহার জাতক্রোধ হইয়াছিল, ইত্যাদি কাহিনী সৃষ্টি অতি অল্প দিন মাত্রই হইয়াছে। তাঁহার নায়কতায় বাঙ্গালী-মুসলমান সৈন্য যে কামরূপ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিজয় কালে মূর্ত্তি ভগ্ন

করিয়া কুকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দায়ুদের সহিত মোগল-সৈন্যের দ্বিতীয় বার যুদ্ধে অসম সাহসে সৈন্য চালনা করিয়া কালা-পাহাড়ের পতন হইয়াছিল।

আকবরের বঙ্গ-বিজেতা সেনাপতির দল পাঠান দলনের পরে ভৌমিক জমিদারবর্গের সহিত যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এ কালেও বার-ভুঁইয়ার প্রভুশক্তি প্রবল ছিল; দেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোকের অভাব ছিল না। প্রত্যন্ত ভাগে কোচবিহার, ত্রিপুরা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রভাবে তখন শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার হইতেছিল, বাহুবলও অল্প ছিল না। প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায় ত বাহুবলে মোগলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া-ছিলেন; চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়ও শক্তিশালী ছিলেন। বরেন্দ্র এবং মধ্যবঙ্গের সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের জমিদারেরা রাজা টোডর মল্লের শাসন-নীতিতে মোগল বাদশার অনুকূলে সহায়তা করিয়া আত্মরক্ষা করেন। শেষ মহামোগলের রাষ্ট্রনীতি এবং মানসিংহের সৈন্যবল বাঙ্গালী হিন্দুর শক্তিনাশ করিয়া বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণরূপে পদানত ও বলহীন করিয়া ফেলে। অতঃপর বাঙ্গালী হিন্দু আর যুদ্ধকার্য্যে পূর্ব্বের মত কৃতিত্ব দেখাইবার অবকাশ পায় নাই। মোগল মহীরুহের শীতল ছায়ায় মোহ-নিদ্রার আবেশ আসিয়া পড়িল। পরবর্ত্তী জমিদারেরা যে সৈন্যদল রাখিতেন, তাহারা সাময়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লাঠি তরবারী চালাইয়াই বাহাদুরী দেখাইত।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, হিন্দু রাজত্ব কালে যাঁহারা সামন্ত নরপতি ছিলেন, পাঠান আমলে তাঁহাদেরই স্থলাভি-ষিক্ত ভূস্বামীবর্গের অনেকে ভৌমিকে পরিণত হন; মুসলমান অধিকারে বিশেষতঃ মোগল যুগের ব্যবস্থায় নব জমিদার দলের সৃষ্টি। ইঁহারা পূর্ব্বতন

ভূস্বামীর অনুকরণে গড়বন্দী বাটী, জমিদারী সেনাদল এবং অপর রাজচিহ্ন ধারণ করিলেও পূর্ব্বের প্রভুশক্তি হারাইয়াছিলেন। বাঙ্গলার জল বায়ু বীরধর্ম্মের পোষক না হইলেও প্রয়োজনবশে সে যুগের বাঙ্গালীকে যুদ্ধ-কার্য্যেও লিপ্ত হইতে হইত। বঙ্গের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত গড় পরিখার ভগ্নাবশেষ সে কালের অবস্থা এখনও বুঝাইয়া দেয়। উত্তর-বঙ্গে দেবকোঠ, বাণগড়, মহাস্থানগড় প্রভৃতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ হিন্দুযুগের স্মৃতি জাগাইয়া চিত্তবিভ্রম আনয়ন করে। জমিদারী এবং পাঠান-মোগলের গড়গুলি সেকালের বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রামের পরিচয় দিতেছে। মধ্য-বঙ্গে প্রাচীন বর্দ্ধমান ভুক্তির মধ্যে ইছাই ঘোষের শ্যামারূপার গড়, মঙ্গলকোট, সেন পাহাড়ী, ভরতপুর প্রভৃতির প্রাচীন দুর্গ ব্যতীত সমুদ্রগড়, গড় মান্দারণ, শেরগড়, রাজগড় প্রভৃতি অসংখ্য গড় রহিয়াছে। উত্তরে প্রাচীকোট (পাইকোড়), নগর প্রভৃতি এবং দক্ষিণে ময়না গড় প্রমুখ পুরাতন স্থান লোকের মনে কত কল্পনার উদ্রেক করিতে পারে। এককালে গড়বন্দী স্থানের আবশ্যক ছিল, এবং বাঙ্গালী এত নির্জ্জীব ছিল না, একথা সকলেই বুঝিতে পারে। জমিদারে জমিদারে যুদ্ধ কলহও অসাধারণ ছিল না। প্রতাপাদিত্য-প্রমুখ বীরধর্ম্মা জননায়ক নিজ নিজ কর্ম্মশালায় কামান বন্দুক প্রভৃতিও নির্ম্মাণ করাইতেন। কবির 'ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্, দামামা দম্‌দম্, ঝনর ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে"—বাদ্য বাঙ্গালী পল্লীকেও এককালে নাচাইয়া তুলিত; তীর তলোয়ার লাঠি শড়কীতে সে কালের বাঙ্গালী ক্ষিপ্রহস্ত ছিল, একথা এখন গল্পের মত শুনায়।

বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়ে পুস্তকের এতটা স্থান দিবার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সর্ব্বদা একভাবের মন্তব্য শুনিতে শুনিতে এ কালের ভদ্র বাঙ্গালীর বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, এদেশে বীরধর্ম্মা লোক প্রায় জন্মগ্রহণই করে নাই, নতুবা সপ্তদশ অশ্বারোহী কি একটা দেশ জয় করিতে

পারিত! অবতরণিকায় এ উক্তির আলোচনা করা হইয়াছে। নিজের ঢাক নিজে বাজান সকল জাতির স্বভাব; কিন্তু বীরকর্ম্মে বাঙ্গালীও নিযুক্ত হইত, একথা বলিলাম বলিয়াই কেহ এমন বুঝিবেন না যে, বাঙ্গালী বীরের জাতি এই মত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারও সমর্থন করে। অন্যান্য যোদ্ধজাতির তুলনায় বাঙ্গালীর একার্য্যে কৃতিত্ব নগণ্য হইলেও, সেকালে উপযুক্ত অবসর ও শিক্ষা পাইয়া লোকে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানও করিয়াছে। "দেশের জন্য'—ভাবের উদয় না হইলেও প্রভুর কার্য্যে আত্মনিয়োগ একই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছে। 'রণে এয়ো' নামে এক কুমারী ব্রত পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ঘরে চলিত ছিল। উত্তর-বঙ্গের কৈবর্ত্ত এবং পশ্চিম-বঙ্গের গোপজাতি পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী রাজার প্রধান বল; গোপভূমি ও মল্লভূমি পূর্ব্বে বীরভোগ্যাই ছিল। মধ্যযুগে, বর্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয় এবং বাঁকুড়ার বাগদী জাতি সাহসে অতুল ছিল, এখন নিরীহ হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে বীরভূমির লোক ভাল তীরন্দাজ এ কথার উল্লেখ আছে। দুই শত বৎসরও অতীত হয় নাই, বর্দ্ধমান এবং বিষ্ণুপুর রাজের মধ্যে তুমুল যুদ্ধে অনেক তীর শড়কী এবং বন্দুকের ক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। লাঠিতে বাঙ্গালীর কৌশল অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও ছিল। এখন লেখনীমুখে যুদ্ধ-ব্যাপার চলিয়াছে।

লেখনীর কথায় মনে পড়িল, ঐতিহাসিক যুগে বঙ্গবাসী উহার বলেই কীর্ত্তিলাভ করিয়া আসিতেছে। হিন্দুরাজার ধর্ম্মাধিকরণ, মহামাত্য, মহামাণ্ডলিকের কার্য্য দেশের লোকেই করিবে, ইহা স্বাভাবিক। পাঠান অধিকারেও শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু রাজ-দরবারে লেখাপড়ার প্রধান প্রধান কার্য্য দখল করিয়া বসিয়াছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গৌড় রাজ-সরকারে প্রথম যুগ হইতেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন; রাজধানীর নিকটের লোকেই 'চাকরীর' সুযোগ পায়।

দূরবর্ত্তী স্থানের বৃত্তিভোগী লোকের সন্তানেরা ক্রমে গৌড়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্মকুশলতায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই জন্য দেখিতে পাই, সুপণ্ডিত কায়স্থ কবি কুলীন গ্রামের মালাধর বসুর জ্ঞাতি ভ্রাতা গোপীনাথ হোসেন শার রাজস্ব-সচিব হইয়া পুরন্দর খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছেন (১২)। রূপ-সনাতনের মাতুলবংশ গৌড়ের রাজ-সরকারে কার্য্য পাইয়া নিকটে রামকেলীগ্রামে বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। রূপাদি তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে সংস্কৃত পাঠ করিয়া শেষে গৌড়ে গিয়া কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া উচ্চপদ লাভ করেন। রূপ হোসেন শার দবিরখাস (Private Secretary) এবং সনাতন সাকর মল্লিক (Finance minister) হইয়াছিলেন; পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে ঐরূপ উচ্চপদ প্রাপ্তি অবশ্য সেকালে সম্ভব ছিল না। তখন বাঙ্গালী হিন্দু 'অধিকারী', চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিতে রাজস্ব আদায় পরিদর্শন করিতেন; অনেকস্থলে হিন্দু ডিহীদারও নিয়োজিত হইতেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুবুদ্ধি রায় 'গৌড় অধিকারী' এবং সনাতন গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'ডিহীদার' ছিলেন, একথা চৈতন্য চরিতামৃতে পাই। পরবর্ত্তীকালে কানুনগোর কার্য্য বাঙ্গালী কায়স্থের এক-চেটিয়া মত হইয়া উঠে। তখন যে যে পরিমাণে পারসীতে কৃতবিদ্য হইত, সে সেইরূপ উচ্চ নীচ রাজকর্ম্ম পাইত। প্রতাপাদিত্যের পিতা, ভূতপূর্ব্ব কানুনগোর মোহরের শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য) দায়ুদের 'দবিরখাস' হইয়া কিরূপে ভূরি পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হন সে কথা বলা গিয়াছে। "তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং" বলিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে

(১২) প্রবাদ বলে, এ গোপীনাথ কেবল লেখনী বংশীই ধারণ করেন নাই; পুরন্দর খাঁ পদবী পুরন্দর নামক স্থানের যুদ্ধজয়ের ফল। বীরভূমির পুরন্দরপুর কি এই নব সৌভাগ্য লাভ করিবে? এই পুরন্দর খাঁ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থের প্রথম একজাই (সমীকরণ) করিয়াছিলেন।

চাকরীর স্থান নির্দ্দেশ করিলেও বাঙ্গালী সুচিরকাল রাজ-সেবার ফলভোগ করিয়া আসিয়াছে। মোগল অধিকারে বাঙ্গালী হিন্দু উচ্চপদগুলি প্রায় সমস্তই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; শেষদিকে 'নায়েব নাজিম'—অর্থাৎ লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের পদও হিন্দুর অপ্রাপ্য ছিল না। বলা বাহুল্য, তখন যাঁহারা উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইতেন, সেকালের নিয়মে তাঁহাদের সকলেই সেনানায়কের কার্য্যও করিতেন। নবাবী আমলের ইতিহাসে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা গিয়াছে। সে কালের জমিদারবর্গ সমাজের নেতা ছিলেন; মোগল আমলের নূতন জমিদারবর্গের অনেকে চৌধুরী বা কানুনগোর কার্য্য করিতে করিতে অর্থসঞ্চয় করিয়া বা অন্যরূপ সুযোগে জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মজুমদার, তরফদার, সরকার, বক্সী, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি পাঠান যুগের; হাজারী, তালুকদার, চাকলাদার, পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত। এই সমস্ত রাজকার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অনেকেই ভূস্বামী হইয়া উঠিতেন। পিতৃপুরুষের পদবী পাইয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণ লড়াই না করিয়াও বক্সী বা হাজারী, খাজানা আদায়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়াও মজুমদার তরফদার প্রভৃতি উপাধিতে পুরুষানুক্রমে দখলিকার হইয়া বসিতেন। অবশ্য সেকালের নিয়মে পুত্র অনেক সময়ে পিতার চাকরীরও উত্তরাধিকারী হইত বটে, কিন্তু পরে চাকরীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটিলেও উপাধি স্থির থাকিত। তাই ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিতেই এখনও বক্সী, মজুমদার, সরকার, তরফদার দেখিতে পাই। অনেক বক্সী, সরকার ব্রাহ্মণ একালে ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক 'উপাধ্যায়' সংযোগের পক্ষপাতী; তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, তাঁহাদের পদবীর মধ্যে প্রাচীন যুগের স্মৃতি, তৎসহ বাঙ্গালীর অধিকার, কি ভাবে জড়িত রহিয়াছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর দক্ষতা বিষয়ে অতি সংক্ষেপে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে সেকালের শিক্ষা দীক্ষার ও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণের উপর একটা মস্ত অভিযোগ যে, তাহারা বিদ্যা শিক্ষার পথ ও রুদ্ধ করিয়াছিল। শাস্ত্রে যে বিদ্যায় শূদ্রের অনধিকার বলা আছে, তাহা কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা; অবশ্য ব্রহ্মবিদ্যাই সাত্ত্বিক হিন্দুর নিকট একমাত্র বিদ্যা; অন্যগুলি 'কলাবিদ্যা'—ইহাতে সকলেরই প্রবেশ-পথ অবারিত। অধিকার-বাদের সমালোচনা এ গ্রন্থে অনধিকার চর্চ্চাই হইবে; কিন্তু প্রসঙ্গত বলা উচিত যে, যেমন প্রবেশিকা পাশ না করিলে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যারও সোপান আছে, ইহাই প্রাচীন হিন্দুর বিশ্বাস ছিল। ব্রাহ্মণ-কুমার সংস্কার ও শিক্ষার বলে যে পথে সত্বর অগ্রসর হইতে পারে, স্ত্রী শূদ্রাদি সেরূপ সহজে পারে না; সাধনের পথে ক্রম আছে, ইত্যাদি তাঁহাদের বক্তব্য। অবশ্য যে যুগে ব্রাহ্মণ শূদ্রাধম হইয়া দাঁড়াইবে, সে কালের কথা তাঁহারা আদৌ ভাবেন নাই। সে কালের ব্রাহ্মণের শিক্ষা দীক্ষার কথা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান অর্থকরী বিদ্যার প্রভাবের যুগে প্রাচীন ব্যবস্থা নিতান্তই সেকেলে বলিয়া অবজ্ঞাত হইবে সন্দেহ নাই। অন্ন-সমস্যা এখন বড়ই কঠিন দাঁড়াইয়াছে; এজন্য শিক্ষা দীক্ষা যাহা কিছু সবই 'তৈলেন্ধন চিন্তার' জটিল প্রশ্নের মধ্য দিয়া বিচারিত হইতেছে। মধ্যযুগে শিল্প বাণিজ্যাদি সমস্তই দেশীয় লোকের আয়ত্ত থাকায় এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে নাই। তাই, মুসলমান অধিকারের প্রথম অবস্থায় বিপ্লব প্রশমিত হইয়া গেলেই বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চা নবভাবে চালিত হইয়াছিল দেখিতে পাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে টোল চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত চর্চ্চার কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়। প্রাচীনকালের জীমূতবাহন, ভবদেব প্রভৃতি মহাত্মগণের কথা ছাড়িয়া দিয়া পরবর্ত্তী যুগে বরেন্দ্রে কুল্লুক ভট্ট বা উদয়নাচার্য্য এবং রাঢ়ে বৃহস্পতি প্রমুখ পণ্ডিত সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চার নিষ্প্রভ বর্ত্তিকা উজ্জ্বল করিয়াছেন। কানোজাগত কুলীন-সন্তানের

অনেকেই তখন বিদ্যাদি গুণ সম্পন্ন হইতেন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দে নদীয়া সমাজে বিদ্যাচর্চ্চার সমধিক উন্নতির কথাও আলোচিত হইয়াছে; এবং এই কাল হইতে নবদ্বীপের আলোক-বর্ত্তিকা হইতে ঋণ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানের বিদ্যা-মন্দিরে ক্ষুদ্র দীপ প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল। তখন "নবদ্বীপে পড়ি সেই বিদ্যা রস"—পাইয়া পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ-সমাজ কিছুকাল মিষ্টস্বাদ সম্ভোগ করিতেছিল। ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় পাঠনার নিমিত্ত টোল প্রত্যেক কেন্দ্রে স্থাপিত ছিল; এই শান্তিময় যুগে স্বধর্ম্মানুরাগী ভূম্যধিকারীবর্গ নানা ভাবে বিদ্যার উৎসাহ দান করিতেন। অন্ন-চিন্তা অল্প বলিয়া সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে গুরুও যেমন ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রে তদ্গত চিত্ত হইয়া সোৎসাহে বিদ্যা বিস্তারে ব্রতী ছিলেন, ছাত্রও সেইরূপ সম্মুখে চরিত্র বলের জীবন্ত দৃষ্টান্ত পাইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত। ছাত্রের মানসিক বৃত্তিতে যে বীজ নিহিত থাকিত, অনুশীলনে তাহার পরিপুষ্টি সাধন সহজ হইয়া তাহাকে হিন্দু আদর্শের মনুষ্যত্বের দিকে পরিচালিত করিত। শিক্ষার জন্য সেকালের ছাত্রের যে আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, ঐকান্তিকতা ছিল, একালের অর্থকরী বিদ্যার যুগের লোকের তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়াও আয়াসসাধ্য। তখন প্রতিযোগী পরীক্ষা বা কণ্ঠস্থ তথাকথিত জ্ঞানের জন্য অর্থাদি বৃত্তি ছিল না; অধ্যয়নই তপ, এই ধারণা বদ্ধমূল থাকায় গুরুপরিচর্য্যা এবং অনেক সময়ে নিজের শরীর পোষণের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লইয়া ছাত্র শাস্ত্র-চর্চ্চায় বিভোর হইয়া থাকিত। সেকালের টোলের পড়ুয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন সংসারে অনভিজ্ঞ, সুতরাং একালের হিসাবে অকর্ম্মণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্বের একটা দিক্ সুন্দর পুষ্টিলাভ করিত, যাহা বর্ত্তমান ব্যবহারিক শিক্ষার নিমিত্ত চীৎকারের যুগের ছাত্রের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নহে।

টোল চতুষ্পাঠীতে ছাত্র সাধারণতঃ চা'ল দা'ল ও জ্বালানি কাষ্ঠ পাইত; অন্যান্য দ্রব্য স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। ধনাঢ্য লোকে চতুষ্পাঠীতে সাময়িক সাহায্য দান করিতেন; জমিদারবর্গ ভূসম্পত্তি এবং বৃত্তিদ্বারা আনুকূল্য করিতেন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও ছাত্রকে 'বিদায়' দিতেন। ক্ষুদ্র টোলে ছাত্রেরা প্রায়ই গুরু-গৃহে আহার পাইত; গৃহকার্য্যের অনেক ব্যাপার তাহারা নিজেই হৃষ্টচিত্তে সম্পাদন করিত। পরিবারভুক্ত অবশ্য-পোষ্য লোকের সহিত ছাত্রের কোন প্রভেদ ছিল না। এইরূপ টোল চতুষ্পাঠীতে বৈদ্যের সন্তানের প্রবেশাধিকার ছিল; মুকুন্দ এবং নরহরি সরকার নবদ্বীপের টোলে, দর্শনের পড়ুয়া ছিলেন, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। বাটীতে বা গ্রাম্য টোলে ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া পল্লী বালক একালের কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার মত নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। কায়স্থ বা অন্য সৎশূদ্রের ন্যায় ও স্মৃতির টোলে প্রবিষ্ট হইবার নিদর্শন পাওয়া যায় না; সম্পন্ন সৎশূদ্র গৃহে পণ্ডিত রাখিয়া সন্তানকে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি পড়াইতেন, ইহা চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যা শিক্ষার কথায় বুঝা যায়। কায়স্থ-কুমার মসিজীবি হইবে বলিয়া সংস্কৃত অপেক্ষা পারসী শিক্ষার নিমিত্তই সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিত। মখ্‌তবে হিন্দুর পুত্রকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে কোন বাধা না থাকিলেও সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থের পুত্র সাধারণতঃ কোন মুসলমান মৌলবীর বাটীতে গিয়া পারসী পড়িয়া আসিত। ব্রাহ্মণাদি জাতিরও রাজসরকারে কার্য্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিলে পুত্রকে এইরূপে পারসী শিখাইতে হইত। কৃষি ব্যতীত শিল্প বাণিজ্যাদি কার্য্যে বহুতর লোকের নিয়োজিত হইবার অবসর থাকায় সেকালে চাকরীই লোকের প্রধান লক্ষ্য ছিল না; সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার দিকে অল্প লোকেই আকৃষ্ট হইত। পুরাণ পাঠাদি শুনিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম শিক্ষার যে সুযোগ ছিল, মুসলমানের

পক্ষে পীর ফকিরগণের উপদেশে সাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধি পুষ্ট করিবারও সেইরূপ অবকাশ ছিল। কিন্তু অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই সামাজিক কারণে বা উদরান্নের জন্যই মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। কৃষি-শিল্পই এই শ্রেণীর উপজীব্য হওয়ায় শিক্ষা তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, কিন্তু পীরের কৃপায় ধর্ম্মোপদেশ পাইত।

সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত মুসলমান রাজ নিয়মিত কোন ব্যবস্থা করেন নাই বটে, কিন্তু মুসলমানের ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে মস্‌জীদের সংসৃষ্ট মাদ্রাসা ছিল। প্রথম যুগের মুসলমান বিজেতৃবর্গ বাগ্‌দাদের বাহিরে কায়রো বা কর্ডোভায় কিম্বা সিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে যে সমস্ত বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিক্ষার বিস্তারে বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণ তাহার অনুকরণ করিতে পারেন নাই। ভারতবাসীর সেকালের সভ্যতা ও শিক্ষা নব বিজেতাদিগের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উন্মেষ করিয়াছিল; তাই শতাব্দীকালের নির্য্যাতন নিগ্রহের পরে যখন শাসনযন্ত্র স্থির হইয়া বসিল, তখন রাজকীয় প্রধান প্রধান স্থান ভিন্ন অন্যত্র আর শিক্ষা কেন্দ্র গঠিত করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাঙ্গলায় বখ্‌তিয়ার গৌড়জয়ের পরেই মস্‌জীদের সংসৃষ্ট মাদ্রাসা বসাইলেন; কারী ছাত্র খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন হইল। সুলতান গিয়াসুদ্দীন্ পারসী ও আরবী শিক্ষার উৎসাহ দানের নিমিত্ত অনেক ইনাম্ ও বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; রাজা গণেশও মুসলমানগণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইনাম্ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে পারসী শিক্ষার অনুরাগ তখনও জন্মে নাই। নসরৎ শা রামায়ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া দেশীয় ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন; সুপণ্ডিত দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন্ কবি হাফেজের সহিত পত্র ব্যবহারে পারসী কবিতা ফুটাইতেন,—কিন্তু দেশের লোককে পারসীর

দিকে আকৃষ্ট করা সে যুগের কার্য্য নহে। বাদশা হোসেন শা দেশীয় কবিকে উৎসাহ দিয়া, গৌড় ভিন্ন অন্যান্য স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দু মুসলমানকে পারসী শিখিবার সুযোগ দিলেন, কিন্তু রাজদরবারে কর্ম্মপ্রার্থী লোক ভিন্ন আর কেহই বিজাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী হইল না। ব্রাহ্মণগণ তখন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য যে সামান্য সংস্কৃত শিক্ষা আবশ্যক তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন; বুদ্ধিমান্ ছাত্র নিকটবর্ত্তী টোলে পাঠ শেষ হইলে ক্বচিৎ কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে যাইত। কায়স্থ বিষয়-কর্ম্মের নিমিত্ত পাঠশালায় শিখিত; অবস্থা ভাল হইলে বা বালক বুদ্ধিমান্ হইলেই নিকটবর্ত্তী গ্রামে মৌলবীর নিকটে পন্দেনামা বা গোলেস্তাঁ পড়িতে পারিলেই চরম বিদ্যা উপার্জ্জন হইল মনে করিত। মোগল অধিকারে রাজকার্য্যের দ্বার অধিকতর উন্মুক্ত হইলে অনেক হিন্দু ভদ্রলোকে পারসী পড়িতে আরম্ভ করিল; শেষে গ্রামে গ্রামে পারসী নবীস্ লোকের আদর ইজ্জৎ বাড়িল। উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হিন্দুরাও পারসী শিক্ষার উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত সে যুগের গণ্ডগ্রামে পাঠশালা থাকিত; এইরূপ পাঠশালার শিক্ষা প্রণালী কালে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও লোকে পল্লীতে পল্লীতে উহার প্রচলন দেখিয়াছে। পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা হস্তাক্ষর এবং হিসাব শিক্ষাদানেই সমধিক পটু ছিলেন। সে যুগের বাঙ্গালী গৃহস্থের উপযোগী সাধারণ জ্ঞানদানই পাঠশালার কার্য্য ছিল; তবে যে ছাত্র সাধারণ জ্ঞান লাভের পরে জমিদারের বা মহাজনের কাগজ পত্র লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহার জন্য উপযুক্ত হইলে বিশেষ শিক্ষারও ব্যবস্থা কোন কোন গুরু করিতেন। শুভঙ্করী হিসাবে পটুতা লাভ বিশেষ আবশ্যক বিবেচিত হইত। শুভঙ্কর দাস কোনও মতে পঞ্চদশ আবার কোন মতে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া

কথিত; তৎপূর্ব্বে মানসাঙ্ক প্রভৃতির চর্চ্চা কি ভাবে হইত, বিশেষ জানা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত কোন জমিদারী কাগজ পত্র প্রাচীন জমিদারবর্গের অনেকের গৃহে বিশেষ সন্ধান করিয়াও পাই নাই। পাট্টার প্রাচীন বাঙ্গলা আদর্শ পাওয়া যায়। সনন্দগুলি মোগল আমলের, অবশ্য পারসীতে লিখিত এবং রূপেয়া দাম্ অঙ্ক বিশিষ্ট। বাঙ্গলায় প্রচলিত হিসাবের কড়া ক্রান্তি বা ধূল দন্তী, কতকাল চলিত হইয়াছে জানিবার উপায় নাই। সে যুগের পাঠশালার লেখাপড়া শিক্ষায় পড়ার ব্যাপারটা প্রধান স্থান অধিকার করে নাই; লিপি-কুশলতাই লক্ষ্য থাকিত এবং দৈনন্দিন গৃহকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত হিসাব শিক্ষাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। বিদ্যারম্ভে রামখড়ি সহযোগে মাটীতে গণেশের আঁকুড়ী ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালা আদর্শ লিখনের উপর বুলাইয়া অর্থাৎ ক্রমাগত লিখিয়া লিখিয়া হাত ঠিক্ করা হইত এবং পরে তালপাতা কলাপাতা প্রভৃতিতে ঐ বর্ণমালা, ফলা, কড়া গণ্ডাদি লিখিতেই অনেক সময় ব্যয়িত হইত। কাগজ সুলভ ছিল না, কিন্তু শক্ত বলিয়া অষ্টে পৃষ্ঠে মক্স করা অর্থাৎ লেখার উপরে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লেখা চলিত। আদর্শ দৃষ্টে 'বন্দ মাতা সুরধূনী' প্রভৃতি কবিতা লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র পড়িবার যে টুকু অবসর পাইত, তাহাই হইল পড়া। রামায়ণ মহাভারতাদি রচিত হইবার পরে বাঙ্গালা পুঁথি পড়ার সুযোগ হইয়াছিল। সাধারণ লোকে অবস্থা সচ্ছল এবং সন্তান বুদ্ধিমান্ হইলে তবে পাঠশালার সহিত সম্বন্ধ রাখিত। মুসলমান-দিগের জন্য প্রধান প্রধান স্থানেই রাজব্যয়ে বা ইনাম্ বৃত্তিতে পুষ্ট মখ্তাব ছিল। হিন্দু অপেক্ষা সে যুগের সাধারণ মুসলমান আরও নিরক্ষর ছিল। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা মৌলবীর সাহায্যে পারসী শিক্ষা করিয়া আরবীতে লিখিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। অতি অল্প লোকেই শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিত; কিন্তু তখন পেটে অন্ন ছিল, দেহে শক্তি ছিল, সুতরাং মনে বলও

ছিল; বর্ত্তমানের অসার ভাব আসে নাই। 'লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই' বলিয়া বলিয়া বালককে পুঁথিগত বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়োজন সেকালে ছিল না।

মধ্যযুগের বাঙ্গলায় কায়স্থ ভিন্ন চাকরী-জীবি জাতি ছিল না। কৃষক এবং শিল্পীর জাতীয় বৃত্তিতে জীবিকার্জ্জন তখন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে নাই। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবি লোক ব্যতীত অন্য সকলেরই সমাজের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যজাতীয় ভদ্রলোকে অতি অল্পমাত্রই রাজকার্য্যের প্রার্থনা করিতেন; চাকরী সেকালে হীনবৃত্তি বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কায়স্থ জাতি বহুকাল অবধি ঐরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া উহা তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায় বলিয়া ধরা হইত। রাজদরবারে লেখক, হিসাব-রক্ষক বা জমিদারী ব্যবস্থায় সরকারী ক্রোরী কানুনগো প্রায় কায়স্থেরাই ছিলেন; ভবানন্দ রায় প্রভৃতি দুই চারিটী ব্রাহ্মণ মাত্র কানুনগোর কার্য্য করিতেন, জানা যায়। জমিদারের নায়েব, মুন্সী, কারকুন্ বা পাটোয়ারী সবই কায়স্থের একচেটিয়া ছিল। সেকালে সকলে পরমুখাপেক্ষী, পরপদসেবী হইয়া পড়ে নাই। পল্লীবাসী নিজের কার্য্য নিজেই করিয়া লইত, অথবা পরস্পরের সহায়ক হইত। ধনাঢ্য লোকে পল্লীতেই বাস করিতেন, পল্লীর শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন; গৃহিণীর গহনা অপেক্ষা দীর্ঘিকা বা অতিথিশালা প্রতিষ্ঠার দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। পল্লীবাসী একালের মানদণ্ডে ধনী না হউক, শান্তিসুখ, আমোদ আহ্লাদ, উৎসাহ উৎসবে দিনযাপন করিত। মুখে হাসি, অন্তরে আনন্দ, হৃদয়ে সজীবতা দেখা যাইত। লোকে সামাজিকতা, সমপ্রাণতা, আত্মনির্ভরশীলতা জানিত; এমন সময় গিয়াছে যে আবশ্যক বস্তুর নিমিত্ত বিদেশীর কথা দূরে থাকুক গ্রামান্তরবাসীরও মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। গ্রাম্য-সমাজে সজীবতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, সাহচর্য্যের ভাব ছিল; এক কথায় প্রতি বাঙ্গালী পল্লী আদর্শ শান্তি-নিকেতন ছিল। মুসলমান রাজপুরুষের সাময়িক অনাচার, কোথাও কোথাও না দেখা দিত এমন নহে, কিন্তু ব্যবসাদারী বিচার বা বাহিরের আমদানী বিলাস সমাজ-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সালিস মধ্যস্থে ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা হইত; পাপবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া লোকে প্রতিশোধ লইবার কামনায় নিজের সর্ব্বনাশ করিতে শিখে নাই। ধনাঢ্যের বেশভূষা দেখিয়া দর্দ্দুরের উদর স্ফীতির অভিনয় সে যুগে ঘটিত না; গ্রাম্য শিল্পের আদান প্রদানে গ্রামের অভাব পূর্ণ হইত। রাজনীতির সহিত লোকের বড় একটা সংস্রব ছিল না; সমাজস্থিতির নিমিত্ত নেতৃবর্গ যে বিধান করিয়া দিতেন তাহাতেই তৃপ্ত থাকিত, অথচ গ্রাম্য পঞ্চায়েতে সকলেরই স্থান ও কর্ত্তব্য ছিল। সমাজে ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই একটা মাখামাখি ভাব ছিল। এ কালের তথা কথিত শিক্ষিত ভদ্র (?) লোক সেই প্রীতি ঘুচাইতেছে। বামুনের দোষ বেশী নাই; এক বিছানায় না বসিয়া, এক পাত্রে না খাইয়াও যে মাখামাখি হইতে পারে তাহা অল্প কাল পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে। দাদা ঠাকুর লোকের হিতাচরণেই সতত রত, নীলু বাগ্দী গোলাম হইয়াও গৃহস্থ পরিবারে স্নেহের 'নীলু খুড়া', হানিফ চাচা হিন্দু পরিবারেরই যেন আর একজন, এইভাব স্পর্শদোষ প্রবল থাকিতেও দেখা গিয়াছে। এখনকার 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির'—ভাবে হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীত ছিল না।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর প্রভাব কি পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল, সভ্যতা-বিস্তারে বাঙ্গালী কতদূর সহায়তা করিয়াছে, এই বিষয় লইয়া একালে তর্ক বিতর্ক হইতেছে। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী অধ্যাপক নালন্দায় সহস্র শিষ্যকে পরা অপরা উভয় বিদ্যারই আলোকে আনিয়াছেন; গুরু অতীশ তিব্বতে গিয়া নবভাবে ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী

এখন গৌরব অনুভব করে। বাঙ্গলার প্রান্তভাগে পাহাড়ে জঙ্গলে যে সমস্ত লোক বাস করিত, তাহাদের নিমিত্ত মধ্য বঙ্গের লোকে কি করিয়াছে সে কথার বড় একটা আলোচনা হয় না। দক্ষিণে তমলুক্ পুরাকালে হিন্দু বৌদ্ধের সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল; এখানকার সমুদ্র বন্দরে নানা দিগ্দেশ হইতে আগত নানা শ্রেণীর লোকের ভাব বিনিময় ঘটিত। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-প্রভাবে এখানে দশম শতাব্দীতেই বৌদ্ধপ্রভাব বিনষ্ট হইয়া শাক্তমতের বহুল প্রচার ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ মঠের স্থানে বর্গভীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা এই যুগের বলিয়া অনেকের ধারণা। পাল নরপতিগণের সময়ে এই দণ্ডভুক্তি তাঁহাদের অধীনে আইসে; শেষে রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত হইয়া যায়। তখন, উৎকল ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান আরম্ভ হয়; শেষে দক্ষিণ মেদিনীপুরের মিশ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। ওড্রাজের সামন্ত ময়ূর রাজগণ বহুদিন ধরিয়া এ অঞ্চলে বাঙ্গালীর পূজা পদ্ধতি, আচার ব্যবহার বিস্তারে পরোক্ষে সহায়তা করেন; বৌদ্ধ ধর্ম্মপূজা ক্রমে বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও শিবপূজায় পরিণত হয়। দক্ষিণে বালেশ্বর এবং পশ্চিমের জঙ্গলময় ভূভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর প্রভাব অনুভূত হয়; কালে দক্ষিণ মেদিনীপুরের পল্লীবাসীর বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত সামাজিক আচার কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া মধ্যবঙ্গের সমাজের সহিত ঘনিষ্টতার সুযোগ হয়। এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী কৈবর্ত্তজাতি (বর্ত্তমানে মাহিষ্য) বঙ্গীয় সভ্যতার আশ্রয়ে উন্নত হয়। চন্দ্রকোণা, ময়না, কর্ণগড় প্রভৃতির ভূস্বামীরা মোগল অধিকারে সামন্ত নৃপতির ন্যায় সম্মান পাইয়াছিলেন; জঙ্গল অঞ্চলে ব্রাহ্মণভূম এখনও ব্রাহ্মণ প্রভাবের স্মৃতি বহন করিতেছে।

মধ্যবঙ্গের পশ্চিমের প্রান্তে বীরভূমি, বাঁকুড়া এবং মানভূমির কঠিন মৃত্তিকায়ও নবাগত ব্রাহ্মণের প্রভাব সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল।

পঞ্চকোট বা শেখরভূমের রাজবংশ এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত। একাদশ শতাব্দীতে এক পাহাড়িয়া সামন্ত পাচেটের অধিপতি ছিলেন। পাচেট-গড় সেকালের বাঙ্গলার সীমান্ত দুর্গ ছিল? দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ প্রভাবে পাচেট্ পঞ্চকোট হইয়া দাঁড়ায় ও সামন্ত হরিশ্চন্দ্র নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়া বরাকর নদীর নিকটে মেটে সিঁদুরে পাহাড়ের উপর দুইটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তী কালের পাচেটে হিন্দুর সভ্যতা বিশেষ বিস্তৃত হয়। বাঁকুড়ায় বন-বিষ্ণুপুরের মল্ল বা বাগ্দী রাজা হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আসিয়া পড়িলে ঐ রাজবংশের নিমিত্ত নব পুরাণের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রথমে, বৃন্দাবন অঞ্চলের তীর্থযাত্রী ক্ষত্রিয় রাজার রাণীর এই স্থানেই প্রসব বেদনা ঘটায় শ্রীকুশমেটিয়া বাগ্দী নামক লোক (জাতি নহে!) প্রসূত বালকের পালনের ভার গ্রহণ করিল; পরবর্ত্তীকালে এই পালকের ব্রাহ্মণ হইয়া উঠা কষ্টকর হইল না এবং বাগদীর রাজা, বাগদী রাজা নহে, এ ব্যাখ্যা অতি সহজে চলিল। মল্লরাজ হাম্বীর যে দস্যুদলের নেতা ছিলেন, এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কৃপায় সদলে বৈষ্ণব হইলেন, একথা লোকে বিস্মৃত হইল। বীর হাম্বীরের পুত্র রাজা রঘুনাথ প্রথমে সিংহ উপাধি ধারণ করিলেন; তাঁহার সময়ে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত হিন্দু সদাচার বদ্ধমূল হইল। বিষ্ণু মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় দুর্গ প্রাকার নির্ম্মিত হইয়া নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল। সেই হইতে দুইশত বর্ষকাল যে সুনিয়মে বিষ্ণুপুর রাজ্য পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই কৌতূহল ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল (১৩)। ভবিষ্য পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে যে সামন্তভূমি, বরাহভূমি প্রভৃতি জঙ্গলময় প্রদেশ অসভ্য অধর্ম্মাচারী দস্যুর আবাস স্থান বলিয়া বর্ণিত, যেথানে লোকে সর্ব্বপ্রকার মাংস এমন কি সর্প পর্য্যন্ত উদরস্থ করিত, মদ্যপান যথায় সাধারণ ছিল,

(১৩) See—Holwell's Interesting historical events.

লোকে মৃগয়া এবং লুণ্ঠন দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, রমণীগণ আকার, ভাবভঙ্গী পরিচ্ছদে রাক্ষসীর অনুরূপ ছিল, ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে বৃক্ষ ও প্রস্তরে গ্রাম দেবতার পূজা হইত, সেইস্থানেই মধ্যবঙ্গের বাঙ্গালীর প্রভাবে ক্রমশঃ শক্তি, শিব ও বিষ্ণু পূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। শিক্ষা ও সদাচার তথাকার সমাজের উচ্চস্তরে মাত্র অনুপ্রবিষ্ট হইলেও ক্রমে রন্ধ্রপথে নিম্নগ হইয়া লোককে হিন্দু সভ্যতার মধুর রসের আস্বাদ গ্রহণে নিরত করিয়াছিল।

পূর্ব্বভাগে কিরাত দেশ হিন্দু-সভ্যতার আলোক পাইয়া ত্রিপুরা নামে অভিহিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিত বিরচিত রাজমালায় দ্রুহ্যুর পুত্র ত্রিপুর জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ত্রিপুরাকে মহাভারতের যুগে উঠাইয়া লন। ত্রিপুরাবাসী লোকের আকৃতি প্রকৃতি, ভাষা, উহাদের প্রাচীন পৈশাচিক পূজা উৎসব, কুক্কুট, হংস, বরাহ, গবয় প্রভৃতি বলি (কুত্রাপি বা নরবলি), বিবাহ-প্রথা, সমস্তই উহাদের পার্ব্বতীয় কিরাত-কুলের কার্য্যকলাপের সাক্ষ্য দান করিতেছে। মণিপুর, হেরম্ব, কাছাড়ও পুরাকালে কিরাত-রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কৃপায় হিন্দু-সভ্যতা বিস্তারের পরে মণিপুর নূতন নাম পাইয়া মহেন্দ্র গিরির পার্শ্ববর্ত্তী মহাভারতীয় মণিপুরের সহিত অর্জ্জুনকে ভাগে ভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ত্রিপুরাও ঐ ভাবে প্রাচীন হিন্দুর স্থান বলিয়া দাবী করে। রাজাদিগের পূর্ব্বকালের তুঙ্গফা, রত্নফা নাম (ফা= পিতা) হিন্দু ও পাহাড়িয়া উভয়ের মিলন ক্ষেত্রের দিকে সঙ্কেত করিতেছে; রাজাদের কাছুয়া (বলপূর্ব্বক পৈশাচ-বিবাহ) এবং ব্রাহ্ম-বিবাহও উহার প্রমাণ দেয়। রত্নফা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সোণার-গাঁ আসিয়া শাসনকর্ত্তা তুগ্রলের সাহায্য ভিক্ষা করেন। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে তুগ্রল খাঁ ত্রিপুর-সৈন্যকে পরাভূত করিয়া রত্নফাকে তাহার পৈতৃক সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দু-মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত

প্রভৃতি ত্রিপুরায় গিয়া শক্তি ও শৈব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন; রাজার নাম রত্নমাণিক্য হয়। (১৪) 'মাণিক্য' যোগে অল্পকাল পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গের লোকের নাম উজ্জ্বল করার প্রথা ছিল। ত্রিপুরায় বহুদিন শৈব মতেরই প্রাধান্য ছিল; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীরা ত্রিপুরার রাজাকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করেন।

নেপালে শৈব মতের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর কার্য্য কিনা, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও কোচবিহারে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ও সংস্কার যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, তাহা এখন একবাক্যে স্বীকৃত (১৫)। রঙ্গপুরের উত্তরাঞ্চল পূর্ব্বে লুইপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল; এই খানেই হাড়িপা, ময়নামতী প্রভৃতির প্রবাদ বদ্ধমূল হইয়াছিল। তথাপি, প্রাচীন কাম্‌তাপুরের রাজবংশের শাসনকালে মধ্যবঙ্গের নব-হিন্দুমত ঐ প্রদেশের আধ বৌদ্ধ, আধ হিন্দু-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া তিন শতাব্দী যাবৎ একটা প্রতিক্রিয়া চালাইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহার হিন্দু শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল; রাজধানীতে বহুতর দেব-মন্দির, পান্থশালা এমন কি পশুচিকিৎসালয় পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১৬)। নৃপতি বিশ্বসিংহ এবং তাঁহার পুত্র বীরবর শুক্লধ্বজ (চিল রায়) আসাম এবং ত্রিপুর-সৈন্যকেও পরাস্ত করিয়া বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন। শেষে সোলেমান্ কররাণীর সহিত সংগ্রামে শুক্লধ্বজ বন্দীভূত হইয়া গৌড়ে আনীত হন। আসাম বুরঞ্জী সাক্ষ্য দিতেছে যে, সোলেমান স্বীয় কন্যার সহিত শুক্লধ্বজের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে

(১৪) এ বিষয়ে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য। তাঁহার পরবর্ত্তীকালে লিখিত গ্রন্থ রাজ অনুগ্রহ প্রাপ্ত বলিয়া বিদিত।

(১৫) Gait's History of Assam—P. 55.

(১৬) Ralph Fitch.

ভিতরবন্দ, বাহিরবন্দ, গয়াবাড়ী, সেরপুর ও দশ-কাহনিয়া পরগণা যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন (১৭)। ভৌমিক ইশা খাঁর সহিত শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবের যুদ্ধ-ব্যাপারে পূর্ব্ব কোচবিহার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; শেষ মোগলের সহিত সংঘর্ষে পশ্চিম কোচবিহারও শ্রীহীন হইয়া পড়িল। আসামের দুর্দ্দান্ত আহোম্ রাজারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শিক্ষায় ক্রমে হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন, পরে কাম্‌তা ও কুচবিহারের রাজ-পুরিবারের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটায়, আসামীরাও ক্রমশঃ পুরা বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছিল। আসামে বৈষ্ণব-মতের প্রবর্ত্তক শঙ্কর দেবকে অনেকে বাঙ্গালী ঔপনিবেশিকের বংশধর মনে করেন। কামরূপ ত প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শক্তি-সাধনার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র এবং বাঙ্গলারই অংশ বিশেষ বলিয়া স্বীকৃত। বাঙ্গলা হইতে এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার ব্যবহার চারিদিকেই প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

---

(১৭) Gait's Assam—P. 53. (এই বিবাহ কি কালাপাহাড়ে উঠিয়াছে?)

উনবিংশ অধ্যায়।

—*০*—

উপসংহার—ধর্ম্ম-কর্ম্ম।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙ্গালীর যৎসামান্য কৃতিত্ব নির্দ্দেশ করা হইল। একালে কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী জাতিকেই মনুষ্যত্বের অধিকারী মনে করা হইতেছে। বাঙ্গলার জল-বায়ু এবং অবস্থান মানুষকে কঠোর কর্ম্মী হইতে দেয় নাই। নরম মাটি, গরম এবং বাষ্পসিক্ত বায়ু, অল্প শ্রমে লব্ধ প্রচুর শস্য, দৈহিক আলস্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর হৃদয়ে কোমল বৃত্তির পুষ্টি সাধন করিয়া আসিয়াছিল। স্নেহ, মমতা, প্রেম সেকালের বাঙ্গালীর প্রাণে পূর্ণমাত্রায় এমন কি অযথা বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালী স্বভাবকে বাঙ্গলার মাটির মতই মৃদু পেলব করিয়া ফেলিয়াছে। আবার বৌদ্ধ এবং জৈন অহিংস ধর্ম্মের প্রভাব প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির উপরে কিছু অধিক মাত্রায় চাপিয়া বসায় কর্ম্মের কতকটা অন্তরায় স্বরূপও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ কালে কোমল বৃত্তির অনুশীলন এক প্রকার অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া ধরা হইতেছে; আদর্শ সভ্যতার মানদণ্ড কোন কালেই স্থিরীকৃত হয় নাই। শীলতা এবং সদাচারসম্পন্ন ভারতবাসী বাহ্য চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া সেকালের বিদেশী পর্য্যটকের পুস্তকে অর্দ্ধ-নগ্ন বর্ব্বর বলিয়া অবজ্ঞাত। যুগ যুগান্তর ধরিয়া হিন্দুজাতি ধর্ম্মকেই বল ভাবিয়াছে; 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—এই বলের ভাবে অনুপ্রাণিত হিন্দু

কর্ম্মক্ষেত্রেও ধর্ম্মকে প্রধান আশ্রয় বলিয়া ধরিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্ম-
যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিয়া অতি অল্পদিন পূর্ব্বের দুইটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি।
বিগত বক্‌সার বিপ্লবে চীন-সমরে নানা ইউরোপীয় জাতির সেনার সঙ্গে
একদল রাজপুত (ব্রাহ্মণ নামে কথিত) হিন্দু-সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছিল।
কমিসেরিয়েটের জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়াছেন, কোন একস্থানের খণ্ড-
যুদ্ধে চীনাদিগকে তাড়িত করিয়া ইউরোপীয় খৃষ্টান (?) সেনা যখন গ্রাম-
লুণ্ঠনে ধাবিত হইয়াছে, হিন্দুদল তখন একস্থানে বসিয়া পড়িয়া 'ভজন গান'
আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধে চন্দননগরবাসী তিন জন যুবক
একটি কলের কামান চালাইবার ভার পাইয়াছিল; ফ্রান্সের উত্তর-প্রান্তে
বিরাট আহবে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানের গোলা যখন মুহুর্মুহু সংহারের ভীষণ মূর্ত্তি
প্রকটিত করিতেছিল, ফরাসী গৃহস্থ সৈনিক যখন কাতর-হৃদয়ে খাদের
(trench) মধ্যে ম্রিয়মাণ, তখন বাঙ্গালী হিন্দু মরিতেই ত আসিয়াছি
বলিয়া অটলভাবে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য ঐ
তিন বাঙ্গালী যুবকের শিক্ষা ও সাধনা এ পথের সহায় ছিল। কিন্তু
শারীরিক বলই বল নহে; 'ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং, বলং ব্রহ্মবলং'—এই
হইল হিন্দুর বিশ্বাস। মনের বল প্রাচীন বাঙ্গালীরও ছিল; নানা কারণে
কর্ম্মে দৃঢ়তা নষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালী এক মিশ্রিত জাতি—অথবা
প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকগুলি মিশ্রিত জাতির সমষ্টি। পৌরাণিক যুগে
আর্য্য প্রভাব বিস্তৃত হইলে নানা স্থানের ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত বাঙ্গালী
অধিবাসী হিন্দু ঔপনিবেশিকদিগের সংসর্গে আসিয়া হিন্দু-ভাবাপন্ন
হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে পশ্চিম-বঙ্গে মহাবীর প্রভৃতি জৈন তীর্থিক-
গণের এবং উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ শ্রমণ বর্গের শিক্ষায় এবং আদর্শে
সাধারণ লোকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক্ ভাবে

চালিত হইয়া একটা বিশেষত্ব পাইয়াছিল। এখনও বাঙ্গালীর পূজা পার্ব্বণ,
ব্রত নিয়মে এই জৈন বা বৌদ্ধ ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্থানান্তরে এই
যুগের আচার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গীয়-সমাজে ধর্ম্মাচরণের ক্রম-বিকাশ
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এস্থলে সামান্য উল্লেখ মাত্র
করিয়া মধ্য-যুগের সাধারণ কথা কয়েকটা বলাই উদ্দেশ্য। আমাদের
এ দেশে লুইপাদ, কাহ্ণু প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যেরা প্রাচীন মহাযানী বৌদ্ধ-
দিগের প্রচারিত ধর্ম্ম-মতকে দেশ কাল অনুসারে রূপান্তরিত করিয়া
পূর্ব্ববর্ত্তী হীনযান মতের সহিত মিলাইয়া নবভাবে ধর্ম্মমত গঠিত করিয়া
গিয়াছেন। আবার, বাঙ্গলার সমস্ত বিভাগে এই সকল ধর্ম্ম-সংস্কার
এক ভাবে কি এক কালে সাধিত হয় নাই, ইহাও স্মরণ রাখা উচিত। শত
শত বর্ষ ধরিয়া ঐ বৌদ্ধভাব প্রসার লাভ করিয়াছে এবং পরে গোরক্ষনাথ
প্রভৃতি সন্ন্যাসী নাথ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত নবভাবে গঠিত হিন্দু ধর্ম্মমতও
প্রথমে সংঘর্ষ পরে মিলন দ্বারা পূর্ব্বমতের পুষ্টি বা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া
আসিয়াছে। পক্ষান্তরে, প্রাচীন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-দলও পরোক্ষভাবে এই
সামাজিক ধর্ম্ম-গঠনে সহায়তা করিয়া আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের
মধ্যেই দেবতা মূর্ত্তির সৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইতেছিল। বাঙ্গলার প্রাচীন
ব্রাহ্মণেরা পৌরাণিক শাক্তমতের সহিত অপরিচিত ছিলেন, বোধ হয় না;
তাঁহারা অভিচারাদি ক্রিয়ায়ও নিপুণ ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সেই
কারণে কালে ঐ ব্রাহ্মণেরাই অনেক বৌদ্ধ-মন্দিরে পুরোহিত হইয়া বসিলেন
এবং হিন্দু রাজাদিগের উৎসাহে পৌরাণিক দেবমূর্ত্তি ব্যতীত, বৌদ্ধ অনুকরণে
কল্পিত দেবদেবীর নূতন নূতন মূর্ত্তির পূজাও বাঙ্গালায় প্রচলন হইতেছিল,
ইহার প্রমাণ একালে আবিষ্কৃত নানা শ্রেণীর দেব-মূর্ত্তিতে স্পষ্ট রহিয়াছে।

ধর্ম্ম শিক্ষায় কানোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণবর্গ বা পাশ্চাত্য বৈদিকগণ
বঙ্গীয় সমাজকে কি পরিমাণে উন্নত করিয়াছেন, ইতিহাসের অভাবে তাহা

নির্ণীত হওয়া সুকঠিন। এইমাত্র বলা যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদের মত আর্য্যাবর্ত্তে বহু প্রচারিত হইলে উত্তর ভারতের যে ব্রাহ্মণকুল 'শিবোঽহং' এই প্রাচীন মন্ত্রের সাধনায় জ্ঞানকেই ধর্ম্মচর্য্যার প্রধান আসন দিয়াছিলেন, সেই বেদবেত্তাদিগের বংশধর কয়েকজনই বাঙ্গলায় আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রাচীন তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদের প্রভাব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বৌদ্ধ দেব-দেবীর উপাসনা পদ্ধতি এবং বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই পৌরাণিক তথা তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি এই মত যে সব পণ্ডিত পূর্ব্বে প্রচার করিতেন, তাঁহারা এখন প্রায় কোণঠেসা হইতেছেন। বুদ্ধদেবের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে শৈব মত মগধের ঐ অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এ কথা এখন স্বীকৃত। ঋগ্বেদের 'রুদ্র' দেবকে অথর্ব্বের 'শিবের' পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া বয়সে ছোট বড় দেখাইবার জন্য প্রত্নতত্ত্বান্বেষীদিগের বর্ত্তমান প্রয়াস যথার্থই হাস্যকর হইয়া উঠিলেও তাঁহাদের উদ্যম পুরা মাত্রায় এখন চলিতেছে। কবির 'বয়সে বাপের বড়'—কথা উড়াইয়া এখন ব্রহ্মাকে ধরিয়াও টানাটানি লাগিয়াছে। প্রকৃতির খেলায় হিরণ্যগর্ভের নানাভাবে বিকাশ লইয়া তত্ত্বদর্শী বৈদিক ঋষিরা যে সহস্রশীর্ষা পুরুষের বিভিন্ন স্ফুরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক কালের আরোপ করিতে গিয়া পরস্পর বৃথা কলহ চলিতেছে। ভাবাবেশে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, শিব, কালী, করালী প্রভৃতি জগৎ-সবিতার বিভিন্ন বিকাশ যাহা দেখিয়াছেন, তাহার মধুর আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া উহারা 'কোন্ ডালের আম' এই সন্ধানেই থাকুন। কিন্তু "অথর্ব্ব মন্ত্র অর্ব্বাচীন'—এই উক্তি অর্ব্বাচীনের, তাহা শতবার বলিব; মন্ত্রের ভাষা ও ভাব বিশ্লেষণ হইতে এখনও বিলম্ব আছে, কতকালের তাহা বলা বড়ই সাহসিকতা।

যাক্, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় আসিয়া দেখিলেন, এখানে বর্ণাশ্রম

ধর্ম্ম সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। হিন্দু রাজা বেদানুমোদিত, পুরাণে ব্যাখ্যাত, ধর্ম্ম ও সদাচারের অনুকূল হইলেও জনসাধারণের আচার ব্যবহারে বৌদ্ধভাব মজ্জাগত হওয়ায় আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগের মত হিন্দুত্বের পূর্ণ প্রসার এখানে অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধগণ পশ্চিম প্রদেশে জাতির গণ্ডী ভাঙ্গিতে পারেন নাই; একই পরিবারে হিন্দু এবং বৌদ্ধ-মতের অনুকূল লোক থাকায়, ধর্ম্ম-বিশ্বাস জাতির মূলে আঘাত করে নাই। বাঙ্গলার মুষ্টিমেয় আর্য্যসন্তান পশ্চিমের আদর্শে জাতিপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই; বরং বৌদ্ধপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও আদর্শ হইতে স্খলিত এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি আচার হীনতায় ব্রাত্যমধ্যে গণিত হইয়াছিলেন। পাল-রাজগণের অধিকারে বৌদ্ধভাব দেশের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে; ইহার পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু তন্ত্রগুলিতে নূতন প্রণালীর বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ পড়িতে-ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং সাধনের প্রকৃতি প্রাচ্য ভারতের সমাজশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাকে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সারস্বত, সপ্তশতী প্রভৃতি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা সমাজে বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিতেন না; নানা শ্রেণীর বৌদ্ধভাবাপন্ন, ব্যবসায় অনুসারে গঠিত, জাতির পৌরহিত্য করিয়া তাঁহারা যেটুকু সম্মান পাইতেন, তাহাতেই তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের সম্ভ্রম বজায় থাকিত। প্রাচীন তন্ত্রে পদ্মহস্ত বুলাইয়া বৌদ্ধ সাধনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস এই প্রাচীন শ্রেণীর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরই কার্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। শক্তিবাদের নবপ্রচারে পীঠাদির স্থান নির্দ্দেশ ইহারাই করেন কিনা, তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। অনেক তন্ত্রের বর্ত্তমান পরিচ্ছদ পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত ব্রাহ্মণদল পরে দিয়াছেন, এ উক্তিও বিচারসহ। ধর্ম্মপ্রচার এই ব্রাহ্মণদিগের ব্যবসায় ছিল না; নিজ সদাচার ও ধর্ম্মসাধনায় তাঁহারা এদেশে নব হিন্দুভাবের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শেষ সপ্তশতী

প্রভৃতি দেশীয় ব্রাহ্মণেরা যখন ইহাদের সহিত বৈবাহিক ও অন্য সম্বন্ধে মেলা-মেশা করিতে আরম্ভ করেন, সেই কালে অর্থাৎ মুসলমান অধিকারেই তাঁহাদের প্রভাব সমাজের নিম্নতর স্তরেও অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু হেবজ্রযান হইতে কালচক্রযানে পৌছিতে কতটা সময় লাগে এবং বৌদ্ধ সহজ সাধনা এবং দেহতত্ত্ব কতকালে কি ভাবে চোঁয়াইয়া হিন্দুত্বের নূতন বোতলে পোরা হইয়াছে, এসব কথার সন্ধান একালের হাওয়া-গাড়ী-চালক মকার সাধক পুরাবিৎ দিতে পারেন।

সেন-রাজগণের অধিকারে বাঙ্গলায় জনসাধারণের মধ্যে পুরাণ এবং তন্ত্রোক্ত শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রচার যে যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ সে কালের গ্রন্থাদিতে এবং অধুনা আবিষ্কৃত দেবমূর্ত্তিগুলিতে পাওয়া যায়। দ্বিভূজা হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ ভূজা পর্য্যন্ত দেবীমূর্ত্তি নানা যুগের সাধনা প্রকটিত করিতেছে। শক্তি-উপাসনা আধুনিক এই মতবাদের সমালোচনা বৃথা হইলেও এস্থলে দুই চারিটি পৌরাণিক কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে আত্মাশক্তি ভূলোক ও দ্যুলোকের পরে বর্ত্তমানা, স্বর্গ মর্ত্ত্য তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না; কেনোপনিষদে এবং ছান্দোগ্যে উমা হৈমবতী সিংহবাহিনী ভগবতীর প্রাচীন উপাখ্যান আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, ব্রহ্ম, অগ্নি, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। দেবী-ভাগবতে শরৎকালে মহাপূজার উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশে উমাদেবীর বর্ণনা আছে, কিন্তু দুর্গা পূজার উল্লেখ নাই। প্রাচীন মৎস্যপুরাণধৃত দুর্গা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখিলে দুর্গা-পূজার প্রাচীনত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মহাভাগবত পুরাণের অষ্টোত্তর-শত নীলপদ্ম দ্বারা দেবী-পূজার আখ্যান সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস নিজ রামায়ণে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতে ব্রজগোপীর পতিলাভ-ব্রতে ভদ্রকালী কাত্যায়নী পূজার উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের তিনটি আখ্যান-

সর্ব্বজন-পরিচিত; মহিষমর্দ্দিনী বা চণ্ডীপূজা এই পুরাণ হইতেই বাঙ্গালী পাইয়াছে। দেবী, কালিকা প্রভৃতি পুরাণে উল্লিখিত পূজাপদ্ধতি কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালের হইতে পারে। "কুল্লুক ভট্টের বংশে কংসনারায়ণ দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেন" এ উক্তি কোন্ উল্লুকের মস্তিষ্ক প্রসূত জানি না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্ণনা এবং চৈতন্যভাগবতে দুর্গাপূজার বহুপ্রচারের উল্লেখও এই শ্রেণীর লোকে লক্ষ্য করে না। রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীদত্ত রায় মুকুট, হলায়ুধ, বিদ্যাধর, জীমূতবাহনাদি দুর্গাপূজার কথা লিখিয়াছেন। উমা হৈমবতী কথা লইয়া নানা পণ্ডিত নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করেন। প্রাচীনেরা স্বর্গে অর্থাৎ হিমালয় অঞ্চলেই দেবদেবীর আবাস কল্পনা করিয়াছিলেন একথা আমলে না আনিয়া কোন্ পূজা পাহাড়ে বা অসভ্য জাতির, ইহার নির্ণয়জন্য এযুগের মনীষিরা অনেকটা মাথা ঘামাইতেছেন। পুরাণকে নূতন প্রতিপন্ন করিতে পারিলে অনেক পণ্ডিত কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু এযুগে আবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আগম বা তন্ত্রের উল্লেখ সংহিতা, পুরাণ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও আছে; শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে ষট্‌চক্রের উল্লেখ করিয়া তান্ত্রিক সাধনা লক্ষ্য করিয়াছেন।

'যোগাচার' মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা প্রাচীন হিন্দু তান্ত্রিক মত আংশিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। গুপ্তযুগে উত্তর-ভারতে হিন্দু এবং বৌদ্ধমতের আদান প্রদান অধিক হইয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটেরা সময়ে সময়ে বৈদিক অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও বৌদ্ধপ্রভাবে বৈষ্ণব মতই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভাগবতপুরাণেও যজ্ঞার্থে পশুবধের ব্যবস্থা আছে। দয়াধর্ম্মের সমধিক প্রচার বৌদ্ধ প্রভাবের ফল সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনায় বৌদ্ধেরা যে পৌরাণিক হিন্দুর নিকট ঋণী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; শৈব এবং শক্তি

আগম নিগমের বহুলপ্রচার বাঙ্গলায় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাদের জন্মস্থান পশ্চিমে। কান্যকুব্জব্রাহ্মণেরা গুপ্তযুগের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, এবং পৌরাণিক পঞ্চোপাসনার সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পর হইতেই গৌড়ে বেদবিহিত ক্রিয়া এবং বাসুদেব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রথা চলিত হইল; প্রাচীন সিংহবাহিনী মূর্ত্তিগুলিও এই কালের বলিয়া অনুমিত হয়। সেন-রাজগণের সময়ে দেশের সর্ব্বত্র দেব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা অধিক পরিমাণে হইয়াছিল বলিয়াই এখনও নানাস্থানে মূর্ত্তির বহুতর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে 'দেউল দেহরা ভাঙ্গে' উক্তিতে মূর্ত্তিগুলির বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করে। বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবমূর্ত্তির পার্থক্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; বাঙ্গলায় বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তির অনুকরণে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্ভবপর। সূর্য্য, গঙ্গা এবং চণ্ডীমূর্ত্তিও বাঙ্গলার অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। মৃৎ-প্রতিমা নির্ম্মিত করাইয়া গৃহস্থের দুর্গোৎসবপ্রথা কতকালের ইহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দিষ্ট না হইলেও ভারতের অন্যান্য ভাগের মত বাঙ্গলায় শক্তি উপাসনা যে পৌরাণিকযুগে ছিল, ইহা ইঙ্গিত করা গিয়াছে। মহিষমর্দ্দিনী ভগবতীর আরাধনা বিশেষভাবে প্রচলন ব্রাহ্মণ আগমনের সমকালবর্ত্তী হওয়াই সম্ভব এবং সেই যুগেই বঙ্গে শৈবধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হওয়ার অনেক তন্ত্র নূতন পরিচ্ছদ পাইয়াছে। শৈবাগমের প্রাচীনতা কষ্টেস্থষ্টে স্বীকার করিলেও নিগম অর্থাৎ দেবী-প্রোক্ত তন্ত্রগুলি যে বাঙ্গালীর নিজস্ব, ইহাই অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস। শাক্ত-ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা যদি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কৃতত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে বরং বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছু আছে; শক্তি-উপাসনা যে বঙ্গে পরিপুষ্ট হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সেন-রাজগণের অনেকেই শৈব ছিলেন, ইহা তাঁহাদের অনুশাসনোক্ত

বিশেষণে প্রমাণিত হয়। এ যুগে ব্রাহ্মণপ্রভাবে মধ্যবঙ্গের ভদ্রসমাজে শৈবধর্ম্ম যেমন প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই সঙ্গে শৈব তন্ত্রগুলিরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। সমাজে সদাচার এবং ধর্ম্মভাব পরিপুষ্টির নিমিত্ত রাজা এবং সমাজ-নায়কবর্গের সমবেত চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধভাবাপন্ন সাধারণ লোকের মধ্যে শৈবমতে অনুপ্রাণিত নাথ সম্প্রদায়ের সাধনা সমধিক সমাদর লাভ করিতেছিল; পক্ষান্তরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা এবং সহজিয়া মতও নানাশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-দেবতার উপাসনায় আনন্দ লাভ করিত। এমন সময়ে বিদেশীয় ধর্ম্মান্ধ জাতির আক্রমণ ও উৎপীড়নে উত্তর ও মধ্যবঙ্গ ত্রস্ত হইল। কিয়ৎকাল মুহ্যমান অবস্থায় সমাজ কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিল। পরে ক্রমশঃ দেশের অবস্থা এবং জাতিগত আচার ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ-রক্ষার চেষ্টা চলিল। দায়ভাগে জীমূতবাহন ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া গেলেন; ভবদেব বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড মিলাইয়া বৌদ্ধভাবাপন্ন জনসমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পদ্ধতি প্রচার করিলেন। নিবন্ধকারেরাও ঐ ভাবে বাঙ্গালী হিন্দুর নিমিত্ত স্মৃতির ব্যাখ্যায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দিকে মনোযোগ দিলেন। এখন পৌরাণিক দেবদেবী ব্যতীত মনসা, বাসুলী, ষষ্ঠী প্রভৃতিও স্থান পাইলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কর্ত্তব্য এবং ব্যবহার উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। 'দেব পূজায় সকলেরই অধিকার আছে' এই প্রাচীন মত নিবন্ধকারের মধ্যে তিনিই বিশেষরূপে ধরিয়াছেন;—নানা দেবতার সৃষ্টিতে এই মতের প্রচলন আবশ্যক ছিল। তখন হিন্দুর তন্ত্রে বৌদ্ধ তন্ত্র মন্ত্রও স্থান পাইয়াছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া মত দেহতত্ত্বে মিলিয়া, হিন্দুর ষট্চক্রের এবং কুলকুণ্ডলিনী আদি শক্তির মধ্য দিয়া তান্ত্রিক মতের কুলস্ত্রী সাধন প্রভৃতি অভিনব ব্যাপারের রচনা

করিতেছিল। দেহস্থ আত্মাই পরমাত্মা—তাঁহার ধ্যান ধারণাই ধর্ম্ম,—দেহভাণ্ডে আত্মস্থ দেবতাই পরম দেবতা,—ইত্যাদি মত বৌদ্ধ এবং হিন্দু-ভাবে মিলিয়া কয়েক শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছে।

হিন্দুযুগে বাঙ্গলায় পৌরাণিক ভাগবত ধর্ম্মের সাধনায় বাসুদেব বিষ্ণুমূর্ত্তির আরাধনা প্রচলিত ছিল, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। শেষদিকে যখন পশ্চিমাঞ্চলে সনক এবং নিম্বার্ক প্রভৃতি ভাগবত-সাধকেরা 'মামেকং শরণং ব্রজ' উপদেশ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ এবং ঐকান্তিকী ভক্তিই সার ধর্ম্ম এই মতের বিশেষ প্রচার করিতেছিলেন, তখন নানাস্থানে রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত হইতেছিল। 'রসো বৈঃ সঃ' এই মহাবাক্য পাঞ্চোপাসকের মধ্যে বৈষ্ণবেরাই বিশেষরূপে নিজ সাধনায় নিয়োগ করিয়া শ্রীরাধা ও সখীবর্গের মধুর কৃষ্ণে তন্ময়তার অনির্ব্বচনীয় সুধারস উপভোগের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শেষাংশ যে যুগেই রচিত হউক, হালা সপ্তশতীর 'রাধা' সংযুক্ত গাথা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে নব ভাগবত ধর্ম্মের স্রোত যে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অজেয় কবি জয়দেবের কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা আকস্মিক নহে। সেক শুভোদয়া গ্রন্থে উল্লিখিত লক্ষ্মণ-সেনের রাজসভায় বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর কীর্ত্তন নর্ত্তনের ব্যাপার সম্ভবতঃ জয়দেবের গীতাবলী প্রসঙ্গেই হইয়াছিল। কিন্তু সে যুগে শৈব শাক্ত-প্রধান গৌড়ীয় ভদ্রসমাজে এই নব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব সমধিক বিস্তৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। একদিকে সহজ সাধনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যেমন এই বৈষ্ণব মতের প্রসার হইতেছিল, অন্যত্র তেমনই তন্ত্রোক্ত বামাচার এবং বীরাচার সাধনও কালবশে অপচার আনিয়া ফেলিতেছিল।

নারীর হাবভাব দর্শনে লালসা-বদ্ধ মূঢ় মানব কামপ্রবৃত্তির পরিচর্য্যায়

ধাবিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। তাহাকে পাইবার আশায় ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সহজ বা যুগল সাধনা যে উৎকৃষ্ট পন্থা, সময়ে ইহা বুঝাইয়া রূপসীকে আবদ্ধ করা চলে, কারণ ধর্ম্মসাধন কামিনীর নিজেরও কাম্য। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সর্ব্বত্র সকল সমাজেই চলিয়াছে। ধর্ম্মভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত, কাম-কলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর; সুতরাং উভয়ে মিলিতে অধিক সময় লাগে না। তাই অর্ব্বাচীন বৌদ্ধের সহজ সাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শাক্ত তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্বে যোগিনী সাধন, ইত্যাদি ব্যাপার বাঙ্গলার নরম মাটিতে সত্বরে পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার অপ-ব্যবহারে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শাক্তসাধক যখন ইন্দ্রিয়সেবাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল; মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাসুলী প্রভৃতির পূজায় এবং তামসিক উৎসবে সাধারণ লোকের ধর্ম্ম-কর্ম্ম যখন বিকৃত হইয়াছিল, তখন প্রতিক্রিয়ায় ভাগবত বৈষ্ণব মতের নব আবির্ভাব সহজ হইল। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত এ যুগের মধ্যবঙ্গের ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে (১)। উচ্চ শ্রেণীর লোকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, দেব ও অতিথিসেবা যথারীতি পালন করিলেও সাধারণের ধর্ম্মজ্ঞান ও নৈতিক অবস্থা বড় উচ্চ ছিল না। দুইশত বর্ষের উর্দ্ধকাল বিপ্লবের এবং অনাচার অত্যাচারের পরে হোসেন শার সমকালে যখন দেশে শান্তি ও সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হইল তখন মধ্যবঙ্গে শাস্ত্র-চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচারেরও অনেক পরিমাণে সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা হইতে-ছিল। কিন্তু এই সংস্কারের ফল সমাজের নিম্নস্তরে প্রবেশলাভ অল্প-কালের মধ্যে করিতে পারে নাই।

গীতগোবিন্দ রচনার যুগে রাধাকৃষ্ণ উপাসনা পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত

(১) ২২৩ পৃষ্ঠা; ভ্রমক্রমে এস্থলে 'চৈতন্য চরিতামৃত' ছাপা হইয়াছে।

ছিল। মহারাজ লক্ষ্মণসেনও এই নব বৈষ্ণব মতের অনুকূল ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সাধারণের মধ্যে কৃষ্ণলীলা যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, সম্প্রতি প্রকাশিত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তাহার আভাষ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত রাধাকৃষ্ণ কথা পশ্চিম বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর নায়ক-নায়িকার উপযুক্ত হইয়া কি সাজ পাইয়াছিল, তাহা এই কীর্ত্তনে দৃষ্ট হয় (২)। এখানে কুট্টিনী বড়াই বুড়ীর কার্য্য-কলাপ এবং রাধাকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার তখনকার গোয়ালা সমাজের উপযুক্ত হইতে পারে। যে চণ্ডীদাস 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ' প্রভৃতি অমূল্য গীতাবলী রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই অপর এক ব্যক্তি। তাঁহার ভাষা কীর্ত্তনীয়াদের দ্বারা কালে কালে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্য যে চণ্ডীদাসের রস-কীর্ত্তন সঙ্গোপনে আস্বাদন করিতেন, তিনি এই চণ্ডীদাস তাহাও নিশ্চয়। বিদ্যাপতি বা এই চণ্ডীদাসের গীতের আদিরস সাধক রাধাকৃষ্ণের বিহারের আধ্যাত্মিকভাবে সহজে লইতে পারেন; বড়ু চণ্ডীদাসের অনেক গীত সহজিয়া ভাবে গঠিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু খাঁটি হিন্দু বৈষ্ণব ইহাকে কৃষ্ণলীলার আদর্শ বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহা হউক, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় রাধাকৃষ্ণের উপাসনা স্থানে স্থানে প্রচলিত থাকিলেও ভদ্রসমাজে উহার বহুল প্রচার হয় নাই। বৃন্দাবন দাস 'সংসার কৃষ্ণভক্তিশূন্য' বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন; গীতা ভাগবতাদি পাঠকেরাও ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যা করেন না বলিয়াছেন। অতঃপর পরম বৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যানুশিষ্যবর্গ যখন নবদ্বীপে ভাগবত-ধর্ম্মের চর্চ্চা আরম্ভ

(২) এ বিষয়ে মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন; প্রমাণ যথেষ্ট দেন নাই।

করিলেন, তখনই গয়া হইতে অন্যতম প্রধান শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট উপদেশ পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে ফিরিলেন। শ্রীবাস-ভবনের ধর্ম্মসভা গৌরচন্দ্রের প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে এক অপূর্ব্ব নবরসে প্লাবিত হইল। তখন অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ আসিয়া যোগ দিলেন। শ্রীচৈতন্যের মধুর ধর্ম্মভাব সম্মুখে জ্বলন্ত বর্ত্তিকার মত পথ দেখাইয়া দিলে আর ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিল না। প্রচারকের যাহা অসাধ্য, তাঁহার ভাবময়ী রাগানুগা ভক্তি সহজেই লোকের মন সেদিকে আকৃষ্ট করিল। শ্রীরূপ সনাতনাদি পণ্ডিত বিষয়ী লোকও সংসার ত্যাগ করিয়া ঐ ভাবে মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন; আঢ্য জমিদারপুত্র রঘুনাথ ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া ধন্য হইলেন।

মধ্যবঙ্গের শাক্ত ভদ্রসমাজ এই নব বৈষ্ণব ভাব গ্রহণ করিল না। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত সমাজে সন্ন্যাসার ধর্ম্মপ্রাণতা চিত্ত বিকার বলিয়া সকল যুগেই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য শ্রীক্ষেত্রে এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ বৃন্দাবনে রহিয়া গেলেন। ত্যাগী নিত্যানন্দ পরিণতবয়সে দুইটি বিবাহ করিয়া নবধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডীরা নিন্দা করিলেও তাঁহার প্রভাব ও উপদেশে সপ্তগ্রামী সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি সমাজে উপেক্ষিত জাতি সত্বরেই এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল। শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মভাবের আদর্শই দেখাইয়া গেলেন; মতের ব্যাখ্যা দিলেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা। বৈষ্ণব সমাজের নবপ্রতিষ্ঠা নিত্যানন্দ এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি গুরু পরম্পরার কার্য্য। প্রথম যুগে প্রবর্ত্তক এবং আচার্য্যেরা পথ দেখাইলেন, মহাজন কবিগণ উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিয়া নব বৈষ্ণব সাধনার পুষ্টিসাধন করিলেন, কিন্তু কালবশে এই শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ ক্রিয়ারও অপব্যবহার আসিয়া যুটিল। শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শনে 'সেইত পরাণ নাথ পাইনু, যার লাগি মদন দহনে ঝুরি-

গেনু' এই উক্তি এবং তাঁহার বিরহভাবের বিকাশ সাধারণে ধারণা করিতে অক্ষম। কবিরাজ গোস্বামীর 'মোর পিতা, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই করে মোরে শুদ্ধ রতি', উক্তি এবং কাম প্রেমের পার্থক্য নির্দ্দেশ সাধারণ বৈষ্ণবের বোধগম্য হয় নাই। মাধুর্য্যরসে পতিভাবের ভজন, হৃদয়ের ব্যাকুলতা—একান্ত নিষ্ঠার জ্ঞাপক; ইহা ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালী সমাজে পরতন্ত্রা নারীর ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। তাই বাঙ্গলায় পরকীয়া মতের কল্পনা, যোষিৎ সম্ভোগরূপ প্রেমের ভিতর দিয়া সহজ পন্থার মহাসুখবাদের সহিত মিলিয়াছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি যাহা হিন্দু বৈষ্ণবের প্রধান কাম্য, তাহাই এইভাবে বিকৃত হইয়াছে। অলস, ভোগাসক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব শেষে পরকীয়া সাধনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের সাহিত্যও জাতীয় স্বভাবের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মমত সকলের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। সেই জন্যই বৌদ্ধ দোঁহায় সহজ সুখ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত; শাক্ততন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব মকার সাধনায় এবং বৈষ্ণব প্রেম কামে পরিণত হইয়াছে। সময়ে সময়ে আগমবাগীশের মত সাধক শাক্তমতের এবং নরোত্তম প্রভৃতির মত সাধু বৈষ্ণবের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের উদ্যম করিলেও অধঃপতিত বঙ্গীয় সমাজে সাধারণ লোক ধর্ম্ম-বিষয়ে নিতান্ত নির্জীব অবস্থাতেই কালাতিপাত করিয়াছে। যে ভাবে এই অধ্যায় শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল, গ্রন্থ প্রকাশে নিতান্ত বিলম্ব ঘটায় তাহা না হইয়া এই স্থানেই উপসংহার হইল।

সম্পূর্ণ

নির্ঘণ্ট।